হিন্দুধর্ম-প্রবেশিকা

স্বামী বিষ্ণুশিবানন্দ গিরি

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মহেশ লাইব্রেরী

২—১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ইহা ব্যতীত প্রকাশকের ঠিকানায়ও পাওয়া যায়।

মূল্য : চারি টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

১৯৫৩

মুদ্রাকর—
শ্রীবামনদাস সেন
ট্রুথ প্রেস
৩নং নন্দন রোড
কলিকাতা-২৫

দেবী কন্যাকুমারী

কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারী ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।

মঙ্গলাচরণম্

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিবৈঃ স্তবৈ—
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

নিবেদন

যাঁহারা পণ্ডিত তাঁহাদের হিন্দু ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সব জানা আছে। কিন্তু অধিকাংশ সাধারণ হিন্দুর এই বিষয়ে একটা মোটামুটি জ্ঞানেরও অভাব; প্রধানতঃ তাঁহাদের জন্যই এই গ্রন্থখানা লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া যদি কয়েক জনেরও চিত্তে হিন্দুধর্মের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা ও প্রীতি জাগিয়া উঠে, তবে আমাদের সকল শ্রম সার্থক হইবে। এরূপ পুস্তকে ভুলভ্রান্তি থাকা বিচিত্র নহে। কোথায় কি ভুলভ্রান্তি আছে তাহা জানিতে পারিলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের ইচ্ছা আছে। এই গ্রন্থে মাঝে মাঝে হিন্দুধর্মের সহিত অন্য ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা আছে। ইহার উদ্দেশ্য—পাঠকসমাজে হিন্দু-ধর্মের স্বকীয় রূপকে পরিস্ফুট করা, অন্য ধর্মের নিন্দা নহে।

বানান সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, সংস্কৃত ব্যাকরণে রেফযুক্ত অক্ষরের দ্বিত্ব অনুমোদিত নহে। র্দ্ধ, র্ম্ম, র্ত্ত, র্য্য ইত্যাদির পরিবর্তে র্ধ, র্ম, র্ত, র্য ইত্যাদি ব্যবহারের বিধি। এই পুস্তকে সেই বিধি পালন করা হইয়াছে। বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের মূল মন্ত্রাদি সাধারণতঃ সকলের পড়িবার সুযোগ হয় না। সেই কারণ, সেগুলি পাদটীকায় যতদূর সম্ভব উদ্ধৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এত যত্ন সত্ত্বেও মুদ্রণ-প্রমাদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় নাই। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ প্রয়োজনবোধে গ্রন্থশেষে সংযোজিত শুদ্ধিপত্র দেখিয়া লইবেন। শিবমিতি।

স্বামী বিষ্ণুশিবানন্দ গিরি

বিষয়-সূচিকা

প্রথম অধ্যায়—অবতরণিকা (পৃঃ ১—২৬)

দ্বিতীয় অধ্যায়—হিন্দু ও হিন্দুধর্ম (পৃঃ ২৭—৫১)

তৃতীয় অধ্যায়—হিন্দুধর্মগ্রন্থ (পৃঃ ৫২—১৪৪)

চতুর্থ অধ্যায়—হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব (পৃঃ ১৪৫—১৯৬)

পঞ্চম অধ্যায়—বর্ণাশ্রম ধর্ম ও সামান্য ধর্ম (পৃঃ ১৯৭—২৫১)

ষষ্ঠ অধ্যায়—সৃষ্টি ও প্রলয় (পৃঃ ২৫২—২৮৮)

সপ্তম অধ্যায়—দেবতা ও অবতার (পৃঃ ২৮৯—৩২৬)

অষ্টম অধ্যায়—যোগ-সাধনা (পৃঃ ৩২৭—৩৭৩)

নবম অধ্যায়—আনুষ্ঠানিক ধর্ম (পৃঃ ৩৭৪—৪৩১)

দশম অধ্যায়—হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য (পৃঃ ৪৩২—৪৫১)

সাঙ্কেতিক শব্দের সূচী

ঋক—ঋগ্বেদ

যজুঃ—

অথর্ব—অথর্ববেদ

বৃঃ উঃ—বৃহদারণ্যক উপনিষৎ

ছাঃ উঃ—ছান্দোগ্য উপনিষৎ

তৈঃ উঃ—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ

ঐঃ উঃ—ঐতরেয় উপনিষৎ

কঃ উঃ—কঠ উপনিষৎ

শ্বেঃ উঃ—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ

মুঃ উঃ—মুণ্ডক উপনিষৎ

কেঃ উঃ—কেন উপনিষৎ

কৈঃ উঃ—কৈবল্য উপনিষৎ

জাঃ উঃ—জাবাল উপনিষৎ

বৃঃ জাঃ উঃ—বৃহজ্জাবাল উপনিষৎ

নিঃ উঃ—নির্বাণ উপনিষৎ

শাঃ উঃ—শাঠ্যায়নীয় উপনিষৎ

রাঃ পূঃ উঃ—শ্রীরামপূর্বতাপনীয় উপনিষৎ

প্রঃ উঃ—প্রশ্ন উপনিষৎ

ঈঃ উঃ—ঈশ উপনিষৎ

যোঃ উঃ—যোগতত্ত্বোপনিষৎ

তৈঃ ব্রাঃ—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ

ষঃ ব্রাঃ—ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ

মনু—মনুসংহিতা

গীঃ—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

যোঃ রাঃ—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ

বেঃ দঃ—বেদান্ত দর্শন

যোঃ সূঃ—যোগসূত্র

বিঃ চূঃ—বিবেক চূড়ামণি

মঃ নিঃ তঃ—মহানির্বাণ তন্ত্র

জ্ঞাঃ সঃ তঃ—জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র

বেঃ সাঃ—বেদান্তসার

H. C. A. I.—History of Civilisation in Ancient India—By R. C. Dutt.

গ্রন্থকার

——:0:——

প্রথম অধ্যায়।

অবতরণিকা।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার প্রারম্ভে মনে স্বতঃই জাগে সেই আদিপুরুষ সুমহান প্রাচীন আর্যদের কথা। তাঁহারা কোথায় ছিলেন, কি অবস্থায় ছিলেন, কি প্রকারে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন এবং ভারতের কৃষ্টি-সাধনার মূলে তাঁহাদের অবদানই বা কতখানি—এই সকল জিজ্ঞাসা হিন্দুর অন্তরে উপস্থিত হয়। অতএব, এই সকল বিষয়ের অবতারণা যেন অনিবার্য হইয়া পড়ে। সেই কারণ, সর্বপ্রথমে খুব সংক্ষেপে এই বিষয়গুলির কিছু দিঙ্‌নির্দেশ করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

[এক]

আর্য্যগণের আদি বাসস্থান।

পুরাতত্ত্বজ্ঞদিগের মতে ইউরোপীয়গণ, পারসিকগণ এবং ভারতবাসী হিন্দুগণ সুদূর অতীতে এক আর্যগোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। পরে কালক্রমে ভিন্নদেশবাসী, ভিন্নভাষাভাষী, ভিন্নবেশবেশী হওয়ায় তাঁহাদের ভিতর

পৃথক্ পৃথক্ ধর্মমতের উৎপত্তি হয়। এই মতবাদকে আমরা অসার বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি না। ইউরোপীয় কৃষ্টি-সভ্যতার মূল, গ্রীক ও রোমক কৃষ্টি-সভ্যতা। গ্রীক ও রোমক জাতির অভ্যুত্থানের প্রথম স্তরে তাহাদের যে স্ব স্ব জাতীয় সংস্কৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত প্রাচীন আর্যহিন্দুর জাতীয় সংস্কৃতির সৌসাদৃশ্য অনেকাংশে লক্ষিত হয়। আর্যহিন্দুর জাতি—বংশ—গোত্র—শ্রেণী—বৈষম্যের মত, সেকালে গ্রীক ও রোমক সমাজেও কিছু কিছু দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন—গ্রীক সমাজে 'family' ও 'phrataria' এবং রোমক সমাজে 'gens', 'curia', 'tribe' ইত্যাদি। আর্যহিন্দুর মত ধর্মানুষ্ঠান-ব্যাপারে দেবোদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার প্রথাও প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জাতির ভিতর সুস্পষ্ট।

পারসিকগণের সহিত আর্যহিন্দুগণের সৌসাদৃশ্য অনেক বিষয়ে। পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ, জেন্দ্-আবেস্তা। ইহা জেন্দ্ ভাষায় আর্য-ঋষি আবেস্তার দ্বারা লিখিত। সামবেদে এই আবেস্তা ঋষির নাম পাওয়া যায়। জেন্দ্ ভাষার উদ্ভব বৈদিক সংস্কৃত ভাষা হইতে। জেন্দাবেস্তার ছন্দ এবং বৈদিক সূক্তের ছন্দ, প্রায় এক প্রকার। সংস্কৃত 'বেদ' শব্দের অর্থ, জ্ঞান; আবেস্তার 'আবিস্তা' শব্দেরও অর্থ, জ্ঞান। সংস্কৃত 'সোম' শব্দের অর্থ, একপ্রকার পানীয় রস; আবেস্তার "হোম" শব্দের অর্থও তাহা। সংস্কৃত 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ, আরাধনা; আবেস্তার 'যস্ন' শব্দের অর্থও তাহা। 'যজ্ঞ' এবং 'যস্ন' একই 'যজ' ধাতু হইতে 'ন' প্রত্যয় যোগে সিদ্ধ। সংস্কৃত 'গীত' শব্দের অর্থ, গান; আবেস্তার 'গাথা' শব্দেরও অর্থ তাহা। সংস্কৃত 'অথর্বান' শব্দের ন্যায় আবেস্তার 'অথর্বান' শব্দে অগ্নিহোত্রী ঋত্বিক বুঝায়। বৈদিক দেবতা মিত্র, ইন্দ্র, যম, শিব প্রভৃতির উল্লেখ আবেস্তাতে দেখা যায়। প্রভেদ

এই যে, ঋগ্বেদে প্রচলিত—দেবতার উপাসনা; আর, আবেস্তাতে প্রচলিত—অহুরের বা অসুরের উপাসনা। আবেস্তাতে 'দেবতা' শব্দ বিপরীত অর্থে, অর্থাৎ দৈত্য-দানবের অর্থে, ব্যবহৃত। ঋগ্বেদে প্রথমাংশে 'অসুর' শব্দের প্রয়োগ ভাল অর্থে হইয়াছে। 'অসু' অর্থাৎ প্রাণ; 'অসু-র, শব্দের অর্থ, প্রাণবায়ুর মত অমূর্ত বা রূপহীন। ঋগ্বেদের প্রথমাংশে এই অর্থে অসুর শব্দ ব্যবহৃত, সুর শব্দের বিপরীত অর্থে নহে। পারসিকগণ একেশ্বরবাদী—এক অহুর-মজ্‌দার উপাসক। সংস্কৃত ভাষায় অহুর-মজ্‌দা—অসুরো মহান! মহান অসুরই পরমেশ্বর। এখানে পরমেশ্বর অমূর্ত বলিয়া অসুর, সুরগণের বা দেবতাগণের শত্রু বলিয়া অসুর নহেন। বৈদিক দেবতাগণ পরমেশ্বরের প্রতীক। মনে হয়, বেদের এই প্রতীকোপাসনা পারসিকগণ গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহারা এই উপাসনার বিরোধী হইয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত তাঁহারা বৈদিক দেবতাদের নাম কদর্থে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। সেকালে এই উপাসনা-বিরোধ চরম অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। জেন্দাবেস্তাতে বৈদিক দেবতাদের এবং দেবোপাসক আর্যদের প্রতি স্থানে স্থানে নিন্দাবাদ ও গালিবর্ষণ আছে, ইহা সত্য। তবে এই কথা সুস্পষ্ট যে, অসুরোপাসক পারসিকগণ এবং দেবোপাসক আর্যগণ যমজ ভ্রাতা—এই কলহ, ভ্রাতৃকলহ মাত্র। পারস্যের প্রাচীন নাম, ইরাণ। আর্যদের অয়ন বা বাসস্থান—আর্যায়ন। এই আর্যায়ন শব্দেরই অপভ্রংশ, ইরাণ। ইরাণ বলিতে আর্যগণের বাসস্থান বুঝায়।

এই সব তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী অনুমান করেন যে, ইউরোপীয়গণের, পারসিকগণের এবং ভারতীয় আর্যগণের আদি পিতৃপুরুষ সুদূর অতীতে একস্থানে বাস করিতেন, এক ভাষা বলিতেন, এক দীক্ষা-শিক্ষা লাভ করিতেন এবং এক আর্য

জাতির অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ইহা সত্য হইলে, সেই জনকস্বরূপ মূল আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। সনাতনী হিন্দু বলেন—আর্য সভ্যতার ও আর্য চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ ফল হইল বেদ এবং সেই বেদ যখন সর্ব প্রথমে ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল, তখন আর্যদের আদি বাস ছিল এই ভারতে ; এমন হইতে পারে যে, পরবর্তীকালে ভারতীয় আর্য হিন্দুগণের শাখা বহির্ভারতে যাইয়া পারস্যে ও ইউরোপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন (১)। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি—বেদ সংহিতায় কোথাও আর্যদের বহির্ভারত হইতে আগমনের কথা নাই। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই মতবাদ সমর্থন করেন না। বর্তমান কালে কয়েকজন প্রাচ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণও ইহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অধিকাংশ পাশ্চাত্য পুরাবিদ্দের অভিমত—আর্যগণের আদি বাসস্থান, মধ্য এসিয়া। কেহ কেহ বলেন—Sweden, Northern Europe, Germany, Central Europe, North Africa, South Russia ইত্যাদি। কোন কোন প্রাচ্য পণ্ডিত (২) বলেন—এই আদি বাসস্থান ছিল আমুদরিয়া নদীর (Oxus river) উৎপত্তি স্থানের সন্নিকটে একদিকে হিমানী-মণ্ডিত মেরু ও অপর দিকে কালাগ্নি-সঙ্কুল মাল্যবান পর্বতের পাদদেশে জম্বু নামক উপত্যকায়। প্রসিদ্ধ শ্রীবালগঙ্গাধর তিলক মহারাজের অভিমত (৩)—এই আদি বাসস্থান, উত্তর মেরু বা সুমেরু। অধুনা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মণ্ডলেশ্বর মহারাজ বিশদ গবেষণার পর সুমেরুই

(১) প্রখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দজীরও এই অভিমত।

(২) শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল কৃত, বেদ-প্রবেশিকা।

(৩) তাঁহার কৃত, The Arctic Home of the Vedas।

যে আর্যগণের আদি বাসস্থান তাহা প্রকারান্তরে সমর্থন করিয়াছেন। (৪) তাঁহার সুচিন্তিত যুক্তিবাদের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদে যে 'সপ্তসিন্ধু' শব্দের প্রয়োগ আছে, তদ্দ্বারা পঞ্চনদ বা পঞ্জাব বুঝায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রাচীন আর্য-পারসিকগণের আদি বাসস্থান —আর্যনোবীজো। আর্যনোবীজো অর্থাৎ আর্যগণের বীজভূমি বা আদি বাসস্থান। ইরাণী সাহিত্যে এই আর্যনোবীজোর উত্তরমেরুর নিকটবর্তী স্থান বলিয়া কথিত। এই আর্যনোবীজো বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সেখানে সাত মাস দিন ও পাঁচ মাস রাত্রি। মেরুপ্রদেশেও ছয় মাস দিন এবং ছয় মাস রাত্রি। জেন্দাবেস্তাতে দেবোপাসকদের প্রতি অসুরোপাসকদের গালিবর্ষণকালে এই উক্তি আছে—দেবগণ উত্তর দিকে ধ্বংস হোক। ইহার দ্বারা সূচিত হয় যে, দেবোপাসক-দিগের বা বৈদিক আর্যদিগের আদি বাসস্থান ছিল আর্যনোবীজোর উত্তর দিকে—সুমেরুতে। আর্যনোবীজোর উত্তর দিকে সুমেরু। সুমেরু যে ভারতীয় আর্যগণের আদি বাসস্থান, ইহা হিন্দুর বেদ-পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রের দ্বারাও সমর্থিত। হিন্দু শাস্ত্রের কথা—হিমালয় পর্বত হইল মহাদেবের এবং কুবেরের আবাস, আর সুমেরু হইল ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি অন্য দেবতাদের আবাস। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৩৯ অধ্যায়ে সুমেরু যে দেবস্থান, ইহা স্পষ্ট উল্লিখিত। বিষ্ণুপুরাণ বলেন যে, বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষাকু এবং তাঁহার বংশধরগণ সুমেরুতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। জ্যোতিঃ-শাস্ত্র সূর্যসিদ্ধান্তও বলিয়াছেন যে, সুমেরুই দেবস্থান। ঋগ্বেদে অনেক স্থলে তুষার-মণ্ডিত গিরি-শিখর এবং পার্বত্য স্রোতস্বতীর উপর ভাসমান তুষার-ক্ষেত্র

(৪) তাঁহার কৃত, Vedic Culture।

ইত্যাদির বর্ণনা আছে। "বীভৎস দিব্যজল," অর্থাৎ আকাশ হইতে বীভৎস শিলাবৃষ্টি, ইত্যাদিরও উল্লেখ আছে। এই সকল বর্ণনা তুষারাচ্ছন্ন সুমেরু প্রদেশকে ইঙ্গিত করে।

মার্কিন পণ্ডিতদিগের মতে, শেষ তুষার-যুগ (glacial period) ঘটিয়াছিল দশ হাজার বৎসর পূর্বে, এবং তাহার ফলে যে প্রবল নীহার-প্লাবন হয়, তাহার শেষ হয় আট হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দের প্রাক্কালে। ঐ তুষার-যুগের প্লাবনধারায় সুমেরুপ্রদেশ ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহ নীহার-সমুদ্রে পরিণত হয়। সেই হেতু দেবোপাসক আর্যগণ এবং অসুরোপাসক আর্যগণ উভয় দল ঐ অঞ্চল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। উপযুক্ত বাসস্থানের অনুসন্ধানে যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রাচীন আর্যদিগের এই যাযাবর বৃত্তির নাকি উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের বহু সূক্তে দেখা যায় যে, প্রাচীন দেবোপাসক আর্যগণ তাঁহাদের স্থায়ী বাসোদ্দেশে যাত্রার পথে দেবতাদের নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন—হে দেবগণ! তোমরা আমাদের এই দস্যু-তস্করময় বিপদসঙ্কুল যাত্রাপথে রক্ষা কর এবং আমাদের স্থায়ী বাসোপযোগী গৃহনির্মাণস্থান ও উর্বর ক্ষেত্র দাও। তাঁহাদের থাকার জন্য নিরানব্বইটি স্থান ইতস্ততঃ নির্দিষ্ট হয়, এই কথাও ঋগ্বেদে (১) আছে। মনে হয়, এই যাত্রাপথে যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বনে তাঁহারা সাময়িক ভাবে এই সকল স্থানে বসবাস করেন এবং পরিশেষে বহু বৎসর বাদে ভারতবর্ষে উপনীত হন। অসুরোপাসক আর্যগণ তাঁহাদের আদি বাসস্থান আর্যনোবীজো পরিত্যাগ করিয়া পর পর পনেরটি স্থানে বসবাস করেন এবং সেই সকল স্থানের নাম

(১) ঋক. ৭।১৯।৫

জেন্দাবেস্তাতে স্পষ্ট পাওয়া যায়। (২) শেষের দশ বারটি স্থান আফগানিস্থানে ও পারস্য দেশে। পারসিকদিগের শ্রেষ্ঠ তীর্থঙ্কর ধর্মরাজ জরথুস্ত্র (Zoroaster) জন্মগ্রহণ করেন পারস্যের অন্তঃপাতী তেহারাণের সন্নিকট রঘরজই নামক এক নগরে। জেন্দাবেস্তায় এই স্থানের উল্লেখ আছে। যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বনে যাত্রাপথের শেষে দেবোপাসক আর্যগণ যেমন দেব-নির্দিষ্ট এই পুণ্য ভারতভূমিতে স্থায়ী বাসস্থান লাভ করিয়াছিলেন, তেমনি মনে হয় অসুরোপাসক আর্যগণ ও শেষে ইরাণে, অর্থাৎ বর্তমান পারস্যদেশে, অহুরমজ্দা-নির্দিষ্ট স্থায়ী বাসস্থান লাভ করিয়াছিলেন।

আর্যগণই বর্তমান ইউরোপীয়দিগের আদি পুরুষ—এই কথা ধরিয়া লইলে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ঐ যাযাবর দেবোপাসক ও অসুরোপাসক আর্যদের যাত্রাপথের মাঝে কোন শাখা প্রশাখা হয় তো মধ্য ইউরোপে যাইয়া বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন এবং বর্তমান ইউরোপীয়গণ তাঁহাদের উত্তর পুরুষ। দেবোপাসক আর্যগণ যে বহির্ভারতে এসিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে এককালে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বেশ পাওয়া যায়। দুই একটির উল্লেখ এখানে করা যাইতেছে। (৩) অনুমানিক দুইহাজার খৃষ্ট পূর্বাব্দে বাইবেলে কথিত কোশায়ৎ বা কোসিয়ান (Kassites or Kosseans) নামক এক জাতি প্রাচীন বেবিলোন (Babylon) রাজ্য জয় করেন এবং তেরশত খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ অবধি; অর্থাৎ সাত শত বৎসর, রাজত্ব করেন। অবশেষে এসিরিয়ার (Assyria) রাজা তুকুল্-তিনিনিভ (Tukultininiv) ঐ কোশয়ৎদিগকে বিধ্বস্ত করেন।

(২) Vedic Culture.

(৩) Prof, N. K. Dutt—The Aryanisation of India.

এই কোশয়ৎগণ ছিলেন বৈদিক দেবতা সূর্য ও মরুতের উপাসক এবং তাঁহাদের ভাষা ছিল আর্যভাষা; ইহার দ্বারা সহজেই অনুমিত হয় যে, তাঁহারা ছিলেন দেবোপাসক আর্যদের এক শাখা। কেহ কেহ এমনো বলেন যে, এই কোশায়ৎগণ শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশজাত এব কুশ স্থাপিত করিয়াছিলেন কুশস্থান! প্রায় ঐ এক সময়ে দেবোপাসক আর্যদের আর এক শাখা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ইউফ্রেটিশ (Euphrates) নদীর উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহাদের নাম—মিতৌনি (Mitauni)। তাঁহাদের রাজাদের নাম ছিল আর্তম, দুশরও (সংস্কৃত দশরথের অপভ্রংশ) ইত্যাদি; এবং তাঁহারা বৈদিক দেবতা মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যের উপাসক ছিলেন। চৌদ্দ শত খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ অবধি রাষ্ট্রশক্তি তাঁহাদের হাতে ছিল। পশ্চাৎ হিটাইটিস্‌দিগের (Hittitis) দ্বারা তাঁহারা বিজিত হন।

[দুই]

আর্যগণের ভারতাধিকার।

বহির্ভারত হইতে দেবোপাসক আর্যগণ ভারতে আসিয়াছিলেন—এই অভিমতের বিরুদ্ধে কেহ কেহ এই অভিযোগ করেন যে, তাহাতে পবিত্র ভারতভূমির গৌরব ম্লান হইয়া পড়ে। এই অভিযোগ বস্তুতঃ ঠিক নহে। এই পবিত্র ভারতভূমি পূতচরিত্র দেবোপাসক আর্যদিগের স্থায়ী বাসস্থানরূপে দেবতাগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছিল। এই পুণ্য ভারতভূমিতেই সেই পবিত্র কুরুক্ষেত্র ধাম, যেখানে পুরাকালে দেবতাসমূহ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং যাহা সকল জীবের ভগবৎ—আরাধনার উপযুক্ত স্থান বলিয়া কথিত—কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্বেষাং ভূতানাম্ ব্রহ্মসদনম্। (১) আদিকালে আর্যগণ বহির্ভারতের

(১) জাঃ উঃ, ১

যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁহাদের উন্নত চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ ফল যে বেদ, তাহার সঙ্কলন হয় এই পুণ্য ভারতভূমিতে এবং এখানেই আর্য-কৃষ্টি-সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে। ইহা সর্ববাদিসম্মত। অতএব, আর্যগণের বহির্ভারত হইতে ভারতে আগমন স্বীকার করিলেও পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের গৌরব তাহাতে কিছুমাত্র মলিন হয় না।

কেহ কেহ বলেন যে, ভারত-প্রবেশের অব্যবহিত পূর্বে দেবোপাসক আর্যগণ বর্তমান কাবুলের নিকট উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই উপনিবেশের রাজধানীর নাম, প্রতিষ্ঠান। চীনদেশীয় লিপিতে ইহা 'কো—লি—সি—সা—টাং—না' বলিয়া লিখিত হয়। (২) তাহার পর আর্যগণ খাইবার পাশ (Khyber Pass) নামক উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। কোন্ সময়ে দেবোপাসক আর্যগণ ভারতে আগমন করেন, সেই বিষয়ে অনেক গবেষণা হইয়াছে। কোন কোন বিজ্ঞের মতে, ইহা ঘটে আনুমানিক তিন হাজার খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে, অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে। এই অভিমত সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নহে। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার আয়ুকাল যদি হয় ছয় হাজার বৎসর, তবে এই কথা অবশ্য স্বীকার্য যে বৈদিক সভ্যতা আরো প্রাচীন। বৈদিক সভ্যতার চরম বিকাশ যখন ভারতে, তখন ইহা নিঃসন্দেহে ধরা যাইতে পারে যে, কম পক্ষে আজ হইতে সাত হাজার বৎসর পূর্বে প্রাচীন আর্যগণ ভারতে আগমন করেন। ভারত-প্রবেশের পর কোথায় সর্বপ্রথম তাঁহারা বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন, সে সম্বন্ধেও অনেক গবেষণা হইয়াছে। পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যের অনুগামী দেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত—সেই স্থান পঞ্চনদ বা পঞ্জাব। এই অভিমত নির্ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না।

(২) বেদ-প্রবেশিকা।

ঋগ্বেদে ঠিক পঞ্চনদের উল্লেখ নাই ; উল্লেখ আছে, সপ্তসিন্ধু। সপ্তসিন্ধুর অর্থ, সপ্তনদী। ঐ সকল পণ্ডিতের মতে. এই সপ্তনদী হইল সিন্ধুনদের পাঁচ উপনদী এবং তৎসহ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী। কিন্তু ইহাতে সন্দেহ থাকিয়া যায়। জেন্দাবেস্তাতে দেখা যায় যে, অসুরোপাসক আর্যদিগের শেষ উপনিবেশ ছিল রজ্ঞ নামক এক স্থানে এবং তাহার অব্যবহিত পূর্বে ছিল হপ্তহিন্দুতে। এই হপ্তহিন্দু— সপ্তসিন্ধু। আবার, শুক্লযজুর্বেদে মহানদী সরস্বতীও নাকি পঞ্চশাখাযুক্তা বলিয়া কথিত। সেই কারণ, সরস্বতীর পাঁচ উপনদীর সহিত গঙ্গাও যমুনাকে ধরিলে, এই অঞ্চলও সপ্তসিন্ধু হয়। (১) যাহাই হোক, প্রাচীন আর্যগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রথম বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ভারতে আগমনের পর আর্যগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় ভারতের আদিবাসী অনার্যগণের সঙ্গে। বর্তমান কালে কোল, কুকি, নাগা, মুণ্ডা ভিল, সাঁওতাল, ভুলিয়া প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষ ছিল ভারতের আদিবাসী—অনার্য। তাহাদের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ ও নাসিকা চ্যাপ্টা। তাহারা প্রস্তর-লৌহাদির দ্বারা নির্মিত দ্বিতল ত্রিতল গৃহে বাস করিত। তাহাদের অশ্বগবাদি পশুও ছিল। এই অনার্যগণ প্রধানতঃ পশুপক্ষীর কাঁচা মাংসে জীবনধারণ করিত, রান্নার কাজ জানিত না। সিন্ধুনদের পূর্ব দিকে সরস্বতী নদী। (২) ইহা সেকালে পবিত্রতার

(১) Vedic Culture.

(২) পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে, সরস্বতী নদী সিন্ধু নদীর এক উপনদী। ইহা ঠিক কথা নহে। শুক্লযজুর্বেদে সরস্বতী নদী বিশালকায়া এবং তাহার পাঁচটি উপনদী আছে বলিয়া কথিত। অধুনা এই নদী শুকাইয়া যাওয়ায় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বটে, তথাপি গুজরাট প্রদেশে সিদ্ধপুরাতে ইহার তীরে কপিলাশ্রম নামে এক তীর্থস্থান অদ্যাবধি বর্তমান। —Vedic Culture.

জন্য আর্যদের পূজ্য ছিল, একালে যেমন গঙ্গা নদী। কেহ কেহ বলেন যে, সেকালের সরস্বতী একালের ঘাগর নদী। সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকাটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ষাট মাইল এবং প্রস্থে প্রায় বিশ মাইল। এই ভূমিখণ্ড তখন ছিল উর্বর ও সমৃদ্ধ। মনুসংহিতায় এই ভূমিখণ্ডের নাম—**ব্রহ্মাবর্ত**। ব্রহ্মাবর্তের অর্থ, ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের স্থান। প্রাচীন আর্যগণ সর্বপ্রথমে এই ব্রহ্মাবর্তে কৃষিকার্যের প্রচলন করেন। তৎপূর্বে এই দেশে কৃষিপ্রথা ছিল না। আমমাংসভোজী অনার্যদল তাঁহাদিগকে শত্রুজ্ঞানে তীর-ধনু ইত্যাদি অস্ত্রের সাহায্যে আক্রমণ করিতে লাগিল এবং তাঁহাদিগের কৃষিকার্যে বাধা দিতে লাগিল। আর্য-অনার্য-সংঘর্ষের ইহাই ছিল অন্যতম কারণ। আর্য-অনার্য-সংগ্রামই দেবাসুর-যুদ্ধ। আর্যগণ তখন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অনার্যগণের অধিকৃত স্থানসমূহ জয় করিবার অভিপ্রায়ে সমরাভিযান করিলেন। এই অভিযানে প্রথমে তাঁহারা অধিকার করেন উত্তর ভারত। হিমাচল হইতে বিন্ধ্যাচল পর্যন্ত অধিকৃত স্থানের নাম হয়—**আর্যাবর্ত**। আর্যাবর্তের অর্থ, আর্যদের বাসস্থান। তারপর, আর্যগণ বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করিয়া অধিকার করেন দাক্ষিণাত্য, তারপর পশ্চিম ভারত, তারপর পূর্ব ভারত ও বঙ্গদেশ। মহামুনি অগস্ত্য বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্য-অভিযানের নেতৃত্ব করেন। আর্যদিগের এই সকল অধিকৃত স্থানে ক্রমশঃ বহু জনপদ স্থাপিত হয়। সেই সমস্ত জনপদের মধ্যে আর্যাবর্তের অন্তঃপাতী সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ পাঁচটি—কুরু, পাঞ্চাল, শূরসেন, চেদি ও মৎস্য। এই পঞ্চ জনপদ একত্রে—**ব্রহ্মর্ষিদেশ**। ব্রহ্মর্ষিদেশের অর্থ, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের

ব্রহ্মাবর্ত—আর্যাবর্ত—ব্রহ্মর্ষিদেশ

স্থান। সেকালে এই ব্রহ্মর্ষিদেশ নিত্য সামগানে মুখরিত থাকিত। মনু মহারাজের বিধানানুসারে, এই ব্রহ্মর্ষিদেশে প্রচলিত প্রথা ও ধর্মানুষ্ঠান অন্য সকল দেশের সকল আর্য হিন্দুর অনুসরণীয়। ব্রহ্মর্ষিদেশভুক্ত পঞ্চ জনপদের ভিতর ঋগ্বেদে পাঞ্চাল উল্লিখিত কৃবি বা শ্রীঞ্জয় নামে। মৎস্যদেশ এবং চেদিদেশেরও উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে।

ভারত অধিকারের পর আর্যগণ সুশাসনের অভিপ্রায়ে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাদের নাম বেদ-স্মৃতি-পুরাণ-ইতিহাসাদি ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়। এখানে সেই সকল প্রাচীন আর্যহিন্দু রাজ্যের কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় (১) দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রাচীন আর্য-হিন্দু-রাজ্য

(১) কুরুরাজ্য—কুরুক্ষেত্র বা কুরুদিগের ভূমি ছিল পশ্চিমে বর্তমান পাটিয়ালা রাজ্যের পূর্বার্ধ হইতে সমগ্র দিল্লী প্রদেশ, এবং পূর্বে যমুনা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পবিত্রভূমি ব্রহ্মাবর্ত অবস্থিত ছিল এই কুরুক্ষেত্রের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা কুরুরাজ্য ছিল আরো বৃহৎ। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগের উত্তরাংশ ও এই কুরুরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী—হস্তিনাপুর। আজকাল ইহা উত্তরপ্রদেশে মীরাট জেলার অভ্যন্তরে গঙ্গাতীরে। কুরুর প্রতিবেশী, পাঞ্চাল।

(২) পাঞ্চালরাজ্য—এই রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, উত্তর পাঞ্চাল এবং দক্ষিণ পাঞ্চাল। ইদানীন্তন উত্তরপ্রদেশের

(১) Rapson—Ancient India.

অন্তর্গত গঙ্গানদীর পূর্বদিকস্থ এবং আউধ প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ জেলা সমূহ লইয়া ছিল উত্তর পাঞ্চাল। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগের কুরুরাজ্যাধিকৃত স্থান বাদে অবশিষ্ট অংশ ছিল দক্ষিণ পাঞ্চাল। উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী—অহিছত্র। বর্তমানকালে ইহা বেরিলী জেলার মধ্যে রামনগর গ্রামে এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত। দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী—কাম্পিল্য। অধুনা ফরক্কাবাদ জেলার ভিতর ঐ নামে এক গ্রামে পরিণত। এখানে দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদ রাজার রাজধানী ছিল। অহিছত্র এবং কাম্পিল্য এই দুই প্রাচীন রাজধানী মহাভারতে উল্লিখিত।

কুরু-পাঞ্চালের নাম প্রাচীন গ্রন্থসমূহে বহুবিশ্রুত ও বহুকথিত।

(৩) কোশল রাজ্য—পাঞ্চাল রাজ্যের পূর্বে এবং বিদেহ রাজ্যের পশ্চিমে। আজকাল উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অন্তঃপাতী আউধ প্রদেশ। এই রাজ্যের প্রধান নগরী—অযোধ্যা। অযোধ্যা ছিল রাজধানী। অযোধ্যার অপর নাম, সাকেত এবং শ্রাবস্তী। বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে অযোধ্যা সাকেত নামে অভিহিত।

(৪) বিদেহ রাজ্য—বর্তমানকালে ত্রিহুত বা উত্তর বিহার। সম্ভবতঃ বর্তমান চাম্পারণ, মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা জেলা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল ক্ষুদ্র বৈশালী রাজ্য। ইহা সীতা দেবীর পিতা জনক রাজার রাজ্য। ইহার রাজধানী—মিথিলা। বিদেহ রাজ্যের দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ গঙ্গানদীর দক্ষিণে ছিল মগধ রাজ্য, একালের দক্ষিণ বিহার।

(৫) কাশী রাজ্য—বর্তমান বারাণসী এবং তাহার চতুর্পার্শ্বস্থ ভূভাগ। ইহাও সুপ্রাচীন এবং প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বহুবার উল্লিখিত।

(৬) **বৈশালী রাজ্য**—বর্তমান নাম, বসাড়। আজকাল বিহার রাজ্যের হাজিপুর মহাকুমার অন্তর্গত। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থাদিতে বৈশালী রাজ্য সুপ্রসিদ্ধ।

৭। **মৎস্য রাজ্য**—অন্য নাম, বিরাট রাজ্য। বর্তমান কালে রাজস্থানের মধ্যে আলোয়ার রাজ্য এবং তাহার নিকটস্থ প্রদেশ-সমূহ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (১) ঋগ্বেদে ইহার উল্লেখ আছে।

৮। **চেদি রাজ্য**—বর্তমান বুন্দেলখণ্ড এবং বিন্ধ্যগিরির উত্তরাংশ।

৯। **নিষাধ রাজ্য**—বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে, মালব রাজ্যের দক্ষিণে এবং বিদর্ভ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। মহাভারতে কথিত নল রাজার রাজ্য।

১০। **শূরসেন রাজ্য**—বর্তমান কালে উত্তরপ্রদেশান্তর্গত মথুরা ও তন্নিকটবর্তী স্থান সমূহ। এই রাজ্যের রাজধানী—মথুরা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান।

১১। **শাক্য রাজ্য**—হিমালয়ের পাদদেশে বর্তমান নেপাল রাজ্যের সীমানায়। উত্তরে হিমাচল, পূর্বে রোহিণী নদী এবং

---

(১) কেহ কেহ বলেন যে, রাজস্থানের অন্তঃপাতী বর্তমান জয়পুর এবং বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণ-পশ্চিম চালু স্থান।

দক্ষিণে ও পশ্চিমে অচিরাবতী বা রাপ্তী নদী। এই রাজ্যে ক্ষত্রিয় শাক্যগণ রাজত্ব করিতেন। রাজধানী—কপিলাবস্তু। সম্ভবতঃ, ইহা ছিল কোশল রাজ্যের এক করদ রাজ্য। ভগবান শ্রীবুদ্ধ এই শাক্যবংশোদ্ভূত।

১২। বিদর্ভ রাজ্য—অধুনা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বেরার। নল-দময়ন্তীর উপাখ্যানে দময়ন্তীর পিতা নল রাজা এই রাজ্যের রাজা ছিলেন।

১৩। মালব রাজ্য—আজকাল মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত। কিয়ংকাল এই রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—পশ্চিম মালব বা অবন্তী এবং পূর্ব মালব বা আকর। পশ্চিম মালবের রাজধানী—উজ্জয়িনী। পূর্ব মালবের রাজধানী—বিদিশ বা ভিলসা।

১৪। সৌরাষ্ট্র রাজ্য—সৌরাষ্ট্র শব্দের অর্থ, উত্তম রাষ্ট্র বা রাজ্য। বর্তমানকালে পশ্চিম ভারতে কাথিয়াওয়ার এবং গুজরাটের কিয়দংশ। সৌরাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ—সুরাট। ইদানীং এই নামে পরিচিত।

১৫। বৎস রাজ্য—এখন উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদ বা প্রয়াগ এবং তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহ। ইহার রাজধানী—কৈশম্বী।

১৬। অন্ধ্র রাজ্য—দক্ষিণ ভারতে এক বিশাল রাজ্য। আজকাল মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। (২) এই রাজ্যের

(২) সম্প্রতি প্রাচীন অন্ধ্র রাজ্যের কিয়দংশ মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র অন্ধ্র রাজ্য হইয়াছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের রাজধানী—বৈজয়ন্তী। বৈজয়ন্তীর বর্তমান নাম, বনোয়াসী। ইহা অধুনা বোম্বাই প্রদেশের উত্তর-কানারা জেলার অন্তর্গত। এই রাজ্যের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজধানী—ধান্যকটক বা ধারণিকোট্ট। ইহা এখন মাদ্রাজ প্রদেশে গুণতুর জেলায় কৃষ্ণানদীর তীরে অবস্থিত। এই রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী—প্রতিষ্ঠান। ইদানীং হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ঔরঙ্গাবাদ জেলার ভিতর গোদাবরী নদীর তটে অবস্থিত এবং ইহার বর্তমান নাম, পাইঠান।

১৭। **পল্লব রাজ্য**—বর্তমান মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। ইহার রাজধানী—কাঞ্চী। ইহার বর্তমান নাম, কাঞ্চীপুরম্; মাদ্রাজে চিঙ্গলপুট জেলার মধ্যে।

১৮। **বঙ্গ রাজ্য**—বর্তমানকালীন পশ্চিম বঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান এবং নদীয়া জেলা এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯। **গান্ধার রাজ্য**—বর্তমানকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তঃপাতী পশ্চিম পাঞ্জাবে রাওয়ালপিণ্ডি জেলা ও তন্নিকটবর্তী স্থান-সমূহ এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহার প্রধান নগরী—তক্ষশীলা। (৩) এই তক্ষশীলায় ছিল প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে বিদ্যার্থিগণ ঋক-সাম-যজুর্বেদ এবং অষ্টাদশ কলাবিদ্যা শিক্ষা করিত। এখন সেই তক্ষশীলা এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

২০। **কোল রাজ্য**—পল্লব রাজ্যের দক্ষিণে, কাবেরী নদীর

(৩) গ্রীকদিগের Taxila;

দক্ষিণ তটে। ইদানীং মাদ্রাজ প্রদেশে নীলগিরির সন্নিকটবর্তী উডকামণ্ড প্রভৃতি স্থানসমূহ।

২১। **চের রাজ্য**—চোল রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। ইদানীং ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলের কিয়দংশ।

২২। **পাণ্ড্য রাজ্য**—দক্ষিণ ভারতের শেষ সীমানা। বর্তমানকালে মাদ্রাজ প্রদেশে মাদুরা, রামনদ, তুতিকোরিণ প্রভৃতি স্থানসমূহ।

বৈদিক যুগের আরম্ভ হইতে বৌদ্ধযুগের অন্তর্বর্তী কাল পর্যন্ত, প্রাচীন আর্যগণ কর্তৃক মুখ্যতঃ এই বাইশটি প্রধান উল্লেখযোগ্য রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দেখা যায়, ভগবান শ্রীবুদ্ধের আবির্ভাবের প্রাক্কালে পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বত হইতে পূর্বে বঙ্গোপসাগর অবধি এবং উত্তরে হিমালয় পর্বতের পাদমূল হইতে দক্ষিণে মহাসমুদ্র অবধি, এই সুবিস্তৃত ভূখণ্ড আর্যদিগের শাসনাধীনে আসিয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিতে পারা যায়। আজকাল যুদ্ধবিগ্রহের সুদূর লক্ষ্য, বিজিতের শোষণে বিজেতার ভোগলালসার তৃপ্তিসাধন। সেকালে অনার্যদের বিরুদ্ধে আর্যদের সমরাভিযানের সুদূর লক্ষ্য ঠিক তাহা ছিল না। তাহা ছিল বিজিত অনার্যদিগকে উন্নত আর্যসংস্কৃতির ও আর্যসভ্যতার প্রভাবে সুসংস্কৃত করিয়া অবশেষে বিজেতা আর্যদিগের অঙ্গে অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া। সমরাভিযানের ঐ মহৎ উদ্দেশ্য প্রাচীন আর্যঋষি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছিলেন—কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্, বিশ্বের সকলকে আর্য কর। (১) এই নীতির অনুসরণে বিজেতা আর্য

(১) ঋক, ৯।৬৩।৫

সত্যসত্যই বিজিত অনার্যের অনেককে সুসংস্কৃত করিয়া আপনাদের সমাজে স্থান দিয়াছিলেন। আর্যগণের দাক্ষিণাত্য অধিকারের পূর্বে বর্তমান মাদ্রাজ প্রদেশের আদিম অধিবাসী ছিল, দ্রাবিড় জাতি। অবশ্য এই দ্রাবিড় জাতি শিক্ষা-দীক্ষায় অনার্য অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত ছিল। প্রথমে এই দ্রাবিড় জাতি আর্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা গ্রহণে স্বীকৃত হয় নাই। সেই কারণ, আর্যগণের সঙ্গে এই দ্রাবিড়গণের বহু খণ্ডযুদ্ধ ঘটে। পরিশেষে দ্রাবিড়গণ পরাজিত হয় এবং আর্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা গ্রহণে সুসংস্কৃত হইয়া আর্য-সমাজে স্থান পায়।

প্রাচীন আর্যদিগের প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী। কি সত্যধর্ম-নিরূপণে, কি জাতি-সংগঠনে, কি সমাজ-সংগঠনে, কি রাষ্ট্র-সংগঠনে, কি কৃষি-বিদ্যায়, কি যুদ্ধবিদ্যায়, সর্বক্ষেত্রে তাঁহাদের অলৌকিক প্রতিভা দর্শনে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইতে হয়। সেই সুপ্রাচীন যুগে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, আঙ্গিরস ও কণ্ব প্রভৃতি প্রখ্যাত বংশপ্রবর্তকগণের বংশে একাধারে সত্যদ্রষ্টা ঋষি, শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক এবং শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেবোপাসক আর্যগণ ভারতে আসিয়া প্রথমে সপ্তসিন্ধু প্রদেশে বাস করেন। পারসিকগণ সপ্তসিন্ধুকে বলিতেন 'হপ্তহিন্দু'। তাঁহারা 'স' উচ্চারণ করিতে না পারায়, উচ্চারণ করিতেন 'হ'।

ইণ্ডিয়া, ভারত ও হিন্দুস্থান নামের উৎপত্তি

তাঁহাদের এই হপ্তহিন্দু হইতে ভারতীয় আর্যদের নাম হয়—হিন্দু। বেদে এবং পুরাণে হিন্দু নাম পাওয়া যায় না। এই নাম বিদেশীয়, অর্থাৎ বিদেশী পারসিকগণের দেওয়া। পশ্চাৎ ব্যাক্ট্রীয়ান গ্রীক (Bactrian Greek) ভারত অধিকার করিলে, তাঁহারা 'হ' উচ্চারণ করিতে না পারায়, তাঁহাদের ভাষায় 'হিন্দু' শব্দ শেষে 'ইণ্ড' শব্দে রূপান্তরিত হয়। এই ভাবে পাশ্চাত্যজাতির নিকট হিন্দুগণ ক্রমশঃ

'ইণ্ডিয়ান' নামে পরিচিত হইলেন এবং হিন্দুগণের এই দেশ 'ইণ্ডিয়া' নামে অভিহিত হইল। আমাদের এই উপমহাদেশের দেশীয় নাম—ভারত। দুষ্মন্তের ঔরসে ও শকুন্তলার গর্ভে সম্রাট ভরতের জন্ম। সম্রাট্ ভরতের জন্মকথা ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়। (২) ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সম্রাট্ ভরতের সুকীর্তি কথিত। (৩) তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করেন, যমুনাতীরে আটাত্তরটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, গঙ্গাতীরে পঞ্চান্নটি যজ্ঞস্তূপ নির্মাণ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার রাজ্যাভিষেক-উৎসবে দীর্ঘতমা ঋষি পৌরহিত্য করেন। সেই চিরঃস্মরণীয় কীর্তিমান সম্রাট ভরতের দেশ বলিয়া এই উপমহাদেশের নাম—ভারত। সেই প্রাচীন কালে সপ্তসিন্ধুতে উপনিবেশের পর দেবোপাসক আর্যদিগকে আর্যহিন্দু নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। বৈদিক ঋষিগণ ছিলেন আর্যহিন্দু। পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষ আর্যহিন্দুদের আবাস বলিয়া, ইহার নাম হয়—হিন্দুস্থান। বহু মুনি-ঋষি-মহাপুরুষের আবির্ভাব এই হিন্দুস্থানে। সেই কারণ, এই হিন্দুস্থান সত্যসত্যই পূতভূমি ও পুণ্যভূমি।

[তিন]
প্রাচীন ভারতে আর্যহিন্দুর অবদান।

প্রাচীন ভারতে বেদপন্থী আর্যহিন্দু কেবলমাত্র পারমার্থিক বিদ্যায় যে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে ; লৌকিক বিদ্যায়ও তাঁহাদের স্থান অতি উচ্চে। অনেক লৌকিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভাবক, প্রাচীন আর্যহিন্দু। সে সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

---

(২) ঋক,—৬ | ১৬ | ৪, ৭ | ৮ | ৫

(৩) Vedic Culture.

৯। জ্যোতির্বিদ্যা—জ্যোতির্বিদ্যার সুস্পষ্ট পরিচয় ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। (১) চিত্রা, মঘা, মৃগশিরা, মষ্টি (বিসাখা), শুক্রগ্রহ, আর্জুনি বা ফাল্গুনি, সতভিষা, রিক্ষ (Great Bear), শ্বানং (Dog Star) প্রভৃতি নক্ষত্রের নাম ঋগ্বেদে উল্লিখিত। (২) অতএব, এই সকল গ্রহ-নক্ষত্রাদি আবিষ্কৃত হয় বৈদিক যুগে এবং সেই যুগ হইতে তাহাদের নাম অদ্যাবধি প্রচলিত। ঋগ্বেদে দ্বাদশ রাশিচক্রেরও (Zodiac) উল্লেখ আছে। (৩) সূর্যের ছয় মাস উত্তরায়ণ ও ছয় মাস দক্ষিণায়ন (৪) এবং চান্দ্রমাস ও মলমাস (৫), এই সব তথ্যও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। মধু, মাধব, সুক্র, সুচি, নভ এবং নভাস্য, এই ছয় ঋতুরও বর্ণনা তথায় পাওয়া যায়। (৬) সূর্যগ্রহণের বিষয় এবং তুরীয়-ব্রহ্ম-যন্ত্র নামক এক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহা দ্রষ্টব্য, এই কথাও ঋগ্বেদে আছে। (৭) মহামুনি অত্রি ঐ যন্ত্রসাহায্যে সূর্যগ্রহণ দর্শন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সেই সুদূর বৈদিক যুগে জ্যোতির্বিদ্যার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। ষড় বেদাঙ্গের মধ্যে জ্যোতিষ বা জ্যোতির্বিদ্যা একটি অঙ্গ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এবং শুক্ল যজুর্বেদে জ্যোতির্বিদ্‌গণ নক্ষত্রদর্শক ও গণক নামে অভিহিত। পরবর্তীকালে বর্তমান ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা

---

(১) Vedic Culture.

(২) ঋক.—৭।৭৫।৫ ; ২।৩২।২ ; ৫।৫৪।১৩ ; ১০।৮৫ ; ১।১৬১।১৩

(৩) ঋক্‌,—১।১৬৪।১১ ; ১।১৬৪।৪৮

(৪) ঋক,—১।১৬৪।১২

(৫) ঋক,—১।২৫।৮ ; ১।১৬৪।১৮

(৬) ঋক, ২।৩৬

(৭) ঋক, ৫।৪০।৫-৬

তিন জন,—আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রীঃ), বরাহমিহির (৫০৫ খ্রীঃ), এবং ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খ্রীঃ)। বরাহমিহিরের রচিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ও ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ জ্যোতিঃ-শাস্ত্র। প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ ভাস্করাচার্য (১১১৪ খ্রীঃ) সিদ্ধান্তশিরোমণি রচনা করেন। গুরুতর বিষয়ে তাঁহার কতকগুলি সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদবর্গ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন পাঁচ শত ছয় শত বৎসর পরে। (৮) রবি-সোমাদি বার এবং প্রতিপদ-দ্বিতীয়াদি তিথি আবিষ্কার করেন সর্বপ্রথমে সেই প্রাচীন আর্যহিন্দুগণ। কোপার্নিকস্ (Copernicus) জন্মিবার অনেক পূর্বে আর্যহিন্দুই পৃথিবীর দৈনিক গতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পৃথিবীর গতি আছে এবং ইহা স্থির নহে, এই সত্য প্রাচীন আর্যহিন্দু আবিষ্কার করেন গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত পিথাগোরাসের (Pythagoras) বহু পূর্বে। আর্যভট্ট স্পষ্ট বলিয়াছেন—চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি; পৃথিবী চলিতেছে, কিন্তু বোধহয় যেন স্থির রহিয়াছে। অনেকের ধারণা যে, প্রাচীন আযগণ পৃথিবীকে ত্রিকোণাকার বলিয়া জানিতেন। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে পরিষ্কারভাবে লিখিত আছে—কপিত্থফলবদ্বিশ্বং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমম্, পৃথিবী কপিত্থফলের অর্থাৎ কয়েত বেলের ন্যায় গোলাকার এবং উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। আবার অনেকে মনে করেন—সর্পের মাথায় পৃথিবী অবস্থিত, এইরূপ বিশ্বাস ছিল প্রাচীন আর্যদিগের। এই ধারণাও ঠিক নহে। জ্যোতির্বিদ্ সূর্যসিদ্ধান্ত স্পষ্ট বলিয়াছেন—ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি, গোলাকার পৃথিবী শূন্য মণ্ডলে অবস্থিত। নিউটনের (Newton) জন্মগ্রহণের পূর্বে আর্যভট্ট পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী যৎ তয়া প্রক্ষিপ্যতে

(৮) H. C. A. I.

তৎ তয়া বীর্যতে। অর্থাৎ, পৃথিবী আকর্ষণশক্তিবিশিষ্টা ; কেননা, যাহা কিছু প্রক্ষিপ্ত হয় তাহাই পৃথিবী ধারণ করে আকর্ষণশক্তির সহায্যে।

২। **জ্যামিতি বা ক্ষেত্রতত্ত্ব**—ষড় বেদাঙ্গের এক অঙ্গ, কল্পসূত্র। আপস্তম্বের কল্পসূত্র এখনো বিদ্যমান। এই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে সুল্‌ভসূত্র। এই সুল্‌ভসূত্রে যজ্ঞবেদি-প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে ক্ষেত্রতত্ত্ব বা জ্যামিতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথানিয়ম যজ্ঞবেদি-রচনার প্রয়োজনীয়তা-বোধে ক্ষেত্রতত্ত্বের উদ্ভব হয় সেই অতীত বৈদিক যুগে এই ভারতভূমিতে।

৩। **ব্যাকরণ**—ষড় বেদাঙ্গের এক অঙ্গ, ব্যাকরণ বা শব্দ-ব্যুৎপাদক শাস্ত্র। জগতের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ—পাণিনি। মহাভারত রচনারও পূর্বে পাণিনির ব্যাকরণ সূত্র রচিত। ভারতে ব্যাকরণ-শাস্ত্রের উৎপত্তি পাণিনির ও পূর্বে বৈদিক যুগে। আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, কোন ভাষায় দশ হাজার শব্দরাশিকে শেষে অল্পসংখ্যক মূল ধাতুতে পরিণত করিতে পারা যায়। মর্ম—অল্পসংখ্যক ক্রিয়াবাচক প্রকৃতি হইতে বিবিধ প্রত্যয়-যোগে বিবিধ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এই বৈয়াকরণ তথ্যটি কমপক্ষে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বে ভারতভূমিতে সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষাতে এই বৈয়াকরণ সত্যটি সম্পূর্ণ প্রমাণিত। অন্য কোন ভাষা এই বিষয়ে এত সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতে অক্ষম। সংস্কৃত ভাষাতে ব্যুৎপত্তিলাভের পর পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী ভাষা-বিজ্ঞানকে (Philology) আবিষ্কার করিতে

সক্ষম হইয়াছেন। (১) ভারতে পৌরাণিক যুগ অবধি সংস্কৃত ছিল চলিত ভাষা।

(৪) গণিত-বিদ্যা—বীজগণিত, পাটীগণিত ও গোলাধ্যায় (Spherical Trignometry) প্রভৃতি গণিত-বিদ্যার জনক, আর্যহিন্দু। আর্যভট্ট (৪৭৬ খ্রীঃ) প্রথমে বীজগণিত প্রণয়ন করেন। প্রসিদ্ধ ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের (১১৫০ খ্রীঃ) প্রথমাংশ হইল বীজগণিত, লীলাবতী (Arithmetic) এবং গোলাধ্যায়। জ্যোতির্বিদ্যায় ও ক্ষেত্রতত্ত্বে বীজগণিতের প্রয়োগ একমাত্র আর্যহিন্দুর মস্তিষ্ক-প্রসূত। পাটীগণিতে দশমিক রাশিতত্ত্বের আবিষ্কর্তা, আর্যহিন্দু। আর্যহিন্দুর বীজগণিত আরবি ভাষায় ভাষান্তরিত হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এবং পিসা (Pisa) দেশের লিয়োনার্ডস্ (Leonards) সর্বপ্রথমে এই বিদ্যার প্রচার করেন আধুনিক ইউরোপে। পাটীগণিত এবং ত্রিকোণমিতি (Trignometry) সংক্রান্ত বিদ্যাও অর্জন করেন আরবীয়গণ আর্যহিন্দুর নিকট এবং পশ্চাৎ তাঁহারা ইউরোপখণ্ডে এই বিদ্যার শিক্ষাদান করেন। (২)

৫। চিকিৎসা-বিদ্যা—আয়ুর্বেদের বা চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রচলন ছিল বৈদিক যুগে। তবে আজকাল তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চরক মুনি ও সুশ্রুত মুনি আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থদ্বয়

---

(১) H. C. A. I.

(২) H. C. A. I.

চরক ও সুশ্রুত নামে খ্যাত। আর্যহিন্দুর শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্র এই দুইখানা। এই দুই গ্রন্থে কমপক্ষে ১২৭ প্রকার অস্ত্রোপাচার-যন্ত্র কথিত। অতএব ইহা সত্য যে, চরক-সুশ্রুতের মতে ও অস্ত্রচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবে হারুণ-অল্-রসিদের (Harun-al-Rashid) সময়ে আরবীয়গণ আরবি ভাষায় অনুদিত চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থদ্বয়ের সহিত পরিচিত হন। গ্রীসদেশীয় চিকিৎসকসমূহ যে সকল রোগের উপশম করিতে পারিতেন না, সেই সকল রোগের চিকিৎসার জন্য আলেক্জান্দার (Alexander the Great) তাঁহার শিবিরে হিন্দু চিকিৎসক রাখিতেন। সে আজ প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বের কথা। তাই বলিতে পারা যায় যে, চিকিৎসা-বিদ্যায় ও আর্যহিন্দুর অবদান কম নহে।

৬। **স্থাপত্য-বিদ্যা**—আর্যহিন্দুদের ভিতর স্থাপত্য-বিদ্যার অনুশীলন প্রাক্-বৌদ্ধ যুগেও ছিল, এমন কি বৈদিক যুগেও ছিল। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদী ও যজ্ঞশালা প্রভৃতির নির্মাণ কথনো সম্ভব হইত না এই বিদ্যার একান্ত অভাবে। তবে এই কথা সত্য যে, বৌদ্ধযুগে ভারতে এই বিদ্যার চরম উৎকর্ষ ঘটে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে আর্যহিন্দু মন্দিরনির্মাণ-সংক্রান্ত স্থাপত্য-বিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি মন্দিরনির্মানের কাজ চলে; বহুসংখ্যক দেব-দেবীর মন্দির নির্মিত হয় সারা ভারতে। মুসলমান-অধিকারের পর উত্তর ভারতে হিন্দুর এই কাজ রুদ্ধ হইয়া পড়ে; কিন্তু দক্ষিণ ভারত মুসলমান-শাসনের বশীভূত না হওয়ায়, তথায় অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি অবাধে আর্যহিন্দুর অনেক সুচারু, সুবৃহৎ ও সুমহান্ দেবালয় গঠিত

হইতে থাকে। আজো দাক্ষিণাত্যে সেইগুলি অতীতের সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান।

৭। সঙ্গীত-বিদ্যা—সঙ্গীত-বিদ্যায় প্রাচীন আর্যহিন্দুর কৃতিত্ব যথেষ্ট। সঙ্গীতের উৎপত্তি বৈদিক যুগে। সমগ্র সামবেদ স্বর-তান-লয়-সংযুক্ত। ইহা গীত হইত। সঙ্গীত-বিদ্যার পূর্ণ পরিচয় সামবেদে। সেকালে ব্রহ্মর্ষিদেশ নিত্য সামবেদের গীতি-ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত হইত। পরবর্তী কালে আর্যহিন্দুগণ অনেক সঙ্গীত-শাস্ত্র রচনা করেন। স্বরশক্তির গুহ্য তত্ত্ব আর্যহিন্দু সেকালে যতখানি বুঝিয়াছিলেন, একালে পৃথিবীতে অন্য কোন জাতি আজো ততখানি বুঝিতে পারেন নাই।

৮। সাহিত্য—সাহিত্যে ও ভাষাতত্ত্বে আর্যহিন্দু বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। জগতে বৈদিক সাহিত্য প্রাচীনতম। কি দর্শনে, কি কাব্যে, কি নাটকে, কি কথা-কাহিনীতে, আর্যহিন্দু অগ্রণী। বালক-বালিকাদের পাঠ্যরূপে পঞ্চতন্ত্রের উপকথা জগত-প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই পঞ্চতন্ত্র প্রথম পারস্য ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। তারপর হয় আরবি ভাষায়, গ্রীক ভাষায়, ল্যাটিন ভাষায়, ইহুদী ভাষায়, স্পেন দেশীয় ভাষায়, জার্মান ভাষায়, এবং অবশেষে ইউরোপের প্রায় সকল ভাষায়।

আর্য কৃষ্টি-সভ্যতার বৈশিষ্ট্য—ধর্মভাব

আর্য-কৃষ্টি-সভ্যতা ধর্মমূলক। ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য। যথা তিথিতে যথাক্ষণে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানার্থে জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন। যথানিয়ম যজ্ঞবেদীর রচনাকল্পে জ্যামিতির বা ক্ষেত্রতত্ত্বের অনুশীলন। বৈদিক মন্ত্রের যথার্থ অর্থবোধের অভিপ্রায়ে ব্যাকরণের অনুশীলন। বৈদিক মন্ত্রের শুদ্ধভাবে আবৃত্তির উদ্দেশ্যে ছন্দের

অনুশীলন। দেবালয় ইত্যাদির নির্মাণকল্পে স্থাপত্য-বিদ্যার অনুশীলন। সুর-লয়-যোগে বেদমন্ত্র পাঠের ও দেব-দেবীর ভজনের অভিপ্রায়ে সঙ্গীত-বিদ্যার অনুশীলন। এই প্রকারে সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, প্রায় সমস্ত প্রাচীন লৌকিক আর্য-বিদ্যার মূলে ধর্মভাব নিহিত। (১) এক কথায়, ধর্মই আর্য-হিন্দুর প্রাণ। যেমন সঙ্গীতে একটি প্রধান সুর থাকে, তেমনি প্রত্যেক জাতির ভাবধারার মাঝে একটি মুখ্যভাব আছে, অন্য ভাবসমূহ তাহার অনুগত। আর্যহিন্দুজাতির মুখ্য ভাব, ধর্ম; (২) অপর ভাবগুলি ঐ মুখ্য ধর্মভাবের অনুগত। প্রাচীন ভারতে আর্যহিন্দুর অবদান অতুলনীয়। প্রাচীন ভারতকে মহিমান্বিত করিয়াছিল এই ধর্মপ্রাণ আর্যহিন্দু। সেই নিমিত্ত ভারতের ইতিহাসে—পৃথিবীর ইতিহাসে—অদ্যাবধি প্রাচীন ভারত এক গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়া আছে।

(১) প্রখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত Dr. Thibaut এই সকল কথা বলিয়াছেন।

—Asiatic Society Journal, Bengal, 1875, P. 227

(২) স্বামী বিবেকানন্দজীর উক্তি।

—স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হিন্দু ও হিন্দুধর্ম।

হিন্দু ও হিন্দুধর্ম বলিতে বুঝায় এক বিশাল বিষয়বস্তু। বর্তমান অধ্যায়ে তাহার সূচনা মাত্র। এখানে আলোচ্য বিষয় কেবলমাত্র তিনটি— (১) হিন্দুর পরিভাষা, (২) ধর্মের অর্থতত্ত্ব, এবং (৩) হিন্দুধর্মের স্বরূপ-নির্ণয়।

[এক]

হিন্দুর পরিভাষা।

বেদ-স্মৃতি-পুরাণে হিন্দু শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, পারসিকদের 'হপ্তহিন্দু' হইতে ভারতীয় আর্যদিগের নাম হয়—হিন্দু। এই নাম পারসিকদের দেওয়া। হিন্দু শব্দ ইংরাজিতে ইণ্ড্ (Ind) হয়; তাহা হইতে ইণ্ডিয়া (India) এবং ইণ্ডিয়ান (Indian) শব্দ উৎপন্ন। সমগ্র ভারতবর্ষ আর্যহিন্দুর অধিকারভুক্ত থাকায়, এই উপমহাদেশ বিদেশীর নিকট নাম গ্রহণ করে—হিন্দুস্থান। সেই প্রাচীন কালে এই উপমহাদেশের আদিবাসী অনার্যগণ এবং দ্রাবিড়গণ অবশেষে আর্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা গ্রহণে সুসংস্কৃত হইয়া আর্যহিন্দুসমাজে স্থান পায়। তখন আর আর্য-অনার্যের ভেদ থাকে না। সকলেই এক হিন্দুনামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে বহির্ভারত হইতে শক, হূন, গ্রীক (Bactrian Greek), যবন (Ionian), মোগল, পাঠান, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি

ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং এই দেশের অধিবাসী হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ সব বহিরাগত জাতির কতকাংশ কালক্রমে আর্যহিন্দুর সংস্কৃতি-সভ্যতা গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া যায়। যথা—শক, হুন, গ্রীক, যবন ইত্যাদি। এই কথা স্বীকার করিলেও অবশিষ্টাংশ যে এই দেশে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন ইহা অবিসংবাদী সত্য। অতএব, বর্তমান পটভূমিকায় ভারতের অধিবাসীদের ভিতর হিন্দু-অহিন্দু প্রশ্ন স্বভাবতঃ উত্থিত হয়। সেই কারণ, হিন্দু নামের পরিভাষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

হিন্দুর পরিভাষা সম্বন্ধে হিন্দুমহাসভা বলেন—ভারতে উদ্ভূত কোন ধর্মে যিনি বিশ্বাস করেন, তিনিই হিন্দু। এই সংজ্ঞা ব্যাপক। ভারতের অপর নাম, হিন্দুস্থান। কাজেই এই হিন্দুস্থানে উৎপন্ন সকল ধর্মকে হিন্দুধর্ম বলিলে একেবারে মিথ্যা হয় না। তবে আর্যহিন্দুর আদি ধর্মগ্রন্থ—বেদ। বেদ-প্রচারিত ধর্ম, বৈদিক ধর্ম। এই বৈদিক ধর্ম ব্যতীত বৌদ্ধধর্ম, জৈন ধর্ম এবং শিখ ধর্মও ভারতে উদ্ভূত। হিন্দুমহাসভার ঐ সংজ্ঞানুসারে বৌদ্ধ, জৈন এবং শিখধর্মাবলম্বিগণও হিন্দু। যদিও এই তিন ধর্মের উদ্ভব বৈদিক ধর্ম হইতে, তথাপি বেদকে এবং বৈদিক সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ গ্রহণ না করায় তাহাদের লক্ষ্য ও লক্ষ্যাভিমুখী ভাবধারা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে এবং শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কার বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে। এই অবস্থায় বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মাবলম্বীদিগকে হিন্দু সংজ্ঞার অন্তর্গত করিলে তাঁহাদের ঐ চিরানুষ্ঠিত ও চিরাদৃত বৈশিষ্ট্যধারাকে অবজ্ঞা করা হয়। সেই হেতু ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

অখিল ভারতীয় হিন্দুমহাসভা আর এক পরিভাষা নির্দেশ করিয়াছেন—সিন্ধুনদ হইতে সাগর পর্যন্ত সুবিস্তৃত ভারতভূমিকে যিনি

।পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলিয়া স্বীকার করেন, তিনিই হিন্দু। (১) এই সংজ্ঞাটি আরো ব্যাপক নিঃসন্দেহ। পিতৃভূমির অর্থ, পিতৃ-পুরুষের আবাস। ভারতবর্ষে বহু মুনি, ঋষি, মহাপুরুষের আবির্ভাব; তাই ইহা পুণ্যভূমি। যাঁহাদের পিতৃভূমি এই ভারতবর্ষ, তাঁহারা যদি ইহাকে পুণ্যভূমি বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এই সংজ্ঞানুযায়ী তাঁহারা হিন্দু। এখানে শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কার এই সবের কথা কিছু নাই। অতি সহজ। ধরা যাক্—বাঙ্গলা দেশ। এই দেশে বর্ত্তমান-কালীন অধিকাংশ মুসলমানের প্রপিতামহ অথবা তদূর্ধ্ব পিতৃপুরুষ ছিলেন হিন্দু। পশ্চাৎ ইসলামের আওতায় ধর্মান্তরিত হন। ভারত তাঁহাদের পিতৃভূমি, ইহা নির্বিরোধী সত্য। এখন তাঁহারা যদি বহির্ভারতে মক্কা-মদিনা প্রভৃতি স্থানকে পুণ্যভূমি মনে না করিয়া সত্যসত্যই ভারতকে পুণ্যভূমি বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে এই সংজ্ঞানুযায়ী তাঁহারাও হিন্দু। এইভাবে বাঙ্গালী খৃষ্টীয়ানগণও হিন্দু হইতে পারেন। কিন্তু এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে, সংস্কারের প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক জাতিরই শাস্ত্রবিহিত সংস্কার আছে। কোন জাতির জাতিত্ব লাভ করিতে সেই জাতির শাস্ত্রবিহিত সংস্কারের অনুষ্ঠান আবশ্যক। অতএব, কেবলমাত্র ভারতকে পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলিয়া গ্রহণ করাই হিন্দু হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নহে—আর্যহিন্দুর বেদবিহিত সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হওয়াও প্রয়োজন।

হিন্দুর আর এক পরিভাষাও লক্ষিত হয়—হিংসয়া দূয়তে চিত্তং তেন হিন্দুরিতীরিতঃ। অর্থাৎ—হিংসাতে যাহার চিত্ত ব্যথিত হয়,

(১) আসিন্ধোঃ সিন্ধুপর্যন্তা যস্য ভারতভূমিকা।
পিতৃভূঃ পুণ্যভূশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ॥

সেই হিন্দু। এই সংজ্ঞা যে আরো ব্যাপক তাহা সহজে বোধগম্য। এখানে ভারতবর্ষের নাম পর্যন্ত নাই। যে কোন দেশবাসী, যে কোন মতাবলম্বী, যদি মাত্র অহিংসা-মন্ত্র কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেন, তিনিই হিন্দু। হিংসায় চিত্ত ব্যথিত হয়, এমন মানুষ সকল দেশেই আছে। বলা বাহুল্য, তাঁহাদেব সকলকে হিন্দু নামে অভিহিত করা কষ্টকল্পনা মাত্র।

আরো এক হিন্দু-পরিভাষা দৃষ্টিগোচর হয়—যিনি বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় নিষ্ঠাবান, গোভক্ত, বেদকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করেন, দেব-মূত্তির অবজ্ঞা করেন না, সকল ধর্মকে সমাদর করেন, পুনর্জন্মবিশ্বাসী, মুক্তিপ্রয়াসী এবং সর্ব জীবকে আত্মবৎ মনে করেন, তিনিই হিন্দু। (২) এই সংজ্ঞাটি সুন্দর। তবে একটা কথা। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থায় নিষ্ঠাবান না হইলে যে তিনি হিন্দু নহেন, এ কথা বলা সুকঠিন। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা সমর্থন করেন না, এমন সম্প্রদায় হিন্দু জাতির ভিতর আছে। তাঁহাদিগকে বাদ দিলে হিন্দু জাতি অযথা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তাই এই সংজ্ঞাটি কিছু সংকীর্ণ।

সনাতন ধর্ম-সভার এক বৈঠকে স্বর্গীয় লোকমান্য শ্রীবালগঙ্গাধর তিলক হিন্দুর পরিভাষা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—বেদে স্বপ্রমিত ও স্বতঃসিদ্ধ সত্যরাজি নিহিত, এই কথা যিনি বিশ্বাস করেন তিনি হিন্দু। এই সংজ্ঞা ব্যাপকতা অথবা সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট নহে। আর্য-শিক্ষা-সভ্যতার চরম বিকাশ বৈদিক সাহিত্যে। বেদে যে সকল শাশ্বত

---

(২) যো বর্ণাশ্রমনিষ্ঠাবান্ গোভক্তঃ শ্রুতিমাতৃকঃ।
মূর্তিং চ নাবজানাতি সর্বধর্ম-সমাদরঃ ॥
উৎপ্রেক্ষতে পুনর্জন্ম তস্মান্মোক্ষণমীহতে।
ভূতানুকূল্যং ভজতে স বৈ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ ॥

সনাতন সত্য নিহিত, তাহা সর্বকালে সর্বদেশে প্রযোজ্য। আর্যহিন্দু বেদপন্থী। রুচি-প্রকৃতির ও বোধ-শক্তির তারতম্যহেতু পরবর্তীকালে হিন্দুজাতির অভ্যন্তরে নানা মতবাদের ফলে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইলেও মূলতঃ সকলেই বেদানুগামী। প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় যে, অনার্য-দ্রাবিড় বেদ-গ্রহণে বৈদিক সংস্কারে সুসংস্কৃত হইয়া আর্যহিন্দু-সমাজে স্থান পাইয়াছিল। অপর দিকে, ভগবান শ্রীবুদ্ধ স্বয়ং হিন্দুর দশাবতারের অন্যতম হইয়াও হিন্দু-সমাজে স্থান পান নাই, যেহেতু তিনি বেদকে গ্রহণ করেন নাই। যিনি বেদকে গ্রহণ করেন, তিনিই হিন্দু—এই পরিভাষাটি সুষ্ঠু ও সমীচীন। কেহ কেহ মনে করেন যে, ব্রাহ্মধর্মাবলম্বিগণ হিন্দু-সংজ্ঞার বহির্ভূত। ইহা ঠিক নহে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা উপনিষদের সার সত্য গ্রহণ করিয়া নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের পরিপোষ্টা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার রচিত "ব্রাহ্মধর্ম" গ্রন্থে উপনিষদ্‌কে বিশেষভাবে মানিয়া লয়েন। সেই কারণ, বলা যাইতে পারে যে, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ও হিন্দু। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁহার "সত্যার্থ-প্রকাশ" গ্রন্থে বেদের সংহিতা ও মন্ত্রভাগ এবং বেদের কর্মকাণ্ডান্তর্গত যাগযজ্ঞের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই নিমিত্ত আর্যসমাজিগণও হিন্দু। ব্রাহ্মণ্যসমাজ বেদের সংহিতাভাগ, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সব মানিয়া লইয়াছেন; তবে বলেন যে, বৈদিক যাগযজ্ঞ একালের উপযোগী নয়। অধুনা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ্যসমাজকেই হিন্দু নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু উদার দৃষ্টিতে আর্যসমাজী এবং ব্রাহ্মসমাজীও হিন্দু, কারণ তাঁহারাও বেদের কোন-অংশ-না-কোন-অংশ গ্রহণ করেন।

[দুই]
ধর্মের অর্থতত্ত্ব।

ইংরাজি 'রিলিজন্' (religion) শব্দ এবং সংস্কৃত' ধর্ম' শব্দ ঠিক একার্থবোধক নহে, যদ্যপি সচরাচর এই দুই শব্দকে একার্থবোধক-রূপে গণ্য করা হয়। 'রিলিজন্' পদের উৎপত্তি দুইটি মূল ল্যাটিন শব্দের সংযোগে—'Re' এবং 'Ligare'। 'Re' শব্দের অর্থ, পিছন; 'Ligare' শব্দের অর্থ, লইয়া যাওয়া। পরিদৃশ্যমান জগতের পিছনে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের অভিমুখে জীবকে যাহা লইয়া যায়, তাহাই রিলিজন্। অথবা, যদ্দারা ঈশ্বর-চৈতন্য লাভ হয়, তাহাই রিলিজন্। সেই ঈশ্বর-চৈতন্য-লাভের অভিপ্রায়ে, পাশ্চাত্য ধর্মযাজকদল এক এক গির্জা (Church) স্থাপন করিয়া, সেই গির্জার অনুমোদিত কতকগুলি ধর্মানুষ্ঠানের চালনা করেন। ইদানীং পাশ্চাত্য জগতে এরূপ এক এক গির্জার অনুমোদিত ও প্রবর্তিত স্বতন্ত্র প্রার্থনা-উপাসনা-পদ্ধতি এবং ধর্মানুষ্ঠানসমূহকে রিলিজন্ বলা হইয়া থাকে।

সংস্কৃত 'ধর্ম' পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনেক গভীর ও অনেক ব্যাপক। 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন' প্রত্যয় যোগে 'ধর্ম' পদ নিষ্পন্ন। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ, ধারণ করা। যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম। কাহাকে ধারণ করে?—বিশ্বজগতকে। (১) শ্রুতি বলিতেছেন—ধর্ম বিশ্বজগতের প্রতিষ্ঠা, কারণ ধর্মের আধারে বিশ্বজগত চলিতেছে;

(১) কেহ কেহ বলেন—ধারয়তি পরং ব্রহ্ম ইতি ধর্ম, পরব্রহ্মকে যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম। জ্ঞানের সাহায্যে পরব্রহ্মকে ধারণ করা যায়, অতএব জ্ঞানই ধর্ম। এই ব্যাখ্যা অবশ্য জ্ঞানপন্থীদের।

সংশয় ও বিবাদ উপস্থিত হইলে লোকে বিচারার্থে ধর্মিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট গমন করে ; সর্ব পদার্থ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, অতএব ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। (২) শ্রুতির এই উক্তি অনুসরণে অন্যান্য শাস্ত্রও বলিয়াছেন—ধর্ম্মো ধরাধারকঃ, ধর্মই পৃথিবীর ধারক। এই শাস্ত্রীয় বচন খুব ব্যাপক ও গভীরার্থক। পৃথিবীর সর্বত্র সকল সভ্য জাতির ও সমাজের প্রতিষ্ঠা ধর্মনীতির উপর। ধর্মসম্মত নীতি-শৃঙ্খলার অভাবে সভ্য মানবসমাজ এতদিনে অসভ্য পশুসমাজে পরিণত হইত, মানুষ মানুষকে খাইয়া ফেলিত। পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রাচীন রোমক (Roman) নীতি ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইউরোপে অন্যান্য দেশের নীতিবিধানের ও রাষ্ট্র-বিধানের ভিত্তিস্বরূপ। রোমক সভ্যতার মূল নীতি ছিল—ন্যায়পরায়ণতা, সৎসাহস, মিতাচার, মহত্ত্ব ইত্যাদি। এই সকল নীতি—ধর্মনীতি। ধর্মভাব জাগ্রত না থাকিলে, এই সকল নীতির অনুষ্ঠান অসম্ভব। এই কথা সত্য যে, এই সকল রোমক ধর্মনীতি ঈশ্বর-মূলক ছিল না। পরবর্তী কালে ঈশা (Jesus) এই অভাব পূরণ করেন। তিনি ঈশ্বরবাদ প্রচলন করেন এবং ঐ সব ধর্মনীতিকে ঈশ্বরবাদের উপর অধিষ্ঠিত করেন। সর্বকালে সর্বদেশে মানবসমাজে লৌকিক ব্যবহারের সুপরিচালনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি ব্যবহার-বিধি বা আইন রচিত হইয়া থাকে। তাহাদের ভিত্তি—ধর্মনীতি।

ধর্মের পরিভাষা সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রকারগণ আরো গবেষণা করিয়াছেন। মহর্ষি জৈমিনীর মতে, যাহা বেদবিহিত এবং যাহা পরিণামে দুঃখদায়ক নহে—তাহাই ধর্ম। মহর্ষি কনাদ

---

(২) ধর্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, লোকে ধর্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি। ধর্মে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাৎ ধর্মং পরমং বদন্তি।

বৈশেষিক সূত্রে ধর্মের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন—যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ, যাহার দ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি হয় তাহাই ধর্ম। (১) অভ্যুদয়ের অর্থ, ইহলোকে ও পরলোকে উন্নতি-জনিত সুখ। নিঃশ্রেয়সের অর্থ, ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ। অভ্যুদয়ের জন্য প্রবৃত্তিমার্গ, আর নিঃশ্রেয়সের জন্য নিবৃত্তিমার্গ। এই সূত্রের তাৎপর্য—যে জ্ঞান-কর্মের সাহায্যে প্রবৃত্তিমার্গের যাত্রীর ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ হয় এবং নিবৃত্তিমার্গের যাত্রীর সংসার-মুক্তি হয়, তাহাই ধর্ম। প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক উভয়বিধ সাধনার উপযোগী জ্ঞান-কর্মের নির্দেশ থাকায়, ধর্মের এই সংজ্ঞাটি হিন্দুসমাজে সুপ্রচলিত।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে ধর্মের আর এক সংজ্ঞা নিরূপণ করিয়াছেন—যোগ্যতাবচ্ছিন্নাধর্মিণঃ শক্তিরেব ধর্মঃ, যোগ্যতাবিশিষ্ট ধর্মীর বা পদার্থের কার্যসাধিকা শক্তিই ধর্ম। যোগ্যতার অর্থ, কার্যরূপে পরিণত হওয়ার সামর্থ্য। এই সংজ্ঞাটি খুব গভীর ও ব্যাপক। ধর্ম শব্দের ধাতুগত অর্থের সহিত ইহার যথেষ্ট সামঞ্জস্য। যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম। কে ধারণ করে?—শক্তি। বিশ্বজগতে প্রত্যেক পদার্থকে ধারণ করে, অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থের অস্তিত্ব রক্ষা করে, তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি। সেই শক্তি, সেই পদার্থের গুণ; সেই গুণ, সেই পদার্থের ধর্ম। অগ্নির অন্তর্নিহিত শক্তি—দাহিকা শক্তি। সেই দাহিকা শক্তি, অগ্নির গুণ। দাহিকা শক্তি অগ্নিকে ধারণ করে, অর্থাৎ অগ্নির অস্তিত্ব রক্ষা করে। সেই নিমিত্ত এই দাহিকা শক্তিই অগ্নির ধর্ম। স্থূল অচেতন পদার্থমাত্রের ধর্ম—জড়ত্ব-শক্তি। কেননা, এই জড়ত্ব-শক্তি জড়পদার্থের গুণ এবং ইহার অভাবে কোন স্থূল অচেতন পদার্থের

---

(১) বৈশেষিক দর্শন, ১ম অধ্যায়, আহ্নিক সূত্র।

অস্তিত্ব থাকে না। সেইরূপ মানবেরও এক অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, সেই শক্তি তাহার গুণ এবং সেই শক্তি মানবের মানবত্বকে ধারণ করিতেছে। সেই শক্তি—দেবত্বলাভের শক্তি। এই শক্তিই মানবের ধর্ম। বিধাতার এই বিপুল সৃষ্টির মাঝে এই শক্তি বা ধর্ম মানবকে মানবেতর জীব ও পদার্থসমূহ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। ঈশ্বরের দ্বারা নিখিল জগত পরিব্যাপ্ত। তিনি মানবের আধারেও আছেন, আবার কীট-পতঙ্গ-উদ্ভিদাদি অপর সচেতন পদার্থের এবং ইট-পাথর পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি অচেতন পদার্থের মাঝেও আছেন। ইহা সত্য কথা। তবে মানবের সঙ্গে তাহাদের প্রভেদ—তাহাদের এমন শক্তি নাই যে তাহারা ঈশ্বরত্ব বা দেবত্ব লাভ করিতে পারে, কিন্তু মানবের সেই শক্তি আছে। অতএব, এই দেবত্বলাভের শক্তিই মানবের ধর্ম।

[তিন]
হিন্দুধর্মের স্বরূপ-নির্ণয়

প্রত্যেক জাতিরই এক এক বিশিষ্ট ধর্ম আছে। আর্যহিন্দুজাতির ধর্ম—হিন্দুধর্ম। জাতির বুনিয়াদ ধর্মের উপর। ইংরাজ জাতির বুনিয়াদ খৃষ্টীয় ধর্মের উপর, মুসলমান জাতির মহম্মদীয় ধর্মের বা ইস্‌লামের উপর, পারসিক জাতির জরথুস্ত্রীয় ধর্মের (Zoroastrianism) উপর, শিখ জাতির শিখ ধর্মের উপর, হিন্দুজাতির হিন্দুধর্মের উপর। রাষ্ট্র-গঠন এক, জাতি-গঠন আর এক। বিভিন্ন ধর্মপন্থীদের লইয়া এক রাষ্ট্র-গঠন সম্ভব, কিন্তু এক জাতি-গঠন সম্ভব নহে। ধর্মকে বাদ দিয়া জাতি-গঠন হয় না।

ধর্মের ভিত্তিতে জাতি

জগতের প্রাচীনতম ধর্ম, হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্ম কোন মানব-বিশেষের প্রবর্তিত নহে। অন্য ধর্মগুলির এক একজন প্রতিষ্ঠাতা আছে; সেই সেই প্রতিষ্ঠাতার নামে সেই সেই ধর্ম প্রচারিত। যেমন—খৃষ্টীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ঈশা (Jesus), ইস্‌লামের হজরত মহম্মদ, পারসিক ধর্মের জরথুস্ত্র, বৌদ্ধধর্মের শ্রীবুদ্ধ, শিখ ধর্মের গুরু নানক। কিন্তু হিন্দুধর্মের এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠাতা নাই—এই ধর্ম কোন মানব-বিশেষের বা অবতার-বিশেষের পরিকল্পিত নহে। অপর সকল ধর্মের উৎপত্তি-কাল নির্দিষ্ট, কিন্তু হিন্দুধর্মের উৎপত্তিকাল অনির্দিষ্ট।

হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নাই

হিন্দুধর্মের অন্য নাম—সনাতন ধর্ম এবং বৈদিক ধর্ম। শাশ্বত-সত্য-সম্বলিত এবং সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে বিদ্যমান বলিয়া ইহার নাম—সনাতন ধর্ম। বেদমূলক বলিয়া ইহার নাম—বৈদিক ধর্ম।

ধর্মের দুই দিক্—তত্ত্ব এবং সাধনা। সাধনার অর্থ, ব্যবহারিক প্রণালী কিংবা বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রা-প্রণালী। তত্ত্ব এবং সাধনা দুই প্রয়োজন। একটিকে বাদ দিয়া আর একটি থাকিতে পারে না। চাই তত্ত্বের ভিত্তিতে সাধনার দ্বারা তত্ত্বের উপলব্ধি। মানব-ধর্মের চরম তত্ত্ব—দেবত্বলাভ।

সাধনার সাহায্যে ঐ দেবত্বলাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্মে প্রচুর পরমার্থ-তত্ত্ব থাকিলেও, ইহা অতীব সাধনযোগ্য। বিভিন্ন রুচি-প্রকৃতি-সম্পন্ন যাবতীয় ব্যক্তির ধর্মসাধনার জন্য ইহার দ্বার উন্মুক্ত। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, দেবত্বলাভের শক্তিই মানব-ধর্ম। হিন্দুধর্ম বলেন—শুধু মন্দিরে-মসজিদে-গির্জায় গমনে এবং কতকগুলি বাহ্যানুষ্ঠানের পালনে এই শক্তি লাভ করা যায় না। ঐ শক্তি লাভ করা যায়

হিন্দুধর্ম অতীব সাধনযোগ্য

সাধনার দ্বারা। কেবলমাত্র ভাগবত-চৈতন্য অন্তরে জাগিলেই যথেষ্ট নয়। সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা চাই—প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম। তাহার জন্য আবশ্যক—সাধনা। হিন্দু মুনি-ঋষি-মহাপুরুষগণ সাধনার সাহায্যে প্রত্যক্ষানুভূতিতে ঈশ্বরত্ব বা দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। একমাত্র চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে তাহা সম্ভব। সেই কারণ, সাধনার মূল কথা, চিত্তশুদ্ধি। ইহা সাধনাসাপেক্ষ। তাই হিন্দুধর্ম যত সাধনযোগ্য, অন্য ধর্ম তত নহে।

হিন্দুধর্ম প্রধানতঃ নৈতিক এবং ব্যক্তিগত আচরণ-সম্বন্ধীয়। শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্মকেও ধর্ম বলা হয়। এই ধর্ম দুই প্রকার—সামান্য ও বিশেষ। মানবমাত্রেরই নীতিসম্মত আচরণীয় যে সব কর্ম, তাহা সামান্য ধর্ম। আর বিশেষ বিশেষ কালে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ বিশেষ পরিবেশে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে নীতিসম্মত আচরণীয় যে কর্ম, তাহা বিশেষ ধর্ম। ইহা ছাড়া ব্যক্তিগত ধর্ম ও সমষ্টিগত ধর্ম আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির আচরণীয় কর্তব্য কর্ম—ব্যক্তিগত ধর্ম। প্রত্যেক সমষ্টির আচরণীয় কর্তব্য কর্ম—সমষ্টিগত ধর্ম। প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজের প্রতি, জাতির প্রতি, কিংবা রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য কর্ম হইল তাহার ব্যক্তিগত ধর্ম। সমাজের অথবা জাতির অথবা রাষ্ট্রের নিজ নিজ সমাজভুক্ত বা জাতিভুক্ত বা রাষ্ট্রভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি যে কর্তব্য কর্ম, তাহা হইল সমষ্টিগত ধর্ম। হিন্দুধর্মে এই সকল প্রকার ধর্মাচরণের অর্থাৎ কর্তব্য-সম্পাদনের নির্দেশ আছে।

হিন্দুধর্ম আচরণ-সম্বন্ধীয়—বিভিন্ন প্রকারের আচরণ-ধর্ম—সামান্য এবং বিশেষ ধর্ম

মানবের সামান্য ধর্ম সম্পর্কে হিন্দুধর্ম দশটি সাধারণ ধর্ম-লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন—

সামান্যধর্মের দশ লক্ষণ

ধৃতি বা ধৈর্য, ক্ষমা অর্থাৎ প্রতিকারের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপকারীর প্রতি উপেক্ষা, দম বা শীত-তাপ-সহিষ্ণুতা, অস্তেয় অর্থাৎ চুরি না করা, শৌচ বা দেহ-মনের নির্মলতা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধী বা বিচারবুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ। (১) এই দশ নীতিমূলক কর্মের অনুষ্ঠানে মানবমাত্রেরই চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়—ইষ্টপ্রাপ্তি হয়। এক এক বস্তুর এক এক লক্ষণ আছে। সেই লক্ষণের সাহায্যে সেই বস্তুকে চিনিতে পারা যায়। মানুষ, ছাগল, গাছ প্রভৃতির বাহ্য লক্ষণ আমরা জানি। সেই লক্ষণ দেখিবামাত্র কে কোনটি তাহা আমরা চিনিতে পারি। সেইরূপ ধর্মের এই দশ সাধারণ লক্ষণের সাহায্যে ধর্মকে আমরা চিনিতে পারি। অর্থাৎ, মানবের আচরণসমূহের মধ্যে কোন আচরণ ধর্মসঙ্গত এবং কোন আচরণ তাহা নহে, এই পার্থক্য আমরা বুঝিতে পারি। সেই নিমিত্ত এইগুলি ধর্মের লক্ষণ বলিয়া কথিত। আমাদের আচরণ-সমূহের ভিতর যে আচরণের মধ্যে ধর্মের ঐ দশ লক্ষণের কোনটি বা কয়েকটি প্রকাশিত হয়, সেই আচরণ ধর্মসঙ্গত এবং তাহাই ধর্মাচরণ বলিয়া গণ্য—অন্য আচরণ নহে। এই দশ ধর্ম-লক্ষণ সার্বজনীন, দেশ-জাতি-নির্বিশেষে মানবমাত্রেরই পালনীয়। উপাস্য-উপাসনার ভেদে বিভিন্ন ধর্মপন্থীদের মাঝে বিবাদের স্থান ইহাতে নাই। দেশ-সেবা কিংবা রাষ্ট্র-সেবারূপ কর্তব্যকর্মের সহিতও এই ধর্মলক্ষণগুলির কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই।

কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের ধর্ম-সংশয় উপস্থিত হয়। কোন কর্ম ধর্মসম্মত কি-না, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন হইয়া পড়ে।

(১) ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥—মনু, ৬ | ৯২

কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে মানবশ্রেষ্ঠ অর্জুনের এই প্রকার ধর্ম-সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া উপদেশ চাহিয়াছিলেন।

ধর্ম-সংশয়-কালে ধর্ম-নির্ণয়ের উপায়

এইরূপ সংশয়-কালে ধর্ম-নির্ণয়ের উপায় চারি প্রকার হিন্দুধর্ম বলিয়াছেন—বেদ, স্মৃতি, সাধুগণের আচার-ব্যবহার এবং বিবেকের অনুমোদন। (২) তাৎপর্য—যে কর্ম এই চারিটির দ্বারা অনুমোদিত, তাহা ধর্মকর্ম; এবং যাহা এই চারিটির বিরোধী, তাহা ধর্মকর্ম নহে। কোন কর্ম ধর্মসম্মত কি-না এই সংশয় উপস্থিত হইলে দেখিতে হইবে যে, সে সম্বন্ধে বেদ-স্মৃতি কি বলিয়াছেন, সাধুদিগের আচার-ব্যবহারে কি দেখা যায় এবং নিজের বিবেক কি বলে। বেদের বাণী হইল সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের বাণী, অতএব অভ্রান্ত। স্মৃতি, বেদের প্রতিবিম্ব। সাধুদের আচার-ব্যবহারে সত্য ধর্মই প্রকাশ পায়। ধর্ম-সংশয়-কালে এই তিনটির আশ্রয় লওয়া সেই হেতু সমীচীন। তারপর বিবেক। এই বিবেক-বাণী একটি বড় কথা। অন্তর্যামী শ্রীভগবান বা পরমাত্মা মানবের অন্তরে প্রজ্ঞারূপে অধিষ্ঠিত। তিনি সদা জাগ্রত। তিনি সর্বদা আমাদের দোষ-ত্রুটীর বিচার করিতেছেন এবং আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন, কোনটি ধর্ম আর কোনটি অধর্ম। সকলের অন্তরে প্রকৃতপক্ষে এক প্রজ্ঞার অধিষ্ঠান, তাঁহার অনুশাসন সর্বত্র সমান। তিনি একজনকে চুরি করিতে, আর একজনকে চুরি না

(২) বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্॥

এই শ্লোকে ধর্মস্য লক্ষণম্ বলিতে ধর্ম-নির্ণয়ের উপায় বুঝিতে হইবে। স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ—এই বাক্যের দ্বারা এখানে বিবেককে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

করিতে বলেন না; একজনকে সত্য বলিতে, আর একজনকে সত্য না বলিতে বলেন না। তাঁহার বাণী শোনার মত কাণ আমাদের সকলের নাই, আর যদিও শুনিতে পাই বিদ্রোহী মন তাহা মানিতে চায় না। তাই একজন চুরি করে, আর একজন করে না; একজন সত্য বলে, আর একজন বলে না। রাগ-দ্বেষ-মুক্ত পুরুষই ঠিক মত অন্তরে প্রজ্ঞার বাণী শুনিতে পান। আমরা সাধারণতঃ রাগ-দ্বেষ-মুক্ত নহি। কাজেই আমাদের পক্ষে প্রজ্ঞা-বাণী ঠিক মত শোনা সম্ভব নহে, নিজের রাগ-দ্বেষ-যুক্ত মলিন মনের কথাকে প্রজ্ঞার বাণী বলিয়া ভ্রম হওয়া খুব স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সচরাচর আমাদের পক্ষে কোন রাগ-দ্বেষ-মুক্ত মহাপুরুষের বাণী ও নির্দেশ শুনিয়া চলাই প্রশস্ত। তিনিই গুরু—সদ্‌গুরু। সেই কারণ, সাধনার পথে কোন সদ্‌গুরুর আশ্রয় লওয়ার কথা হিন্দুধর্মে। বেদ, স্মৃতি এবং সাধুগণের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের সুযোগও আজকাল সকলের মিলে না। সেই হেতু ও আবশ্যক হয় সংশয়-কালে কোন সদ্‌গুরুর উপদেশ-গ্রহণ। কর্মবিমূঢ়চেতা নরপুঙ্গব অর্জুনকেও গুরুরূপী শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

ধর্মের সূক্ষ্মা গতি

হিন্দুধর্ম বলেন—ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতি, ধর্মের সূক্ষ্মা গতি। কোন এক নির্দিষ্ট দেশ-কালে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যে কর্ম ধর্মসম্মত, ভিন্ন দেশ-কালে ভিন্ন পরিস্থিতিতে তাহা ধর্মসম্মত না হইতে পারে। বেদ-স্মৃতি-সদাচার একবাক্যে বলিয়াছেন যে, সত্য কথা বলা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কিন্তু তাই বলিয়া সত্য কথার দ্বারা একজন নির্দোষ ব্যক্তির অযথা সর্বনাশ-সাধন ধর্ম নহে। একজন নিরপরাধ লোক দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত। সে প্রাণভয়ে পলাইয়া কোন গুপ্ত স্থানে আত্মগোপন করিয়াছে। আমি

হয়তো সেই স্থান জানি। দস্যুদল আমার কাছে সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান করিল, আর আমি সত্যের অনুরোধে তাহার গুপ্ত স্থান প্রকাশ করিয়া দিলাম। দস্যুদল তথায় তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া হত্যা করিল। এক্ষেত্রে সত্য কথা বলাই আমার অধর্ম হইল, মিথ্যা বলিয়া লোকটির প্রাণরক্ষা করাই ধর্মসম্মত। (১) বেদ-স্মৃতি-সদাচার মিথ্যা-কথনের অনুমোদন না করিলেও, এই বিশেষ দেশ-কাল-পরিস্থিতিতে রাগ-দ্বেষ-মুক্ত বিবেক বা প্রজ্ঞা-বাণী তাহা অনুমোদন করে; এতএব, এইরূপ বিশেষ ক্ষেত্রে মিথ্যাকথনই ধর্ম হয়। সম্পূর্ণ বিপদ্-কালে জীবনহানির সম্ভাবনা ইত্যাদি দেখা দিলে সাধারণ ধর্মকর্মের ব্যতিক্রমের বিধান হিন্দুধর্মে আছে। ইহার নাম—আপদ্-ধর্ম। হিন্দুধর্ম এই কথা বলেন না যে, সর্ব দেশে সর্ব কালে সর্ব অবস্থায় ধর্মকর্মের মানদণ্ড এক প্রকার।

হিন্দুধর্ম বলেন—পরমেশ্বরের চিন্ময় সত্তা সর্বভূতে, জড়ের মধ্যেও সেই সত্তা। তবে কি জড়, কি চেতন, সকল আধারে সমান ভাবে তাঁহার চৈতন্যাংশের প্রকাশ হয় না। আধার-ভেদে তাঁহার চৈতন্য-বিকাশের মাত্রার তারতম্য। জড় পদার্থ অপেক্ষা চেতন জীবের আধারে চেতনার প্রকাশ অনেক বেশী, আবার স্থূলশরীরী চেতন জীবসমূহের ভিতর মানবের আধারে সর্বাপেক্ষা অধিক। সৃষ্টিমণ্ডলে শরীরধারী জীবের মধ্যে সূক্ষ্মশরীরী দেবতাদিগের নীচে স্থূলশরীরী মানব-জাতি এবং মানব-জাতির নীচে স্থূলশরীরী পশু-জাতি। দেবতা ও পশুর মধ্যস্থলে মানুষ। তাই, মানবের আধারে দেবত্ব ও পশুত্ব এই দুই ভাব বর্তমান। পশুর সঙ্গে মানবের প্রভেদ—মানবের প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-তন্ত্র আছে এবং তাহা আছে বলিয়া মানবের

(১) মহাভারতে কর্ণপর্বে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে কৌশিক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান দ্রষ্টব্য।

বিচার-শক্তি আছে, কিন্তু পশুর প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-তত্ত্ব নাই এবং বিচার-শক্তিও নাই। জ্ঞান-প্রজ্ঞা-চালিত মানব বিচার-শক্তির সাহায্যে জীবনযাত্রার বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ প্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া পশুত্ব-বর্জনে পূর্ণ দেবত্ব অর্জন করিতে পারে, অর্থাৎ মানুষ দেবতা হইতে পারে; কিন্তু পশু দেবতা হইতে পারে না। মানবের আধারে এই সম্ভাবনা থাকায় মানবের জীবনযাত্রার এক লক্ষ্য আছে। পশুর আধারে এই সম্ভাবনা না থাকায় তাহার জীবনযাত্রার কোন লক্ষ্য নাই। মানবজীবনের যে এক লক্ষ্য আছে, ইহা সর্বদেশে সর্ব সভ্যসমাজে সর্ববাদিসম্মত। হিন্দুধর্ম এই মানবজীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য—দেবত্বলাভ। তাহা সম্ভব চিত্তশুদ্ধির সাহায্যে। অন্তরে রাগ-দ্বেষ-ভূত ময়লারাশি সর্বদা চিত্তকে মলিন করিয়া রাখিয়াছে। সেই মলিনতার পরিশোধন—চিত্তশুদ্ধি। খুব কঠিন কথা। স্বভাবতঃ, মানবের মন বহির্মুখী ও ভোগোন্মুখী। প্রকৃতির রাজ্যে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধময় বাহ্য জগত সর্বদা নানাবিধ ভোগ্য-সম্ভার জীবের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছে। তাহাদের মাঝে যেগুলি যে জীবের ইন্দ্রিয়প্রীতিকর সেইগুলি সেই জীব পাইতে চায়, আর যেগুলি তাহা নহে সেইগুলি সে পরিহার করিতে চায়। প্রথম প্রকার চিত্তবৃত্তির নাম—রাগ বা অনুরাগ। দ্বিতীয় প্রকার চিত্তবৃত্তির নাম—দ্বেষ বা বিরাগ। এই রাগ-দ্বেষ চিত্তকে মলিন করিয়া রাখে, তাই তাহারা চিত্তমল নামে অভিহিত। এই রাগ-দ্বেষ হইতে কাম-ক্রোধাদি রিপুর উদ্ভব। চিত্তশুদ্ধির অর্থ, রাগ-দ্বেষ হইতে চিত্তকে মুক্ত করা। ইহা বড় শক্ত কথা। সাধারণ মানুষের দুঃসাধ্য। সেই নিমিত্ত হিন্দুধর্ম সমস্ত

হিন্দুধর্মে মানবজীবনের লক্ষ্য-বিশ্লেষণ—প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ

মানুষের জীবনযাত্রার এক পথ নির্দেশ না করিয়া, দুই পথ নির্দেশ করিয়াছেন—প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গ, ভোগের পথ। নিবৃত্তিমার্গ, ত্যাগের পথ। ভোগোন্মুখী মন স্বভাবতঃ প্রবৃত্তির পথে চলিতে চায়, তাই প্রথমে প্রবৃত্তির পথ বা প্রবৃত্তিমার্গ। শাস্ত্র-বিধি অনুসারে জীবনযাপনে ভোগোন্মুখী মন ক্রমশঃ শান্ত ও সংযত হয়, চিত্ত রাগ-দ্বেষ হইতে মুক্তির জন্য চেষ্টান্বিত হয়, মানুষ ক্রমশঃ নিবৃত্তি-মার্গে প্রবেশের উপযুক্ত হয়। তারপর নিবৃত্তিমার্গ। মানবজীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম প্রবৃত্তিমার্গে তিনটি এবং নিবৃত্তিমার্গে একটি নিরূপণ করিয়াছেন। ধর্ম-অর্থ-কাম এই তিনটি প্রবৃত্তিমার্গে এবং শুধু মোক্ষ নিবৃত্তিমার্গে। এই চারিটিকে বলা হয়—পুরুষার্থ বা চতুর্বর্গ। পুরুষার্থের অর্থ, পুরুষের প্রয়োজন বা লক্ষ্য।

গৃহস্থাশ্রম প্রবৃত্তিমার্গে, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম নিবৃত্তিমার্গে।

পুরুষার্থ বা চতুর্বর্গ

গৃহীর পুরুষার্থ—ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ।
বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর পুরুষার্থ—মোক্ষ বা মুক্তি।

চতুর্বর্গের আরম্ভে ধর্ম এবং শেষে মুক্তি। হিন্দুধর্ম ধর্মের ভিত্তিতে মানবজীবন গঠন করিতে প্রয়াসী। সেই কারণ, চতুর্বর্গের প্রথমেই ধর্মের স্থান। হিন্দুধর্মের চরম লক্ষ্য, মুক্তি। সেই কারণ, চতুর্বর্গের শেষে মুক্তির স্থান।

ধর্ম—গৃহীর ত্রিবর্গ ধর্ম-অর্থ-কাম; কিন্তু প্রারম্ভে ধর্ম এবং পশ্চাৎ অর্থ ও কাম। ইহা তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে ধর্ম অর্থে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম-কর্ম বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম বুঝিতে হইবে। (১) যথা—নিত্য সন্ধ্যা-

(১) ধর্ম কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে। ধর্ম কি? যা ইহলোকে বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়, ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূল। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।—স্বামী বিবেকানন্দ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

বন্দনা, উপাসনা, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, ব্রত-দান ইত্যাদি। এই সব ধর্মাচরণের দ্বারা গৃহীর চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সত্ত্বগুণ বর্ধিত হয়। তাহার ইহলোক-সর্বস্ববুদ্ধি কমিয়া যায় এবং এক অতীন্দ্রিয় সত্তার চেতনা জাগিয়া উঠে। মানবমাত্রের প্রথম প্রয়োজন, এই চেতনার জাগরণ।

অর্থ—গৃহীর ত্রিবর্গের দ্বিতীয় পদার্থ। বিত্তহীন অবস্থায় স্বজনদের প্রতিপালনার্থে অন্যের গলগ্রহ হওয়া, গৃহস্থ-জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। প্রত্যেক গৃহীকে যথাসাধ্য অর্থোপার্জন করিতে হইবে। তবে কথা এই যে, সেই অর্থ ধর্মানুমোদিত বা শাস্ত্রবিহিত উপায়ে অর্জিত হওয়া চাই। কেননা, ত্রিবর্গের প্রথমেই ধর্ম। ধর্ম-বিযুক্ত অর্থ—অনর্থ। এমন ভাবে অর্থোপার্জন করিতে হইবে, যাহাতে চিত্ত অশুদ্ধ বা কলুষিত না হয়। চুরি-ডাকাতির অর্থ ধর্মানুমোদিত নহে, যেহেতু তাহাতে চিত্ত কলুষিত হয়। উৎকোচের অর্থও তাহাই, প্রতারণা-প্রবঞ্চনার অর্থও তাহাই। অতএব, এই সকল দূষিত উপায়ে অর্থোপার্জন নিষিদ্ধ। সৎপথে সদ্ভাবে অর্জিত অর্থই ধর্মানুমোদিত; কারণ, তাহা চিত্তশুদ্ধির পরিপন্থী নহে।

কাম—গৃহীর ত্রিবর্গের তৃতীয় পদার্থ। এই কাম শব্দের অর্থ স্ত্রী-পুরুষ-সম্ভোগের প্রবৃত্তি বা শৃঙ্গারেচ্ছা নহে। ইহার অর্থ, কামনা বা অভিলাষ। কামনা অর্থাৎ সুখের কামনা। অতএব, এই কামনা শব্দের লাক্ষণিক অর্থ—সুখ। মানবমাত্রই চায় সুখ ইহলোকে এবং পরলোকে। সেই নিমিত্ত গৃহীর জীবন-লক্ষ্য, সুখ। এই সুখের অপর নাম—অভ্যুদয় বা শ্রী-সমৃদ্ধি। শ্রী-সমৃদ্ধিহীন গৃহী সমাজের ভারস্বরূপ। কিন্তু এখানেও সেই কথা—এই সুখ বা অভ্যুদয় হওয়া চাই ধর্মানুমোদিত, যেহেতু ধর্ম ত্রিবর্গের আদি। ধর্ম-বিযুক্ত সুখ—অসুখ। চোর-ডাকাত-বেশ্যা-লম্পট প্রভৃতির সুখ ধর্ম-বিযুক্ত, কেননা

তাহাতে চিত্ত কলুষিত হয়। কাজেই যথার্থতঃ সেই সুখ সুখ নহে—অসুখ। সেই সুখ গৃহীর জীবন-লক্ষ্য হইতে পারে না।

মোক্ষ—নিবৃত্তির পথে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর জীবন-লক্ষ্য, মোক্ষ বা মুক্তি। ইহা চতুর্বর্গের শেষ পদার্থ। মুক্তির অর্থ, সংসার হইতে মুক্তি। গীতার শাশ্বত বাণী—জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ, (১) জন্মীর মৃত্যু এবং মৃতের জন্ম সুনিশ্চিত। এই স্থূল দেহের নাশে জীবাত্মার নাশ হয় না। স্থূল দেহের নাশ—মৃত্যু। মৃত্যুর বা স্থূলদেহনাশের পর জীবাত্মা সূক্ষ্মশরীরে কিছুকাল অবস্থান করেন পরলোকে বা সূক্ষ্মলোকে, তারপর আবার ইহলোকে বা স্থূললোকে আসেন স্থূল দেহ লইয়া, এই আসার নাম—জন্ম। স্থূল জগত কর্মভূমি, এখানে আমরা আসি কর্মের জন্য। সূক্ষ্ম জগত ভোগভূমি, সেখানে কিছুকাল আমরা ভোগ করি এখানকার অনুষ্ঠিত কর্মের ফল। স্থূলদেহের আশ্রয় স্থূল জগত, আর সূক্ষ্মদেহের আশ্রয় সূক্ষ্ম জগত। জন্মের পর মৃত্যু, আবার মৃত্যুর পর জন্ম। সমস্ত জীব যেন ছুটিয়া চলিয়াছে এই জন্ম-মৃত্যুর অনন্ত প্রবাহের মুখে। জীবাত্মার এই ভাবে পুনঃ পুনঃ সূক্ষ্মলোকে ও স্থূললোকে গমনাগমন—সংসার। সম্+সৃ+ঘঙ্=সংসার। 'সৃ' ধাতুর অর্থ, গমন। 'সংসার' পদের ধাতুগত অর্থ, গমনাগমনের বা জন্ম-মৃত্যুর চক্র। (২) আমরা সচরাচর এই পদের নানা বিকৃত অর্থ করিয়া থাকি; যথা—পৃথিবী, পরিবার, গার্হস্থ্য

(১) গীতা, ২ | ২৭

(২) প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণও সংসার-চক্র স্বীকার করিতেন। তাঁহারা বলিতেন—Metempsychosis।

ইত্যাদি। এই সংসারের বা গমনাগমন-চক্রের ভিতর নিরবাচ্ছন্ন সুখ-শান্তি-লাভ অসম্ভব। এই স্থূললোকের অধিবাসী জীবমাত্রই ত্রিতাপ-জ্বালায় তাপিত। ত্রিতাপজ্বালা—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক তাপের অর্থ, দেহ ও মনের ব্যাধি। (৩) আধিভৌতিক তাপের অর্থ, অন্য জীবের (৪) দ্বারা ঘটিত তাপ বা দুঃখ। আধিদৈবিক তাপের অর্থ, শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতু এবং ঝড়, রৌদ্র, বৃষ্টি, অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রকৃতি-জনিত তাপ বা দুঃখ। এই স্থূল জগতে স্থূলশরীরী এমন জীব কেহ নাই, যে সারা জীবনে এই ত্রিতাপজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিতে সমর্থ। স্থূললোকে আচরিত কর্মের ফল সূক্ষ্মলোকেও ভোগ করিতে হয়। শুভ কর্মের ফল—সুখ। অশুভ কর্মের ফল—দুঃখ। সাধারণতঃ, জীবমাত্রেরই কর্ম শুভ ও অশুভ মিশ্রিত। সারাজীবন কেবলমাত্র শুভ কর্মের আচরণ কল্পনাতীত। তাই, সূক্ষ্মলোকেও নিরবচ্ছিন্ন অবিমিশ্রিত সুখভোগের অবসর মিলে না। সেখানেও সূক্ষ্মশরীরে দুঃখভোগ করিতে হয়। দেবতাগণ সূক্ষ্ম শরীরী। তাঁহাদেরও সূক্ষ্মলোকে কৃতকর্মের ফলস্বরূপ দুঃখভোগ অনিবার্য। মানুষ তো দূরের কথা। এই সব বিবেচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট হয় যে, এই ত্রিতাপ-জ্বালা ও কর্মফল-ভোগ হইতে নিষ্কৃতি-লাভের একমাত্র উপায় জন্ম-মৃত্যুরূপী সংসার-চক্র হইতে মুক্তি। সেই মুক্তি হইল ব্রহ্ম-লাভ বা পূর্ণভাবে ঈশ্বরত্ব-লাভ। ইহা সুসাধ্য নহে। প্রকৃতির রাজ্যে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বিশিষ্ট ভোগ্য বস্তুনিচয় সর্বদা জীবের সম্মুখে

(৩) বাঙ্গলা ভাষায় আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ, আত্মাসম্বন্ধীয়। শ্রুতিতে এই শব্দের অর্থ, শরীরসম্বন্ধীয়। এই স্থলে আধ্যাত্মিক শব্দ শ্রুতির অর্থে প্রযুক্ত।

(৪) যেমন—অপর মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি।

থাকে সুসজ্জিত। স্বভাবতঃ, ঐ সকল বস্তুর ভোগাভিপ্রায়ে চিত্তে কামনা-বাসনার উদ্রেক হয়। সেই কামনা-বাসনার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে জীব কর্ম করে, সেই কৃতকর্মের সংস্কার তাহার চিত্তপটে অঙ্কিত হয় এবং পরিশেষে তাহাকে কৃতকর্মের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ-ভোগ করিতে হয়। কামনা-বাসনা এবং কৃতকর্মের সংস্কাররাশি জীবের সূক্ষ্মশরীরের আবরণস্বরূপ। স্থূলদেহের অবসানে সূক্ষ্মশরীরে সেইগুলি সংলগ্ন থাকে। সেই সব ভোগ করিতে পুনরায় জীবকে স্থূল দেহ ধারণ করিয়া মর্ত্যলোকে আসিতে হয়। অতএব, এই কাম-কর্মই সংসার-চক্রের বন্ধন-রজ্জু। যতদিন না—যত জন্ম না—এই কাম-কর্মের উচ্ছেদ-সাধন ঘটে, ততদিন—ততজন্ম—সংসার-চক্রের আবর্তের ভিতর আবদ্ধ হইয়া জীবকে ঘুরপাক খাইতে হয়। কাম-কর্মরূপ বন্ধন-রজ্জুর উচ্ছেদ-সাধন—মুক্তি-সাধনা। এই সাধনায় চাই বিষয়ভোগে নিরাসক্তি বা বিষয়-বৈরাগ্য। ইহা সম্ভব নিবৃত্তির পথে—প্রবৃত্তির পথে নয়। অন্তরে ভাগবত-চৈতন্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার দ্বারা ইহা সম্ভব। শ্রীভগবান অন্তর্যামীরূপে কি জীবজগতে, কি তথাকথিত জড়জগতে, সর্বত্র সর্বভূতে অবস্থিত—বাসুদেবঃ সর্বম্। সৃষ্টিরাজ্যে সেই চৈতন্যময় ভাগবত-সত্তার অধিকতম প্রকাশ মানবের আধারে। যে মানব অন্তর্মুখী মনের সাহায্যে অন্তরের অন্তরতম দেশে সেই সত্তার অনুভূতি যে পরিমাণে লাভ করিতে পারে, সেই পরিমাণে তাহার চিত্তে বিষয়-বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়। ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য। সেই দিব্য সত্তার অনুভূতির পথে প্রধান অন্তরায় —অহংভাব, অর্থাৎ আমি ও আমার এই বোধ। এই অহংভাবের বশবর্তী হইয়া, অর্থাৎ আমি ও আমার এই বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া, জীব স্বীয় কামনার পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে বিষয়ভোগে আসক্ত হয়।

অন্তরে ঐ উচ্চ অতি-মানস দিব্য ভাগবত-সত্তাতে যদি এই নীচ প্রাকৃত অহংভাবের লয়-সাধন করিতে পারা যায়, তবে আমি ও আমার বোধ আর থাকে না এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কামনা-বাসনার উচ্ছেদ হয়। এই লয়-সাধনই মুক্তি বা ব্রহ্ম-নির্বাণ। মুক্তির সেই উচ্চ ভূমিতে উঠিলে সকল বোধে, সকল চিন্তায়, সকল কর্মে, ভাগবত-সত্তার অনুভূতি ব্যতীত আর কিছুই থাকে না—তখন সর্বভূতে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান সাক্ষাৎভাবে অনুভূত হয়। ইহাই হইল অন্তরে ভাগবত-চৈতন্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। কামনা-বাসনা এবং তজ্জনিত কর্মসমূহ রজোগুণোদ্ভূত। প্রয়োজন সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে রজোগুণ আপনাআপনি কমিয়া যায়। যে পরিমাণে মন শ্রীভগবানের অভিমুখী হয়, সেই পরিমাণে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয় এবং রজোগুণের হ্রাস হয়; সেই পরিমাণে কামনা-বাসনা ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ইহাও একটি পরীক্ষিত সত্য।

হিন্দুধর্মে একমাত্র সুখ মানবজীবনের চরম লক্ষ্য নহে

একমাত্র সুখ মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের (১) অভিমত। পাশ্চাত্য ধর্মের ও সেই কথা। হিন্দুধর্ম সে কথা বলেন না। হিন্দুধর্ম বলেন—প্রবৃত্তির পথে গৃহস্থাশ্রমে সুখ বা অভ্যুদয় লক্ষ্য বটে, কিন্তু সমগ্র মানবজীবনের তাহা চরম লক্ষ্য নহে; সেই চরম লক্ষ্য, মুক্তি বা মোক্ষ বা ব্রহ্ম-নির্বাণ। সুখ প্রবৃত্তির পথে লক্ষ্য হইলেও, তাহা ধর্মানুমোদিত হওয়া চাই—অসংযত ও অধর্মবিহিত সুখ গৃহস্থাশ্রমেরও লক্ষ্য নহে। ধর্মই মানবের জীবনযাত্রা-

(১) The object of Nature is Function. The object of Man is Happiness. The object of Society is Action. —L. F. Ward, The psychic factors of Civilisation.

প্রণালীর ভিত্তি; তাই, চতুর্বর্গের আদিতে ধর্ম বা ধর্মানুষ্ঠান। এই ধর্মসাধনার পূর্ণ পরিণতি মুক্তিতে; তাই, চতুর্বর্গের শেষে মোক্ষ। এই বিষয়ে পাশ্চাত্য ধর্মাপেক্ষা হিন্দুধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি কত উন্নত, তাহা সহজেই বোধগম্য। হিন্দুধর্ম শুধু এই চতুর্বর্গের তত্ত্ব-বিশ্লেষণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। এই তত্ত্বের উপলব্ধির উদ্দেশ্যে মানবের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ জীবনযাত্রা-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিয়াছেন। সেই নিমিত্ত বলা যায় যে, হিন্দুধর্ম যত ব্যবহারসিদ্ধ অন্য ধর্ম তত নহে।

কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক (২) হিন্দুধর্মের মুক্তিবাদকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, ইহা দুঃখবাদ (Pessimism) হইতে উৎপন্ন। তাঁহারা বলেন—যেহেতু হিন্দুর বিশ্বাস যে এই জগতে সুখের অস্তিত্ব কিছুই নাই এবং এই জীবন কেবলমাত্র দুঃখময়, সেই হেতু হিন্দু মুক্তিপ্রয়াসী। ঐ সকল পাশ্চাত্য দার্শনিক মানবজীবনে দুঃখ-জ্বালাকে একেবারে অস্বীকার করেন না; তবে বলেন যে, সামাজিক পরিবেশের সহিত ব্যক্তি যখন আপনাকে মিল করিয়া রাখিতে পারে না, তখনি দেখা দেয় তাহার দুঃখ-জ্বালা। মর্ম—এই সব দুঃখ-জ্বালা প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশের ফল মাত্র, অনুকূল সামাজিক পরিবেশে ইহা আর থাকে না। (৩) সে যাহাই হৌক, পাশ্চাত্য দার্শনিকবর্গের হিন্দুধর্মে মুক্তিবাদ-সম্পর্কে ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ। হিন্দুধর্ম ঠিক মানব-জীবনকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় বলেন না, অথবা চরম দুঃখবাদের প্রশ্রয় দেন না। মানবজীবনে সুখের অস্তিত্ব আদৌ নাই, এই কথা হিন্দুধর্ম বলেন না। প্রবৃত্তিমার্গে সুখ মানবজীবনের লক্ষ্য, এই কথাই হিন্দুধর্ম

(২) Ibid

(৩) Ibid

হিন্দুধর্মে মুক্তিবাদ দুঃখবাদ নহে

বলেন; তবে আরো বলেন যে এই সুখ মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য নহে। কারণ, বিষয়ভোগ-জনিত যে সুখ তাহা ক্ষণস্থায়ী মাত্র—নিত্য চিরস্থায়ী নহে। পশু-জীবনেও সেই অনিত্য বিষয়সুখের আস্বাদন মিলে। পশুর ন্যায় জীবন-যাপন মানবের উদ্দেশ্য কখনো হইতে পারে না। মানবের উদ্দেশ্য—দিব্যজীবন-যাপনে নিত্য চিরস্থায়ী ভূমানন্দের আস্বাদন। সেই ভূমানন্দের তুলনায় বিষয়সুখ অতি তুচ্ছ। সেই ভূমানন্দ-লাভার্থে নিবৃত্তির পথে—ত্যাগের পথে—বিষয়বৈরাগ্যের পথে চলিতে হইবে। এই পথে চলিতে চলিতে অন্তরে ভাগবত-চৈতন্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হওয়া মাত্র সেই ভূমানন্দের অধিকারী হওয়া যায়। এই ভারত-ভূমিতে বহু ঋষি-মহাপুরুষ এই পথে চলিয়া সেই আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আজো উজ্জ্বল। কাজেই, ইহা কেবলমাত্র কথার কথা নহে। তারপর আর এক কথা। মানবজীবনে ত্রিতাপজ্বালা একেবারে নাই, ইহা কোন বিবেকবান্ সত্যদর্শী পুরুষ বলিতে পারেন না। রাজরাজ্যেশ্বর হইতে পথের ভিখারী অবধি কেহ তাঁহার জীবনের শেষ ক্ষণে এই সাক্ষ্য দিতে পারেন না যে, জন্ম হইতে মৃত্যুর প্রাক্কাল পর্যন্ত তাঁহাকে আধ্যাত্মিক—আধিভৌতিক—আধিদৈবিক এই ত্রিতাপজ্বালার কোনটিও কোন দিন ভোগ করিতে হয় নাই। অতএব, মানবজীবনে ত্রিতাপজ্বালার বা দুঃখের অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। অনুকূল সামাজিক পরিবেশের মধ্যে কিছু সুখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ব্যক্তির ত্রিতাপজ্বালার ঐকান্তিক নিবৃত্তি কখনো ঘটে না। সে নিবৃত্তির সম্ভাবনা একমাত্র

পূর্ণ ঈশ্বর-চৈতন্য-লাভে, বা ব্রহ্ম-নির্বাণে, বা মুক্তিতে। ইহাই হিন্দুধর্মের বাণী। (১)

(১) মোক্ষ কি? যা শিখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেরও তাই, এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে তো এ লোকও নয়, পরলোকও নয়। তবে, সে দাসত্ব—লোহার শিকল আর সোণার শিকল। অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীরবন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চল্‌বে না। এই মোক্ষ-মার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

হিন্দুধর্মগ্রন্থ।

প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ আছে। ধর্মগ্রন্থের অপর নাম, শাস্ত্র। বাসনা ও সহজাত সংস্কার জীবমাত্রে বিদ্যমান—কি পশুতে, কি মানবে। প্রভেদ এই যে, সেই সকল বাসনা ও সহজাত সংস্কার অনুসরণে কর্ম করা পশুর ধর্ম, কিন্তু তাহা মানবের ধর্ম নহে। মানবের ধর্ম—সেই সমস্ত বাসনা-সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া, এক উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, জীবনযাত্রার প্রণালীকে সুসংযত ও সুনিয়মিত করা। সেই উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন যুগে মহাপুরুষগণ অন্তর্বোধ, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে কতকগুলি তথ্য আবিষ্কার করিয়া জনকল্যাণের অভিপ্রায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই তথ্যনিচয়—শাস্ত্র। শাস্ত্রকে জীবন-বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। 'শাস্' ধাতু হইতে 'শাস্ত্র' পদের উৎপত্তি। শাস্ ধাতুর অর্থ, শাসন। যাহা শাসন করে তাহাই শাস্ত্র। ঐ সকল গ্রন্থে লিখিত মহাপুরুষদের বিধি-নিষেধ-মূলক অনুশাসনের দ্বারা মানব-জীবন শাসিত হয় বলিয়া উহাদের নাম, শাস্ত্র। অন্য ধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্মের শাস্ত্র-সংখ্যা অনেক বেশী। তাহার কারণ, হিন্দুধর্ম সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানব-সমাজে হিন্দুধর্ম বিদ্যমান, ইহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এই সুদীর্ঘ কাল যাবৎ অসংখ্য মুনি-ঋষি-মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া

শাস্ত্র ও সিদ্ধ শাস্ত্র

মানবজীবনের আদর্শ ও সাধনা সম্বন্ধে নানা তথ্য নানা ভাবে আবিষ্কার করিয়াছেন। সকল মানব এক শ্রেণীর নহে। রুচি-প্রকৃতি-সামর্থ্য-শিক্ষা অনুযায়ী শ্রেণিভেদ আছে। বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী বিভিন্ন সাধনপন্থার নির্দেশ তাঁহারা দিয়াছেন। সেই নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রের এত সংখ্যাধিক্য। প্রত্যেক ধর্মে একাধিক ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্র বর্তমান থাকিলেও, তাহাদের মধ্যে একখানা সিদ্ধশাস্ত্র বা আম্নায় আছে। অন্য শাস্ত্রগুলির বুনিয়াদ তাহার উপর। যিনি যে ধর্মই অনুসরণ করুন না কেন, তাঁহাকে সেই ধর্মের সিদ্ধশাস্ত্রকে নির্ভ্রান্ত স্বীকারে তাহার অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইবে। যেমন—খৃষ্টীয় ধর্মের বাইবেল, ইস্‌লামের কোরাণ, পারসিকের গাথা, বৌদ্ধের ধর্মপদ, শিখের গুরু-গ্রন্থসাহেব। হিন্দুধর্মের সিদ্ধশাস্ত্র বা আম্নায়—বেদ। বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্মের জননী—হিন্দুধর্ম; তথাচ, বেদকে নির্ভ্রান্ত সিদ্ধশাস্ত্র স্বীকার না করায় তাঁহাদের আশ্রয় মিলিল না হিন্দুধর্মে। অন্যপক্ষে, বেদকে স্বীকার করায় অনার্য-দ্রাবিড় স্থান পাইয়াছিল হিন্দুধর্মের কোলে।

বৈদিক যুগের অবসানে হিন্দু ঋষি-মহাপুরুষগণ বেদকে ভিত্তি করিয়া যুগোপযোগী কতকগুলি শাস্ত্র রচনা করেন—স্মৃতি-সংহিতা, ইতিহাস, পুরাণ, আগম এবং ষড়্‌দর্শন। বেদে শাশ্বত সনাতন সত্যসমূহ থাকায়, ইহা সনাতন শাস্ত্র—অপরিবর্তনশীল। অপর-গুলিতে যুগোপযোগী তথ্য থাকায়, সেগুলি যুগ-শাস্ত্র—যুগ-পরিবর্তনে তাহাদের পরিবর্তন ঘটে। হিন্দুর মোট ধর্মগ্রন্থ, ছয়খানা—বেদ, স্মৃতি-সংহিতা, ইতিহাস, পুরাণ, আগম এবং ষড়্‌দর্শন।

হিন্দুর ছয় ধর্মগ্রন্থ

[এক]

বেদ।

'বিদ্' ধাতু হইতে 'বেদ' পদ নিষ্পন্ন। বিদ্+ঘঙ্=বেদ। বিদ ধাতুর অর্থ, জানা। তাই 'বেদ' শব্দের ধাতুগত অর্থ, জ্ঞান বা বিদ্যা।

'বেদ' শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য

বিদ্যা দুই প্রকার—পরা ও অপরা। জগৎ-কারণ পরব্রহ্মবিষয়ক অলৌকিক জ্ঞান—পরা বিদ্যা। জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধীয় যাবতীয় লৌকিক জ্ঞান—অপরা বিদ্যা। চক্ষু-কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়সংস্পর্শে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রত্যক্ষ বলিয়া খ্যাত; সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর অধিষ্ঠিত অনুমানের সাহায্যে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা অনুমান বলিয়া খ্যাত। অপরা বিদ্যার উদ্ভব এই প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে। পরা বিদ্যা তাহা নহে। অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তির বা বোধির সাহায্যে পরা বিদ্যা লাভ হয়। অপরা বিদ্যা—বিজ্ঞান। পরা বিদ্যা—বেদ। বেদ নামধেয় ধর্মগ্রন্থে পরা এবং অপরা এই দুই বিদ্যা স্থান পাইয়াছে, ইহা সত্য। সেই কারণ, বেদগ্রন্থকে সর্বজ্ঞানের ভাণ্ডার বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে বেদের বেদত্ব ঐ পরা বিদ্যা প্রকাশের নিমিত্ত। পরা বিদ্যা শ্রেষ্ঠ, অপরা বিদ্যা নিকৃষ্ট। (১) বেদ শব্দের দুই অর্থ—মুখ্য ও গৌণ। ইহার মুখ্যার্থ, জ্ঞানরাশি; আর গৌণার্থ, শব্দরাশি। ভাব ও ভাষা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। ভাব আত্মপ্রকাশ করে ভাষার অবলম্বনে। ভাষা জীবন্ত হয় ভাবের অবলম্বনে। জ্ঞান—ভাবের

(১) শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা—ঈশ্বরের বা জগৎ-কারণ ব্রহ্মের জ্ঞানই জ্ঞান, আর বাকী সব অজ্ঞান।

দিক। শব্দ—ভাষার দিক। বৈদিক জ্ঞানরাশি বা ভাবরাশি আত্মপ্রকাশ করে বৈদিক শব্দরাশি বা ভাষার সাহায্যে। বেদগ্রন্থে বৈদিক শব্দরাশির স্থান। তাই, বেদগ্রন্থকেও বেদ বলা হয় এবং এই গ্রন্থ হিন্দুর পূজ্য। বেদগ্রন্থ—শব্দব্রহ্ম। ইহার তাৎপর্য—বেদগ্রন্থ অনন্তপুরুষ পরব্রহ্মের বাঙ্ময়ী মূর্তি।

বেদ অপৌরুষেয়—পুরুষের চিন্তাপ্রসূত নহে। কোরাণের বাণী হজরত মহম্মদের চিন্তাপ্রসূত, তিনি একজন পুরুষ। গাথার বাণী জরথুস্ত্রের চিন্তাপ্রসূত, তিনি একজন পুরুষ। ধর্মপদের বাণী শ্রীবুদ্ধের চিন্তাপ্রসূত, তিনি একজন পুরুষ। বাইবেলের বাণী ঈশার চিন্তাপ্রসূত, তিনি একজন পুরুষ। কিন্তু বেদের বাণী ঐ রকম কোন পুরুষের চিন্তাপ্রসূত নহে। জগৎ-কারণ পরব্রহ্ম বা জগদীশ্বর সম্বন্ধীয় অলৌকিক জ্ঞানরাশি চিরদিন বিদ্যমান। অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ-শক্তি-সম্পন্ন আর্যঋষিগণ সেই শাশ্বত সনাতন জ্ঞানরাশির কিয়দংশ অন্তর্বোধের সাহায্যে অন্তরে উপলব্ধি বা দর্শন করেন এবং তাহা মুখে বৈদিক ভাষার বা শব্দরাশির সাহায্যে জগতে প্রকাশ করেন। তাঁহাদের উচ্চারিত সেই শব্দরাশি—বেদবাণী। বৈদিক ঋষিগণ ছিলেন আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের আবিষ্কর্তা—স্রষ্টিকর্তা নহে। তাঁহারা বেদ রচনা করেন নাই। তাঁহারা ছিলেন বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টামাত্র—ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারো ন তু বেদস্য কর্তারঃ। বেদের অনেক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গ স্মরণ হইতে যতটুকু আভাষ দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা ধরিতে পারি, কোন বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা কোন ঋষি। ঋষিগণ সাধারণ মানব ছিলেন না। তাঁহারা কঠোর তপস্যা-যোগ-ধ্যানাদির দ্বারা অতীন্দ্রিয়

বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়

সূক্ষ্ম যোগ-শক্তি লাভ করিয়া দেব-পুত্র (২) নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। (৩)

বেদ অনাদি ও অনন্ত; কালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। বেদগ্রন্থ নাশ পাইতে পারে, কিন্তু বেদ নামধেয় অলৌকিক জ্ঞানরাশি কোন দিন নাশ পাইবার নহে। সেই অলৌকিক জ্ঞানরাশিই অনাদি ও অনন্ত। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, বেদ অপৌরুষেয়। অর্থাৎ—কোন পুরুষের দ্বারা ঐ অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি উৎপাদিত হয় নাই। যদি তাহার উৎপাদক কেহ থাকেন, তবে তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর। কিন্তু এই উৎপাদন তাঁহার চেষ্টনা নহে। ইহা আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় তাঁহার স্বাভাবিক ক্রিয়া মাত্র। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার কোনটিতেই জীবকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য কোন চেষ্টা করিতে হয় না। ইহা তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়া। সুষুপ্তিতে যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তখনো নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক স্বাভাবিক নিয়মে চলিতে থাকে। সেইরূপ প্রতিকল্পে পরমেশ্বরের নিশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে তাঁহার বাণীস্বরূপ

---

(২) ঋক, ১০ | ৬২ | ৪

(৩) প্রসঙ্গতঃ, বৈদিক ঋষি সম্বন্ধে আরো দুই এক কথা উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের ভিতর অনেক মহিলা ছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী, স্ত্রী-ঋষি বা ঋষিকা নামে খ্যাত। ছাব্বিশ জন ব্রহ্মবাদিনী ঋগ্বেদের মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম স্পষ্ট পাওয়া যায়। যথা—গোধা, ঘোষা কাক্ষিবতী, বিশ্ববারা আত্রেয়ী, উপনিষদ, অপালা আত্রেয়ী, ব্রহ্মজায়া জুহু, অগস্ত্য-স্বসা অদিতি, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রমাতা, সরমা, রোমশা, উর্বশী, লোপমুদ্রা, নদী, যমী, নারী শাশ্বতী, শ্রী, লাক্ষা, সার্প রাজ্ঞী, বাক্, শ্রদ্ধা, মেধা, দক্ষিণা, রাত্রী, সূর্যা এবং মমতা। মন্ত্রদ্রষ্টা বৈদিক ঋষিগণের ভিতর শূদ্রও ছিলেন। শূদ্র কবষ ঐলুষ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের কয়েক সূক্তের দ্রষ্টা। ব্রহ্মবাদিনী যজ্ঞবারা যজ্ঞে ঋত্বিকের আসন ও গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেদ নামধেয় জ্ঞানরাশি ঋষিগণের অন্তরে প্রকটিত হয়। কল্পান্তে এই জ্ঞানরাশির তিরোভাব হয় বটে, কিন্তু ধ্বংস হয় না। পুনরায় নূতন কল্পারম্ভে ইহা পরমেশ্বরের বাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করে সৃষ্টির আদিতে। কল্প-কল্পান্তর ধরিয়া সৃষ্টি-প্রবাহের মত বেদও প্রবাহরূপে নিত্য। এই প্রবাহের আদি নাই—অন্ত নাই। হিন্দুধর্মের ন্যায় অন্য কয়েকটি ধর্মেও সিদ্ধশাস্ত্রের ঈশ্বরমূলকত্ব স্বীকৃত। যেমন—খৃষ্টীয় ধর্ম, পারসিক ধর্ম, ইস্‌লাম প্রভৃতি। তবে প্রভেদ এই যে—অপর ধর্মগুলির মতে তাঁহাদের শাস্ত্র ঈশ্বরের পুত্র-মিত্র-ভক্তরূপে অবতীর্ণ কোন পুরুষ-বিশেষের দ্বারা প্রবর্তিত ও প্রচারিত; কিন্তু হিন্দুধর্মের মতে বেদ কোন পুরুষ-বিশেষের দ্বারা প্রবর্তিত ও প্রচারিত নহে। ইহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। সেই নিমিত্ত বেদের উৎপত্তির সময় নির্ণয় করা যায় না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী অবশ্য এই অভিমত গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বেদগ্রন্থ রচিত বলেন এবং রচনার কাল সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। তবে ঋগ্বেদ যে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ, ইহা সর্ববাদিসম্মত। (১) ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশ নিবিদ নামে খ্যাত।

বেদের অপর নাম—শ্রুতি। কারণ, পরমেশ্বরের বেদরূপী বাণী সর্বপ্রথমে ঋষিগণ অলৌকিক যোগশক্তির সাহায্যে শুনিতে পান এবং তাহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না হইয়া, গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় শ্রুত হইয়া মানব-সমাজে প্রচলিত হয়।

বেদের নাম — শ্রুতি

(১) হিন্দুসাধারণের বিশ্বাস, মহাভারতের যুদ্ধের সময় বেদব্যাস কর্তৃক বেদ সঙ্কলিত হয়। তিলক মহারাজের মতে, বেদ সঙ্কলিত হয় চারি হাজার খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে।

বৈদিক যুগে (২) ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদের সংহিতা-ভাগ কণ্ঠস্থ করার বিধান ছিল।

বেদ চারিভাগে বিভক্ত—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব বেদ।

বেদের বিভাগ

বেদের এই বিভাগ-কর্তা দ্বাপর যুগে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস (৩) বেদকে বিভাগ করায় তাঁহার উপাধি হয়—বেদ-ব্যাস। তিনি বেদের রচয়িতা নহেন—সঙ্কলয়িতা। প্রতি বেদের আবার দুই অংশ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। যাহার দ্বারা মনন করা যায় তাহাই মন্ত্র—মন্ত্রাঃ মননাৎ; তাৎপর্য এই যে, অধ্যাত্ম ও অধিদৈবাদি বিষয়ে মননের বা অনুচিন্তনের পক্ষে মন্ত্রই সহায়। (৪) বেদের মন্ত্রাংশের অপর নাম, সংহিতা। সংহিতার অর্থ, যে অংশে মন্ত্রসমূহ সংহিত বা একত্র স্থাপিত হইয়াছে। (৫) যে অংশে শ্রুতি বা বেদ স্বয়ং অপ্রকাশিত বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন এবং মন্ত্রাংশের প্রয়োগাদি প্রদর্শন করিয়াছেন সেই বেদাংশের নাম—

(২) অনেকের ধারণা এই যে, বৈদিক যুগে অক্ষরমালার সৃষ্টি ও লিখন-প্রথার প্রচলন হয় নাই, তাই গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় মুখস্থ করার বিধি ছিল। ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ঋগ্বেদে অক্ষরমালার ও লিখন-প্রথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

—Vedic Culture.

(৩) পুরাণের মতে, আপান্তরতপাঃ নামক বেদাচার্য এক প্রাচীন ঋষি ভগবান বিষ্ণুর আদেশে কলি ও দ্বাপর যুগের সন্ধিকালে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৪). ইহা যাস্কের অভিমত।

(৫) কোন এক বিষয়ক বেদোক্ত মন্ত্রসমষ্টিকে সূক্ত বলা হয়। যথা—দেবীসূক্ত, পুরুষ-সূক্ত ইত্যাদি। সু+উক্ত=সূক্ত, বা উত্তম বচন।

ব্রাহ্মণ। (৬) ব্রাহ্মণাংশে প্রধানতঃ বিধি-নিষেধ, যাগ-যজ্ঞ, ইতিবৃত্ত, অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসাপর বা নিন্দাপর বাক্য, উপাসনা ও ব্রহ্মবিদ্যা নিবেশিত হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণের অংশবিশেষ—আরণ্যক। ইহা বানপ্রস্থাশ্রমে অরণ্যবাসিগণের পাঠ্য ছিল। আরণ্যকে প্রচুর পরিমাণে উপাসনাদি বিহিত। অরণ্যবাসিগণ যাগ-যজ্ঞ করিতেন না, আত্মোপলব্ধির অভিপ্রায়ে ধারণা-ধ্যান-উপাসনা ছিল তাঁহাদের মুখ্য কর্ম। যাগ যজ্ঞ ছিল গৃহস্থাশ্রমে গৃহিগণের প্রধান ধর্ম-কর্ম। ব্রাহ্মণের আরণ্যক অংশ গদ্যে রচিত। বেদের অংশবিশেষ—উপনিষদ্। উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এই উভয় বিভাগেই উপনিষদ্ স্থান পাইয়াছে। সংহিতাভাগের উপনিষদ্—সংহিতোপনিষদ্। ব্রাহ্মণভাগের উপনিষদ্—ব্রাহ্মণোপনিষদ্। যেমন—ঈশোপনিষদ্, একখানা সংহিতোপনিষদ্; আর ঐতরেয়, একখানা ব্রাহ্মণোপনিষদ্। যদ্যপি আরণ্যক ও উপনিষদের যুগ বলিয়া পৃথক যুগ নাই, তত্রাচ ইহা স্বীকার্য যে, সাধারণতঃ বেদের সংহিতাদি বিভাগের ভিতর এক পারম্পর্য বিদ্যমান। প্রথমে সংহিতা, পরে ব্রাহ্মণ, পরে আরণ্যক এবং সর্বশেষে উপনিষদ্। মনে হয়, যেন আর্য-হিন্দুর চারি আশ্রমের জন্য এই চারি বিভাগ। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের জন্য সংহিতা, গৃহস্থাশ্রমের জন্য ব্রাহ্মণ, বানপ্রস্থাশ্রমের জন্য আরণ্যক এবং সন্ন্যাসাশ্রমের জন্য উপনিষদ্।

---

(৬) ব্রাহ্মণ পদের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত-ভেদ আছে। একটি মত এই যে, বেদের স্তোত্রাংশ ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত, সেই স্তোত্রাংশ সম্বন্ধীয় উক্তিই ব্রাহ্মণ।

বেদ-মন্ত্র সমূহ (৭) পদ্যাত্মক, গদ্যাত্মক ও গানাত্মক। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি পদ্যাত্মক, যজুর্বেদের গদ্যাত্মক এবং সামবেদের গানাত্মক। সামবেদের স্বর-লয়-যুক্ত মন্ত্রগুলির প্রায় সমস্ত ঋক মন্ত্র। যজ্ঞকালে হোতা ও তাঁহার সহকারিগণ ঋকমন্ত্রে হবির্ভোজী দেবতাগণের স্তব করিয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞে আহ্বান করেন। উদ্‌গাতা ও তাঁহার সহকারিগণ সামমন্ত্রে গান করেন। অধ্বর্যু ও তাঁহার সহকারিগণ যজুর্মন্ত্রে আহুতি প্রদান করেন। (১) বেদব্যাস যজ্ঞে ব্যবহার্য এক এক শ্রেণীর মন্ত্রগুলিকে এক এক স্থানে স্থাপিত করিয়া ঋক, সাম ও যজুঃ এই তিন বেদ গ্রন্থাকারে বিভক্ত করেন। যে ভাগে যে শ্রেণীর বাহুল্য, সেই শ্রেণীর নামানুযায়ী সেই ভাগের নামকরণ হয়। পদ্যাত্মক মন্ত্রের নাম, ঋক; এই শ্রেণীর মন্ত্র যে ভাগে অধিক, তাহার নাম—ঋগ্বেদ। গদ্যাত্মক মন্ত্রের নাম, যজুঃ; এই শ্রেণীর বাহুল্য যে ভাগে, তাহার নাম—যজুর্বেদ। গানাত্মক মন্ত্রের নাম, সাম; যে ভাগে এই শ্রেণীর বাহুল্য, তাহার নাম—সামবেদ। যজ্ঞে ব্যবহার্য নহে যে সব অবশিষ্ট মন্ত্র, সেগুলি যে ভাগে সন্নিবিষ্ট

(৭) ঋগ্বেদের মোট মন্ত্র-সংখ্যা ১০৫৮৯; সমস্ত ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডলে, ৮৫ অনুবাকে ও ১০১৮ সূক্তে বিভক্ত। যজুর্বেদের মোট মন্ত্র-সংখ্যা ১৯৭৫; সমস্ত যজুর্বেদ ৪০ অধ্যায়ে ও ৩০৩ অনুবাকে বিভক্ত। সামবেদের মোট মন্ত্র-সংখ্যা ১৮৯৩; ইহার দুই অংশ—পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক; পূর্বার্চিকে ৪ কাণ্ড ও ৬ প্রপাঠক; উত্তরার্চিকে ২১ অধ্যায় ও ৯ প্রপাঠক। অথর্ববেদের মোট মন্ত্র-সংখ্যা ৫৯৭৭; ইহার ২০ কাণ্ড এবং ৩৪ প্রপাঠক। সমগ্র বেদে মোট মন্ত্র-সংখ্যা ২০৪৩৪।

(১) ঋগ্‌ভিঃ স্তুবন্তি, যজুর্ভিঃ যজন্তি, সামভিঃ গায়ন্তি—ঋকমন্ত্রের দ্বারা দেবতার স্তব যজুঃমন্ত্রের দ্বারা তাঁহার পূজন এবং সামমন্ত্রের দ্বারা তাঁহার ভজন হয়।

—শাস্ত্র-বচন

তাহার নাম—অথর্ববেদ। (২) অথর্ববেদে উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আছে এবং রাজোচিত কর্ম, মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ ইত্যাদি লৌকিক তত্ত্বও আছে। অনেকের ধারণা এই যে, অথর্ববেদ বেদ নহে—বেদ-বহির্ভূত। এই ধারণা ভ্রান্ত। অথর্ববেদও বেদ, তবে তাহার মন্ত্র যজ্ঞে ব্যবহৃত হয় না। (৩) শাস্ত্রে বেদের আর এক নাম—ত্রয়ী। তিনের সমষ্টি, ত্রয়ী। ত্রয়ী নামের তাৎপর্য ইহা নহে যে, ঋক—যজুঃ—সাম এই তিনটি বেদ এবং অথর্ব বেদ-বহির্ভূত। চারি বেদকে ছন্দ হিসাবে পদ্যাত্মক, গদ্যাত্মক ও গানাত্মক এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় বলিয়া বেদের নাম, ত্রয়ী। (৪) ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে চারি বেদ উল্লিখিত। অথর্ববেদ দুই ভাগে বিভক্ত —ভার্গব উপস্থা ও আঙ্গিরস নিগম। সেই নিমিত্ত অথর্ববেদকে ভৃগ্বঙ্গিরসী সংহিতা কহে। (৫) সমগ্র বেদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত —কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। আরণ্যক ও উপনিষদ্ এই দুই বাদে অবশিষ্ট সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলি কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত, কেননা প্রধানতঃ সেগুলির প্রয়োগ হয় যজ্ঞরূপ ধর্মকর্মে। আরণ্যকের ও উপনিষদের লক্ষ্য উপাসনা এবং ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিপাদন, সেই জন্য এই দুইটি জ্ঞান কাণ্ডের অন্তর্গত। কর্মকাণ্ড প্রবৃত্তিমার্গে, জ্ঞানকাণ্ড নিবৃত্তিমার্গে।

---

(২) অথ+ঋ+বনিপ=অথর্ব। অথ=অনন্তর; ঋ=গমন করা। অথর্ব পদের ধাতুগত অর্থ. অনন্তর গমন করা বা পরবর্তী। অতএব অথর্ববেদ, বেদের পরিশিষ্ট।

(৩) হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব।

(৪) বিনিযোক্তব্য রূপশ্চ ত্রিবিধ স প্রদর্শতে।
ঋগ্ যজুঃ সাম রূপেন মন্ত্রো বেদচতুষ্টয়ে ॥

—মীমাংসা দর্শনের সর্বানুক্রমনী বৃত্তি।

(৫) Macdonell, History of Sanskrit Literature.

বেদব্যাস বেদ বিভাগের পর নিজের চারি শিষ্যকে চারি বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন—পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথর্ববেদ। বৈশম্পায়নের শিষ্য, যাজ্ঞবল্ক্য।

বেদের শাখা প্রশাখা

যাজ্ঞবল্ক্যের বিদ্যাভিমান বেশী হওয়ায় গুরু কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। তখন তিনি গুরুলব্ধ বেদ-বিদ্যা উদ্গীরণ করেন। যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্গীর্ণ বা পরিত্যক্ত বেদ—কৃষ্ণযজুর্বেদ। তারপর তিনি উপাসনার দ্বারা সূর্যদেবকে তুষ্ট করণান্তর সূর্যদেবের নিকট পুনরায় বেদবিদ্যা লাভ করেন। সেই বেদ—শুক্লযজুর্বেদ। কালক্রমে শিষ্য-প্রশিষ্য-পরম্পরায় চারি বেদ বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। ঋগ্বেদের একুশ শাখা, যজুর্বেদের একশত নয় শাখা, সামবেদের এক হাজার শাখা এবং অথর্ব বেদের পঞ্চাশ শাখা। সর্বসমেত চারি বেদের ১১৮০ শাখা। অধুনা এই সকল শাখা-প্রশাখার অধিকাংশ বিলুপ্ত। আজকাল যে সব শাখা বিদ্যমান তাহাদের নাম—ঋগ্বেদের শৈশিরীয় শাখা; শুক্লযজুর্বেদের কান্ব ও ও মাধ্যন্দিন শাখা; সামবেদের কৌথুম, জৈমিনীয় ও রাণায়নীয় শাখা এবং অথর্ববেদের সৌনক শাখা। এই শাখা বলিলে বৃক্ষের অংশ বিশেষ এক এক শাখার ন্যায় বেদের অংশবিশেষকে বুঝায় না। এখানে এক এক শাখা অর্থে এক এক সংস্করণ বুঝিতে হইবে। যেমন—বাল্মীকি রামায়ণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, তুলসীদাসী রামায়ণ প্রভৃতি এক রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণ। যেরূপ রামায়ণের প্রত্যেক সংস্করণে সম্পূর্ণ রামায়ণ আছে, সেইরূপ বেদের প্রত্যেক শাখায় সেই বেদের পূর্ণাঙ্গ আছে। কোন বেদের একটি শাখা পড়িলে সেই বেদটি সব পড়া হয়।

বেদের প্রতি শাখাতেই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ ছিল। বেদের

শাখা-প্রশাখার সংখ্যা ১১৮০। তাই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদের প্রত্যেকের সংখ্যাও ছিল ১১৮০। বর্তমান কালে প্রায় সমস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবলমাত্র কয়েকখানা ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের নাম পাওয়া যায়। তাহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। ঋগ্বেদের দুই ব্রাহ্মণ—ঐতরেয় ও কৌষীতকী; শুক্লযজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ (১); কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ও মৈত্রায়ণ ব্রাহ্মণ; সামবেদের তাণ্ড্য, পঞ্চবিংশ (২) বা প্রৌঢ়, তলবাকার, ছান্দোগ্য, সামবিধান, দেবতাধ্যায়, বংশ ও সংহিতোপনিষদ্; অথর্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণ। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের এক এক আরণ্যক আছে। কেনোপনিষদ্ সামবেদের তলবাকার ব্রাহ্মণের চতুর্থ কণ্ডিকার অন্তর্ভুক্ত।

ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক

'উপ' ও 'নি' পূর্বক 'সদ্' ধাতুর উত্তর 'ক্বিপ' প্রত্যয় যোগে 'উপনিষদ্' পদ নিষ্পন্ন। সদ্ ধাতুর অর্থ, প্রাপ্তি এবং বিনাশ দুই। উপনিষদ্ পদের ধাতুগত অর্থ—যে বিদ্যা সত্বর নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে লইয়া যায় এবং সংসার-বন্ধনকে বিনাশ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা (৩)। ইহা উপনিষদ শব্দের মুখ্যার্থ। ইহার গৌণার্থ—যে গ্রন্থের সহায্যে এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয়। অতএব, উপনিষদ্ বলিলে ব্রহ্মবিদ্যা এবং যে গ্রন্থ হইতে ঐ বিদ্যা

উপনিষদ্

(১) ইহা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, ইহাতে ঐতিহাসিক তথ্যও আছে। বদরিকাশ্রমের উত্তরে প্রখ্যাত শতপথ হ্রদের নামের সহিত ইহা সংশ্লিষ্ট।

(২) ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ পঞ্চবিংশের পরিশিষ্ট।

(৩) সেয়ং ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎশব্দবাচ্যাতৎপরাণাং সহেতোঃ সংসারস্য অত্যন্তাবসাদনাৎ।—বৃঃ উঃ ভাষ্য-ভূমিকায় শ্রীশঙ্করাচার্য।

লাভ হয় সেই গ্রন্থ, এই দুইটি বুঝায়। বেদের অন্তে বা শেষে ব্রহ্মবিদ্যা নিবদ্ধ হওয়ায়, উপনিষদের অন্য নাম—বেদান্ত। অথবা, এই ব্রহ্মবিদ্যা বেদের সারাংশ বলিয়া ইহার নাম, বেদান্ত। বেদের প্রত্যেক শাখায় এক একখানা উপনিষদ্ থাকা ধরিয়া লইলে, উপনিষদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৮০। ইদানীং অধিকাংশ বিলুপ্ত। আজকাল প্রায় দুই শত পুস্তক উপনিষদ্ নামে খ্যাত। তাহার মধ্যে কতকগুলি অনেক পরে রচিত—অর্বাচীন। যেমন, আল্লোপনিষদ্। ইহা সম্রাট আকবরের সময়ে বিরচিত। যজুর্বেদান্তর্গত মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ খানা উপনিষদের নাম পাওয়া যায়। সেই কারণ, সাধারণতঃ উপনিষদের সংখ্যা ১০৮ বলা হয়। শ্রীশঙ্করাচার্যের রচিত বেদান্ত-দর্শনের শারীরক ভাষ্যে মাত্র চৌদ্দখানা উপনিষদের বচন উদ্ধৃত। কিন্তু তিনি উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন-কালে কেবলমাত্র দশ খানা উপনিষদের ভাষ্য লিখেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, তিনি এই দশখানা উপনিষদ্ প্রধান বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য—এই দশখানা। ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর এই চারি খানা পদ্যাত্মক উপনিষদ্ বৈদিক যুগে পারমার্থিক তত্ত্বকথার স্মারকরূপে নিত্য পাঠ্য স্বাধ্যায় ছিল।

উপনিষদ্, বেদান্তদর্শন এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই তিনের সমন্বয়ে বেদান্তশাস্ত্র। এই তিনটিকে বেদান্তের প্রস্থানত্রয় কহে। প্রস্থানত্রয় বলিলে শ্রুতিপ্রস্থান, ন্যায়প্রস্থান এবং স্মৃতিপ্রস্থান এই তিনটি বুঝায়।

বেদান্তশাস্ত্রের প্রস্থানত্রয়

উপনিষদ্ সমূহে বেদের বা শ্রুতির পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদিত, তাই বেদান্তশাস্ত্রে উপনিষদ্ সমূহ—শ্রুতিপ্রস্থান। শ্রুতি-প্রতিপাদিত

ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা ছয় দর্শনেই আছে বটে, কিন্তু ব্যাস-বিরচিত বেদান্তদর্শনে ঐ ব্রহ্মবিদ্যা এবং আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় যেরূপ বিশেষভাবে বিশ্লেষিত অন্য দর্শনগুলিতে সেরূপ নহে। ন্যায়দর্শনে যেমন পঞ্চাবয়ব বিচার-পদ্ধতি অনুসরণে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, বেদান্তদর্শনও তেমনি বিচার-সন্দেহ-সঙ্গতি-পূর্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত এই পঞ্চবিধ প্রকারে বিচার করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত বা নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই জন্য বেদান্তশাস্ত্রে বেদান্তদর্শন—ন্যায়প্রস্থান। বেদের নাম, শ্রুতি। বেদ বাদে অন্য ধর্মগ্রন্থগুলি বেদ-বচনকে স্মরণ করিয়া রচিত বলিয়া তাহারা স্মৃতি নামে পরিচিত। স্মৃতির এই ব্যাপক অর্থে স্মার্তসূত্র, ইতিহাস, অষ্টাদশ পুরাণ, নীতিশাস্ত্র এই সব বুঝায়। সেই নিমিত্ত মহাভারত ও স্মৃতিশাস্ত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের অন্তঃপাতী। সকল উপনিষদের সার এই গীতা। তাই, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বেদান্তশাস্ত্রে—স্মৃতিপ্রস্থান। উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই তিন গ্রন্থ ব্যতীত বেদান্তশাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করে না। সেই কারণ শ্রীশঙ্করাচার্য, শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীনিম্বর্কাচার্য প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়-প্রবর্তক মনীষী বেদান্তবাদী আচার্যগণ নিজ নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন কালে এই প্রস্থানত্রয়ের বিভিন্ন ভাষ্য প্রণয়নে, নিজ নিজ সম্প্রদায়গত মতবাদ যে বেদান্তশাস্ত্রসম্মত, তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই প্রস্থানত্রয় কলিযুগের ধর্মসহায়।

বেদের মর্ম ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে বেদের ছয়খানা অবয়বগ্রন্থ অধ্যয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই অবয়ব-গ্রন্থগুলিকে বলা হয়, বেদাঙ্গ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এই ছয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলি সূত্রাকারে রচিত। শিক্ষা ও ব্যাকরণের রচয়িতা পাণিনি, ছন্দের

বেদাঙ্গ

পিঙ্গলাচার্য, নিরুক্তের যাস্ক, জ্যোতিষের গর্গ এবং কল্পের ভিন্ন ভিন্ন ঋষি-সম্প্রদায়।

১। **শিক্ষাসূত্র**—ইহাতে বর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম নিবদ্ধ হইয়াছে।

২। **ব্যাকরণসূত্র**—শব্দ-ব্যুৎপাদক শাস্ত্র। ইহাতে পদ-সাধনাদির নিয়ম আছে।

৩। **নিরুক্ত**—ইহাতে বৈদিকশব্দের যোগার্থ নিরূপিত।

৪। **ছন্দঃ**—পদ্যবন্ধশাস্ত্র। ইহাতে বৈদিক পদ্যবন্ধের নিয়মাবলী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষিত। সামবেদের নিদানসূত্র প্রসিদ্ধ।

৫। **জ্যোতিষ**—ইহাতে গ্রহনক্ষত্রাদির রূপ ও গতি বিশেষ-ভাবে আলোচিত।

৬। **কল্পসূত্র**—শ্রৌতসূত্র, ধর্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্র এই তিনের সমষ্টি। শ্রৌতসূত্রে শ্রৌত অর্থাৎ বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-পদ্ধতি বর্ণিত। ধর্মসূত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির সমাজের ও দেশের প্রতি কর্তব্য কর্ম নির্ধারিত। গৃহ্যসূত্রে প্রত্যেক গৃহীর পিতা-পুত্র-ভ্রাতা-স্বামীরূপে স্বপরিবারভুক্ত অন্য সকলের প্রতি কর্তব্য কর্ম বিশদভাবে কথিত। এই তিনের সমষ্টি কল্পসূত্রে আরো অনেক বিষয়বস্তুর আলোচনা আছে। যথা—প্রতিশাখ্য, পদপাঠ, ক্রমপাঠ, উপলেখ

অনুক্রমনি, দৈবতসংহিতা, পরিশিষ্ট, প্রয়োগ, পদ্ধতি, কারিকা, খিল এবং ব্যূহ ইত্যাদি। প্রত্যেক বেদের অঙ্গস্বরূপ কল্পসূত্র প্রণীত। ঋগ্বেদের তিনটি কল্পসূত্র—অশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন ও শাণ্ডভ্য। সামবেদের পাঁচটি—মশক, লত্যায়ন, দ্রহ্যায়ন, গোভিল ও খদির। শুক্লযজুর্বেদের দুইটি—কাত্যায়ন ও পরস্কর। কৃষ্ণযজুর্বেদের সাতটি—আপস্তম্ভ, হিরণ্যকেশি, বোধায়ন, ভরদ্বাজ, মানব, বৈখানস ও কথক। অথর্ববেদের দুইটি—বৈতান ও কৌশিক। কল্পসূত্রে পদপাঠ, ক্রমপাঠ, জটাপাঠ, ঘনপাঠ ইত্যাদি যে সব পাঠের ব্যবস্থা নির্দেশিত তাহাতে বেদমন্ত্রগুলি যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। বেদ-সংহিতায় নূতন মন্ত্রের যোজনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বেদের সংহিতাভাগের বিশুদ্ধিরক্ষার্থে এই ব্যবস্থা। জগতের সাহিত্যে এইরূপ আর কোথাও নাই। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ায়, অনেকেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী রচনা করিয়া উপনিষদ্ নামে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; যেমন, সম্রাট আকবরের আমলে আল্লোপনিষদ্।

উপবেদ

মূল চারি বেদ ব্যতীত চারি উপবেদ আছে। আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র। আয়ুর্বেদ—ভেষজবিদ্যা। ধনুর্বেদ—অস্ত্রবিদ্যা। গন্ধর্ববেদ—সঙ্গীতবিদ্যা। অর্থশাস্ত্র—কৃষিবিদ্যা। এই চারি উপবেদের বিদ্যা বা জ্ঞান লৌকিক বিষয় সম্বন্ধে, ইহা অপরা বিদ্যা। ঋগাদি চারি মূল বেদে পরা বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাই মুখ্য বিষয়বস্তু। অতএব, এই চারি উপবেদ ঐ মূল চারি বেদের সমশ্রেণী-ভুক্ত নহে। তবে মূল বেদের সহকারীরূপে গণ্য বলিয়া তাহাদের নাম, উপবেদ। মানব-সমাজের রক্ষণ-পরিচালনে এই সকল লৌকিক বিদ্যার প্রয়োজন। প্রাচীন ঋষিগণ এই সত্য উপলব্ধি করিয়া মানবের ও মানব-সমাজের কল্যাণার্থে এই সকল উপবেদ রচনা করিয়াছিলেন।

[দুই]
স্মৃতি-সংহিতা।

যাহা স্মৃত হইয়াছে, তাহাই স্মৃতি। স্মৃতি পদের অর্থ, স্মরণ। বেদের শাশ্বত সনাতন সত্য সমূহ বৈদিক ঋষিগণ কর্তৃক ঈশ্বরের প্রত্যাদেশরূপে অলৌকিক সূক্ষ্ম যোগ-শক্তি-সাহায্যে অন্তরে শ্রুত হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত বেদের নাম, শ্রুতি। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। শ্রুতি হইল মূল শাস্ত্র—সিদ্ধ শাস্ত্র—সনাতন শাস্ত্র। বেদ-নিহিত তত্ত্বরাশি সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে না; তাই, যুগ-পরিবর্তনে সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিলেও, ঐ সকল বৈদিক তত্ত্বের পরিবর্তন ঘটে না। পরবর্তীকালে আর্য মুনি-ঋষিগণ বেদের ঐ শাশ্বত সনাতন বাণীর মর্ম অন্তরে স্মরণ করিয়া, তাহার ভিত্তিতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কালে সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতির গতি অনুযায়ী নিজ নিজ যুগোপযোগী কতকগুলি শাস্ত্র রচনা করেন। সেই সকল শাস্ত্র—স্মৃতি। এইগুলি যুগ-শাস্ত্র। সামাজিক অবস্থা-সম্বন্ধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের পরিবর্তন হয়। এইগুলি ঋষিগণের রচিত ও চিন্তাপ্রসূত, সেই জন্য অপৌরুষেয় নহে। বেদের প্রামাণ্য মুখ্য, ইহাদের প্রামাণ্য গৌণ। কোন স্মৃতিবাক্য বেদানু-মোদিত হইলে আদৃত হয় এবং বেদ-বিরুদ্ধ হইলে অনাদৃত ও ত্যক্ত হয়। স্মৃতি শব্দের দুই অর্থ—ব্যাপক ও সঙ্কীর্ণ। ব্যাপক অর্থে বৈদিক যুগের পরবর্তীকালে যে সকল যুগশাস্ত্র বেদবাণীর স্মরণে রচিত সে সমস্ত বুঝায়; যথা—ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ ও আগম। ইহার সঙ্কীর্ণ অর্থে কেবলমাত্র ধর্মশাস্ত্রকে বুঝায়।

স্মৃতির অর্থ

ধর্মশাস্ত্রের অপর নাম—স্মৃতি-সংহিতা। এই ধর্মশাস্ত্রগুলি বিশ জন সমাজ-ব্যবস্থাপক ঋষি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। সেই বিশ জন ঋষি—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, ব্যাস, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ। তাঁহাদের রচিত স্মৃতি-সংহিতায় তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন কালে, দেশের সুশাসন ও আর্য-হিন্দুর জীবনযাত্রার সুনিয়ন্ত্রণ অভিপ্রায়ে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কতকগুলি বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দশবিধ সংস্কার, খাদ্যাখাদ্যবিচার, ব্রতপূজা, প্রায়শ্চিত্ত, দায়ভাগ, রাজধর্ম, শাসন-নীতি ইত্যাদি নানা বিষয়বস্তু-সম্ভারে এই স্মৃতি-সংহিতাগুলি সমৃদ্ধ। ইহাতে রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান এই সব বিশদভাবে আলোচিত। এই সকল স্মৃতি-সংহিতার অনুশাসন যুগ-প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। সত্যযুগে মনু-স্মৃতি বা মানব ধর্মশাস্ত্র, ত্রেতায় যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি, দ্বাপরে শাঙ্খ ও লিখিতের স্মৃতি এবং কলিতে পরাশর-স্মৃতি প্রচলিত। (১) বিশ খানা স্মৃতি-সংহিতার ভিতর মনু-স্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি এবং পরাশর-স্মৃতি এই তিন খানা প্রধান ও প্রসিদ্ধ। স্মার্তকার ঋষিগণ ছিলেন সমাজ-ব্যবস্থাপক এবং আইন-প্রণেতা। বর্তমান হিন্দু-আইন ঐ প্রাচীন স্মার্ত ঋষিগণের অনুশাসনের উপর অধিষ্ঠিত। ঐ সকল ঋষিগণের ভিতর মনু মহারাজ শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম আইন-প্রণেতা। তাঁহার পর ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য। অধুনা

ধর্মশাস্ত্র বা
স্মৃতি-সংহিতা

---

(১) কৃতে তু মানবা ধর্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ ॥
—পরাশর।

সারা ভারতবর্ষে আর্য-হিন্দুর ব্যবহারিক জীবনে মনু-স্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি এই দুইখানা প্রামাণিক গ্রন্থরূপে সম্মানিত। বিচারালয়ে হিন্দু-আইন সম্পর্কে কোন কঠিন প্রশ্ন উঠিলে, প্রধানতঃ মনু-স্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি খুঁজিয়া দেখা হয় যে, এই দুই স্মার্ত ঋষি বিতর্কিত বিষয় সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। আবার, এই দুইখানার মধ্যে হিন্দু-আইন সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের অনুশাসন বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়। স্মার্তকার ঋষিগণের বিধি-নিষেধের সুদূর লক্ষ্য ছিল—কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক, জীবনে মানবের চিত্তশুদ্ধি-সংসিদ্ধি। চিত্তশুদ্ধিই মানব-ধর্মের আদি কথা। মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য—মোক্ষ। চিত্তশুদ্ধি না হইলে মোক্ষলাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সেইজন্য স্মৃতি-সংহিতায় এই সকল বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা। এই বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিলে অন্তরে সত্ত্বভাবের বৃদ্ধি হয়। সত্ত্বগুণের দ্বারা মানব পশু-প্রকৃতি জয় করিয়া দিব্য প্রকৃতি লাভ করিতে পারে।

প্রাচীন বিশ জন স্মৃতিকার ঋষির স্মৃতি-সংহিতার প্রণয়ন-কালে আর্য-হিন্দু-সমাজের যে পরিবেশ-পরিস্থিতি ছিল, তাহার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সেই নিমিত্ত সেই সকল স্মৃতির কতক অনুশাসন আজকাল অচল। নূতন স্মৃতি-সংহিতার প্রয়োজন। ঐ প্রাচীন স্মৃতিকার ঋষিগণের বহু পরে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীবাচস্পতি মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা যুগোপযোগী নূতন স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করেন। অধুনা প্রধানতঃ বঙ্গদেশীয় হিন্দু-সমাজে তাঁহাদের স্মৃতি প্রচলিত। (১) মানব-সমাজ প্রগতিশীল। শ্রীরঘুনন্দন

(১) স্মার্ত ভট্টাচার্য শ্রীরঘুনন্দনের নিবাস নবদ্বীপে এবং শ্রীবাচস্পতি মিশ্রের মিথিলাতে। একের প্রভাব দক্ষিণ বঙ্গে, আর অন্যের উত্তর বঙ্গে। এই দুই জনের স্মৃতি-নিবন্ধ বঙ্গদেশে সকল টোলে নিত্য অধীত হইত।

ও শ্রীবাচস্পতি মিশ্রের পর এই দেশে হিন্দু-সমাজে আরো কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অতএব মনে হয়, বর্তমান কালোপযোগী এক নূতন স্মৃতির সময় আসিয়াছে।

[তিন]
ইতিহাস।

রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্য ইতিহাস বলিয়া গণনীয়। বেদের শাশ্বত সনাতন সত্যগুলি ঐতিহাসিক কথা-কাহিনীর মাধ্যমে জন-সমাজে প্রচার করা, এই ধর্মগ্রন্থগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। কাব্যে ও বর্ণনা-চাতুর্যে এই গ্রন্থদ্বয় অতুলনীয় ও হৃদয়গ্রাহী। সেই কারণ, আবালবৃদ্ধবনিতা মূর্খ-পণ্ডিত সকলেরই চিত্ত সহজে ইহাদের প্রতি আকর্ষিত হয়। বেদ—প্রভু-সংহিতা, অর্থাৎ অধিনায়ক গ্রন্থ। ইতিহাস—সুহৃৎ-সংহিতা, অর্থাৎ বেদ-সংহিতার সঙ্গী গ্রন্থ। বেদ-সংহিতার উচ্চ তত্ত্ব এবং উপনিষদেরও ব্রহ্মসূত্রের সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তাধারা সাধারণ মানবের পক্ষে দুর্বোধ্য। স্মৃতির অনুশাসন ও সকলের পক্ষে সুবোধ্য নহে ; এই নিমিত্ত মহর্ষি বাল্মিকি ও বেদব্যাস এই দুই মহাকাব্যরূপী ইতিহাস রচনা করিয়া, বেদ-বেদান্তের উচ্চ তত্ত্ব ও স্মৃতির অনুশাসন মনোরম উপায়ে রূপক ও কথাচ্ছলে সাধারণ জনসমাজে প্রচার করেন। এই গ্রন্থগুলির অধ্যয়নে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে।

রামায়ণ আদিকাব্য, বাল্মিকি-বিরচিত। রামায়ণের পূর্বে কাব্য-সাহিত্য ছিল না। বাল্মিকি আদি কবি। তাঁহার পূর্বে কবিও কেহ

ছিল না। ইক্ষাকুবংশজাত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের (১) জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি সমস্ত ঘটনা রামায়ণে বর্ণিত। রামায়ণে কথিত শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি এবং সীতা দেবীর পতিভক্তি জগতে আদর্শস্থানীয়। শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন একাধারে আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, আদর্শ নৃপতি, আদর্শ পিতা, আদর্শ যোদ্ধা, আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক, আদর্শ বিচারক ও আদর্শ মানব। তাই তিনি মহাপুরুষ—বিষ্ণুর এক অবতার। রাম-চরিত্রে শিক্ষনীয় অনেক কিছু আছে। তাঁহার রাজ্যে সুখ-শান্তি সদা বর্তমান ছিল। তাই, আজো আদর্শ-রাজ্য বলিতে রাম-রাজ্য বুঝায়। রামায়ণে আমরা পাই সেই যুগের আর্য-সমাজের এক সুন্দর চিত্র এবং আর্য-হিন্দুর জীবন-যাত্রা-প্রণালীর রমণীয় বর্ণনা। সকল দিক দিয়া রামায়ণ-মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়। অদ্যাবধি হিন্দুজাতির অধিকাংশ রামায়ণ-পাঠে রত ও অনুপ্রাণিত। শ্রীরামচন্দ্রের বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে কুলগুরু মুনিবর বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধে যে সব সারগর্ভ উপদেশ দেন, তাহা স্বতন্ত্রভাবে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ নামে পরিচিত। ইহা ও একখানা অমূল্য ধর্মগ্রন্থ—শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মশাস্ত্র।

রামায়ণ

মহাভারত আর এক মহাকাব্য ও ইতিহাস। হিন্দুসাধারণের বিশ্বাস এই যে, দ্বাপর যুগের শেষে ও কলিযুগের আরম্ভে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই মহাকাব্য

মহাভারত

(১) কেহ কেহ বলেন যে, অথর্ববেদের আঙ্গিরস-সংহিতাভাগের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন দশরথ-নন্দন শ্রীরামচন্দ্র এবং ভার্গব-সংহিতাভাগের ছিলেন পুরুষাশ্ব-নন্দন জরথুস্ত্র। উভয়েই ক্ষত্রিয়। শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন দেবোপাসক, আর জরথুস্ত্র অসুরোপাসক। জরথুস্ত্র পারসিক ধর্মের প্রবর্তক।

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র।

রচনা করেন। তবে অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, ব্যাস উপাধিধারী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং বেদ-বিভাগকর্তা ও মহাভারত-রচয়িতা এক ব্যাস নহেন। সে যাহাই হৌক্‌, মহাভারত হিন্দুধর্মের বিশ্বকোশ। ইহাকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। কাব্য ও ইতিহাসের ভিতর দিয়া হিন্দুধর্মের সকল তত্ত্ব কথিত। নীতিধর্ম, রাজধর্ম, গার্হস্থ্যধর্ম, সামাজিক ধর্ম, আনুষ্ঠানিক ধর্ম ইত্যাদি মানবের সর্বপ্রকার ধর্ম বা কর্তব্যকর্ম সুন্দর ভাবে রূপক ও কথাচ্ছলে বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত। চন্দ্রবংশীয় কুরু-পাণ্ডবগণের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ (২) ঘটিয়াছিল। মহাভারতে প্রধানতঃ সেই মহাযুদ্ধ বর্ণিত এবং তাহার পট-ভূমিকায় সেই যুগের আর্য-সমাজের একখানা মনোরম চিত্র অঙ্কিত। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে শরশয্যাশায়ী কুরুপিতামহ ভীষ্মদেব ধর্ম সম্বন্ধে যে সব মহামূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে সনাতন হিন্দুধর্মের মর্ম উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সেই উপদেশরাজি কালবিজয়ী। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে শিষ্যরূপী অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জগদ্বাসীর উদ্দেশে বিশদভাবে ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রচারিত বাণী—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। শ্রীভগবানের বাণী বলিয়া গীতাকে ভগবদ্গীতা বলা হয়। গীতা মহাভারতের অন্তর্গত হইলেও স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থরূপে

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

(২) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ বলেন যে, মহাভারতীয় যুদ্ধ ও কাহিনী ইত্যাদি সব রূপক মাত্র—তাহার মূলে কোন ঐতিহাসিক তথ্য নাই। এই মত ভ্রান্তি-মূলক। শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ পাণিনি দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ব্যাকরণে শ্রীকৃষ্ণের কথা ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

সর্বদা ব্যবহৃত। চতুর্বেদের সার উপনিষদ্, উপনিষদের সার এই গীতা গীতা বেদান্তশাস্ত্রের প্রস্থানত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, প্রত্যেক আচার্য স্বমতানুসারে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অদ্যাবধি গীতার বিভিন্ন ব্যাখান বা ভাষ্য প্রায় সত্তরখানা প্রকাশিত হইয়াছে। জগতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় গীতার অনুবাদ যত হইয়াছে, অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের তত হয় নাই। ইহাতে জগতে সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে গীতার ব্যাপকতা ও সার্বভৌমিকতা যে সর্বাধিক তাহা প্রমাণিত হয়। রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদও বহির্ভারতে বিভিন্ন ভাষায় হইয়াছে।

ইতিহাস-শ্রেণীভুক্ত আর এক গ্রন্থ—হরিবংশ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী বর্ণিত। ইহা পুরাণের অন্তঃপাতী নহে, অতএব ইহাকে ইতিহাসের শ্রেণীতে গণ্য করা যাইতে পারে।

সূত নামধেয় এক শ্রেণীর লোক সেকালে বৈদিক যুগ হইতে ছিল, ইহার পরিস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের বৃত্তি ছিল নৃপতিগণের কীর্তি-কাহিনী, রাজবংশের ইতিহাস এবং মহাপুরুষগণের চরিত্রাবলী কীর্তন করা। ইহা ছিল তাঁহাদের বংশপরম্পরাগত বৃত্তি। ইতিহাস ও পুরাণের অনেক উপাদান তাঁহাদের কীর্তিত গাথাগুলি হইতে সংগৃহীত। বংশক্রম-রক্ষা আর্যহিন্দুসমাজের বিশেষত্ব। বৈদিক যুগ হইতেই তাহার সূচনা। বিবাহাদি মাঙ্গলিক উৎসবে অভিজাত আর্যহিন্দুগণ স্ব স্ব কুলপরিচয় বা বংশেতিহাস কীর্তন করিতেন। রামায়ণে আমরা তাহার পূর্ণ পরিচয় পাই। রাম-সীতার বিবাহ-সভায় কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ বরপক্ষের এবং স্বয়ং রাজর্ষি জনক কন্যাপক্ষের আদ্যন্ত কুল-কীর্তন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি বিশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণের বিবাহ-উৎসবে বর ও কন্যা উভয় পক্ষের কুল-কীর্তন

প্রচলিত। এই কুল-কীর্তন-প্রথার দ্বারা অভিজাত আর্যহিন্দুর বংশ-কুলগত ইতিহাস রক্ষিত হইত। সেই নিমিত্ত বলা যাইতে পারে যে, ইতিহাস-পুরাণের কাহিনী সম্পূর্ণ কিংবদন্তী নহে।

[চার]
পুরাণ।

যাহা পুরাতন বা প্রাচীন, তাহা পুরাণ। পুরাণ নূতন বা অর্বাচীন তত্ত্ব-তথ্য প্রচার করেন নাই, প্রচার করিয়াছেন জনসাধারণের মাঝে বেদের সেই পুরাতন বা প্রাচীন উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব ও সাধন-তত্ত্ব বহু উপাখ্যানের সাহায্যে। সেই জন্য নাম—পুরাণ। পুরাণ পণ্ডিতের জন্য নহে, সর্বসাধারণের জন্য।

পুরাণের অর্থ ও পঞ্চ লক্ষণ

পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত। (১) যেমন পরব্রহ্ম ঔপনিষদিক পুরুষ অর্থাৎ উপনিষদের প্রতিপাদ্য, তেমনি বিষ্ণু (২) বা বিশ্বব্যাপী শ্রীভগবান পুরাণ-পুরুষ অর্থাৎ পুরাণের প্রতিপাদ্য। রামায়ণের ও মহাভারতের মত, পুরাণকেও বলা হয় সুহৃৎ-সংহিতা। তাহারা সমশ্রেণীভুক্ত। পুরাণে ইতিহাস, সৃষ্টিতত্ত্ব,

---

(১) সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশ মন্বন্তরানি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।।

সর্গ = সৃষ্টি ; সৃষ্টি দ্বিবিধ—প্রাকৃতিক সৃষ্টি ও ব্রহ্মার সৃষ্টি। প্রতিসর্গ = ব্রহ্মার সৃষ্টির পর দক্ষাদি দশ প্রজাপতির সৃষ্টি। বংশ = পূর্ব পুরুষের বা উত্তম পুরুষের পরিচয়। বংশানুচরিত = বংশের চরিত্র-বর্ণন। মন্বন্তর = স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দশ মনুর শাসন-কাল। প্রত্যেক পুরাণে এই পাঁচটি বিষয় বর্ণিত।

(২) বিবেষ্টি ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণু — বিশ্বব্যাপক।

রাজবংশাবলী, দার্শনিক তত্ত্ব, সাধন-প্রণালী ইত্যাদি অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। স্থূললোক ব্যতীত সূক্ষ্মলোক সমূহের বর্ণনাও আছে। হিন্দুধর্মের সার তত্ত্বগুলি মনোরম কথা-কাহিনীর ভিতর দিয়া এরূপ সহজ ও সরল ভাবে বিবৃত যে, সকল শ্রেণীর নর-নারী অনায়াসে তাহা বুঝিতে সক্ষম। তাই, পুরাণের জনপ্রিয়তা। মন্দিরে, নদীতীরে, তীর্থক্ষেত্রে এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানে গ্রামে গ্রামে অদ্যাবধি কথকতা প্রচলিত। কথকগণ পণ্ডিত। তাঁহারা যখন কথকতার সাহায্যে পৌরাণিক কাহিনী ব্যাখ্যা করেন, তখন কৃষক-শ্রমিক অবধি সোৎসুক চিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া দিনের ক্লান্তি দূর করে। এক কালে হিন্দুর গৃহে গৃহে পৌরাণিক কাহিনীর প্রচলন ছিল। সন্ধ্যার পর ঠাকুরমায়ের চতুর্দিকে বসিয়া বালক-বালিকাগণ তাঁহার মুখ হইতে এই কাহিনী শুনিত। এই প্রকারে পৌরাণিক কাহিনীগুলি জনপ্রিয় হইয়া উঠে।

আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ পুরাণকে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মতে, পৌরাণিক কাহিনী অসত্য, অতএব অগ্রাহ্য। ব্রাহ্মণ্যসমাজ পুরাণকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, পৌরাণিক কথা-কাহিনী সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত নহে বলিয়া স্বীকার করিলেও সেগুলি একেবারে পরিহার্য নহে, কেননা তাহাদের মধ্যে সারতত্ত্ব আছে। (৩) উপনিষদেও উপাখ্যান আছে, সেই সব উপাখ্যানে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত থাকায় মূল্যবান। বেদের উপনিষদাতিরিক্ত ব্রাহ্মণাংশেও

(৩) কিছু-না-কিছু ঐতিহাসিক সত্য সকল পুরাণেরই মূল ভিত্তি। + + + + আর যদিও তাহাতে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য না থাকে, তথাপি উহারা যে উচ্চতম সত্যের উপদেশ দিয়া থাকে, সেই হিসাবে আমাদের নিকট খুব উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ।

—স্বামী বিবেকানন্দ, কথোপকথন।

অনেক উপাখ্যান আছে। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থেও এমন অনেক অলীক কাহিনী আছে। জাতকের কাহিনী কাহিনী হইলেও, বৌদ্ধধর্মগ্রন্থে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বাইবেল-কোরাণেও ঐরূপ অলীক কাহিনী আছে। সকল ধর্মের সকল ধর্মগ্রন্থে এই সব কথা-কাহিনী-উপাখ্যানের উদ্দেশ্য, ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব জনসাধারণে প্রচার করা। আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ পুরাণকে গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু মহাভারতের কিছু কিছু বাক্য প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

পুরাণের দুই শ্রেণী—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। মহাপুরাণের সংখ্যা আঠার, উপপুরাণের সংখ্যাও আঠার। উপপুরাণ অপেক্ষা মহাপুরাণের প্রভাবই হিন্দুসমাজের উপর বেশী। অষ্টাদশ মহাপুরাণ—ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিব পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহ পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, বামন পুরাণ, কূর্ম পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, গরুড় পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ এবং নারদীয় পুরাণ। এই অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বায়ু পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং ভাগবত পুরাণ এই সাতখানা উল্লেখযোগ্য। আবার, এই সাতখানার ভিতর ভাগবত পুরাণই অধুনা হিন্দুজনসমাজে সুপ্রসিদ্ধ। তাহার পর বিষ্ণুপুরাণ। আজকাল অপর মহাপুরাণগুলির প্রচলন নাই। হিন্দুজনসাধারণ ভাগবতকেই জানে, অন্য মহাপুরাণগুলি তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত।

মহাপুরাণ

এই ভাগবতপুরাণ সম্বন্ধে সমস্যাও সর্বাপেক্ষা বেশী। হিন্দু জনসাধারণের মাঝে দুইখানা ভাগবত প্রচলিত—দেবী ভাগবত এবং

মহাপুরাণের অন্তর্ভূত দেবী ভাগবত অথবা শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত বা বিষ্ণু ভাগবত। দেবী ভাগবতে দেবী দুর্গার শক্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণিত, আর শ্রীমদ্ভাগবতে বিষ্ণুর অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও মাহাত্ম্য বর্ণিত। দেবী ভাগবত শাক্ত সম্প্রদায়ের নিকট এবং শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট অতীব আদরণীয়। অষ্টাদশ মহাপুরাণের তালিকাতে কেবলমাত্র ভাগবত নাম দেখা যায়, দেবী ভাগবত বা শ্রীমদ্ভাগবত নাম দেখা যায় না। তাই মহাপুরাণের অন্তর্ভূত দেবী ভাগবত, অথবা শ্রীমদ্ভাগবত, ঠিক কোনখানা তাহা লইয়া হিন্দুসমাজে বহুদিন বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় মনে করেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের অন্তর্গত এবং দেবী ভাগবত উপপুরাণের অন্তর্গত। অন্যপক্ষে, শাক্তগণ মনে করেন যে, দেবীভাগবতই মহাপুরাণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত উপপুরাণ। হিন্দুসাধারণের বিশ্বাস এই যে, অষ্টাদশ মহাপুরাণ সব একজন রচনা করিয়াছেন এবং তিনি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। কিন্তু অনেক গবেষণার পর পুরাতত্ত্বজ্ঞগণ ইহা সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের বহু পরে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণকারগণ এই মহাপুরাণগুলি লিখিয়াছিলেন। (১) সে যাহাই হোক্, অষ্টাদশ মহাপুরাণের ভিতর দেবী ভাগবত অথবা শ্রীমদ্ভাগবত কোনখানা, সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা বেদব্যাস নহেন, ইহার রচয়িতা শ্রীমৎ বোপদেব গোস্বামী—এইরূপ এক সুদৃঢ় কিংবদন্তী বহুদিন যাবৎ বংশপরম্পরায় পণ্ডিতগণের ভিতর চলিয়া আসিতেছে।

(১) এখনকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ বেদব্যাস প্রণীত নহে।

—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচরিত্র।

দেবী ভাগবতের প্রখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ। তিনি টীকায় লিখিয়াছেন—বিষ্ণুভাগবতং বোপদেবকৃতং ইতি বদন্তি। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীও শ্রীমদ্ভাগবতকে বোপদেবের রচনা বলিয়াছেন। (২) বোপদেব ছিলেন দেবগিরির রাজা হেমাদ্রির সভাসদ্, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। (৩) শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার কৃত হইলে ইহা অর্বাচীন হইয়া পড়ে, অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তঃপাতী হয় না। অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত পদ্মপুরাণ। ইহা শাক্তদের পুরাণ নহে, বিষ্ণুভক্তদের পুরাণ। দেবী ভাগবত এবং বিষ্ণু ভাগবতের পরে পদ্মপুরাণ রচিত। (৪) সেই পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—যাহাতে ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য ও নানা দৈত্যবধের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই ভাগবত। (৫) এই সব বিবেচনা করিয়া যদি কেহ বলেন যে, মহাপুরাণের তালিকাতে যে ভাগবত উল্লিখিত তাহা দেবী ভাগবত, তাহা হইলে এই উক্তি সম্পূর্ণ অবজ্ঞেয় হইতে পারে না। তবে দেবী ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভাগবত দুইখানাই ধর্মগ্রন্থ ও বিষয়বস্তুসম্ভারে সমৃদ্ধ; অতএব, ঐ বৃথা বিতর্ক ছাড়িয়া দিয়া এই দুইখানাকেই ভাগবত মহাপুরাণ বলিয়া আমরা সমাদর করিতে পারি।

উপপুরাণ

উপপুরাণ— ক্ষুদ্র পুরাণ। এইগুলিও পুরাণের লক্ষণযুক্ত, মহাপুরাণের অনুগামী। অষ্টাদশ উপপুরাণ—আদি,

(২) সত্যার্থ-প্রকাশ, ১১শ সমুল্লাস।

(৩) কৃষ্ণচরিত্র।

(৪) উইলসন্ (Wilson) সাহেবের মতে ভাগবতের রচনা-কাল ১৩শ শতাব্দী, আর পদ্মপুরাণের রচনা-কাল ১৩শ হইতে ১৬শ শতাব্দী।

(৫) ভগবত্যাঃ কালিকায়াস্তু মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে।
নানা দৈত্য বধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥

নৃসিংহ, বায়ু, শিবধর্ম, দুর্বাসঃ, বৃহন্নারদীয়, নন্দিকেশ্বর, উশনঃ, কপিল, বরুণ, শ্বাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, দেবী, ভার্গব, বশিষ্ঠ, পরাশর ও সূর্য।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই ত্রয়ী পুরাণ-প্রসিদ্ধ দেবতা। সেই নিমিত্ত দেখা যায় অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে কতকগুলি ব্রহ্মার, কতকগুলি বিষ্ণুর ও কতকগুলি শিবের স্তুতিবাদে পূর্ণ। তত্রাচ, পুরাণ-উপপুরাণে দেবীপূজার স্থান যথেষ্ট, শক্তিবাদ পরিপুষ্ট। কেহ কেহ (১) বলেন যে, সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে পুরাণে শক্তিবাদ সম্যক্ সমৃদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বামনপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ প্রভৃতিতে শক্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত।

পুরাণে শক্তিবাদ

বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাঃ ব্রহ্মন্ প্রধানাঃ ব্রহ্মশক্তয়ঃ, ব্রহ্মের প্রধান শক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। (২) তাৎপর্য—ব্রহ্মের সৃজনী শক্তি, পালিনী শক্তি ও সংহার-শক্তি যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নামে অভিহিত। এখানে শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ পর্যন্ত নাই। পূর্ণ অদ্বৈত শাক্ত সিদ্ধান্ত। অনেক পুরাণে ও উপপুরাণে দেবীমাহাত্ম্যশীর্ষক অধ্যায় আছে; এবং দেবীমাহাত্ম্য নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাদের ভিতর মার্কণ্ডেয় পুরাণ প্রসিদ্ধ। কালিকাপুরাণে, দেবীপুরাণে, মৎস্যপুরাণে ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে দুর্গাপূজার পদ্ধতি বিবৃত। যেমন মহাভারতের অংশ শ্রীশ্রীগীতা, তেমনি মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশ শ্রীশ্রীচণ্ডী। (৩) গীতার ন্যায়

(১) স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, শ্রীশ্রীচণ্ডী।

(২) বিষ্ণুপুরাণ, ১ | ২২ | ৫৬

(৩) চণ্ড+(স্ত্রীলিঙ্গে) ঈপ = চণ্ডী। চণ্ড শব্দের অর্থ, দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্ম। চণ্ডীশব্দের অর্থ, পরব্রহ্ম-মহিষী বা ব্রহ্মশক্তি।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

চণ্ডী হিন্দুর নিত্যপাঠ্য ও সর্ববরেণ্য। গীতার ন্যায় চণ্ডীও পাশ্চাত্যে সমাদর লাভ করিয়াছে এবং বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সমস্ত উপনিষদের সার যেমন শ্রীশ্রীগীতা, সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রের সারও তেমনি শ্রীশ্রীচণ্ডী। চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্ভূক্ত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে একখানা শ্রেষ্ঠ তন্ত্রশাস্ত্র। গীতার ন্যায় চণ্ডীও স্বতন্ত্র ধর্মগ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হয়। চণ্ডীপাঠ দেবীপূজার প্রধান অঙ্গ। একান্ন দেবীপীঠস্থানে চণ্ডী নিয়মিত ভাবে পঠিত হয়। এক সময়ে এই চণ্ডী বৌদ্ধভিক্ষুগণেরও প্রিয় হইয়াছিল। শিখদিগের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ নিত্য চণ্ডীপাঠ করিতেন। চণ্ডীর মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত নাম—দেবীমাহাত্ম্য। ইহাতে সপ্ত শত মন্ত্র (৪) থাকায়, ইহার অপর নাম—সপ্তশতী বা দুর্গাসপ্তশতী। (৫) শ্রীশ্রীচণ্ডীর এক একটি শ্লোক বা শ্লোকার্ধও এক একটি মন্ত্র বলিয়া গণ্য। শাস্ত্র বলেন যে, চণ্ডীর প্রত্যেক শ্লোকের ভিতর অপূর্ব মন্ত্রশক্তি নিহিত।

পুরাণ-পাঠে একটি সমস্যা দেখা দেয়। কতকগুলি পুরাণে শিবকে, কতকগুলিতে বিষ্ণুকে এবং কতকগুলিতে দেবী ভগবতীকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। যেমন—শিবপুরাণে শিবের শ্রেষ্ঠ স্থান এবং বিষ্ণুর অধস্তন স্থান, আর বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ স্থান এবং শিবের অধস্তন স্থান। শিবপুরাণে শিবের শ্রেষ্ঠতা ও বিষ্ণুর অধস্তনতা দেখিয়া বৈষ্ণব, এবং বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা ও শিবের অধস্তনতা দেখিয়া শৈব দুঃখিত হন। অনেক সময় ইহা হইতে সাম্প্রদায়িক

(৪) চণ্ডীর মোট শ্লোকসংখ্যা ৫৭৮। এই ৫৭৮ শ্লোককে সাত শত মন্ত্রে ভাগ করা হইয়াছে।

(৫) দুর্গাপূজায় চণ্ডীর সাত শত মন্ত্রের সাত শত হোমের বিধান। সেই জন্য নাম, দুর্গাসপ্তশতী।

কলহের উদ্ভব হয়। তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে এইরূপ সাম্প্রদায়িক ভেদ-বৈষম্য ভিত্তিহীন। তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে এক। এক কারণ-ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ম বিশ্বজগতের আদি কারণ। তাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। সেই এক কারণ-ব্রহ্ম যখন সৃষ্টি-কাজে রত তখন ব্রহ্মা, যখন স্থিতি-কাজে রত তখন বিষ্ণু এবং যখন লয়-কাজে বা সংহারে রত তখন রুদ্র বা শিব। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব সেই এক কারণ-ব্রহ্মের তিন বিভূতি। তাঁহার এই বিভূতিত্রয় সমান। এই ত্রয়ীর মাঝে কোনটি গুরু এবং কোনটি লঘু নহে। বিশ্বরাজ্য-পরিচালনায় সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই তিনের সমান প্রয়োজন। স্থিতি-লয়-বিহীন সৃষ্টি নাই, সৃষ্টি-লয়-বিহীন স্থিতি নাই, সৃষ্টি-স্থিতি-বিহীন লয় নাই। সৃষ্ট পদার্থমাত্রেরই স্থিতি ও লয় আছে। সেই কারণ, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই তিন পৌরাণিক দেবতা নিজ নিজ অধিকারে স্বতন্ত্র হইলেও পরস্পর বিরোধী নহেন, বা কেহ কাহারও অধীন নহেন। তাঁহারা এক কারণ-ব্রহ্মের ত্রিমূর্তিস্বরূপ।

এক কারণ-ব্রহ্মের বিভূতিত্রয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব

কারণ-ব্রহ্ম যখন জগৎ-রচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি সগুণ ও সক্রিয়। গুণ ও ক্রিয়া থাকিলেই শক্তি। সেই নিমিত্ত কারণ-ব্রহ্ম শক্তিমান। অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় কারণ-ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি আছে। (১) শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি অভেদ। সেইরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ।

কারণ-ব্রহ্মের চিন্ময়ী বা সাধিকা শক্তি —*মাতৃরূপা মহাদেবী*

(১) অতো ব্রহ্মণোঽপি স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব পাবকস্য দাহকত্বাদিশক্তিবৎ, অগ্নির দাহকত্বাদি শক্তির মত ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তিসমূহ আছে।

—শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামী।

কারণ-ব্রহ্ম স্ত্রী ও নয়, পুরুষও নয়—নৈব স্ত্রী নৈব পুমান্। তত্রাচ তাঁহাতে স্ত্রী-পুরুষ এই মিথুন-রূপতা কল্পিত হইয়াছে। স্ত্রীরূপে তিনি শক্তি এবং পুরুষরূপে তিনি শক্তিমান। শক্তিময়ী স্ত্রীরূপে তিনি সর্বেশ্বরী জগন্মাতা, শক্তিমান পুরুষরূপে তিনি সর্বেশ্বর জগৎ-পিতা। কারণ-ব্রহ্ম একাধারে জগন্মাতা ও জগৎ-পিতা। যখন তিনি জগন্মাতা তখন তিনি দেবী ভগবতী, পুরাণের মহাদেবী। তাঁহার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই তিন বিভূতির প্রত্যেকটিতেও মিথুনরূপতা বিদ্যমান। ব্রহ্মার সৃষ্টি-শক্তি ব্রহ্মাণী, বিষ্ণুর পালিনী শক্তি বৈষ্ণবী এবং শিবের সংহার-শক্তি শিবানী। এক কারণ-ব্রহ্মের শক্তিমান পুরুষভাবের বিভূতিত্রয় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এবং শক্তিময়ী স্ত্রীভাবের বিভূতিত্রয় ব্রহ্মাণী—বৈষ্ণবী—শিবানী। কারণ-ব্রহ্ম এক। সাধকগণের রুচি-প্রকৃতি-সামর্থ্য-ভেদে তাঁহার উপাসনা-ভেদ। শৈব ও বৈষ্ণব তাঁহাকে জগৎ-পিতারূপে পুরুষভাবে এবং শাক্ত তাঁহাকে জগন্মাতারূপে নারীভাবে দর্শন করেন। সাধকের দৃষ্টি-কোণের ভেদ মাত্র। মূলতঃ সকল উপাসনাই সেই এক কারণ-ব্রহ্মের বা সগুণ ব্রহ্মের। শাস্ত্র স্তুতিপর, নিন্দাপর নহে। পুরাণকার কারণ-ব্রহ্ম তত্ত্বটিকে স্থির রাখিয়া, উপাসনা-ভেদে বিভিন্ন সাধককে নিজ নিজ সাধনায় দৃঢ়নিষ্ঠ করিবার অভিপ্রায়ে, কোথাও শিবকে, কোথাও বিষ্ণুকে, কোথাও দেবীকে সর্বেশ্বর বা সর্বেশ্বরী বলিয়া বর্ণনা করিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। *ইহার নাম, স্তুতি—অন্য দেব-দেবীর নিন্দা নহে। পুরাণ-তত্ত্ব এই ভাবে* গ্রহণ করিলে অনর্থের হেতু হয় না।

[পাঁচ]
আগম।

আগম-শাস্ত্র সংখ্যায় অনেক। স্মৃতি-সংহিতার ও পুরাণের প্রামাণ্য বেদের উপর নির্ভর করে। আগমের প্রামাণ্য বেদের উপর নির্ভর করে না। ইহা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, কিন্তু বেদ-বিরোধী নহে। ইহাতে বেদের তত্ত্বসমূহ সহজবোধ্য ও বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত। স্ত্রী ও শূদ্রের বেদাধিকার নাই, ইহা শাস্ত্রকারগণ বৈদিকযুগের অবসানে ঘোষণা করেন (১) আগমশাস্ত্রে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র সকলের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ইহার এই উদারতা প্রশংসনীয়। আগমশাস্ত্রগুলি কিছুটা পুরাণের মত। তবে বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে দেব-দেবীর পূজার্চনা-পদ্ধতি বিশদভাবে বর্ণিত। পুরাণে দেব-দেবীর রূপ ও লীলার বর্ণনার প্রাচুর্য, পূজার্চনার পদ্ধতি খুব কম। আগম দেব-দেবীর লীলার প্রত্যক্ষমূলক সাধনায় নিযুক্ত। হিন্দুধর্মের মুখ্য সম্প্রদায় তিন—শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ আগম—শৈবাগম, বৈষ্ণবাগম বা

আগমের বিভাগ

(১) বৈদিকযুগে স্ত্রীজাতীর যে বেদাধিকার ছিল, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট। কমপক্ষে ২৬ জন ব্রহ্মবাদিনী বা স্ত্রী-ঋষি ঋগ্বেদের মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বেদাধিকার না থাকিলে ইহা কখনো সম্ভব হইত না। উপনিষদে, পুরাণে, যোগবাশিষ্ঠেও মহাভারতে গার্গী, লীলা, চুড়ালা, মদালসা প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনীর নাম পাওয়া যায়। বেদাধিকার না থাকিলে তাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী হইতে পারিতেন না। ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের ভিতর ছিলেন কবষ ঐলুষ, তিনি শূদ্র। তাই মনে হয় যে, বেদে স্ত্রী-শূদ্রের অনধিকার স্মৃতির অনুশাসনে।

পঞ্চরাত্র-সংহিতা এবং শাক্তাগম বা তন্ত্র। শৈবাগমগুলিতে শিব, বৈষ্ণবাগমগুলিতে বিষ্ণু এবং শাক্তাগমগুলিতে মহামায়া পরম তত্ত্ব।

তন্ত্রের অর্থ ও প্রতিপাদ্য

'তন' ধাতু হইতে 'তন্ত্র' পদ নিষ্পন্ন। 'তন' ধাতুর অর্থ, বিস্তৃত করা। তাই তন্ত্রের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ—বিস্তার। যে গ্রন্থে তত্ত্বসমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচিত তাহা—তন্ত্র। তন্ত্রের এই ব্যাপক অর্থে কেবল শাক্তাগম নহে, অন্য আগমগুলিও বুঝায়। প্রত্যেক দেবতার এক এক শক্তি। ব্রহ্মার শক্তি, ব্রহ্মাণী; বিষ্ণুর শক্তি, বৈষ্ণবী; শিবের শক্তি, শিবানী ইত্যাদি। শক্তিমান ও শক্তি অভিন্ন। অতএব, দেবতা ও তাঁহার শক্তি অভিন্ন। এই দেব-শক্তিগুলি আবার মহামায়া বা ব্রহ্মশক্তির অংশস্বরূপা। যেমন বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, তেমনি তন্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মশক্তি বা মহামায়া। ঐ ব্রহ্মশক্তি বা মহামায়া যেন সর্বদেবতাকে ধারণ করিয়া আছেন। সেই নিমিত্ত শক্তি-উপাসনা বাদ দিয়া কোন দেবতার উপাসনা হয় না। আগমমাত্রেই কিছু না-কিছু শক্তি-উপাসনা বিহিত। এই দৃষ্টিতে সমস্ত আগমগুলিকে তন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়—কি শৈবাগম, কি বৈষ্ণবাগম, কি শাক্তাগম।

বহুকাল হইতে এ দেশে তন্ত্র-সাধন প্রচলিত। দেবী ভাগবত, শ্রীমদ্‌ভাগবত, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বরাহ পুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ প্রভৃতি মহাপুরাণ ও উপপুরাণাদিতে তন্ত্রোক্ত সাধন উপদিষ্ট। মহাভারতেও তন্ত্রের উল্লেখ আছে। সেই কারণ, এই কথা ঠিক নহে যে, পৌরাণিক যুগের পর তান্ত্রিক সাধনার উৎপত্তি। বেদ যেমন

তন্ত্রের প্রাচীনতা ও স্বাধীনতা

অপৌরুষেয় তেমনি তন্ত্র ও অপৌরুষেয়, ইহা তন্ত্রাচার্যগণের কথা। (১) প্রতিকল্পে বেদ যেমন ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হয়, সেইরূপ তন্ত্র ও শিবের মুখ হইতে নির্গত হয়। তাই তন্ত্রের নাম—আগম। (২) তন্ত্রকার যিনিই হৌন, তন্ত্রশাস্ত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন। তন্ত্র অন্য শাস্ত্রের মুখাপেক্ষী নহেন, এমন কি বেদেরও নয়। রসায়ন-বিদ্যা, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিদ্যা, ইন্দ্রজাল, মারণ, বশীকরণ, উচ্চাটন ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম অধ্যাত্মবিদ্যা অবধি ইহার ক্রমোচ্চ স্তর বিস্তৃত। অধ্যাত্মতন্ত্রই তন্ত্রশাস্ত্রের শিরোমণি। নিম্ন স্তরের লৌকিক বিদ্যার সঙ্গে অধ্যাত্মতন্ত্রের কোন সংশ্রব নাই। সাকার এবং নিরাকার উপাসনা এই দুই তন্ত্রে স্থান পাইয়াছে। মহানির্বাণতন্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার কথা আছে। মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধ ব্রহ্মস্তোত্রটি নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনা-স্তোত্র (৩)

অধিকারী-ভেদে সাধনা-উপাসনার ভেদ সকল হিন্দুশাস্ত্রে গৃহীত। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহা পূর্ণভাবে সমর্থিত। বেদ-স্মৃতি-পুরাণ প্রভৃতিতে একান্ত ভোগাসক্ত অধম পশু-মানুষের সাধনা-উপাসনার উপায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নাই। তন্ত্র তাহাদের সম্বন্ধেও উপদেশ দিয়াছেন। ইহা

---

(১) মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্ট বেদের ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্রকেও শ্রুতি বলিয়াছেন। তিনি বলেন—বৈদিকী তান্ত্রিকী চৈব দ্বিবিধা কীর্তিতা শ্রুতিঃ।

(২) তন্ত্রে শিব-পার্বতীর কথোপকথনচ্ছলে সকল তত্ত্ব বিবৃত। তন্ত্রাচার্যগণের মতে, শিবের মুখ হইতে যাহা আগত তাহা আগম এবং পার্বতীর মুখ হইতে যাহা নির্গত তাহা নিগম।

(৩) তবে মহানির্বাণতন্ত্রের নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা-প্রণালী ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করেন নাই। যেমন—সদ্‌গুরুর নিকট যথাশাস্ত্র দীক্ষাগ্রহণ ইত্যাদি।

তন্ত্রের উদারতা

নিশ্চয়ই তন্ত্রের উদারতা। তন্ত্রে তিন প্রকারের অধিকারী—উত্তম, মধ্যম ও অধম; পশু-মানুষগণ তন্ত্রের অধম অধিকারী। তন্ত্রের উচ্চতম স্তরের নিবৃত্তিমূলক আধ্যাত্মিক উপদেশ তাহাদের জন্য নহে। তাহাদের জন্য তন্ত্র প্রবৃত্তিমূলক উপদেশ দিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য, প্রবৃত্তিমার্গে চালিত করিয়া ক্রমশঃ তাহাদিগকে পরমার্থ-পথে আকৃষ্ট করা। (১) এই কথা সত্য যে, তন্ত্রের অংশবিশেষে জঘন্য আচারানুষ্ঠানের বর্ণনা আছে এবং তন্ত্রের নামে কোথাও কোথাও ঘোর ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হয়। তন্ত্রের ঐ প্রবৃত্তিমূলক উপদেশের যথার্থ অর্থ না বুঝিয়া কেহ কেহ কদর্থ করিয়াছেন এবং কামাসক্ত পশুভাবাপন্ন মানব কদাচারের প্রচলন করিয়াছেন। তাহার জন্য মূল তন্ত্রশাস্ত্র দায়ী নহে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের দোহাই দিয়া কোন কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যে সব কদাচার প্রচলিত, তাহার জন্য মহাপ্রভুর মতবাদ কখনো দায়ী নয়। বৌদ্ধধর্মের নামে যে এককালে বীভৎস কাপালিক তন্ত্র প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার জন্য শ্রীবুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম কখনো দায়ী নহে। (২) তন্ত্রের নামে যে সকল মিথ্যা কদাচার দেখা যায়, তাহার আমূল সংস্কার অতীব বাঞ্ছনীয়। তাহার উদ্দেশ্যে আবশ্যক প্রকৃত তন্ত্রমর্মের উদ্ঘাটন। আজকাল সেরূপ তান্ত্রিক পণ্ডিতের অভাব।

---

(১) তন্ত্রে বহুস্থানে 'পাষণ্ড মোহনায়" এই কথা আছে। পাষণ্ডের অর্থ, পাপাসক্ত পশু-মানুষ। তাহাদিগকে প্রবৃত্তির অনুকূল বস্তু দিয়া মোহিত করিয়া পশ্চাৎ পরমার্থ-পথে আকৃষ্ট করার নাম—পাষণ্ড-মোহন। ইহা কষ্টসাধ্য প্রয়াস. তাহাতে সন্দেহ নাই।

(২) বৌদ্ধধর্মে শেষে তন্ত্রের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। হিন্দুতন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থও সংখ্যায় অনেক। নালন্দা ও বিক্রমশিলা এই দুই বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দু তন্ত্র বহু বিষয়ে বৌদ্ধ তন্ত্রের নিকট ঋণী।

শক্তিমঙ্গল তন্ত্রানুসারে ভারতভূমি তিন ভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগ এক এক ক্রান্তা নামে অভিহিত। বিন্ধ্যাচল হইতে চট্টলভূমি অবধি বিষ্ণুক্রান্তা; বিন্ধ্যাচল হইতে কন্যাকুমারিকা অবধি দাক্ষিণাত্য প্রদেশ অশ্বক্রান্তা বা গজক্রান্তা; এবং বিন্ধ্যাচল হইতে নেপাল অবধি রথক্রান্তা। প্রত্যেক ক্রান্তায় ৬৪ খানা তন্ত্র অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষে মোট ১৯২ খানা তন্ত্র প্রচলিত ছিল। অধুনা নয়খানা প্রচলিত ও উল্লেখযোগ্য—মহানির্বাণ, কুলার্ণব, কুলসার, প্রপঞ্চসার, তন্ত্ররাজ, রুদ্রযামল, ব্রহ্মযামল, বিষ্ণুযামল এবং তোডলতন্ত্র। বর্তমান কালে সারা ভারত তন্ত্রশাসিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গদেশের কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব সকলেই তন্ত্রশাসিত। তাঁহারা তন্ত্রানুসারে দীক্ষাদি গ্রহণ করেন। দেব-দেবীর পূজায় তন্ত্রের প্রভাব আকুমারিকা হিমাচল। স্নানশুদ্ধি, জপ, আচমন, স্বস্তিবচন, সঙ্কল্প, জলশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, ন্যাস, মানস-পূজা, আরত্রিক, হোম ইত্যাদি যাহা কিছু করা হয়, প্রায় সব তন্ত্রমতে। তন্ত্রের মন্ত্রের ভিতর বৈদিক মন্ত্রও আছে। বৈদিক যাগযজ্ঞেরও কিছু কিছু ভিন্ন রূপে তান্ত্রিক হোমাদিতে দেখা যায়।

তন্ত্রের প্রভাব ভারতব্যাপী

শৈবসম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ—শৈবাগম। শৈবাগম সংখ্যায় আটাশখানা। তন্মধ্যে কামুক আগম প্রধান। প্রত্যেক শৈবাগমের আবার উপাগম আছে। এই উপাগমগুলির ভিতর মাত্র বিশখানার অংশবিশেষ অধুনা বর্তমান। কাশ্মীরের শিবাদ্বৈত দর্শন বা বিমর্শবাদ এবং দাক্ষিণাত্যে শৈবসিদ্ধান্তবাদ, এই দুই দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি শৈবাগমের উপর। এই দুই দার্শনিক মতবাদে বেদ এবং শৈবাগম উভয় প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত।

শৈবাগম

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ—বৈষ্ণবাগম বা পঞ্চরাত্র-সংহিতা। বৈষ্ণবগণের মতে পঞ্চরাত্র-সংহিতাগুলি শ্রীভগবান বিষ্ণু প্রকাশ করিয়াছিলেন। পঞ্চরাত্র-সংহিতার সংখ্যা ২১৫। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—ঈশ্বর, পৌষ্কর, পরম, শাত্বত, বৃহদ্‌ব্রহ্ম এবং জ্ঞানামৃতসার-সংহিতা। জ্ঞানামৃতসারের অপর নাম—নারদ পঞ্চরাত্র। এই ছয়খানার ভিতর প্রথম খানা শ্রীযমুনাচার্য এবং পরের তিনখানা শ্রীরামানুজাচার্য উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবাগম

[ছয়]
ষড়্দর্শন।

হিন্দুর দর্শনশাস্ত্র ঠিক ইংরাজি ফিলজফি (Philosophy) নহে। ফিলজফি শব্দের অর্থ অনেকটা তত্ত্বজিজ্ঞাসা। হিন্দুদর্শন তত্ত্বজিজ্ঞাসাতে পর্যবসিত নয়। হিন্দুধর্মের চরম লক্ষ্য, মোক্ষ বা মুক্তি। হিন্দুদর্শনেরও চরম লক্ষ্য তাহা। বুদ্ধির সাহায্যে যুক্তি-বিচারের দ্বারা সেই চরম লক্ষ্যের স্বরূপ-নির্ধারণ এবং তদুদ্দেশে ব্রহ্ম-জীব-জগৎ ইত্যাদি তত্ত্ব সমূহের ব্যাখ্যান-প্রয়াস হিন্দুদর্শনে। সেই নিমিত্ত হিন্দুদর্শন হিন্দুধর্মের এক অঙ্গ ও হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ। (১) সত্য সর্বতোমুখ। দর্শন-প্রণেতা

হিন্দুদর্শনের তাৎপর্য ও লক্ষ্য

(১) পাশ্চাত্য দর্শন বা ফিলজফিগুলি তাহা নহে। সেইগুলিতে তত্ত্ববিদ্যার প্রাচুর্য আছে, কিন্তু তাহারা ধর্মের বা ধর্মসাধনার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। যেমন—হেগেল (Hegel,) কাণ্ট (Kant) প্রভৃতি দার্শনিকগণের দর্শন পুস্তক তাঁহাদের নিজ নিজ দার্শনিক চিন্তাধারায় পূর্ণ, কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্মের বা ধর্মসাধনার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে।

ঋষিগণের মধ্যে যিনি ঐ চরম সত্যের যে মুখ বা রূপটি মানস-নেত্রে বুদ্ধি-সাহায্যে দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি সেইটি তাঁহার প্রণীত গ্রন্থে সেইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতা হেতু ভিন্ন ভিন্ন দর্শন শাস্ত্র। (২) এইরূপে ষড়্দর্শনের উৎপত্তি। মহর্ষি কপিল প্রণীত—সাংখ্য-দর্শন; মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত—পাতঞ্জল বা যোগ-দর্শন; অক্ষপাদ গৌতম প্রণীত—ন্যায়-দর্শন; মহর্ষি কণাদ প্রণীত—বৈশেষিক দর্শন; মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত—পূর্ব-মীমাংসা-দর্শন; এবং মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত—উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শন। ইতিহাস, পুরাণ ও আগম জনসাধারণের জন্য, কিন্তু দর্শনশাস্ত্র তাহাদের জন্য নহে। দর্শনশাস্ত্র পণ্ডিতের জন্য। তত্ত্বান্বেষী পণ্ডিতগণের বুদ্ধিবিকাশ দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য। দর্শনগুলিতে শব্দের ঝঙ্কার কিছুমাত্র নাই। তাহাদের মাঝে দর্শন-প্রণেতাগণের চিন্তাধারা স্বল্পাক্ষর সূত্রে প্রকাশিত; সেই হেতু তাহারা দুর্বোধ্য। সেই সূত্রগুলির মর্ম উদ্‌ঘাটনার্থে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকারগণ এক এক ভাষ্য লিখিয়াছেন। আবার, সেই ভাষ্যের জন্য বহু টীকা-টিপ্পনী-বার্তিক রচিত।

ষড়্দর্শনের দ্বন্দ্বত্রয়

ষড়্দর্শন তিন দ্বন্দ্বে বিভক্ত। সাংখ্য-যোগ এক দ্বন্দ্ব, ন্যায়-বৈশেষিক এক দ্বন্দ্ব, এবং পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা এক দ্বন্দ্ব। সাংখ্যের পরিপূরক যোগ, ন্যায়ের বৈশেষিক, এবং পূর্ব-মীমাংসার উত্তর-মীমাংসা। পূর্ব-মীমাংসা যে পূর্বে এবং উত্তর-মীমাংসা যে পরে লিখিত, তাহা নহে। এই উভয়ের মধ্যে সময়ের পৌর্বাপর্য নাই। সাধারণতঃ, বেদের

(২) নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং—এমন মুনি কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই, যাঁহার মতবাদ অন্যের মতবাদ হইতে পৃথক নহে। এই এক কারণে বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে ছয়টি মতবাদের উদ্ভব হইয়াছিল।

কর্মকাণ্ডকে পূর্বকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডকে উত্তরকাণ্ড বলা হয়। পূর্বকাণ্ডের বা কর্মকাণ্ডের অবলম্বনে লিখিত বলিয়া একটির নাম পূর্ব-মীমাংসা, আর উত্তরকাণ্ডের বা জ্ঞানকাণ্ডের অবলম্বনে লিখিত বলিয়া অন্যটির নাম উত্তর-মীমাংসা। সাংখ্য-দর্শনকে মনোবিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। যোগ-দর্শনে অন্তর্জগতের উচ্চ স্তরে ধ্যান-ধারণা-সমাধি ইত্যাদি বিষয় ব্যাখ্যাত। সেই কারণ, যোগ সাংখ্যের পরিপূরক। ন্যায়-দর্শন তর্কশাস্ত্র। ন্যায় ও বৈশেষিক বহির্জগতের বস্তুনিচয়কে কতকগুলি মৌলিক পদার্থে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন এবং বেশীভাগ বহির্জগতের বিশ্লেষণে যত্নবান। তাই, তাঁহারা এক দ্বন্দ্বভুক্ত। পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসার ভিতর মতানৈক্য থাকিলেও এক বেদেরই কাণ্ডবিশেষের ব্যাখ্যানে রত বলিয়া তাঁহারা এক দ্বন্দ্বভুক্ত। অধুনা সুধীসমাজে ন্যায়, যোগ ও উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত ব্যতীত অন্য দর্শনগুলি অপ্রচলিত। ভারতে ও বহির্ভারতে বেদান্ত-দর্শন সর্বাপেক্ষা বেশী সমাদর লাভ করিয়াছে।

দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতাবশতঃ মতবাদের বিভিন্নতা সত্ত্বেও ষড়্‌দর্শন এই কয়েকটি মূল তত্ত্ব সমানভাবে গ্রহণ করিয়াছেন—সংসার, আত্মার অমরত্ব, দুঃখের অস্তিত্ব, কর্ম ও কর্মফল, বেদের প্রমাদশূন্যতা এবং ত্রিগুণ। এখন ষড়্‌দর্শনের মোটামুটি কি কি বিষয়ে মতভেদ এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের মর্মবাণী কি, এই সম্বন্ধে খুব সংক্ষেপে কিছু আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। (১)

(১) যাঁহারা ষড়্‌দর্শন সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিতে চান, তাঁহারা মূল সূত্র ও ভাষ্য পড়িতে পারেন; অথবা, মাধবাচার্যের সর্বদর্শন-সংগ্রহ নামক প্রখ্যাত গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন।

৯। সাংখ্য-দর্শন :

সংখ্যা হইতে সাংখ্য শব্দের উৎপত্তি। সাংখ্য-দর্শন বিশ্বজগতের মূল তত্ত্বের সংখ্যা পঁচিশটি নির্ধারণ করিয়াছেন। এই সংখ্যা-নির্ধারণ থাকায় এই দর্শনের নাম—সাংখ্য। পঞ্চবিংশ তত্ত্ব—প্রকৃতি বা অব্যক্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ মহাভূত, এবং পুরুষ। এই পঞ্চবিংশ তত্ত্ব আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি, বিকৃতি এবং অনুভয়রূপ। প্রকৃতি—যাহা অপরকে প্রসব করে, কিন্তু স্বয়ং প্রসূত নহে; প্রকৃতি-বিকৃতি—যাহা অপরকে প্রসব করে এবং নিজেও প্রসূত; বিকৃতি—যাহা অপরকে প্রসব করে না, কিন্তু স্বয়ং প্রসূত; অনুভয়রূপ—যাহা অপরকে প্রসব করে না এবং নিজেও প্রসূত নহে। পূর্ব-কথিত পঞ্চবিংশ তত্ত্বের মধ্যে মূলা প্রকৃতি বা অব্যক্ত প্রথম শ্রেণীভুক্ত, কেননা ইহা নিজে প্রসূত নহে কিন্তু বুদ্ধিকে প্রসব করে; বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই সাতটি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত, কেননা তাহারা প্রত্যেকে প্রসূত এবং অপরকে প্রসব করে; (২) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত, কেননা তাহারা কেবলমাত্র প্রসূত এবং অপরকে প্রসব করে না; পুরুষ চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত, কেননা ইহা স্বয়ং প্রসূত নহে এবং অপরকেও প্রসব করে না।

পঞ্চবিংশ তত্ত্ব

(২) প্রকৃতি-জাত বুদ্ধি অহঙ্কারকে প্রসব করে, বুদ্ধি-জাত অহঙ্কার শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পাঁচ তন্মাত্রকে প্রসব করে, এবং অহঙ্কার-জাত পঞ্চ তন্মাত্র ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতকে প্রসব করে।

পঞ্চবিংশ তত্ত্বের বিশ্লেষণে ইহা সুস্পষ্ট যে, মূলা প্রকৃতি কেবল পুরুষ ব্যতীত অন্য সকলের আদি প্রসূতি। অতএব সাংখ্যদর্শনের মতে, মূলা প্রকৃতি এবং পুরুষ এই দুইটি চরম তত্ত্ব। এই প্রকৃতি-পুরুষ দ্বৈতের উপর সাংখ্যদর্শন প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতি জড় এবং পুরুষ বা আত্মা চেতন। উভয়ই অনাদি ও অনন্ত। প্রকৃতি জড় হইলেও পুরুষের অধীন নহে। প্রকৃতি সক্রিয় এবং পুরুষ নিষ্ক্রিয়। অন্তর্জগতে এবং বহির্জগতে যত কিছু কর্ম সব প্রকৃতির, পুরুষের নহে। পুরুষ মাত্র দ্রষ্টা ও সাক্ষীরূপে বিদ্যমান। সাধারণতঃ, প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান আমাদের নাই। সেই কারণ, আমরা জন্ম-মরণরূপ সংসার-চক্রের আবর্তে। প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান যথার্থ উপলব্ধি হইলেই সংসার হইতে মুক্তি এবং ত্রিতাপজ দুঃখেরও নিবৃত্তি হয়।

প্রকৃতি

মূলা প্রকৃতির অন্য নাম, প্রধান ও অব্যক্ত। পুরুষবাদে অবশিষ্ট সমস্ত তত্ত্ব মূলা প্রকৃতি হইতে জাত এবং এই প্রকৃতিই বিশ্ব-জগতের আদি কারণ; প্রকৃতির কারণ আর কিছু নাই। তাই ইহার নাম—প্রধান। প্রকৃতি হইতে প্রথমে উৎপন্ন বুদ্ধি বা মহৎ। (৩) বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্বে মূলা প্রকৃতির কোন রূপ থাকে না, ইহা অরূপ বা অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। তাই ইহার আর এক নাম—অব্যক্ত। প্রকৃতির প্রথম ব্যক্তাবস্থা বা সরূপাবস্থা, বুদ্ধি। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ (৪) প্রকৃতির উপাদান। ত্রিগুণ সর্বদা একত্র বর্তমান।

---

(৩) বিশ্বের সমষ্টিগত বুদ্ধিকে মহৎ বলে; কারণ, এই বিশ্ব সর্বদা সর্বত্র বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত এবং এই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই।

(৪) সত্ত্বগুণের ধর্ম পরিশোধন, প্রকটন ও মিলন; রজোগুণের ধর্ম আসক্তি, গতি ও ক্রিয়া; তমোগুণের ধর্ম জড়তা, নিষ্ক্রিয়তা ও অন্ধকারে আচ্ছাদন।

যখন তাহাদের সাম্যাবস্থা, তখন প্রকৃতির সৃষ্টি-কার্য বন্ধ থাকে। তাহাদের বৈষম্যাবস্থায় সৃষ্টি-কার্যের আরম্ভ। প্রকৃতি-জাত সমস্ত পদার্থেই এই ত্রিগুণ বিদ্যমান। গুণের অর্থ রজ্জু। রজ্জুর ন্যায় প্রত্যেক পদার্থকে এই ব্রহ্মাণ্ডে বাঁধিয়া রাখিয়াছে বলিয়া এই ত্রয়ীকে ত্রিগুণ বলা হয়।

বুদ্ধি হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি। অহঙ্কারের অর্থ, আত্মাভিমান বা 'আমি' বোধ। এই আত্মাভিমান বা 'আমি' বোধের দ্বারা ব্যষ্টি-ভাবের প্রকাশ হয়, ব্যক্তি সমষ্টি হইতে পৃথক ভাবে দেখা দেয়। অহঙ্কার বা ব্যষ্টি-বোধ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন এবং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন। ইহার মর্ম এই যে, ব্যক্তির অহঙ্কার বা 'আমি' বোধ আছে বলিয়া তাহার দশ ইন্দ্রিয়, মন এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত (১) পঞ্চ তন্মাত্র জীবন্ত হয়। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন পঞ্চ মহাভূত—শব্দ হইতে আকাশ, স্পর্শ হইতে বায়ু, রূপ হইতে তেজ, (২) রস হইতে অপ এবং গন্ধ হইতে ক্ষিতি।

পুর অর্থাৎ দেহে যিনি শায়িত বা অধিষ্ঠিত, তিনি পুরুষ। পুরুষই আত্মা। ইনি অনাদি, অনন্ত, চৈতন্যময়, গুণাতীত, নিষ্ক্রিয়, কেবল ও উদাসীন। দ্রষ্টারূপে তিনি যেন এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে জড় প্রকৃতির খেলা দেখিতেছেন। প্রকৃতি যাহা কিছু সৃষ্টি করে, সে সব পুরুষের দর্শনের বা উপভোগের উদ্দেশে।

পুরুষ

(১) চক্ষুর বিষয়, রূপ ; কর্ণের বিষয়, শব্দ ; নাসিকার বিষয়, গন্ধ ; জিহ্বার বিষয়, রস; এবং ত্বকের বিষয়, স্পর্শ। চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভিতর যে ইন্দ্রিয় যে তন্মাত্রটি গ্রহণ করে, সেই তন্মাত্রটি তাহার বিষয়। যেমন—চক্ষু গ্রহণ করে রূপ, সেই নিমিত্ত চক্ষুর বিষয় রূপ।

(২) তেজের অর্থ, প্রকাশক অগ্নি বা জ্যোতিঃ।

চৈতন্যময় পুরুষ জড় প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, কিন্তু উভয়ে সর্বদা একত্র বিদ্যমান। পুরুষের সান্নিধ্য ব্যতীত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি কোন কাজ করিতে অক্ষম। সাংখ্য মতে, এই চৈতন্যময় পুরুষ এক নহে—অসংখ্য। তবে এই অসংখ্য পুরুষ এক স্বভাব-সম্পন্ন। সাংখ্য-দর্শন ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা সগুণ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সাংখ্য মতে, ত্রিগুণাত্মিকা জড় প্রকৃতিই চৈতন্যময় পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ স্বাধীনভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করে। রজোগুণপ্রধানা প্রকৃতি সৃষ্টি করে, সত্ত্বগুণপ্রধানা প্রকৃতি স্থিতি বা পালন করে, এবং তমোগুণ-প্রধানা প্রকৃতি লয় বা সংহার করে। তাই, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কার্যে এক চৈতন্যময় ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না। এই নিমিত্ত সাংখ্য-দর্শন নিরীশ্বরবাদী বলিয়া কথিত। (৩)

দেহাচ্ছন্ন পুরুষের বা আত্মার নাম, জীব। দেহরূপ আধারে চৈতন্যময় আত্মা এবং জড় প্রকৃতি-জাত বুদ্ধি-অহঙ্কার-মন-ইন্দ্রিয়াদির সংযোগে জীবের উৎপত্তি। বুদ্ধি চেতন নহে—জড়; কেননা, জড় প্রকৃতি হইতে জাত। কিন্তু চৈতন্যময় পুরুষের বা আত্মার অতি সন্নিকটে

জীব থাকায়, বুদ্ধির উপর চৈতন্য প্রতিভাসিত হয়। সেই হেতু মনে হয় যেন বুদ্ধি চেতন। জীব অজ্ঞানে আবৃত থাকায়, নিজের অন্তরে চৈতন্যস্বরূপ অনাদি অনন্ত পুরুষকে বা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে না। প্রকৃতি-জাত সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরকেই সে আমি বলিয়া জানে। এই মিথ্যা আমিত্ব-বোধ থাকায়, সে কর্মের

(৩) সাংখ্যের প্রখ্যাত ভাষ্যকার, বিজ্ঞানভিক্ষু। তাঁহার মতে—প্রকৃতপক্ষে সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী নহেন, কারণ ঈশ্বর নাই এ কথা সাংখ্য বলেন না। সাংখ্য বলেন যে, প্রমাণ দ্বারা নিত্য স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা ঈশ্বর সিদ্ধ হয় না—ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ, প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ।

ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ করে। সুখ-দুঃখের অনুভূতি বুদ্ধির ধর্ম—আত্মার ধর্ম নহে। আত্মা দেহেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা হইলেও নিষ্ক্রিয় হওয়ায় দেহেন্দ্রিয়ের পরিচালক নহেন। ত্রিগুণবিশিষ্ট বুদ্ধিই কর্তারূপে দেহেন্দ্রিয় পরিচালন করে।

ত্রিগুণাতীত চৈতন্যময় পুরুষ বা আত্মা শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। ত্রিগুণাত্মিকা অচেতনা প্রকৃতিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের বা রজ্জুর দ্বারা জীবকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে এবং জীব ঐ প্রকৃতি-জাত বুদ্ধির বশে ত্রিতাপজ দুঃখ ভোগ করে। পুরুষ-প্রকৃতির সান্নিধ্য হেতু জীব এই উভয়ের মধ্যে ভিন্নতা উপলব্ধি করিতে পারে না।

মুক্তি

প্রকৃতি-পুরুষের অভিন্নতাজ্ঞানের নাম, অবিবেক। যতকাল বা যতজন্ম জীবের এই অবিবেক থাকে, ততকাল বা ততজন্ম তাহাকে সংসারে বদ্ধ থাকিতে হয়। সেই নিমিত্ত সাংখ্য দর্শন বলেন যে, মুক্তিলাভ করিতে প্রয়োজন প্রকৃতি-পুরুষের যথার্থ ভেদজ্ঞান। এই ভেদজ্ঞান—প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক। যে মুহূর্তে জীবের এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকের উদয় হয়, সেই মুহূর্তেই তাহার লাভ হয় মুক্তি। সাংখ্যমতে, পূর্ব-কথিত পঞ্চবিংশ তত্ত্বের সম্যক বিচারের সাহায্যে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকের উদয় হয়। পঞ্চবিংশ তত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের নাম, প্রমা। যে প্রণালীর দ্বারা অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা লাভ হয় তাহার নাম, প্রমাণ। প্র+মা+অনট্=প্রমাণ। 'মা' ধাতুর অর্থ, পরিমাণ করা। যে প্রণালীতে কোন বস্তুর পরিমাণ করা হয়, তাহাই প্রমাণ।

প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবচন

সাংখ্যমতে প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আপ্তবচন। চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়-সংযোগে জাগতিক

বস্তুর যে জ্ঞান জন্মে তাহা—প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হেতু অপ্রত্যক্ষ বস্তুর যে জ্ঞান জন্মে তাহা—অনুমান। যেমন—ধূম-দর্শনে অগ্নির জ্ঞান, ইহা অনুমান। (১) বিশ্বাসযোগ্য বা আপ্ত ব্যক্তির বচন—আপ্তবচন। যে বস্তুজ্ঞান প্রত্যক্ষের বা অনুমানের দ্বারা লভ্য নহে, তাহা আপ্তবচনের দ্বারা লভ্য হয়। অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞানলাভের পক্ষে আপ্তবচনই প্রমাণ, কারণ যাহা অতীন্দ্রিয় তাহা প্রত্যক্ষের বা অনুমানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। বেদ-বচন আপ্তবচনের অন্তর্গত। যিনি রাগ-দ্বেষ-বর্জিত, বিজ্ঞ, সর্বগুণসমন্বিত এবং নিরলস তিনিই আপ্ত নামের উপযুক্ত। তাই, সত্যদ্রষ্টা বৈদিক ঋষিগণ আপ্তপদবাচ্য। অতএব, বেদ-বচন—আপ্তবচন। আত্মা অতীন্দ্রিয়। তাই, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদ-বচন বা বৈদিক ঋষির বাণী প্রামাণ্য। সাংখ্য নিরীশ্বরবাদী হইলেও আপ্তবচনের প্রামাণ্য স্বীকার করায়, বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। তবে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর প্রতিপাদক বেদবচনসমূহের অর্থ সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২। যোগ-দর্শন।

'যুজ্' ধাতু হইতে 'যোগ' পদ নিষ্পন্ন—যুজ্+ঘঞ্। সম্+যুজ্+ঘঞ্=সংযোগ। উৎ+যুজ্+ঘঞ্=উদ্যোগ। সেই কারণ, যোগ শব্দ সংযোগ এবং উদ্যোগ এই দুই অর্থেই প্রযুক্ত। সংযোগ অর্থে মিলন এবং উদ্যোগ অর্থে চেষ্টা বা অভীষ্টসাধনার্থ ক্রিয়া বুঝায়। দর্শন-শাস্ত্রে যোগ শব্দের এই দুই অর্থ লক্ষিত হয়। মুখ্যার্থ—পরমাত্মার সহিত

যোগ শব্দের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য

(১) চক্ষুর দ্বারা ধূম প্রত্যক্ষীভূত, কিন্তু অগ্নি প্রত্যক্ষীভূত নহে। তথাপি যেহেতু ধূমের সহিত অগ্নির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সেই হেতু ধূমদর্শনে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করা হয়।

জীবাত্মার মিলন ; গৌণার্থ—সেই মিলনসাধনার্থ চেষ্টা বা ক্রিয়া। মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁহার কৃত যোগ-দর্শনে যোগ শব্দের গৌণ অর্থে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন—যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ, চিত্তবৃত্তি-নিরোধের নাম যোগ। মর্ম—চিত্তবৃত্তি-নিরোধরূপ ক্রিয়ার সাহায্যে জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন সাধিত হয়।

যোগ-দর্শন সাংখ্য-দর্শনের পরিপূরক। সাংখ্য-দর্শনের পঞ্চবিংশ তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া, সাংখ্যের দুইটি অভাব যোগ-দর্শন পূরণ করিয়াছেন।

যোগ-দর্শন
সেশ্বর সাংখ্য

সেই দুইটি—ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক উৎপাদনের অভিপ্রায়ে অষ্টাঙ্গযোগসাধনা। যোগ-দর্শন খুব সাধনমূলক। সাংখ্যে তত্ত্বের ভাগ বেশী, সাধনের ভাগ নিতান্ত অল্প। ঈশ্বর স্বীকৃত হওয়ায় যোগ-দর্শনকে বলা হয় সেশ্বর সাংখ্য।

যোগ-দর্শনে চারি অধ্যায়—সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ এবং কৈবল্যপাদ। সমাধিপাদে সমাধির স্বরূপ ও উদ্দেশ্য, সাধনপাদে সমাধিলাভের উপায়, বিভূতিপাদে যোগ-সাধনার দ্বারা যে সব সিদ্ধি বা ঐশ্বর্যলাভ হয় তাহা এবং কৈবল্যপাদে কৈবল্যের বা মুক্তির স্বরূপ বিবৃত।

সাংখ্যমতে, চৈতন্যময় পুরুষ অসংখ্য। যোগ-দর্শনের মতে, ব্যষ্টিভাবে চৈতন্যময় পুরুষ অসংখ্য হইলেও, এই অসংখ্য পুরুষের উপরে এক মহান চৈতন্যময় পরম পুরুষ আছেন, এবং তিনি ঈশ্বর

ঈশ্বর

অর্থাৎ অনন্ত ঐশ্বর্য বা শক্তিসম্পন্ন। জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তারূপী ঈশ্বরের স্থান যোগ-দর্শনেও নাই। যোগ-দর্শনের ঈশ্বর—ক্লেশ-কর্ম-রাগ-দ্বেষ-বর্জিত এবং সর্বজ্ঞ পরম পুরুষ। ঈশ্বর-প্রণিধানের বা ঈশ্বর-নিষ্ঠার দ্বারা কৈবল্য-মুক্তি

লাভ হয়। (১) এই ঈশ্বরের বাচক বা প্রকাশক, প্রণব—ওঁ। ওঙ্কারের জপের ও অর্থ-ভাবনার সাহায্যে মন অন্তর্মুখী হয় এবং আত্মোপলব্ধির পথে সকল অন্তরায় দূর হয়। (২) যোগ-দর্শনে ভক্তিবাদ সুস্পষ্ট।

যোগ-দর্শনের মতে, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ—যোগ। চিত্ত ও চিত্তবৃত্তি কি তাহা সর্বপ্রথমে বুঝা প্রয়োজন। সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশ তত্ত্বের ভিতর চিত্ত শব্দ নাই। এই শব্দের ব্যবহার যোগ-দর্শনে। সাংখ্যের অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন এই ত্রয়ীর আধারস্বরূপ চিত্ত শব্দ এখানে ব্যবহৃত।

চিত্ত ও চিত্তবৃত্তি

অন্তরের যে আধারে অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন কাজ করে, তাহাই চিত্ত। চিত্তের উপর অনবরত চিন্তা-তরঙ্গ উঠিতেছে। সেই চিন্তাতরঙ্গগুলিই চিত্তের বৃত্তি। চিত্তবৃত্তি পঞ্চ প্রকার। চিত্তরূপ হ্রদে চিন্তা-তরঙ্গ-সমূহ পঞ্চরূপে দেখা দেয়। পঞ্চ চিত্তবৃত্তি—যথার্থ বস্তুজ্ঞান, মিথ্যা বস্তুজ্ঞান, বিকল্প বা ইচ্ছাকৃত কল্পনা, নিদ্রা ও স্মৃতি। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রমাণের সাহায্যে যথার্থ বস্তুজ্ঞান লাভ হয়। সাংখ্যের আপ্তবচনের পরিবর্তে যোগ-দর্শন আগম শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাতে বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হইয়াছে। আগম শব্দের মুখ্য অর্থ হইল বেদ (৩) এবং গৌণ অর্থ হইল সকল প্রকার আপ্তবচন। প্রমাণ সম্বন্ধে সাংখ্য ও যোগের মতভেদ নাই।

(১) ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা—যোঃ সূঃ, ১ | ২৩
সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ—যোঃ সূঃ, ২ | ৪৫

(২) তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ॥ ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ॥—যোঃ সূঃ, ১ | ২৭-২৯

(৩) তন্ত্রশাস্ত্রের মত বেদকেও আগম কহে।

যোগ-দর্শনের ভাষ্যকারগণ চিত্তের অবস্থাও পাঁচ প্রকার বলিয়াছেন—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। রজোগুণের প্রাধান্য-বশতঃ চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থা, এই অবস্থায় মন ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় সমূহের মাঝে ছুটাছুটি করে।

চিত্তের পাঁচ অবস্থা

তমোগুণের প্রাধান্য-বশতঃ চিত্তের মূঢ়াবস্থা, এই অবস্থায় মন তমসাচ্ছন্ন বা নিদ্রাচ্ছন্ন থাকে এবং নিষ্ক্রিয় হয়। সত্ত্বগুণের প্রাধান্য-বশতঃ চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থা, এই অবস্থায় মন অন্তর্মুখী হইতে চেষ্টা করিলেও মাঝে মাঝে বহির্মুখী হইয়া পড়ে। পূর্ণ সত্ত্বগুণলাভে চিত্তের একাগ্র অবস্থা, এই অবস্থায় মন সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী হয়। একাগ্র অবস্থার পর সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে চিত্তের নিরুদ্ধাবস্থা, এই অবস্থায় মন সমাধিমগ্ন হয়।

প্রাগুক্ত চিত্তবৃত্তি-নিরোধের উপায় দ্বিবিধ—অভ্যাস ও বৈরাগ্য। চিত্তবৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করিয়া চিত্তের স্থিতি বা স্থিরতা লাভের উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রচেষ্টা—অভ্যাস। দীর্ঘকাল আন্তরিক প্রচেষ্টাতে অভ্যাস সুদৃঢ় হয়। নিজ কর্তৃক দৃষ্ট অথবা অপরের নিকট

চিত্তবৃত্তি-নিরোধের উপায়—অভ্যাস ও বৈরাগ্য

শ্রুত ভোগ্য বিষয় সম্বন্ধে উপভোগের যে স্বাভাবিক তৃষ্ণা তাহার জয় এবং ঐ বিষয়-ভোগ-তৃষ্ণা যে জিত হইয়াছে এই সংজ্ঞা বা চেতনা—বৈরাগ্য। ইহার তাৎপর্য এই যে, শুধু বিষয়-বিতৃষ্ণা নহে, তাহার সঙ্গে চাই বিষয়-তৃষ্ণার স্বীয় বশীকরণ-শক্তির অনুভূতি বা বোধ, তবেই যথার্থ বৈরাগ্য-সাধন।

চিত্তস্থিতিতে আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয়। ইহার নাম, সমাধি। এই সমাধিলাভের উপায়সম্পর্কে যোগ-দর্শন যে সকল ব্যবহারিক নির্দেশ দিয়াছেন তাহা অষ্টাঙ্গ-যোগ বা রাজযোগ নামে খ্যাত। রাজযোগের

অষ্টাঙ্গযোগ বা রাজযোগ

অর্থ, শ্রেষ্ঠ যোগ। যোগের অষ্টাঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। (৪) যম-নিয়ম-পালনের অর্থ, সদাচার-পালন। যথা—অহিংসাদির পালন। ইহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়। তারপর, আসন বা আসন-সিদ্ধি। তারপর, প্রাণায়াম বা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি-নিয়ন্ত্রণ। তারপর প্রত্যাহার, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ফিরাইয়া লওয়া। যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার এই আটটি অষ্টাঙ্গযোগের বহিরঙ্গ। বহিরঙ্গ-সাধনার পর অন্তরঙ্গ-সাধনা। ধারণা-ধ্যান-সমাধি এই তিনটি অষ্টাঙ্গযোগের অন্তরঙ্গ। প্রত্যাহারের পর মন অন্তর্মুখী হয় এবং ধারণার যোগ্যতা লাভ করে। দেহের বাহিরে বা অভ্যন্তরে কোন বস্তুর উপর মনকে কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখার নাম, ধারণা। ধারণার পর ধ্যান, অর্থাৎ সেই বস্তুর উপর নিরবচ্ছিন্ন প্রত্যয়-প্রবাহ, মন তাহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র না যায়। ধ্যানের পর সমাধি। ধ্যানের দ্বারা ধ্যেয় বস্তুর নাম-রূপ পর্যন্ত লুপ্ত হইলে এবং কেবল তাহার অর্থবোধটুকু জাগ্রত থাকিলে, সেই অবস্থার নাম—সমাধি। ধারণা-ধ্যান-সমাধি এক সূত্রে গাঁথা। যখন এক লক্ষ্য বস্তুর উপর এই তিনের প্রয়োগ হয়, তখন এই ত্রয়ীকে একত্রে সংযম বলা হয়। অষ্টাঙ্গযোগ-সাধনার চরম লক্ষ্য—সমাধি। সমাধি দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে লক্ষীভূত বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে, জ্ঞেয়ও জ্ঞাতা এই দ্বৈতবোধ থাকে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ঐ বস্তু সম্বন্ধে আর জ্ঞান থাকে না, জ্ঞেয়-জ্ঞাতা এই দ্বৈতবোধ আর থাকে না, সব একাকার। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইল সমাধির উচ্চ স্তর। সমাধি অবস্থায় যোগী প্রবেশ করে এক স্তব্ধ নীরবতার রাজ্যে। বাহ্য জগতের কোলাহল সেখানে পৌঁছায় না। ইন্দ্রিয়গণ মনে লয় পায় এবং মন নিষ্ক্রিয় হয়।

(৪) অষ্টাঙ্গযোগের বিষয় পরবর্তী অষ্টম অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

সাংখ্য-দর্শনমতে, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকের দ্বারা অবিবেক বা অবিদ্যা নষ্ট হয় এবং তখন ত্রিতাপজ দুঃখ ও সংসার হইতে মুক্তি লাভ হয়। মুক্তিলাভের পর চৈতন্যময় পুরুষের বা আত্মার অবস্থান সম্পর্কে সাংখ্য-দর্শন কিছু বলেন না। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকের দ্বারা যে অবিবেক নষ্ট হয়, ইহা যোগ-দর্শন ও বলিয়াছেন ; তবে যোগ-দর্শন আরো বলিয়াছেন যে, ঐ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক এবং মুক্তি লাভ হয় সমাধির সাহায্যে। ইহা ছাড়া মুক্তির পর চৈতন্যময় পুরুষের অবস্থান সম্পর্কেও যোগ-দর্শন বলিয়াছেন যে, সেই অবস্থায় পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করেন। প্রকৃতি-পুরুষের অভেদ-জ্ঞান যতক্ষণ থাকে, পুরুষ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির শৃঙ্খলে যেন ততক্ষণ আবদ্ধ থাকেন। সমাধি অবস্থায় সেই অভেদজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, পুরুষ আর প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা বদ্ধ থাকেন না, তখন তিনি নিজের কেবল, নিষ্ক্রিয়, ত্রিগুণাতীত, চৈতন্যময় সত্তায় অবস্থান করেন। ইহাই পুরুষের স্বরূপে অবস্থান। পুরুষ কেবল একমাত্র নিজের সত্তায় বিদ্যমান থাকেন বলিয়া মুক্তির অন্য নাম, কৈবল্য। কৈবল্য-অবস্থায় পুরুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন।

মুক্তি

৩। ন্যায়-দর্শন।

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন এক দ্বন্দ্বভুক্ত। এই দুই দর্শন বেশী কল্পনার আশ্রয় না লইয়া বহির্জগৎকে ও অন্তর্জগৎকে ব্যবহারিক বুদ্ধিতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তাই, কিছু নিরস বলিয়া মনে হয়। নি+অয়+ঘঞ্‌=ন্যায়। 'ন্যায়' শব্দের ধাতুগত অর্থ, কোন বস্তুর ভিতর প্রবেশ করা, অথবা তাহাকে বিশ্লেষিত করিয়া দেখা। ন্যায়-দর্শনকে কখন কখন বলা হয় তর্ক-বিদ্যা বা বাদ-বিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে, তর্ক-বিদ্যা

ন্যায়-দর্শনের তাৎপর্য ও লক্ষ্য

ন্যায়-দর্শনের একাংশ মাত্র। ন্যায়-দর্শনে মনোবিজ্ঞান, তত্ত্ববিদ্যা, পরমার্থ-বিদ্যা ইত্যাদিও স্থান পাইয়াছে। ন্যায়-দর্শনের প্রধান লক্ষ্য—নির্ভুল উপায়ে বিচার-বিতর্কের সাহায্যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-সম্বন্ধে তত্ত্বান্বেষণ। তত্ত্বান্বেষণেও ঠিক ভাবে বিচার-বিতর্কের প্রয়োজন আছে। বেদ-বিদ্যা-লাভার্থে যে ছয় বেদাঙ্গ নির্দিষ্ট, তাহার মধ্যে ন্যায় অন্যতম। ন্যায়শাস্ত্রে জ্ঞান না থাকিলে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র বুঝা সুকঠিন।

ন্যায়-দর্শন ও বলেন যে, মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি; তবে ষোলটি পদার্থের যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা সেই নিঃশ্রেয়স লভ্য। (১) ষোড়শ পদার্থ—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়. প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি এবং নিগ্রহ-স্থান। এই ষোলটির মধ্যে ফলতঃ প্রমাণ ও প্রমেয় এই দুই পদার্থের ভিতর সব দার্শনিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। অবশিষ্ট চৌদ্দ পদার্থ তর্কশাস্ত্রের অঙ্গীভূত। প্রথমে প্রমাণ ও প্রমেয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

ষোড়শ পদার্থ

ন্যায়-দর্শনের মতে চারি প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান. উপমান ও শব্দ। প্রত্যক্ষ ও অনুমান কি তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। (২) দৃষ্ট বস্তুর সহিত উপমার বা তুলনার সাহায্যে কোন অদৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়. তাহা উপমান।

প্রমাণ

(১) প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্কনির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।

—ন্যায়-দর্শন।

(২) সাংখ্য-দর্শনে ত্রিবিধ প্রমাণ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

উপমানকে অনুমানের এক অঙ্গ বলা যাইতে পারে। শব্দ— বেদবচন।

প্রমেয়

যে বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহা প্রমেয়। প্রমেয় সংখ্যায় দ্বাদশ—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ বা ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয়, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব বা জন্মান্তর-গ্রহণ, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ। প্রথম প্রমেয়—আত্মা। ন্যায়-দর্শনের মতে, আত্মাই জ্ঞাতা-ভোক্তা-কর্তা। রাগ-দ্বেষ-ইচ্ছা আত্মার ধর্ম। বুদ্ধি ও মন আত্মা নহে, তাহারা আত্মার যন্ত্রস্বরূপ। শরীরের নাশে আত্মার নাশ হয় না। আত্মা অমর। ন্যায়-দর্শন ও বলেন যে, আত্মা অসংখ্য। ত্রিতাপজ দুঃখের ঐকান্তিক নাশ—অপবর্গ, বা মুক্তি, বা নিঃশ্রেয়স। মুক্ত আত্মার আর পুনর্জন্ম হয় না, এবং পুনরায় দেহধারণ না করায় তাঁহাকে আর সুখ-দুঃখ-ভোগ করিতে হয় না। যতকাল যতজন্ম শরীর-ধারণ, ততকাল ততজন্ম আত্মা বদ্ধ এবং সুখ-দুঃখের অধীন। অজ্ঞানই এই বন্ধের কারণ। ষোড়শ পদার্থ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হইলে ঐ বন্ধন খসিয়া যায়।

ষোড়শ পদার্থের প্রমাণ-প্রমেয় বাদে বাকী সব বাদ-বিদ্যার বা তর্ক-বিদ্যার অন্তর্গত। অবশিষ্ট চৌদ্দ পদার্থ—সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহ-স্থান। বিচার্য বিষয় সম্পর্কে প্রথমে উপস্থিত হয় সন্দেহ, অর্থাৎ ঐ বিষয়ে বিচারের সার্থকতা সম্বন্ধে দ্বৈধবোধ।

বাদ-বিদ্যা

তারপর হয় প্রয়োজন, অর্থাৎ কি উদ্দেশে ঐ বিষয়ের বিচার কর্তব্য। তারপর হয় দৃষ্টান্ত, অর্থাৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় এমন এক উদাহরণ। তারপর হয় সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তের পর উপস্থিত হয় প্রতিপক্ষের প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ

পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট। পঞ্চ অবয়ব (৩)—প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় বা হেতু-প্রয়োগ, এবং নিগমন বা নিষ্পত্তি। প্রতিবাদের পর উপস্থিত হয় উভয় পক্ষে তর্ক এবং নির্ণয়, অর্থাৎ তর্কিত বিষয়ের সত্যতা-নিরূপণ। তারপর হয় বাদ, অর্থাৎ উভয় পক্ষে পুনরায় তর্ক-বিতর্ক। এই তর্ক-বিতর্কের সময় দেখা দেয় জল্প বা বাচালতা, বিতণ্ডা বা কুতর্ক, হেত্বাভাস বা হেতু-দোষ, ছল বা শব্দের প্রকৃত অর্থের স্থলে বিকৃত অর্থের প্রয়োগে প্রতারণা, জাতি বা নিরর্থকতা এবং সর্বশেষে নিগ্রহ-স্থান। নিগ্রহ-স্থানের অর্থ—তর্ককালে প্রতিপক্ষ এমত অবস্থায় পৌছায়, যেখানে তর্কের ভিত্তি কিছু না থাকায় আর সে তর্ক করিতে সমর্থ হয় না। নিগ্রহ-স্থানই বাদ-বিতণ্ডার বা তর্ক-বিতর্কের শেষ ধাপ।

ন্যায়-দর্শনের মতে, এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে অসংখ্য পরমাণুর সংযোগে। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্ম পরমাণুসমূহের বিকারজাত এই বিশ্ব। পরমাণুগুলির স্বাধীন সত্তা আছে। তাহারা অনাদি-অনন্তকাল বিদ্যমান—পরিবর্তনশীল নহে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ঐ পরমাণুসকলের সংযোগ-বিয়োগে বিভিন্ন জাগতিক পদার্থের সৃষ্টি।

বিশ্ব

ন্যায়-দর্শন ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তবে জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তারূপী ঈশ্বর নহে। প্রত্যেক কার্যের কারণ আছে। কারণ ছাড়া কার্য হয় না, কার্য ছাড়া কারণ হয় না। জগতের রচনা-পরিচালনা-কার্যের ও এক আদি কারণ আছে। সেই আদি কারণ—ঈশ্বর। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ব-

ঈশ্বর

(৩) ন্যায়শাস্ত্রের পঞ্চ অবয়ব গ্রীক তর্কশাস্ত্রের (Logic) অবয়বের (Syllogism) অনুরূপ। এই সাদৃশ্য দেখিয়া কোন পাশ্চত্য পণ্ডিত বলেন যে, গ্রীক তর্কবিদ্যা ভারতের নিকট হইতে গৃহীত।

শক্তিমান। তিনি জগতের পরিচালক। তাঁহার শক্তির দ্বারা আদি পরমাণুসমূহের সংযোগ-বিয়োগ ঘটে, এবং তাহার ফলে জগতের সৃজন-পালন-লয় সংসাধিত হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় প্রত্যক্ষের দ্বারা নহে, যুক্তির বা অনুমানের দ্বারা। ঈশ্বর অনুমানসিদ্ধ। ন্যায়-দর্শন আরো বলেন যে, জীবের কর্মফল ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তিনি অদৃষ্টের পরিচালক ও কর্মফলদাতা। তিনি পুরুষ-বিশেষ, সচ্চিদানন্দময় এবং বিভু বা বিশ্বব্যাপী।

৪। বৈশেষিক দর্শন।

বৈশেষিক শব্দের উৎপত্তি

ন্যায় ও বৈশেষিক এক পন্থানুগামী। ন্যায়-দর্শনের পরমাণুবাদ বৈশেষিক দর্শনে বিশেষভাবে বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত। বৈশেষিক মতে—পরমাণু নিত্য, নিরবয়ব ও অনাদি। কিন্তু এক এক জাতীয় পরমাণুর মধ্যে ভেদ আছে। যে পদার্থের সাহায্যে এই ভেদ সিদ্ধ হয়, তাহার নাম—বিশেষ। এই বিশেষ শব্দ হইতে এই দর্শনের নাম—বৈশেষিক।

বৈশেষিক দর্শন প্রথমেই ধর্ম কি তাহার সংজ্ঞা দিয়াছেন—যাহা দ্বারা অভ্যুদয় বা ইহলোকে ও পরলোকে উন্নতি-জনক সুখ এবং নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভ হয়, তাহাই ধর্ম। (১) ধর্মের এই সংজ্ঞা অতি সুন্দর এবং পণ্ডিতগণ কর্তৃক সমাদৃত। ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্মের অর্থ-তত্ত্ব-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

পদের অর্থ, পদার্থ। প্রত্যক্ষ-অনুমান-শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণের (২)

---

(১) ১ম অধ্যায়, আহ্নিক সূত্র।

(২) বৈশেষিক দর্শনের মতে উপমান অনুমানের অন্তর্গত, অতএব পৃথক্ প্রমাণ নহে

দ্বারা যে সকল বস্তু সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করি, সেই সকল বস্তুতে কতকগুলি সাধারণ অর্থ বা অভিধেয় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সেই সকল অর্থের পরিভাষা—পদার্থ। বৈশেষিক মতে সপ্ত পদার্থ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। (৩)

পদার্থ

প্রথম পদার্থ—দ্রব্য। দ্রব্য নয়টি—পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দেশ, আত্মা এবং মন। এই নয় দ্রব্যের ভিতর পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু ও মন এই পাঁচটি পরমাণু-গঠিত।

নয় দ্রব্যের অন্তরে আছে কতকগুলি গুণ। গুণ ছাড়া দ্রব্য এবং দ্রব্য ছাড়া গুণ থাকিতে পারে না। তাই গুণ—দ্বিতীয় পদার্থ। এই গুণসমূহ সংখ্যায় সপ্তদশ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন। এই সপ্তদশ গুণের মধ্যে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন এই ছয়টি গুণ আত্মার বা চেতন পুরুষের। বাকীগুলি পৃথিবী, অপ ইত্যাদি জড় দ্রব্যের গুণ।

তৃতীয় পদার্থ—কর্ম। কর্ম পঞ্চবিধ—উৎক্ষেপণ বা উপরে ছুঁড়িয়া ফেলা, অবক্ষেপণ বা নীচে ফেলা, আকুঞ্চন, উৎসারণ ও গমন।

চতুর্থ পদার্থ—সামান্য। সামান্য, অর্থাৎ দ্রব্য-গুণ-কর্মের সাধারণ ধর্ম বা সাধর্ম্য। মাত্রার অল্পাধিক্যবশতঃ সামান্য দুই প্রকার—শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট। শ্রেষ্ঠ সামান্যে বিভিন্নতা বা ব্যষ্টিভাব খুব কম। সত্তা বা বিদ্যমানতাই শ্রেষ্ঠ সামান্য, কেননা সকল দ্রব্য-গুণ-কর্মের বিদ্যমানতা

(৩) মহর্ষি কণাদ তাঁহার সূত্রে প্রথম ছয়টি পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। সপ্তম পদার্থটি পশ্চাৎ বৈশেষিক দর্শনে স্থান পাইয়াছে।

ব্যতীত বেশী সমান ধর্ম আর কিছু নাই। যখন দ্রব্য-গুণ-কর্ম সামান্য-উপাধি-বশতঃ ক্রমশঃ পরস্পর বিভিন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহারা নিকৃষ্ট হয়। যেমন—মানুষ, গরু ইত্যাদি সকলেই জীব এবং এই জীবত্ব তাহাদের শ্রেষ্ঠ সাধারণ ধর্ম; দেহাদির উপাধিবশতঃ যখন তাহারা ক্রমশঃ বিভিন্ন হইয়া মনুষ্যজাতি, গো-জাতি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়, তখন তাহারা মনুষ্যত্ব, গোত্ব ইত্যাদি নিকৃষ্ট সামান্য ধর্ম প্রাপ্ত হয়।

পঞ্চম পদার্থ—বিশেষ। পূর্ব-কথিত পৃথিবী, অপ, তেজ ইত্যাদি নয় শাশ্বত সনাতন দ্রব্যনিচয়ের মধ্যে যে পদার্থের সাহায্যে তাহারা চিরকাল পৃথক্ ভাবে বর্তমান থাকে, সেই পদার্থের নাম—বিশেষ। সামান্য হইতে সমষ্টি এবং বিশেষ হইতে ব্যষ্টি। যে কোন বস্তুর পৃথক্ সত্তা যাহার দ্বারা গঠিত হয়, তাহাই তাহার বিশেষত্ব বা ব্যষ্টিভাব। বস্তুসমূহের এক সমান সত্তা যাহার দ্বারা সাধিত হয়, তাহাই তাহাদের সমানত্ব বা সমষ্টিভাব।

ষষ্ঠ পদার্থ—সমবায়। ইহা এক প্রকার। উভয়ের ভিতর নিত্য সম্বন্ধ—সমবায়। এই নিত্য সম্বন্ধ বা সমবায় হেতু, উভয়ের একটি অপরটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। দ্রব্য গুণ ছাড়া থাকিতে পারে না, এবং গুণ দ্রব্য ছাড়া থাকিতে পারে না। অতএব, তাহাদের মধ্যে সমবায় আছে। সেইরূপ সমবায় লক্ষিত হয় সমষ্টি-ব্যষ্টির মধ্যে, জাতি-ব্যক্তির মধ্যে, অংশ-অংশীর মধ্যে, কার্য-কারণের মধ্যে ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাদের ভিতর একটি অন্যটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।

সপ্তম পদার্থ—অভাব। অভাবের অর্থ, অবিদ্যমানতা। অভাব চতুর্বিধ—প্রাগভাব, ধ্বংস, অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। প্রাগ-ভাবের অর্থ পূর্বে অভাব, যেমন বস্ত্র-বয়নের পূর্বে বস্ত্রের অভাব।

ধ্বংসের অর্থ পশ্চাৎ অভাব, যেমন ঘট ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করার পর ঘটের অভাব। অত্যন্তাভাবের অর্থ চরম অভাব, যেমন বন্ধ্যানারীর পুত্র। অন্যোন্যাভাবের অর্থ একটি থাকিলে আর একটি থাকে না, যেমন জল ও বরফ।

বৈশেষিক মতে, জগতের উপাদান-কারণ পরামাণু। ন্যায়-দর্শনেও পরমাণুবাদ আছে, কিন্তু তাহা পূর্ণরূপে নাই। ব্রহ্মাণ্ডকে বিচ্ছেদ করিতে করিতে সর্বশেষে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদান পাওয়া যায় এবং যাহার আর বিশ্লেষ হয় না, তাহার নাম—পরমাণু।

পরমাণুবাদ

পরমাণু জড়, অসংখ্য, অনাদি ও অনন্ত। প্রত্যেক পরমাণুর একটি বিশেষ বা ব্যষ্টিগত চিরন্তন ধর্ম আছে, যাহা তাহাকে অন্য পরমাণু হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে। দুই পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যণুক এবং তিন দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু বা ত্র্যণুক হয়। দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক ইত্যাদি ক্রমে ঘটপটাদি সমস্ত সাবয়ব বস্তুর উৎপত্তি। সূর্য-রশ্মির ভিতর অতি সূক্ষ্ম কণার মত এই ত্রসরেণু প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয়। অণু বা দ্ব্যণুক এত সূক্ষ্ম যে দৃষ্টিগোচর হয় না। সাধারণতঃ বলা হয় যে, একটি সূর্য-রশ্মি-কণার ষষ্ঠাংশ-সদৃশ এক অণু। পৃথিবী, অপ, তেজ ও বায়ুর ভেদবশতঃ পরমাণুও চারি শ্রেণীর। প্রতি পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া কিছুকাল থাকে, তারপর আবার বিযুক্ত হইয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে এই সংযোগ-বিয়োগ অবিরাম চলিতেছে। সমষ্টিগত পরমাণুর ধ্বংস আছে, কিন্তু ব্যষ্টিগত পরমাণুর ধ্বংস নাই। জগৎ এই অসংখ্য পরমাণুর মিলনে গঠিত। তাহারা পরস্পর বিযুক্ত হইয়া পড়িলে জগতের নাশ বা প্রলয় ঘটে। পরমাণুগণের এই সংযোগ-বিয়োগ অদৃষ্ট শক্তির দ্বারা পরিচালিত।

বৈশেষিকের নয় দ্রব্যের মধ্যে আত্মা একটি। মন পরমাণু-গঠিত,

কিন্তু আত্মা তাহা নহে। আত্মা চৈতন্য-স্বরূপ, অনাদি, অনন্ত ও অসংখ্য এবং জড় দেহ হইতে ভিন্ন। এক আত্মা হইতে অন্য আত্মা স্বতন্ত্র। চৈতন্যময় আত্মার সহিত জড় দেহ-মন-ইন্দ্রিয়-প্রাণের সংযোগে জীবের জন্ম। বৈশেষিক মতে, অসংখ্য জড় পরমাণু এবং অসংখ্য চেতন আত্মা যেন পাশাপাশি বর্তমান। অতএব, সাংখ্যের ন্যায় বৈশেষিক দর্শনেরও ভিত্তি অনেকটা দ্বৈতবাদের উপর।

আত্মা

মহর্ষি কণাদ তাঁহার বৈশেষিক সূত্রে স্পষ্টভাবে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। তাঁহার মতে, অদৃষ্ট-শক্তি কর্তৃক পরমাণুর সমবায়ে বিশ্বের সৃষ্টি। কর্মফলরূপ অদৃশ্য কর্ম-শক্তি—অদৃষ্ট। মহর্ষি কণাদের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ পশ্চাৎ বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরবাদ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন। তাঁহারা বলেন যে, যেমন পরমাণু জগতের উপাদান-কারণ তেমনি ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ। জড় পরমাণুগণ পরিচালিত হয় অদৃষ্ট-শক্তির দ্বারা, কিন্তু সেই অদৃষ্ট-শক্তির নিয়ন্তা চৈতন্যময় ঈশ্বর। জড় অদৃষ্ট-শক্তি চৈতন্যের অভাবে সুনিয়মে এই বিশ্বকে কখনো পরিচালিত করিতে পারে না। মূলে এক অখণ্ড, অনন্ত, অসীম, সর্বশক্তিমান, চেতন বস্তু আছেন এবং তিনিই সেই অদৃষ্ট-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। সেই চেতন বস্তু—ঈশ্বর। বেদ নির্ভ্রান্ত, তাহার কারণ বেদেরও নির্মাতা সেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বর। আত্মাও চৈতন্যময় বটেন, কিন্তু প্রলয়-কালে আত্মার চৈতন্য লুপ্তপ্রায় হয়। সেই হেতু জড় পরমাণুকে পরিচালিত করার শক্তি আত্মার থাকে না। তাই, পরমাণু এবং অদৃষ্ট-শক্তির পরিচালক অসংখ্য আত্মা নহে—এক সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর।

ঈশ্বর

রাগ অর্থাৎ আসক্তি বা কামনা, দ্বেষ এবং মোহ এই ত্রিদোষ জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু। এই ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন হয় কর্ম-প্রবৃত্তি, এবং কর্ম-প্রবৃত্তি-জাত কর্মের ফলে জীব সংসারে বদ্ধ হয় ও ত্রিতাপদুঃখ ভোগ করে। অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতে ত্রিদোষের উদ্ভব। যথার্থ আত্মজ্ঞানলাভে ত্রিদোষের নাশ হয়। তখন আর জীবের কর্ম-প্রবৃত্তি থাকে না কর্মফলভোগের জন্য জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-চক্রের আবর্তে ও আর পড়িতে হয় না। সেই অবস্থা—মুক্তি। বৈশেষিকের মতে, পূর্বোক্ত সপ্ত পদার্থের প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হয় এবং মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স লাভ হয়।

মুক্তি

৫। পূর্ব-মীমাংসা-দর্শন

মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত পূর্ব-মীমাংসা-দর্শন এবং তাঁহার গুরু মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত উত্তর-মীমাংসা-দর্শন বা বেদান্ত-দর্শন, বেদের অর্থ-বিচারের ও আপাতবিরোধী বেদবাণীর সামঞ্জস্য-বিধানের অভিপ্রায়ে রচিত। সেই কারণ, ইহাদের নাম—মীমাংসা। বেদের কর্মকাণ্ডের অর্থ-বিচারের উদ্দেশে রচিত পূর্ব-মীমাংসা, আর জ্ঞানকাণ্ডের অর্থ-বিচারের উদ্দেশে রচিত উত্তর-মীমাংসা। উভয়ের মধ্যে রচনা-কালের কোন পৌর্বাপর্য নাই। পূর্ব-মীমাংসাকার তাঁহার সূত্রের মাঝে মাঝে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের অভিমত এবং উত্তর-মীমাংসাকার তাঁহার সূত্রের মাঝে মাঝে জৈমিনির অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন। রচনা-কালের পৌর্বাপর্য থাকিলে এই

মীমাংসা শব্দের তাৎপর্য—পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা

ভাবে পরস্পরের অভিমত উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত থাকা সম্ভব হইত না।

বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞই ছিল বৈদিক কর্ম। বেদের ব্রাহ্মণাংশে বৈদিক যাগযজ্ঞের বিধি-তাৎপর্য ইত্যাদি বিশদভাবে আলোচিত। তাহাদের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে কালক্রমে নানা মুনির নানা মত দেখা দেয়। মহর্ষি জৈমিনি সেই সকল মতের সামঞ্জস্যের অভিপ্রায়ে যজ্ঞসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী সুসংযত ভাবে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাহা ছাড়া ধর্ম, কর্ম ও কর্মফল, আত্মা, অপবর্গ ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা করেন। বর্তমান কালে বিচারালয়ে বৈদিক কর্ম সম্বন্ধে হিন্দু আইনের কোন কূট তর্ক উপস্থিত হইলে জৈমিনির মীমাংসাসূত্র দেখার প্রয়োজন হয়।

পূর্ব-মীমাংসার প্রথম সূত্র—অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা, অনন্তর অতএব ধর্মজিজ্ঞাসা। এই সূত্রের ভিতর পূর্ব-মীমাংসার প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তু নিহিত। ভাষ্যকারগণ এই সূত্রের নানা অর্থ করিয়াছেন। এই

ধর্ম

সূত্রের মর্ম—বেদ-অধ্যয়নের পর তবে এখন ধর্ম কি তাহা জানিবার ইচ্ছা বা ধর্ম-জিজ্ঞাসা। এখানে কর্তব্য কর্মকে ধর্ম নাম দেওয়া হইয়াছে। বৈদিক যুগে বেদবিহিত যজ্ঞকর্মই ছিল কর্তব্য কর্ম, তাই এখানে ধর্ম শব্দের অর্থ বেদবিহিত যজ্ঞকর্ম। অগ্নিহোত্র, দর্শ-পূর্ণমাস, উদ্ভিদ, বাজপেয়, রাজসূয় প্রভৃতি নানা প্রকার বৈদিক যজ্ঞ প্রচলিত ছিল। কোন যজ্ঞের কোন দেবতা ও সেই যজ্ঞানুষ্ঠানে বেদের বিধি-নিষেধ কি, এবং বেদ-মন্ত্র-পাঠের সুপ্রণালী কি এই সব বিষয়ে মীমাংসাকার বিধান দিয়াছেন। প্রত্যেক বৈদিক যজ্ঞের উদ্দেশ্য আছে। কোন যজ্ঞের কি উদ্দেশ্য তাহাও তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যজ্ঞকর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য—স্বর্গলাভ। জৈমিনির

পূর্ব-মীমাংসাসূত্রের প্রধান ভাষ্যকার, শবর স্বামী। পরে কুমারিলভট্ট এবং তাঁহার শিষ্য প্রভাকর স্বতন্ত্র ভাষ্য লিখেন।

আত্মা

চৈতন্যময় আত্মা জড় দেহ হইতে ভিন্ন। জড় দেহ শুধু ভোগের আধার মাত্র। আত্মাই কর্তা ও ভোক্তা। আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া অন্তর্জগতে সুখ-দুঃখ এবং বহির্জগতে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সমূহ ভোগ করেন। ইন্দ্রিয়গণ আত্মার যন্ত্রস্বরূপ এবং দেহ আত্মার ভৃত্যস্বরূপ। আত্মা অনন্ত, অনাদি, অমর ও অসংখ্য।

প্রমাণ

পূর্ব-মীমাংসার মতানুসারে, প্রমাণ পাঁচ প্রকার—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, অর্থাপত্তি ও শব্দ। প্রথম তিনটির ব্যাখ্যা পূর্বে করা হইয়াছে। অর্থাপত্তি—প্রত্যক্ষীভূত নহে এমন কোন বস্তু সম্পর্কে যে জ্ঞান অন্য বস্তুর সাহায্যে সূচিত হয় তাহা। শব্দ—বেদবাণী। ধর্মসম্বন্ধে জ্ঞান একমাত্র শব্দগম্য বা বেদগম্য। বেদ অনাদি, অনন্ত, অক্ষর ও স্বতঃসিদ্ধ। জৈমিনির মতে, বেদ ঈশ্বর-সদৃশ—শব্দ-ব্রহ্ম। শব্দের কখনো নাশ হয় না।

ঈশ্বর

মহর্ষি জৈমিনি ঠিক যে নিরীশ্বরবাদী ছিলেন তাহা নহে। তিনি স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা এবং কর্মফল-দাতা ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেন না। তিনি ছিলেন অনেকটা কর্মবাদী। তাঁহার মতে, বৈদিক কর্ম-সাধনই মানব-জীবনের সার। প্রতি আর্যহিন্দুকে স্বর্গকামনায় নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম করিতে হইবে, নচেৎ প্রত্যবায় দোষ ঘটিবে। নিত্যকর্মের অর্থ, সন্ধ্যাবন্দনাদি; নৈমিত্তিক কর্মের অর্থ, বৎসরের মধ্যে নির্দিষ্টকালে নির্দিষ্ট যজ্ঞোৎসব। জৈমিনির মতে—প্রত্যেক কর্মের ভিতর এক শক্তি আছে, সেই শক্তি সেই কর্মের অনুরূপ ফল

উৎপাদন করে। সেই শক্তি—অপূর্ব বা অদৃষ্ট। তাহা আমাদের গোচরীভূত নহে বলিয়া অদৃষ্ট। সেই নিমিত্ত কর্মফলদাতা স্বতন্ত্র ঈশ্বরের আর প্রয়োজন হয় না। জৈমিনি বলেন যে, ঈশ্বর যদি কর্মফলদাতা হন, তবে তিনি একজনকে সুখ ও আর এক জনকে দুঃখ দিতে পারেন না; সেইরূপ করিলে তিনি পক্ষপাতী হইয়া পড়েন, কল্যাণময় ঈশ্বরকে এইরূপ পক্ষপাতিত্ব-দোষে দোষী করা যায় না। বৈদিক ধর্ম বা যাগযজ্ঞ সাধনের জন্যও ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক যজ্ঞের যজ্ঞভোজী দেবতা আছেন। সেই দেবতাগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করা হয় এবং তাঁহারাই যজমানগণকে যজ্ঞফল দান করেন। ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়াছেন বলিয়া জৈমিনিকে নিরীশ্বরবাদী বলা হয়। পরবর্তীকালে মীমাংসা-দর্শনের ভাষ্যকার কুমারিলভট্ট এবং প্রভাকর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে, এক অপূর্ব বা অদৃষ্ট শক্তি কর্মফলদাতা হইতে পারে না। সেই শক্তি চেতন নহে—অচেতন। এক অচেতন শক্তি স্বয়ং কোন কাজ করিতে পারে না। সেই শক্তির যথাযথ পরিচালনার জন্য একজন চৈতন্যময় পুরুষের আবশ্যক। সেই চৈতন্যময় পুরুষই ঈশ্বর। যজ্ঞভোজী দেবতাগণ আছেন, ইহা সত্য। কিন্তু তাঁহাদের নিয়োজক এক শ্রেষ্ঠ পুরুষের আবশ্যক। সেই পুরুষই ঈশ্বর। ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম না করিলে অভীষ্টসিদ্ধি হয় না।

মহর্ষি জৈমিনি মুক্তি বা মোক্ষ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। তাঁহার মতে, মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য—পরকালে স্বর্গলাভ। স্বর্গসুখই জীবের কাম্য; যজ্ঞকর্মের দ্বারা স্বর্গলাভ হয়। নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য কর্মের দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, আর নিষিদ্ধ কর্মের দ্বারা নরকগমন হয়। পরলোকে স্বর্গসুখের মাত্রার তারতম্য আছে। শুধু যন্ত্রচালিতের

ন্যায় যজ্ঞকর্ম করিলে পূর্ণ স্বর্গসুখ লাভ হয় না। চাই শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং সদাচার-পালনে চিত্তশুদ্ধি। জৈমিনির পরে ভাষ্যকার কুমারিলভট্ট এবং প্রভাকর মীমাংসা-দর্শনে মুক্তির বা মোক্ষের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতানুসারে, জীবের যখন আর ধর্ম বা অধর্ম কোনরূপ কর্ম থাকে না এবং সেই কারণ তাহাকে আর সূক্ষ্ম বা স্থূল কোন শরীর গ্রহণ করিতে হয় না, তখন হয় তাহার মুক্তি বা মোক্ষ। সেই অবস্থায় জীবের সুখ-দুঃখ-ভোগ কিছুই থাকে না। জীবাত্মা তখন স্বরূপে অবস্থান করেন। চিত্তকে রাগ-দ্বেষ-মুক্ত না করিতে পারিলে কর্ম-প্রবৃত্তির নাশ হয় না, এবং কর্ম-প্রবৃত্তির নাশ না হইলে মুক্তিলাভ হয় না। কেবল সদাচার-পালনে চিত্ত রাগ-দ্বেষ-মুক্ত হয় না, জ্ঞানের বা আত্ম-জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। তাঁহাদের মতে, মুক্তিলাভের উদ্দেশে কর্ম ও জ্ঞান দুই সাধনা আবশ্যক।

মুক্তি

দার্শনিক তত্ত্ববিচারের দিক দিয়া দেখিলে পূর্ব-মীমাংসা-দর্শনকে অসম্পূর্ণ বলিতে হয়। ব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ড-জীব-সম্পর্কে তত্ত্বালোচনা এই দর্শনে বিশেষ কিছু নাই। ইহার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু—যজ্ঞকর্ম-সাধন ও স্বর্গলাভ।

৬। উত্তর-মীমাংসা-দর্শন

বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা উপনিষদের অর্থবিচারের অভিপ্রায়ে এই উত্তর-মীমাংসা-দর্শন। ইহার অন্য নাম—ব্রহ্মসূত্র, ব্যাসসূত্র, বাদরায়ন-সূত্র, শারীরকসূত্র, ভিক্ষুসূত্র, ও বেদান্ত-দর্শন। উপনিষদের প্রতিপাদ্য—ব্রহ্ম। এই গ্রন্থে ব্রহ্ম স্বল্লাক্ষরে সূত্রিত বা কথিত বলিয়া, ইহার নাম—ব্রহ্মসূত্র। ব্যাসদেব-বিরচিত বলিয়া, ইহার নাম—ব্যাসসূত্র। বেদব্যাস

উত্তর-মীমাংসা-দর্শনের বিভিন্ন নাম, তাৎপর্য ও প্রতিপাদ্য

বদরিকাশ্রমে বাস বা তপস্যা করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নাম—বাদরায়ন সূত্র। (১) নির্গুণ ব্রহ্মের মায়াকল্পিত ত্রিগুণাত্মক শরীরধারণের কথা এই গ্রন্থে আছে বলিয়া, ইহার নাম—শারীরক সূত্র। মুখ্যতঃ ইহা সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুর পাঠ্য বলিয়া, ইহার নাম—ভিক্ষুসূত্র। উপনিষদের বা বেদান্তের ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধীয় শ্রুতিসমূহের বিচার এই গ্রন্থে আছে বলিয়া, ইহার নাম বেদান্ত-দর্শন বা বেদান্তসূত্র। ষড়্দর্শনের মধ্যে এই বেদান্ত-দর্শন শ্রেষ্ঠ। কি ভারতে, কি বহির্ভারতে, সর্বত্র যুক্তিবাদী দার্শনিকগণের কাছে এই গ্রন্থ অতি প্রিয়। (২) তাহার প্রধান কারণ, ইহার সুন্দর যুক্তিসিদ্ধতা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের সহিত ইহার অদ্ভুত সামঞ্জস্য। (৩)

(১) বদরে (=বদরিকাশ্রমে) অয়নং (=বাসঃ) যস্য সঃ বাদরায়ন—বদরিকাশ্রমে যাঁহার বাস তিনি বাদরায়ন।

(২) পাশ্চাত্য প্রখ্যাত দার্শনিক Schopenhauer উপনিষদের মন্ত্র স্তোত্ররূপে নিত্য পাঠ করিতেন এবং তাঁহার লিখিবার টেবিলের উপর উপনিষদের অনুবাদ সর্বদা থাকিত। তাঁহার দার্শনিক চিন্তায় বেদান্ত-দর্শনের ভাব সুস্পষ্ট, এমন কি তিনি 'মায়া' ও 'নির্বাণ' শব্দ পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। দার্শনিক Fichte উত্তরকালে Schopenhauer রচিত দর্শনশাস্ত্র অবিকল গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই, Fichte যে দর্শনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহাতে বেদান্তমত অতি পরিস্ফুট।

(৩) জগতের সকলেরই বেদান্তের চর্চা করা কেন উচিত, তাহার প্রথম কারণ—বেদান্তই একমাত্র সার্বভৌমিক ধর্ম। দ্বিতীয় কারণ—জগতে যত শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে কেবল ইহারই উপদেশাবলীর সহিত বহিঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে ফল লব্ধ হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। তৃতীয় কারণ—ইহার অদ্ভুত যুক্তিসিদ্ধতা। + + + বেদান্ত-দর্শনই নীতিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া মানবকে জ্ঞানপূর্বক নীতিপরায়ণ হইতে শিখাইয়াছে। উহা সকল ধর্মের সার। —স্বামী বিবেকানন্দ, কথোপকথন।

বেদান্ত-দর্শনের চারি অধ্যায়। ইহার মোট সূত্র-সংখ্যা ৫৫৫। প্রত্যেক অধ্যায় পুনরায় চারি পাদে বিভক্ত. চারি অধ্যায়ে মোট ষোলটি পাদ। প্রথম অধ্যায়ে—উপনিষদ্বাক্যসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় (৪) প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ সেই সকল বাক্য যে ব্রহ্মে পর্যবসিত তাহা প্রমাণিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত এই অধ্যায়ের নাম, সমন্বয়াধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে—প্রথম অধ্যায়ে বিচারের সাহায্যে বেদান্তবাক্যসমূহের অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যে সমন্বয় সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি শাস্ত্রসকলের বিরোধ এবং শ্রুতিবাক্যগুলির পরস্পর সম্ভাবিত বিরোধ নিরসন; এই নিমিত্ত এই অধ্যায়ের নাম, অবিরোধাধ্যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে—ব্রহ্মবিদ্যার সাধনসকল নিরূপিত; এই নিমিত্ত এই অধ্যায়ের নাম, সাধনাধ্যায়। চতুর্থ অধ্যায়ে—সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফল বিচারিত; এই নিমিত্ত এই অধ্যায়ের নাম, ফলাধ্যায়।

বেদান্ত-দর্শনের অধ্যায়-বিভাগ

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাঁচটি সূত্র বেদান্ত-দর্শনের মজ্জাস্বরূপ। সেই পাঁচ সূত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই স্থলে সুসঙ্গত।

বেদান্ত-দর্শনের প্রথম সূত্রপঞ্চক

প্রথম সূত্র—অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। অর্থ—অনন্তর এই জন্যই ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা। সমগ্র বেদান্ত-দর্শনের লক্ষ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা, ইহা এই সূত্রে স্পষ্ট সূচিত।

দ্বিতীয় সূত্র—জন্মাদ্যস্য যতঃ। অর্থ—যাঁহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ সাধিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। এই সূত্রে স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা ঈশ্বররূপী সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদিত।

তৃতীয় সূত্র—শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। এই সূত্রের দুই অর্থ—ঋগ্বেদাদি

(৪) এখানে সমন্বয়ের অর্থ, তাৎপর্য-নিরূপণ।

শাস্ত্রসমূহের যোনি বা উৎপত্তি-কারণ হওয়ায় ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ; অথবা, ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয়ে শাস্ত্রসমূহই যোনি বা কারণ বা প্রমাণ। এই সূত্রে বেদ যে পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধে শব্দ অর্থাৎ বেদ যে প্রমাণ এই উভয় তত্ত্বই প্রতিপাদিত।

চতুর্থ সূত্র—তত্তু সমন্বয়াৎ। অর্থ—বেদান্তবাক্যসমূহ ব্রহ্মে সম্যক অন্বিত বা সম্বদ্ধ হয় বলিয়া ব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়। অর্থাৎ, বেদই ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ এবং ব্রহ্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য।

পঞ্চম সূত্র—ঈক্ষতের্নাশব্দম্। অর্থ—'ঈক্ষ' ধাতুর প্রয়োগ থাকায়, শ্রুতিতে অনুক্ত সাংখ্যোক্ত অচেতনা প্রকৃতি জগৎ-কারণ নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যিনি জগৎ-কারণ তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ বিবেচনা বা আলোচনা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অচেতনা প্রকৃতির আলোচনার শক্তি নাই ; অতএব, ইহা কখনো জগৎ-কারণ হইতে পারে না।

উপনিষদের মধ্যে অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক কয়েকটি সংক্ষেপ-বচন আছে। এইগুলি বেদান্ত-বাণীর সার। যথা—'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' প্রভৃতি। এই সকল বচনের ভিতর 'তত্ত্বমসি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই চারিটি—মহাবাক্য। এই চারি মহাবাক্যের মধ্যে 'তত্ত্বমসি' বাক্যটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই মহাবাক্যটি সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের। উদ্দালক ঋষি তৎপুত্র শ্বেতকেতুকে উপদেশচ্ছলে কহিয়াছিলেন—তত্ত্বমসি, তুমিই ব্রহ্ম। তাৎপর্য—ব্রহ্মই বিশ্বের প্রাণ এবং সকলের আত্মা ; অতএব, হে শ্বেতকেতু, তুমি তিনিই অর্থাৎ তিনিই

বেদান্তের মহাবাক্য

তোমার আত্মা। বেদান্ত-সূত্রে তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদে এই 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অর্থ নিরূপিত হইয়াছে। (১)

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড

বেদান্ত-দর্শনের মতানুসারে এক অদ্বিতীয়, অখণ্ড, চৈতন্যস্বরূপ, অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন, নামরূপবিহীন পরব্রহ্ম বিদ্যমান। তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ। স্বরূপতঃ তিনি নির্গুণ—সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিনগুণের অতীত। কিন্তু তিনি সৃষ্টির সময় ব্রহ্মশক্তির বা মায়াশক্তির সাহায্যে ত্রিগুণযুক্ত হইয়া সগুণ হন এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডে তিনি অনুপ্রবেশ করেন, তবে ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর নিঃশেষিত হইয়া যান না। সৃষ্টির পর তিনি নির্গুণরূপে মায়াতীত অনাবৃত স্বভাবেও অবস্থিতি করেন। তাঁহার একাংশ সগুণ হইলেও অবশিষ্টাংশ নির্গুণ। ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। সাংখ্যের অচেতনা প্রকৃতি, অথবা বৈশেষিকের অচেতন পরমাণু, জগতের উপাদান কারণ হইতে পারে না। কেননা, তাহারা চৈতন্যের অভাবে স্বাধীনভাবে জগৎ রচনা করিতে অসমর্থ এবং চৈতন্যময় পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়। চৈতন্যময় ব্রহ্ম যদি কেবলমাত্র নিমিত্ত কারণ হন এবং তাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ড-রচনার উপাদান অন্যত্র সংগ্রহ করিতে হয়, তবে তাঁহার একত্বের—অনন্তত্বের—অসীমত্বের হানি হয়। মাকড়সা যেমন নিজের ভিতর হইতে তন্তু উৎপাদন করিয়া তাহার তন্তুজাল নির্মাণ করে এবং পশ্চাৎ আবার নিজের মধ্যে সব গুটাইয়া লয়, তেমনি ব্রহ্ম নিজের ভিতর হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান উৎপাদন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের

(১) এক অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্য বা পরমাত্মা 'তৎ' পদের বাচ্য। জীবগণের অন্তঃকরণস্থিত ইন্দ্রিয়াতীত চৈতন্য বা জীবাত্মা 'ত্বং' পদের বাচ্য। এই উভয় চৈতন্য অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মা চৈতন্যাংশে একই, ইহা 'অসি' পদের অর্থ।

সৃষ্টি করেন এবং প্রলয়-কালে তাহাকে নিজের ভিতর লীন করেন। ক্ষুদ্র মাকড়সা যদি নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ উভয় হইতে সমর্থ হয়, তবে অসীমশক্তিসম্পন্ন পরব্রহ্ম নিশ্চয়ই তাহা হইতে পারেন। ব্রহ্মের বহু হইব ও সৃষ্টি করিব এই ইচ্ছাকে ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত কারণ, এবং ব্রহ্ম-শক্তি বা মায়া বা প্রকৃতিকে উপাদান কারণ বলা যাইতে পারে।

ঈশ্বর

সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর। তিনি জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা। তিনি জীবের কর্মফলদাতা। জীবের কর্মানুযায়ী কর্মফল তিনি দান করেন। কর্মের তারতম্যহেতু কর্মফলের তারতম্য। তাই, তাঁহাতে পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই। তিনি একজনকে সুখী, আর একজনকে দুঃখী করেন না। শুভ কর্মের ফল, সুখ। আর অশুভ কর্মের ফল, দুঃখ। যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন কর্মফল তাঁহার নিকট পায়। তিনি যেন বিচারপতি।

আত্মা

বেদান্ত-দর্শনের মতানুসারে, আত্মা এক—অসংখ্য নহে। একই আত্মা বিভিন্ন উপাধিযুক্ত (২) হইয়া বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন নামে প্রতিভাসিত হয়। যিনি সেই এক, চিন্ময়, অদ্বয় আত্মা তিনি পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম। তখন তিনি বিশ্বব্যাপী। সেই পরমাত্মা যখন উপাধিযুক্ত হইয়া প্রতি জীবের অন্তরে অন্তর্যামীরূপে কর্তা-ভোক্তারূপে বিহার করেন, তখন তিনি জীবাত্মা। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যাংশে পরমাত্মা ও জীবাত্মা অভিন্ন।

জীবাত্মা জীবের আধারে পাঁচটি আবরণে আচ্ছাদিত। এই পঞ্চ আবরণ—পঞ্চ কোষ। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চ কোষ। অন্নের বিকার বা ভুক্তান্ন

(২) অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অন্ন ইত্যাদি আত্মার উপাধি। এই উপাধিসমূহ মায়া বা অবিদ্যা কর্তৃক কল্পিত ও আত্মার উপর আরোপিত।

রসাদিরূপে পরিণত হইয়া যে কোষ উৎপাদন করে, তাহা অন্নময় কোষ। প্রাণ—অপান—সমান—উদান—ব্যান এই পঞ্চ বায়ু হস্ত-পদাদি কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া যে কোষ উৎপাদন করে, তাহা প্রাণময় কোষ। চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন মিলিত হইয়া যে কোষ উৎপাদন করে, তাহা মনোময় কোষ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি মিলিত হইয়া যে কোষ উৎপাদন করে, তাহা বিজ্ঞানময় কোষ। আনন্দের অর্থাৎ ভূমানন্দের দ্বারা গঠিত যে কোষ, তাহা অনন্দময় কোষ। এই পঞ্চ কোষ আবার তিন শরীরে বিভক্ত—স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর। অন্নময় কোষই স্থূল শরীর। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিন কোষের দ্বারা নির্মিত সূক্ষ্ম শরীর। আনন্দময় কোষই কারণ শরীর।

পঞ্চ কোষ ও তিন শরীর

জীবাত্মার চেতনার তিন অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি (১)। জাগ্রদবস্থায় স্থূল শরীরের কাজ চলে। স্বপ্নাবস্থায় স্থূল শরীরের কাজ থাকে না, সূক্ষ্ম শরীরের কাজ চলে। সুষুপ্তিতে স্থূল শরীরের ও সূক্ষ্ম শরীরের কাজ থাকে না, কারণ শরীরের কাজ চলে। জীব-চৈতন্যের এই তিন অবস্থার ঊর্ধ্বে আর এক অবস্থা আছে—তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা। জীবাত্মা তিন শরীর হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত সম্পূর্ণ অভেদত্ব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার যে অবস্থা হয়, তাহাই তুরীয় অবস্থা। সেই অবস্থায় জীব-চৈতন্য থাকে না। ইহা অতি-চেতন অবস্থা।

জীব-চৈতন্যের তিন অবস্থা

বেদান্ত-দর্শনের মতে, জীবাত্মার তুরীয় অবস্থায় পরমাত্মার বা

(১) নিদ্রাকালে যখন স্বপ্নদর্শন হয়, তখন স্বপ্নাবস্থা; আর যখন স্বপ্নদর্শন হয় না এবং বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ কোন বিষয়ের অনুভূতি থাকে না, তখন সুষুপ্তি অবস্থা।

পরব্রহ্মের সহিত অভেদত্ব-স্থাপনের নাম—মুক্তি। ইহা জ্ঞানগম্য। কর্মের দ্বারা এই অবস্থা লাভ করা যায় না। অবিদ্যাবশতঃ জীবের দেহাত্মবুদ্ধি ঘটে, অর্থাৎ দেহই আত্মা এই বুদ্ধি জন্মে; চৈতন্যময় আত্মা যে স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এই তিন শরীরের অতিরিক্ত, এই বোধ তাহার থাকে না। যথার্থ আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে এই মায়া বা অবিদ্যা দূর হয়। যেমন সূর্যোদয়ে রাত্রির অন্ধকার থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যার অন্ধকার থাকে না। ব্রহ্মবিদ্যালাভ সাধনসাপেক্ষ্য। এই সাধনা প্রধানতঃ জ্ঞান-উপাসনা-মূলক। ব্রহ্মবিচারের সাহায্যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়—মুক্তিলাভ হয়। তাই, বেদান্ত-দর্শনে সেই ব্রহ্মবিচার বিশেষ স্থান পাইয়াছে। মুক্তিসম্পর্কে বেদান্ত-দর্শন বলেন যে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ দেহান্তে দেবযানমার্গরূপ উত্তর পথে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকবাসী হন, ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্ভের সহিত এক লোকে বাস করেন; তারপর, মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মলোকসহ ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্ভের লয় ঘটিলে, তাঁহারা সকলে ব্রহ্মার বা হিরণ্যগর্ভের সহিত পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ইহার নাম—ক্রমমুক্তি। অপরপক্ষে, যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের সাধক তাঁহারা দেহাবসানে আর উত্তরপথে না যাইয়া সরাসরি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ইহার নাম—বিদেহ-কৈবল্য বা সদ্যমুক্তি। বেদান্ত-দর্শন আরো বলেন যে, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের অভ্যাসে যাঁহাদের নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে এবং সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা যাঁহাদের সগুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়াছে, তাঁহাদের জীবদ্দশাতেই পাপপুণ্যরাহিত্যরূপ জীবন্মুক্তি লাভ হয়। দেহাবসান না হওয়া অবধি জীবন্মুক্ত পুরুষ যে সকল কর্ম করেন, সেই সকল কর্মের ফলস্বরূপ পাপ-পুণ্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

মুক্তি

বেদান্তসূত্র এত স্বল্পাক্ষর যে বিনা ভাষ্য-সাহায্যে তাহার মর্ম উদ্ঘাটন সম্ভব নহে। সেই নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকারগণ বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। প্রাচীন ভাষ্যকারগণের মধ্যে বৌধায়ন, টঙ্ক, দ্রামিড়, গুহদেব, কপর্দী, ভারুকী প্রমুখ আচার্যগণের নাম পাওয়া যায়। সেই সকল ভাষ্য ইদানীং লুপ্ত প্রায়। পরবর্তীকালে শ্রীশঙ্করাচার্য, শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য, শ্রীনিম্বর্কাচার্য, শ্রীবল্লভাচার্য, শ্রীঅবধূতাচার্য, শ্রীভাস্করাচার্য, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি আচার্যগণ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য প্রণয়ণ করেন। তাঁহারা স্ব স্ব মতের সমর্থনে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই কারণ, বেদান্ত-দর্শন নানা মতবাদে বিভক্ত। যথা—কেবলাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ ইত্যাদি। বেদান্ত-কথিত ব্রহ্ম-জীব-বিশ্বএই তিন তত্ত্বের যাথার্থ্য-নিরূপণে ঐ সকল পূজ্যপাদ আচার্যগণের মতভেদ। খুব সংক্ষেপে কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ মতবাদ এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে—(ক) অদ্বৈতবাদ, বা কেবলাদ্বৈতবাদ (খ) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, (গ) দ্বৈতবাদ, (ঘ) দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, (ঙ) শুদ্ধাদ্বৈতবাদ ও (চ) অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ।

বেদান্তসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য

(ক) অদ্বৈতবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ—শ্রীশঙ্করাচার্য (৬৮৬খ্রীঃ) কর্তৃক প্রমাণিত। তাঁহার ভাষ্যের নাম—শারীরক ভাষ্য বা শাঙ্কর ভাষ্য। আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের ঠিক প্রবর্তক নহেন। তাঁহার পূর্বে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, ভর্তৃ-প্রপঞ্চ, দ্রাবিড়াচার্য ও গৌড়পাদাচার্য অদ্বৈতবাদী ছিলেন। বিধিবদ্ধ প্রণালীতে অদ্বৈতবাদের প্রথম ব্যাখ্যাতা, আচার্য গৌড়পাদ। তিনি আচার্য শঙ্করের পরম গুরু বা গুরুর গুরু। আচার্য শঙ্কর সুনিপুণ দার্শনিক বিচারে অদ্বৈতবাদ

সুপ্রমাণিত করিয়া ইহার পূর্ণরূপ দিয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদের বীজ ঋক-সংহিতাতে দেখা যায়। যেমন—মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্, বিভিন্ন দেবগণের প্রাণস্বরূপ এক আত্মা বিদ্যমান। (১) শঙ্করের বিশেষত্ব এই যে, তিনি ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন মুখ্যতঃ শ্রুতির বা উপনিষদের বচন অবলম্বনে; কেননা, ব্যাসদেব স্বয়ং শ্রুতিনিহিত তত্ত্বগুলিকে এক সূত্রে গাঁথিয়া তাঁহার ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং স্মৃতি—পুরাণাদির তত্ত্ব গ্রহণ করেন নাই। পরবর্তীকালে শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য প্রভৃতি আচার্যগণ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-রচনায় স্মৃতি-পুরাণের বচন অবলম্বন করিয়াছিলেন। আচার্য শঙ্করের সহিত তাঁহাদের ভাষ্যরচনা-প্রণালীর পার্থক্য এইখানে।

অদ্বৈতবাদের সার কথা—ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। অর্থাৎ—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। সৃষ্টিতত্ত্বে শঙ্করাচার্য বিবর্তবাদী। অদ্বৈতবাদের মতে, এক ব্রহ্মই সদ্‌বস্তু ও আছেন, জগৎ-প্রপঞ্চ আমাদের অবিদ্যাজাত বা অজ্ঞান-জনিত। যেমন চর্মচক্ষুর দোষে রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়, তেমনি জ্ঞান-চক্ষুর দোষে ব্রহ্মতে এই জগৎ-প্রপঞ্চের ভ্রম আমাদের উৎপন্ন হয়। যেমন চর্মচক্ষুর দোষ কাটিয়া যাইলে রজ্জুতে আর সর্পভ্রম হয়না, তেমনি জ্ঞানচক্ষুর দোষ কাটিয়া যাইলে, অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে, আর জগৎ-প্রপঞ্চের জ্ঞান আমাদের থাকে না। সেই অবস্থায় জগৎ-ভ্রম বিদূরিত হওয়া মাত্র একমাত্র সত্য ব্রহ্ম আমাদের সাক্ষাৎকার হন। এই যে ব্রহ্মতে জগৎ-প্রপঞ্চের ভ্রম, ইহার নাম—বিবর্তনবাদ। সাধারণতঃ, এই কথা আমাদের কাছে বিসদৃশ বোধ হয়। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ঐ বিরাট জগৎ আমাদের সম্মুখে, আর আমরা

(১) ঋক, ৩।৫৫।১১

তাহার বুকের উপর—এটা একেবারে মিথ্যা! এই শঙ্কার উত্তরে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন—এই জগৎ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা নহে; এখানে মিথ্যার অর্থ, ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই; কিন্তু ইহার ব্যবহারিক সত্তা আছে। শঙ্করের মতে, সত্তা তিন প্রকার—পারমার্থিক, প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক। যে বস্তুর কোন কালে কোন পরিবর্তন ঘটে না, অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে সব কালে এক অবস্থায় স্বপ্রতিষ্ঠ থাকে, তাহার সত্তা বা বিদ্যমানতা—পারমার্থিক। আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়ে চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের দোষে যখন এক বস্তুতে আর এক বস্তুর প্রতিভাস হয়, তখন সেই প্রতিভাসিত বস্তুর সত্তা মিথ্যা হইলেও যতক্ষণ সে প্রভিভাস থাকে ততক্ষণ তাহার মিথ্যা সত্তা ও বিদ্যমান থাকে, তাহার এই সাময়িক সত্তা—প্রাতিভাসিক। যেমন, মরুভূমিতে মরীচিকার বা মৃগতৃষ্ণিকার সত্তা। চক্ষুর দোষে মরুভূমির তপ্ত বালুরাশি দূর হইতে হ্রদের মত দেখায়, মনে হয় শীতল বারিপূর্ণ। এই ভ্রমে তৃষ্ণার্ত পথিক ছুটিয়া যায় জলপানের জন্য, কিন্তু নিকটে যাইয়া হতাশ হয় এই দেখিয়া যে হ্রদ নাই—শুধু ধু ধু করে মরুভূমির তপ্ত বালুরাশি। যতক্ষণ পথিক কাছে না যায়, ততক্ষণ বালুরাশিতে মিথ্যা হ্রদের প্রতিভাস থাকে এবং ততক্ষণ এই মিথ্যা হ্রদের সত্তা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে ছুট খাটায় তৃষ্ণানিবারণের উদ্দেশে। মরুভূমিতে মিথ্যা হ্রদের সাময়িক সত্তা, প্রাতিভাসিক সত্তা। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অগ্নি, জল প্রভৃতি যে সকল পার্থিব বস্তুর সংস্পর্শে আমরা সর্বদা আসি এবং যাহাদের ব্যবহার আমরা দৈনন্দিন জীবনে সর্বদা করি, তাহারা বস্তুতঃ অনিত্য, পরিবর্তনশীল ও ধ্বংসশীল হইলেও, তাহাদের সত্তা—ব্যবহারিক। প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক সত্তার মধ্যে ভেদ এই যে, প্রাতিভাসিক সত্তাবিশিষ্ট বস্তু ব্যবহারকালে লোপ

পায়, কিন্তু ব্যবহারিক সত্তাবিশিষ্ট বস্তু ব্যবহারকালে লোপ পায় না। মরুভূমিতে মরীচিকারূপ হ্রদের জল ব্যবহারকালে লোপ পায়; কিন্তু অগ্নি, জল ইত্যাদি ব্যবহারকালে লোপ পায় না। আচার্য শঙ্করের মতে—এই জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু যেহেতু ব্যবহারকালে ইহার লোপ হয় না সেই হেতু ইহার ব্যবহারিক সত্তা আছে। জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই এই কারণে যে, জগৎ পরিণামী, ধ্বংসশীল ও অনিত্য। জগতের নাম-রূপ যাহা ছিল অতীতে তাহা বর্তমানে নাই, এবং বর্তমানে যাহা আছে ভবিষ্যতে তাহা থাকিবে না। একমাত্র জগৎ-কারণ ব্রহ্মের কোন কালে কোন পরিবর্তন নাই, ধ্বংস নাই। তাই, একমাত্র ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা আছে, অন্য কোন বস্তুর তাহা নাই। ব্রহ্মের সত্তার তুলনায় জগতের সত্তা মিথ্যা, তাই বলা হয়—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। আজকাল বিজ্ঞান ও তদনুরূপ কথা বলিতেছেন। বিজ্ঞানের কথা—আমরা পরিদৃশ্যমান জগতের যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিচয় পাই, বস্তুতঃ সে তাহার প্রকৃত পরিচয় নহে। উদাহরণ—জল। জলের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই। হাইড্রোজেন (Hydrogen) এবং অক্সিজেন (Oxygen) এই দুই তরল বায়বীয় পদার্থের সংযোগে জলের উৎপত্তি। জলের স্বতন্ত্র সত্তা না থাকিলেও ব্যবহারিক সত্তা আছে। তৃষ্ণানিবারণের জন্য কিছু হাইড্রোজেন ও কিছু অক্সিজেন খাইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, পান করিতে হয় জল। অতএব, ব্যবহারকালে জলের ব্যবহারিক সত্তা আছে, যদ্যপি তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তারপর, মনে করুন লিখিবার টেবিল। বিজ্ঞান বলেন যে, ইহারও কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অসংখ্য সদা ঘূর্ণ্যমান তড়িতাণুর (Electrons) সমবায়ে ইহা গঠিত। কিন্তু ব্যবহারকালে ঐ টেবিল সদা ঘূর্ণ্যমান হয় না, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, সেই নিমিত্ত উহা আমাদের

ব্যবহারযোগ্য। এখানে টেবিলের স্বতন্ত্র সত্তা না থাকিলেও ব্যবহারিক সত্তা আছে। অদ্বৈতবাদের ও প্রায় সেই কথা—জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তা নাই ; একমাত্র জগৎ-কারণ ব্রহ্মের স্বতন্ত্র সত্তা আছে। জগৎ ব্রহ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও মায়াকল্পিত। (১)

অদ্বৈতবাদ আরো বলেন যে, জগৎ-কারণ ব্রহ্ম এবং জীব অভিন্ন। ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ এবং জীব ও চৈতন্যস্বরূপ। ব্রহ্ম-চৈতন্য এবং জীব-চৈতন্য এক। যে চিৎশক্তি জীবের ভিতর, তাহা ব্রহ্মেরই চিৎশক্তি। জীব-ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা বশতঃ। অনুভবের সাহায্যে জীবের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলে তাহার এই অবিদ্যা দূর হয় এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানে (২) মুক্তিলাভ হয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভেদে অবিদ্যা দুই প্রকার। জীবের ব্যষ্টিগত অবিদ্যা—তুলাবিদ্যা। সকল জীবের সমষ্টিগত অবিদ্যা—মূলাবিদ্যা বা মায়া। জীবের ব্যষ্টিগত অবিদ্যা বা তুলাবিদ্যা জীবভেদে নানা। সেই নিমিত্ত একজন জীবের

---

(১) অদ্বৈতবাদ এবং একেশ্বরবাদ একার্থবোধক নহে। স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা ঈশ্বর এক অদ্বিতীয়—ইহা একেশ্বরবাদ। চরম তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় এবং তাহাতে জীব ও জগৎ প্রতিষ্ঠিত, জীব ও জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই—ইহা অদ্বৈতবাদ। বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ধর্মগ্রন্থে একেশ্বরবাদ প্রচারিত এবং সেই একেশ্বরবাদ অদ্বৈতবাদ নহে—দ্বৈতবাদ।

(২) জীব-ব্রহ্মের ঐক্য অর্থে ইহা নহে যে, জীব বলিতে যত কিছু বুঝায় সেই সমস্ত সহ জীব ব্রহ্মের সহিত এক বা অভিন্ন। জীবের আধারে জীবাত্মা কারণ-সূক্ষ্ম-স্থূল এই ত্রিবিধ শরীরের দ্বারা আবৃত। পরমাত্মার বা পরব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার বা জীবের ঐক্য অর্থে ঐ ত্রিবিধ শরীর সহ জীবাত্মার ঐক্য পরমাত্মার সহিত, ইহা বুঝায় না। পরমাত্মা চৈতন্যস্বরূপ এবং জীবাত্মাও চৈতন্যস্বরূপ। কেবল এই চৈতন্যাংশে উভয়ের ঐক্য। আচার্য শঙ্কর স্পষ্ট বলিয়াছেন—ঐক্যং তয়োর্লক্ষিতয়োর্ন বাচ্যয়োঃ ; অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম লক্ষিতার্থে এক, বাচ্যার্থে নহে। [বিঃ চূঃ—২৪২]

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে মুক্তি হইলে, যুগপৎ সকল জীবের মুক্তিলাভ হয় না। মূলাবিদ্যার বা মায়ার দ্বারা অন্য জীবগণ অভিভূত থাকে। এক একটা গাছ লইয়া গাছের সমষ্টি—বন। একটা গাছ কাটিলে সমস্ত বন কাটা হয় না। সেইরূপ এক এক ব্যষ্টিগত অবিদ্যা লইয়া সমষ্টিগত মূলাবিদ্যা বা মায়া। এক ব্যষ্টিগত অবিদ্যা দূর হইলে, সমষ্টিগত মূলাবিদ্যা বা মায়া দূর হয় না। অতএব, মুক্তির উদ্দেশে প্রয়োজন, প্রত্যেক জীবের নিজ নিজ ব্যক্তিগত সাধনা। মূলাবিদ্যার বা মায়ার আশ্রয়—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আছেন বলিয়া মায়া আছে। ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় এই মায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্ম মায়াবৃত, তাই জীবের নিকট তিনি অজ্ঞাত। জীব মায়াকল্পিত জগৎ-প্রপঞ্চ লইয়া ভুলিয়া থাকে। এই মায়ার আবরণে জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি, ব্রহ্মের লীলা মাত্র। মায়াতে উপহিত ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলা হয়। এই জগৎ মায়োপহিত ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের সৃষ্টি। অদ্বৈতবাদে মায়ার স্থান প্রচুর। তাই ইহার অন্য নাম—মায়াবাদ। (৩) প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা যাইতে পারে যে,

(৩) কোন কোন সম্প্রদায় বলেন যে, জগতের মিথ্যাত্বরূপ মায়াবাদের প্রবর্তক শঙ্করাচার্য। এ কথা ঠিক নহে। মায়াবাদের উল্লেখ ঋগ্বেদে এবং মহাভারতেও আছে। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপো ঈয়তে [৬ | ৪৭ | ১৮], ইন্দ্র বা ব্রহ্ম এক হইলেও নিজ মায়ার দ্বারা বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শঙ্করাচার্যের কৃতিত্ব এই যে, ব্রহ্মের এই মায়াশক্তিকে তিনি অনির্বচনীয়া বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম সৃষ্টির অভিপ্রায়ে মায়ার বা অজ্ঞানতার দ্বারা কেন নিজে আবৃত হন ? বাস্তবিক এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সুকঠিন। যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তাহাই অনির্বচনীয়। অতএব, মায়া অনির্বচনীয়া। আচার্য শঙ্কর স্পষ্ট বলিয়াছেন—মায়ার অস্তিত্ব নাই, অনস্তিত্ব ও নাই, যুগপৎ অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব ও নাই; তাই মায়া অত্যন্ত অদ্ভুত ও অনির্বচনীয়রূপা—মহাদ্ভুতাঽনির্বচনীয়রূপা। [বিঃ চূঃ—১০৯]

আচার্য শঙ্করের মায়াবাদের অর্থ ইহা নহে যে সর্বসাধারণের কাছে এই জগৎ মিথ্যা। তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন—প্রাক্‌প্রবোধাৎ সর্বমেব সত্যং, জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হওয়া অবধি এই সব জগৎ সত্য। ব্রহ্মজ্ঞান কিছু সর্বসাধারণের হয় না। অনেক অদ্বৈত-বাদী দার্শনিক পণ্ডিত গৃহী হইয়া সংসারের সব কাজ করিতেছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য জগৎকে মিথ্যা জানিয়া ও স্বয়ং সত্যধর্ম-প্রচারের অভিপ্রায়ে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি আরো বলিয়াছেন—ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ; অর্থাৎ ধ্যান-ধারণায় অদ্বৈতভাব গ্রহণ করিবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কদাচ নহে। প্রাকৃত তমোরাজসিক জনগণ পাছে অনর্থের সৃষ্টি করে, তাই তাঁহার এই সতর্ক-বাণী।

(খ) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—শ্রীরামানুজাচার্য (১০৩৭ খ্রীঃ) কর্তৃক প্রমাণিত। তাঁহার ভাষ্যের নাম—শ্রীভাষ্য। শ্রীরামানুজাচার্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক নহেন। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতি মহাগ্রন্থে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারিত। প্রাচীন যুগে টঙ্ক, গুহদেব, নাথমুনি, শঠকদমন প্রভৃতি বৈদান্তিক মনীষিগণও এই মতবাদ সমর্থন করিয়াছিলেন। বৌধায়ন, যামনাচার্য ~~এবং শ্রীরামানুজের গুরু শ্রীযাদবপ্রকাশ ও~~ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজ বৌধায়ন-বৃত্তি অবলম্বনে এবং শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের প্রমাণে তাঁহার রচিত শ্রীভাষ্যে এই মতবাদ সুপ্রমাণিত করিয়াছেন। আচার্য শঙ্করের অনেক পরে আচার্য রামানুজের আবির্ভাব। শাঙ্করভাষ্যের শঙ্কর-সিদ্ধান্ত খণ্ডনের উদ্দেশে আচার্য রামানুজ শ্রীভাষ্যে বিপুল যত্ন করিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মতানুসারে, ব্রহ্ম বিশেষ পদার্থ-সমন্বিত (৪) এবং সেই পদার্থসমূহ ব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ, অতএব ব্রহ্মের

---

(৪) আচার্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম কেবল চিন্মাত্র।

ন্যায় সেই পদার্থসমূহ ও নিত্য। বিশ্বের চিৎ-অচিৎ পদার্থসকল সেই এক ব্রহ্মেরই প্রকার, প্রলয়কালে ব্রহ্মে তাহারা বিলীন হইলেও সম্পূর্ণ লয় প্রাপ্ত হয় না। জগৎ মায়া-কল্পিত নহে—সত্য। সৃষ্টিতত্ত্বে শ্রীরামানুজ পদার্থবাদী। তিনি তিন পদার্থের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। তিন পদার্থ—চিৎ বা জীবাত্মা, অচিৎ বা পরিদৃশ্যমান জড় জগৎ, এবং ঈশ্বর বা বিশ্বপতি শ্রীহরি। বাসুদেবই (১) পরব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম। বাসুদেব বহুকল্যাণগুণসংযুক্ত, চতুর্দশ ভুবনের কর্তা, জীবসমূহের অন্তর্যামী, সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী। তিন পদার্থই তাঁহার রূপ। চিন্ময় জীব ও জড় জগৎ তাঁহার শরীর। পরব্রহ্ম বা বাসুদেব এক—অদ্বিতীয়। তবে জীবও জগৎ মিথ্যা নহে, কেননা তাহারা তাঁহার অঙ্গস্বরূপ। এইরূপে একত্ববাদ বা অদ্বৈতবাদকে বিশেষিত করা হইয়াছে বলিয়া, এই মতবাদের নাম—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

আচার্য রামানুজ নির্গুণ ব্রহ্ম স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, ব্রহ্ম সগুণ বা সবিশেষ। বেদ যে নির্গুণ ব্রহ্মের আভাষ দিয়াছেন তাহার প্রকৃত অর্থ—ব্রহ্মে নিকৃষ্ট গুণসমূহ নাই। নিকৃষ্ট গুণ—শোক দুঃখ, নশ্বরত্ব, পরিবর্তন, বার্ধক্য ইত্যাদি। তিনি বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগ এবং অপরিবর্তনশীল। সৃষ্টির কালে এই বিশ্ব তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়কালে ইহা তাঁহাতে লীন হয়। প্রকৃতি সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণযুক্তা। কিন্তু যাহা শুদ্ধ তত্ত্ব তাহা কেবল সত্ত্বগুণযুক্ত। এই শুদ্ধ তত্ত্বের বা কেবল স্বত্ত্বগুণের দ্বারা বাসুদেবের শরীর

---

(১) বাসয়তে ইতি বাসুঃ, অর্থাৎ তিনিই বাসু যাঁহার অসীম দেহে দেব-যক্ষ-কিন্নর-মানব-পশুপক্ষী ইত্যাদি সৃষ্ট জীবগণ ও চরাচর জগৎ অধিষ্ঠিত। অথবা, তিনিই বাসু যিনি আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সৃষ্টির সর্বত্র অন্তর্যামীরূপে বাস করেন। এই বাসুই বাসুদেব। কেননা, তিনি তমোদ্বারা অনাবৃত বলিয়া শুদ্ধসত্ত্বরূপে চির ভাস্বর ও দীপ্তিমান।

গঠিত এবং ইহাই তাঁহার নিত্যবিভূতি। সৃষ্ট জগৎ তাঁহার লীলাবিভূতি।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মতে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন নহে। পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে জীবাত্মার উৎপত্তি বটে, কিন্তু জীবাত্মার সত্তা পৃথক্ এবং চিরকাল তাঁহার এই পৃথক্ সত্তা থাকে। জীবাত্মা সংখ্যায় অসংখ্য। পরমাত্মা-জীবাত্মার সম্বন্ধ অগ্নি-অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়। অগ্নি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উদ্ভব ; অগ্নি এক হইলেও অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি সংখ্যায় অনেক এবং অগ্নি হইতে তাহাদের পৃথক্ সত্তা আছে। সেইরূপ জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইলেও সংখ্যায় অনেক, এবং ব্রহ্ম হইতে তাঁহাদের পৃথক্ সত্তা আছে। জীবগণ শ্রীভগবানের অংশস্বরূপ ; কিন্তু তাঁহার চির-সেবক। শ্রীভগবানই জীবের একমাত্র উপাস্য—পরম সেব্য। আচার্য রামানুজের মতানুসারে, জীবাত্মা তিন শ্রেণীর—নিত্য, মুক্ত ও বদ্ধ। বাসুদেব নারায়ণ তাঁহার শক্তিরূপা মহালক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। নিত্য জীবাত্মাগণ কোন কালে সংসারে আবদ্ধ হন না, তাঁহারা বৈকুণ্ঠে বাসুদেবের সঙ্গে একত্র বাস করিয়া তাঁহার সেবা বা উপাসনা করেন। মুক্ত জীবাত্মাগণ পূর্বে সংসারে আবদ্ধ ছিলেন, পশ্চাৎ মুক্তিলাভ করিয়া বাসুদেব-সহ বৈকুণ্ঠে বাস করেন। বদ্ধ জীবাত্মাগণ সংসারে আবদ্ধ এবং জন্ম-মৃত্যুরূপ চক্রের আবর্তে পড়িয়া কর্মফলানুযায়ী পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহারা মুক্তির জন্য চেষ্টাপরায়ণ।

রামানুজাচার্যের মতে, জীবলোক হইতে মুক্ত হইয়া জীবাত্মার বৈকুণ্ঠলোকে বাসের নামই মুক্তি বা মোক্ষ। মুক্ত আত্মা বাসুদেবের সহিত একত্ব বা অভেদত্ব প্রাপ্ত হন না। তিনি বাসুদেবের সেবক বা সাধক হইয়া বৈকুণ্ঠ-বাসের অধিকারী হন। শ্রীরামানুজ জীবন্মুক্তি

স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে, দেহাবসানে জীবাত্মার মুক্তি হয়, ইহা বিদেহ-মুক্তি। মুক্তি কেবল জ্ঞানগম্য নহে। বাসুদেবের শরণাগতি ও তাঁহার প্রতি অব্যভিচারিণী ভক্তির সাহায্যে মুক্তিলাভ হয়। কর্ম ও জ্ঞান সেই অব্যভিচারিণী ভক্তিলাভের উপায় মাত্র। বিষয়-বাসনার পরিহারে ও আহার-বিহারের সংযমে সত্ত্বশুদ্ধি হয় এবং তখন উদয় হয় বৈরাগ্য। তীব্র বৈরাগ্য ব্যতীত ভক্তির উদ্ভব হয় না। অনন্যপরা অচলা ভক্তিই শুদ্ধাভক্তি বা অব্যভিচারিণী ভক্তি। ইহা জ্ঞানের চরম বিকাশ।

(গ) **দ্বৈতবাদ**—শ্রীমধ্বাচার্য (১) [১১৯৯ খ্রীঃ] কর্তৃক প্রমাণিত। তাঁহার ভাষ্যের নাম—মাধ্ব-ভাষ্য। আচার্য রামানুজের সহিত মধ্বাচার্যের অনেক বিষয়ে মতের ঐক্য থাকিলেও কয়েকটি বিষয়ে মতবিরোধ সুস্পষ্ট। সৃষ্টিতত্ত্বে মধ্বাচার্য সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী। তাঁহার মতে জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ এক নহে। এই দুই কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং উভয়েই অনাদি, অনন্ত ও সত্য। জগতের উপাদান কারণ—জড়া প্রকৃতি। জগতের নিমিত্ত কারণ—পুরুষোত্তম বিষ্ণু। এই নিমিত্ত এই মতবাদের নাম—দ্বৈতবাদ। মধ্বাচার্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত পূর্ণ-প্রজ্ঞ-দর্শন নামে সুপ্রসিদ্ধ। এই মতে, পঞ্চভেদ স্বীকৃত। বিষ্ণু (২) বা নারায়ণই পরব্রহ্ম বা পরম পুরুষ (৩)। তিনি জগদীশ্বর। ভেদ পাঁচ প্রকার—জীবেশ্বর-ভেদ

---

(১) শ্রীমধ্বাচার্যের সন্ন্যাস-আশ্রমের নাম, শ্রীমৎ আনন্দ তীর্থ। ইনি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত দশনামী সন্ন্যাসী।

(২) বিবেষ্টি ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণু—বিশ্বব্যাপক বলিয়া বিষ্ণু। অথবা, বিশ্ প্রবেশনে—সৃষ্টির সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া বিষ্ণু।

(৩) পূর্ণং অনেন সর্বং ইতি পুরুষ :—যাঁহার দ্বারা জীব-জগৎ পূর্ণ তিনিই পুরুষ। অথবা, পুরী শেতে ইতি পুরুষ :—যিনি সকলের অন্তরে অবস্থিত তিনিই পুরুষ।

অর্থাৎ জীব এবং ঈশ্বর বিভিন্ন, জড়েশ্বরভেদ অর্থাৎ জড় জগৎ ও ঈশ্বর বিভিন্ন, জীবে জীবে ভেদ, জড়ে জড়ে ভেদ, এবং জীবে জড়ে ভেদ। এই ভেদপঞ্চক নিত্য ও অনাদি, ইহাদের নাশ নাই।

দ্বৈতবাদ আরো বলেন যে, তত্ত্ব দ্বিবিধ—স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র। সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান বিষ্ণু—স্বতন্ত্র তত্ত্ব। জীব ও বিশ্ব—পরতন্ত্র তত্ত্ব। শ্রীভগবান বিষ্ণু অন্যের উপর নির্ভর করেন না, তাই তিনিই একমাত্র স্বতন্ত্র পদার্থ। জীব ও বিশ্ব শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করে, তাই তাহারা পরতন্ত্র পদার্থ। জীব ও বিশ্ব পরতন্ত্র হইলেও সত্য—মায়া-কল্পিত মিথ্যা নহে। শ্রীবিষ্ণু জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা। শক্তি-স্বরূপা লক্ষ্মীসহ তিনি বৈকুণ্ঠে অবস্থান করেন। তিনি নানা মূর্তিতে ও অবতাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। দ্বৈতবাদের মতে জীব অসংখ্য, এবং দুইটি জীব এক নহে। এক একটি জীব এক একটি পরমাণুর ন্যায় সকল জীব চিন্ময়, অনাদি ও অনন্ত। অন্তর্যামীরূপে শ্রীবিষ্ণু বা নারায়ণ তাহাদের নিয়ামক বা কর্মফলদাতা। শ্রীভগবান সকল প্রকার দোষ হইতে মুক্ত, কিন্তু জীব তাহা নহে। আচার্য রামানুজের মত মধ্বাচার্যও তিন শ্রেণীর জীব স্বীকার করেন—নিত্য, মুক্ত ও বদ্ধ। তিনি বলেন যে, বদ্ধ জীব আবার দুই শ্রেণীর—মুক্তির যোগ্য ও মুক্তির অযোগ্য। যাহারা মুক্তির অযোগ্য তাহাদের ভিতর আবার কতক নিত্যসংসারী ও কতক তমোযোগ্য। মুক্তির অযোগ্য নিত্যসংসারী জীব চিরকাল সংসারে আবদ্ধ. ইহলোকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে। মুক্তির অযোগ্য তমোযোগ্য জীব ঘোর'তমসাচ্ছন্ন নরকে বাস করে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ কর্তৃক জীব পরিচালিত। সাত্ত্বিক জীব স্বর্গে গমন করে, রাজসিক জীব সংসার-চক্রে ঘূর্নিত হয় এবং তামসিক জীব নরকে পতিত হয়। শ্রীভগবানের সহিত জীবের সেব্য-সেবক সম্বন্ধ।

ভ্রমবশতঃ শ্রীভগবানের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া জীব অধঃপতিত হয়। ভগবদ্ভক্তিই জীবের মুক্তির একমাত্র উপায়। জীব শ্রীভগবানের দাস, এই যথার্থ জ্ঞান ভগবৎ-প্রেমের সাহায্যে পাওয়া যায়। ভগবৎ-প্রেমের ও পরাভক্তির দ্বারা জীব জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-চক্রের আবর্ত হইতে মুক্তিলাভ করে, এবং বিষ্ণুলোকে শ্রীবিষ্ণুর সহিত একত্র বাসে তাঁহার সাক্ষাৎ সেবার অধিকারী হয়। ইহাই জীবের মোক্ষ বা মুক্তি। শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা ত্রিবিধ—অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন। অঙ্কনের অর্থ, তাঁহার চিহ্ন অঙ্গে ধারণ; নামকরণের অর্থ, পুত্রকন্যাগণকে তাঁহার নামে নামযুক্ত করা; ভজনের অর্থ, তাঁহার স্তুতিগান। এই ত্রিবিধ উপাসনায় শ্রীভগবান প্রসন্ন হন এবং তাঁহার অনুগ্রহ লাভ হয়। শ্রীমধ্বাচার্য শ্রীভগবানের নাম-স্মরণের অভ্যাস করিতে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন। এই অভ্যাস আয়ত্ত হইলে মরণকালে সহজে তাঁহার নাম স্মরণ হয়, নচেৎ হয় না।

(ঘ) **দ্বৈতাদ্বৈতবাদ**—ইহার অন্য নাম, ভেদাভেদবাদ। শ্রীনিম্বার্কাচার্য (১) এই মতবাদের বিশিষ্ট প্রচারক। তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক নহেন। তাঁহার পূর্বে ঋষিপ্রবর ঔড়ুলোমি তদ্-বিরচিত বেদান্তদর্শন-বৃত্তিতে এই মতের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সেই বৃত্তি অবলম্বনে আচার্য নিম্বার্ক বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ নামক ভাষ্যে ঐ মতের সমর্থন করেন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মতানুসারে, ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ এই দুই ভাব সর্বশ্রুতিসিদ্ধ। সগুণ ব্রহ্মরূপে তিনি জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা। তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের কোন উপাদান কারণ নাই, তাই তাঁহার

(১) ইনি খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন; তাহা শ্রীরামানুজাচার্য ও শ্রীমধ্বাচার্যের মধ্যবর্তী কাল।

সহিত জগতের অভেদ সম্বন্ধ। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মরূপে তিনি জগতের অতীত এবং জগৎ হইতে ভিন্ন। সগুণরূপে তিনি জীবের অন্তর্যামী, সেই কারণ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন ; আর নির্গুণরূপে তিনি জীবের উর্ধে, সেই কারণ জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের এই ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ যুগপৎ বিদ্যমান থাকায়, এই মতবাদের নাম—ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। আচার্য নিম্বার্ক সৃষ্টিতত্ত্বে পরিণামবাদী। তাঁহার মতে, ব্রহ্ম-শক্তির সাহায্যে ব্রহ্মই তাঁহার ভিতর হইতে জগৎকে প্রকাশিত করেন। ব্রহ্ম যেমন সত্য, তেমনি ব্রহ্মের জগৎরূপে প্রকাশ বা পরিণাম ও সত্য। অতএব, তাঁহার পরিণামভূত এই জগৎ মিথ্যা নহে—সত্য। তবে জগৎ স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে এবং ব্রহ্মকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, এই অর্থে ইহা অসত্য। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের মতে, তিনটি প্রধান তত্ত্ব—অপ্রাকৃত, প্রকৃতি ও কাল। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে যাহা উদ্ভূত নহে, তাহা অপ্রাকৃত। শ্রীভগবানের নিত্যবিভূতির আধার-স্বরূপ যে শরীর, তাহা অপ্রাকৃত। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানাত্মক কাল সম্পর্কে কিছু বলা দরকার হয় না। এই তিনটি প্রধান তত্ত্ব অনাদি ও অনন্ত।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলেন যে, জীবাত্মা পরমাত্মার বা পরব্রহ্মের অংশ মাত্র এবং চৈতন্যাংশে উভয়ের অভেদ সম্বন্ধ। কিন্তু জীবাত্মা নাম-রূপে পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় ও প্রাকৃত শরীর গ্রহণ করায় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। যেমন, অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ, সেই নিমিত্ত অগ্নি হইতে অভিন্ন ; কিন্তু প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গের বিশেষ বিশেষ রূপ থাকায় এই স্ফুলিঙ্গগুলি অগ্নি হইতে বিভিন্ন। জীবাত্মা অণু-পরিমাণ। ইনিই কর্তা ও ভোক্তা। আত্মা দেহ হইতে পৃথক্। দেহ জন্ম-মৃত্যুর অধীন, কিন্তু আত্মা তাহা নহে। জীবাত্মা অসংখ্য, অনাদি

ও অনন্ত। ঈশ্বরই তাঁহাদের শাসক-নিয়ামক-পালক। জীব দুই শ্রেণীর—মুক্ত ও বদ্ধ। যে সকল জীব অন্তর্যামী ও সর্বব্যাপক আত্মার জ্ঞানলাভ করিয়াছে এব উপলব্ধি করিয়াছে যে, জগৎপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন নহে, তাহারা মুক্ত। যাহাদের সেই জ্ঞান ও উপলব্ধি হয় নাই, তাহারা বদ্ধ।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ আরো বলেন যে, ভক্তির সাহায্যে মুক্তি বা মোক্ষ লভ্য। সর্বব্যাপক পরব্রহ্মের সত্য সত্তার অনুভূতিই প্রকৃত জ্ঞান। শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণই প্রকৃত ভক্তি। মুক্ত অবস্থায়ও ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার ভেদাভেদ সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। মুক্ত জীব উপলব্ধি করেন যে, তিনি ব্রহ্মের অংশস্বরূপ এবং সেই জন্য তিনি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এই উপলব্ধির ফলে তাঁহাকে আর জন্মমৃত্যুরূপ সংসারচক্রের আবর্তে পড়িতে হয় না। কিন্তু ব্রহ্মের ন্যায় জগতের সৃষ্টি-পালন-সংহারের শক্তি মুক্ত জীবের লাভ হয় না। শ্রীভগবানের প্রসাদ উপভোগ করিতে মুক্ত জীবের ব্যষ্টিগত সত্তা বিদ্যমান থাকে। ভক্তের সম্পূর্ণ শরণাগতিতে শ্রীভগবান প্রসন্ন হইয়া ভক্তের অবিদ্যা-অন্ধকার দূর করেন এবং তখন ভক্তের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। শ্রীনারায়ণ ও মহালক্ষ্মীর স্থলে শ্রীকৃষ্ণ (১) ও রাধাকে যুগলরূপে আচার্য নিম্বার্ক গ্রহণ করিয়াছেন। গোপীপ্রধানা রাধা নহে—শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তিরূপিনী রাধা।

(১) মহাপ্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টির সংহার হইলে একমাত্র পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম বিদ্যমান থাকেন। তিনিই তমোপ্রভাবে মহাপ্রলয় ঘটান। তাঁহার এই তমোময় মূর্তিই কৃষ্ণ। মহাভারত এই কথাই বলিয়াছেন—

কৃষির্ভূবাচকো শব্দঃ নি তু নির্বিত্তি বাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধিয়তে।

(ঙ) শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—ইহার অপর নাম, ব্রহ্মবাদ। শ্রীবল্লভাচার্য (১৪০১ খৃীঃ) ব্রহ্মসূত্রের অনুভাষ্য রচনান্তে এই মতবাদ প্রচার করেন। তিনি ঠিক শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক নহেন। তাঁহার পূর্বে বেদভাষ্যকার শ্রীমৎ বিষ্ণুস্বামীই শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক। শ্রীবল্লভাচার্য এই মতবাদের প্রসার করেন। তিনি মায়া স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, জীব ও জগৎ মায়াকল্পিত মিথ্যা নহে। তাহারা সত্য এবং ব্রহ্মের স্বস্বরূপ। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ব্রহ্মেরই স্বস্বরূপ। ব্রহ্মাতিরিক্ত মায়ার অবতারণা যে মতবাদে, তাহা শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ নহে। সেই হেতু শ্রীবল্লভাচার্যের মায়া-বিহীন মতবাদের নাম—শুদ্ধাদ্বৈতবাদ।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদের মতানুসারে, নির্গুণ ব্রহ্ম নাই—আছেন এক সগুণ ব্রহ্ম। তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, এক, অদ্বিতীয়, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান পুরুষ। তিনি যখন জ্ঞান-কর্ম-যুক্ত হইয়া সৃষ্টি রচনা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধারণ করেন। এই বিশ্ব তাঁহার সঙ্কল্পজাত বা ইচ্ছাশক্তিপ্রসূত এবং তিনিই বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। শ্রুতি-কথিত নির্গুণ ব্রহ্মের প্রকৃত অর্থ এই যে, জীবের ন্যায় সাধারণ গুণ ব্রহ্মে নাই। তাঁহার ভক্তগণের প্রতি কৃপাবশতঃ তিনি নানা রূপে অবতীর্ণ হন। জীব শ্রীভগবানের অংশস্বরূপ ও অণুপরিমাণ এবং তাঁহার দাস। জীব এবং জগৎ নিত্য ও সত্য—মিথ্যা নহে। তবে সংসার মিথ্যা। অবিদ্যাবশতঃ জীব আপনাকে শ্রীভগবান হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র মনে করে। ইহা তাহার অহংবুদ্ধি। এই অবিদ্যাজনিত অহংবুদ্ধির বশে জীব নিজের সত্য দিব্য আনন্দময় স্বরূপত্ব বিস্মৃত হইয়া জগৎপ্রপঞ্চে মগ্ন হয় ও মিথ্যা সংসারের দুঃখাবর্তে পড়িয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলে। জীব যেন নিজের

জালে নিজে বদ্ধ হয়। জীব তিন শ্রেণীর—শুদ্ধ, সংসারী ও মুক্ত। শুদ্ধ জীবকে অবিদ্যাজাত অহংবুদ্ধি স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহার দিব্য ভাব ও ঐশ্বর্য অব্যাহত থাকে। সংসারী জীব অবিদ্যাবশতঃ অহংবুদ্ধিতে সংসার-জালে আবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়। মুক্ত জীব বিদ্যার সাহায্যে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য ভাব ও ঐশ্বর্য পুনরায় লাভ করেন এবং শ্রীভগবান বা ব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ করেন।

বল্লভাচার্যের মতে, অশুভ কর্মের ফলে জীবাত্মা দুর্বল হন। জীবাত্মার পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানের কৃপা অত্যাবশ্যক। এই নিমিত্ত ভগবৎ-কৃপা-লাভের উপায়কে পুষ্টিমার্গ কহে। পুষ্টিমার্গে যে ভক্তি লাভ হয়, তাহা প্রেমা ভক্তি। মুক্তির জন্য প্রয়োজন—প্রীতিবশে শ্রীভগবানের চরণে আত্মনিবেদন। কেবল জ্ঞানের বা কেবল ভক্তির দ্বারা মুক্তি লাভ হয় না। মুক্তিসম্বন্ধে বল্লভাচার্য বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সাযুজ্যরূপ মুক্তি শ্রেষ্ঠ নহে—নিত্য বৃন্দাবনে অনন্তকাল শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের দাস হইয়া তাঁহার সেবাই শ্রেষ্ঠ মুক্তি। ব্রজ-বৃন্দাবনে গোপ-গোপীসহ শ্রীকৃষ্ণের লীলার ন্যায় গোলকস্থ নিত্য বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সূক্ষ্ম লীলা অনন্তকাল চলিতেছে। সেই লীলার পরমানন্দ উপভোগের অভিপ্রায়ে গোপীগণের প্রেমভাবে তন্ময় হইয়া শ্রীভগবানের সেবাই মোক্ষ। বল্লভাচার্য বাল-গোপালের উপাসক।

(চ) **অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ**—এই মতবাদের প্রবর্তক প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য বা শ্রীগৌরাঙ্গ (১৪৮৬ খ্রীঃ)। তাঁহার বিশেষত্ব এই যে, তিনি অন্যান্য মনীষী বৈদান্তিক আচার্যের মত স্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রহ্মসূত্রের কোন ভাষ্য প্রণয়ন করেন নাই। তাঁহার

মতানুসারে, বিষ্ণুভাগবত বা শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য। তাঁহার মতবাদের শ্রেষ্ঠ প্রচারক শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী এবং বৈষ্ণবাচার্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ। শ্রীচৈতন্যদেবের বেদান্ত-সিদ্ধান্ত শ্রীজীব গোস্বামীর কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভটীকায় ষট্‌সন্দর্ভে সন্নিবেশিত। পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একখানা স্বতন্ত্র ব্রহ্মসূত্র-ভায্যের অভাব অনুভূত হয়। তাই, আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের সমর্থনে বেদান্তদর্শনের এক ভাষ্য রচনা করেন। তাহা বলদেবভাষ্য বা গোবিন্দভাষ্য নামে সুপরিচিত। এই মতে, জীব ও জগৎ ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, যদ্যপি তাহারা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন। ঈশ্বরের সহিত জীব-জগতের এই যে ভেদাভেদ সম্বন্ধ, ইহা বাস্তবিক চিন্তার অতীত। সেই কারণ, এই মতবাদের নাম—অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ। (১) নিম্বর্কাচার্যের ভেদাভেদ মতবাদ হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ পৃথক্।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ বলেন যে, বিষ্ণুই পরম তত্ত্ব বা ব্রহ্ম। তিনি এক, অদ্বিতীয় ও সচ্চিদানন্দময়। তিনি ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার অতীত বলিয়া নিগুর্ণ। আর তাঁহাতে সর্বব্যাপকত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ইত্যাদি গুণ থাকায় তিনি সগুণ। তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। তাঁহার পরাশক্তির প্রভাবে তিনি নিমিত্ত কারণ, আর অপরাশক্তি বা আদ্যাশক্তির প্রভাবে তিনি উপাদান কারণ। তিনি অসংখ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার প্রধান রূপ—শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অন্তর্যামী-

---

(১) এই মতে, শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম বা পরম পুরুষ। তাঁহার স্বভাবতঃ কতকগুলি শক্তি আছে। সেই শক্তিগুলির কার্য বোধাতীত ও চিন্তাতীত। সে জন্যও এই মতবাদের নাম—অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ।

রূপে জীবের নিয়ামক ও শাসক। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি—রাধা। পরব্রহ্ম সূক্ষ্ম। তিনি শ্রীভগবানের রূপে বিশ্ব সৃষ্টি করেন। জগৎ সত্য। ব্রহ্মে ও বিশ্বে প্রভেদ ও সত্য। জীব সত্য, নিত্য, শ্রীকৃষ্ণের দাস এবং অণুচৈতন্যবিশেষ। অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ আরো বলেন যে, সূর্যের আলোকদানের শক্তি এবং অগ্নির তাপদানের শক্তি যেমন স্বাভাবিক, তেমনি শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের কতকগুলি স্বাভাবিক শক্তি আছে। শক্তি ত্রিবিধ—চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিৎশক্তি অন্তরঙ্গ, জীবশক্তি তটস্থ এবং মায়াশক্তি বহিরঙ্গ। চিৎশক্তির সাহায্যে বৈকুণ্ঠের সৃষ্টি। বৈকুণ্ঠে শুদ্ধ সত্ত্বভাব। সেখানে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া প্রবেশ করিতে পারে না এবং মহাকাল ও সংহার-শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে না। জীবশক্তির সাহায্যে জীবের সৃষ্টি এবং মায়াশক্তির বা প্রকৃতির সাহায্যে জগতের সৃষ্টি। এই শক্তিত্রয়ের স্বাধীন সত্তা নাই। তাহারা শ্রীভগবানের অধীন। শ্রীভগবান এবং তাঁহার শক্তিত্রয় ভিন্ন ও অভিন্ন। শ্রীভগবানের দৃষ্টিমাত্রে মায়াশক্তি সক্রিয় হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। এই মতবাদে, জীবাত্মা চৈতন্যাংশে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ, অতএব অভিন্ন; কিন্তু মায়াধীন ও পশুর স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় শ্রীভগবান হইতে ভিন্ন। মায়ামুগ্ধ জীব অজ্ঞানান্ধকারে তাহার স্বীয় দিব্যভাব উপলব্ধি করিতে পারে না এবং ভগবদ্-জ্ঞানে বঞ্চিত হয়। এই নিমিত্ত জীব সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়। কৃষ্ণ-প্রেমের সাধনাই মুক্তির প্রশস্ত পথ। ভক্তির দ্বারা মায়া দূরীভূত হয়, কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয়। মুক্তি ভক্তির দাসী। ভগবৎ-প্রেমে বিভোর হইলে বিষয়াসক্তি থাকে না, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা ভক্তের প্রাণে জাগিয়া উঠে এবং পরিশেষে সেই মিলন সাধিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে

সঙ্কীর্তনকেই কৃষ্ণ-প্রেম-লাভের মুখ্য উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণনাম-কীর্তনে কৃষ্ণ-প্রেম অবশ্যম্ভাবী।

সাংখ্য-যোগ-ন্যায়-বৈশেষিক-উত্তরমীমাংসা-বেদান্তদর্শন এই ষড়্‌দর্শন এবং বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন মতবাদ হইতে বিভিন্ন হিন্দুসম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং তাহাদের ভিতর সাম্প্রদায়িক কলহের সূচনা। অনেক সময় বিবদমান সাম্প্রদায়িক আচার্যগণের পরস্পর খণ্ডন-মণ্ডন-মূলক তর্ক-বিতর্কের গোলকধাঁধায় পড়িয়া সাধারণ হিন্দু যেন দিশাহারা হইয়া যায়। তাই, কেহ কেহ মনে করেন—দার্শনিক মতবাদসমূহের মূলে কোন সত্য নাই, সত্য থাকিলে তাহারা বিভিন্ন হইতে পারিত না; সত্য তত্ত্ব এক, কাজেই একই সত্যের দ্রষ্টা ঋষিগণের ভিতর মতানৈক্যের অবসর থাকে না। এই ধারণা ভ্রান্ত। রুচিবৈচিত্র্যহেতু সরল বক্র নানা পথ, কিন্তু গম্যস্থল এক। (১) মূলতঃ সত্য এক বটে, কিন্তু সত্য-দর্শনের প্রণালীভেদ আছে। সেই এক সত্যের দর্শনাভিপ্রায়ে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ বিচারবুদ্ধির সাহায্যে রুচিবৈচিত্র্য হেতু ভিন্ন ভিন্ন পথ দেখাইয়াছেন। (২) দর্শনশাস্ত্রগুলির প্রধান উদ্দেশ্য—তত্ত্বান্বেষীর বুদ্ধি-বিকাশ। সকল তত্ত্বান্বেষী এক রুচিসম্পন্ন নহে, তাই বিভিন্ন রুচির তত্ত্বান্বেষীর বুদ্ধি-বিকাশের অভিপ্রায়ে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্র। তারপর, সত্য এক হইলেও সর্বতোমুখী।

ষড়্‌দর্শন একই সত্যের অভিমুখী ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র

---

(১) রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥
—পুষ্পদন্ত, শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্।

(২) শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা—যত মত তত পথ।

যে ঋষি সত্যের যে মুখটি মানসনেত্রে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি তাহাই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই ভাবে বুঝিলে সাম্প্রদায়িক কলহের স্থান থাকে না। (৩)

সাংখ্য-যোগ-ন্যায়-বৈশেষিক-উত্তরমীমাংসা-বেদান্তদর্শন এই ছয়টি আস্তিক্য-দর্শন। তাই, এই ষড়্‌দর্শন হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ বলিয়া গণ্য। এই ছয়টি ব্যতীত আর এক দর্শন আছে, তাহা নাস্তিক-পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ বলিয়া গণ্য নহে। তাহার নাম—চার্বাক-দর্শন।

নাস্তিক্যবাদ ও চার্বাক-দর্শন

আস্তিক্য-নাস্তিক্য-সম্বন্ধে হিন্দুধর্মের ধারণা কিছু স্বতন্ত্র। অন্য ধর্মে সাধারণতঃ ঈশ্বর-বিশ্বাসকে আস্তিক্য-বুদ্ধি বলা হয়। হিন্দুধর্ম ঠিক তাহা বলেন না। হিন্দুশাস্ত্রের কথা—শ্রৌতে স্মার্তে চ বিশ্বাসো যং তদাস্তিক্যমুচ্যতে, শ্রুতি-স্মৃতিতে বিশ্বাসকে আস্তিক্য বলে। জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তারূপী ঈশ্বর না মানিলেই যে নাস্তিক, তাহা নহে। যাহারা বেদ ও বেদানুগামী শাস্ত্রসিদ্ধান্ত না মানে, তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক। ষড়্‌দর্শনের ভিতর সাংখ্য ও পূর্বমীমাংসা ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। তথাপি তাঁহারা নাস্তিক নহেন, কেননা তাঁহারা বেদ-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যপক্ষে, শ্রীবুদ্ধ হিন্দুর দশাবতারের অন্যতম এবং পূজ্য। তত্রাচ বৌদ্ধবাদ নাস্তিক-পর্যায়ভুক্ত, কেননা বৌদ্ধবাদ বেদ-সিদ্ধান্ত মানেন নাই। সেইরূপ চার্বাক-দর্শন ও বেদ-সিদ্ধান্ত না মানায় নাস্তিক-পর্যায়ভুক্ত। বেদের মূল সিদ্ধান্ত—আত্মা নিত্য, সত্য, শাশ্বত বস্তু এবং

---

(৩) ষড়্‌দর্শনানি মমাঙ্গানি পাদৌ কুক্ষিকরৌ শিরঃ।
তেষু-ভেদং হি যঃ কুর্য্যান্মমাঙ্গচ্ছেদ এব হি ॥
—মহাদেবের উক্তি, কুলার্ণব তন্ত্র।

তাহা নশ্বর জড় দেহ হইতে ভিন্ন। (৪) এই আত্মা-বাদই বৈদিক ধর্মের বা হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব। নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য ও মীমাংসক নিত্য সৎস্বরূপ আত্মায় বিশ্বাসী, অতএব তাঁহারা নাস্তিক নহেন। অপরপক্ষে, বৌদ্ধমতবাদ ও চার্বাকমতবাদ দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, অতএব তাঁহারা নাস্তিক-পর্যায়ভুক্ত।

চার্বাক-দর্শনের প্রবর্তক—ঋষি বৃহস্পতি। তাই, চার্বাক-দর্শনের অন্য নাম—বার্হস্পত্য-সূত্র। ঋগ্বেদে বৃহস্পতি নামে দুইজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। একজন অঙ্গিরাকুলোদ্ভব আঙ্গিরস বৃহস্পতি, অন্য জন লোক্য বৃহস্পতি (৫)। আঙ্গিরস বৃহস্পতি ছিলেন দেবগুরু। তিনি চার্বাক-দর্শন প্রবর্তন করেন নাই। লোক্য বৃহস্পতিই চার্বাক-দর্শনের প্রবর্তক। চার্বাক মতবাদকে লোকায়ত মতবাদও বলা হয়। প্রবাদ—চার্বাক এক রাক্ষসের নাম; লোক্য বৃহস্পতি তাঁহার নাস্তিক্যবাদ প্রথমে ঐ রাক্ষস চার্বাককে কহেন এবং চার্বাক এই মতবাদ জগতে প্রচার করেন; তাই নাম, চার্বাক-দর্শন। চার্বাক-দর্শন সম্পূর্ণ জড়বাদী। এই মতে, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অন্য কোন প্রমাণ নাই। যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহা সত্য, যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে তাহা মিথ্যা। চার্বাক-দর্শনের মতানুসারে —পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু এই চারি মহাভূতের মিলনে দেহ এবং দেহ হইতে চৈতন্য উৎপন্ন। বার্হস্পত্যসূত্র বলেন—চৈতন্য-বিশিষ্ট কায়ঃ পুরুষঃ, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই পুরুষ; অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন নহে। দেহাতিরিক্ত চৈতন্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই, কারণ তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। চৈতন্য দেহ হইতে

(৪) বৃঃ উঃ—৩।১।১৮

(৫) আঙ্গিরস বৃহস্পতি ১০।৭২ সূক্তের এবং লোক্য বৃহস্পতি ১০।৭১ সূক্তের দ্রষ্টা।

উৎপন্ন এবং দেহের নাশেই উহার বিনাশ। দেহনাশের পর জীবের আর কিছু থাকে না। পরলোক নাই, ইহলোকই সর্বস্ব। জন্মান্তর নাই, সংসার নাই, বন্ধন নাই এবং মুক্তিও নাই। তাই, বার্হস্পত্য বা লোকায়ত মতবাদের সার কথা—যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ। ইহা খাটী জড়বাদ। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬) বিশেষভাবে এই বার্হস্পত্য মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলেন যে, দেব-বিরোধী অসুরগণের ধ্বংসের অভিপ্রায়ে লোক্য বৃহস্পতি তাহাদের মাঝে এই বেদ-বিরুদ্ধ অবিদ্যারূপী লোকায়ত মতবাদ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। সে যাহাই হোক এ কথা সুস্পষ্ট যে, বৈদিক যুগেও ঋষিগণের ভিতর মত-বিরোধ ছিল এবং জড়বাদের সূচনা সেই যুগ হইতে।

---

(৬) ছাঃ উঃ—৮।২

চতুর্থ অধ্যায়।

হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব।

প্রত্যেক ধর্মের কতকগুলি মূল তত্ত্ব আছে। সেই মূল তত্ত্বগুলি, সেই ধর্মের প্রাণ। যিনি যে ধর্মই অনুসরণ করুন না কেন, সেই ধর্মের মূল তত্ত্বগুলির উপর তাঁহাকে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। ইস্‌লামের ছয়টি মূল তত্ত্ব—ঈশ্বর, ঈশ্বরের প্রেরিত গ্রন্থ, ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ, দেবদূতগণ, শেষদিনের বিচার এবং দৈব বিধান। এইগুলিকে বলা হয়—ইমান্। ইমানের অর্থ, প্রত্যয় বা বিশ্বাস। ইস্‌লামের মতে, যাহার ইমান্ নাই, সে বে-ইমান্ বা অবিশ্বাসী এবং সে মুসলমান নহে। সেই নিমিত্ত প্রত্যেক মুসলমানকে ইস্‌লামের ঐ ছয় মূল তত্ত্বকে বিশ্বাস করিতে হয়। খ্রীষ্টীয় ধর্মেরও প্রধানতঃ চারি মূল তত্ত্ব—পিতৃরূপী ঈশ্বর (God the Father), পুত্ররূপী ঈশ্বর (God the Son), ও পরমেশ্বর (God the Absolute) এই ত্রয়ী (Trinity) এবং বিচারের দিন (Day of Judgment)। সকল খ্রীষ্টপন্থীকে ঐ মূল তত্ত্বগুলি বিশ্বাস করিতে হয়। যে বিশ্বাস করে না, সে খ্রীষ্টীয়ান নহে। সেই রকম হিন্দুধর্মেরও কতকগুলি মূল তত্ত্ব আছে, যাহা প্রত্যেক হিন্দুকেই বিশ্বাস করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং নানাশাখাবিশিষ্ট। সেই কারণ, হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্ব জটিল ও বিপুল। এখানে খুব সংক্ষেপে মাত্র ছয়টি প্রধান মূল তত্ত্বের আলোচনা করা যাইতে পারে। এইগুলি হিন্দুমাত্রেরই বিশ্বাস করা

হিন্দুধর্মের ছয় প্রধান মূল তত্ত্ব

কর্তব্য। ছয় তত্ত্ব— (১) ব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডবাদ, (২) অধ্যাত্মবাদ, (৩) কর্মবাদ, (৪) জন্মান্তরবাদ, (৫) মুক্তিবাদ এবং (৬) ত্যাগবাদ। এই ছয় মূল তত্ত্ব ঠিক মতবাদ (Doctrine) নহে। পাশ্চাত্য মনীষিগণ এইগুলিকে দার্শনিক পণ্ডিতগণের কল্পনাপ্রসূত মনে করিয়া মতবাদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, এইগুলি তাহা নহে। এইগুলি অলৌকিক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বৈদিক ঋষিগণের সত্য বাণী। যুগে যুগে মতবাদের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু এই ছয় তত্ত্বের পরিবর্তন ঘটে না। তাহারা সনাতন সত্য।

[এক]

ব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডবাদ।

'বৃংহ্' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় যোগে 'ব্রহ্মন্' পদ নিষ্পন্ন। বৃংহ ধাতুর অর্থ, বৃদ্ধি। বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম—যদপেক্ষা বৃহৎ ও ব্যাপক আর কোনো বস্তু নাই, তিনিই ব্রহ্ম। ইহা ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। ব্রহ্ম শব্দের আর এক অর্থ—বৃংহণত্বাৎ ব্রহ্ম যিনি স্বকীয় মায়ার দ্বারা নিখিল জগতের বৃদ্ধি বা প্রসার করেন তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিষয়ে উপনিষদ্ই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষাদি অন্যান্য প্রমাণের সাহায্যে ব্রহ্মবিষয়ের জ্ঞান লাভ হয় না, যেহেতু তিনি প্রত্যক্ষাদির বিষয়ীভূত নহেন। এই নিমিত্ত ব্রহ্মকে বলা হইয়াছে—ঔপনিষদ্ পুরুষ। অবশ্য তাহার দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, উপনিষদ্ ব্যতীত বেদের অপরাংশে ব্রহ্ম-প্রতিপাদক কথা নাই। বেদের সংহিতাভাগে ব্রহ্মসম্বন্ধে অনেক মন্ত্র আছে। প্রাচীনতম ঋগ্বেদসংহিতায় ইহা সুস্পষ্ট। ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্রে (১) যে 'তৎ' শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা

ব্রহ্মের অর্থ ও প্রমাণ

(১) ঋক—৩।৬২।১০

ব্রহ্মবাচক। ঋকমন্ত্রে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে—বেদ-প্রতিপাদিত, নাশরহিত, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বব্যাপক ব্রহ্মে পৃথিবী-সূর্যাদি লোক-লোকান্তর আধেয়রূপে স্থিত। (২) সংহিতার ব্রহ্মবাদ উপনিষদে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত ও প্রতিপন্ন। অতএব, ব্রহ্মকে বলা যাইতে পারে—বেদ-পুরুষ। ব্রহ্মের দুই ভাব—নির্বিশেষ ও সবিশেষ।

ব্রহ্মের দুই ভাব

নির্বিশেষ ভাবকে পরব্রহ্ম, নির্গুণ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ইত্যাদি বলা হয়। সবিশেষ ভাবকে সগুণ ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, মহেশ্বর, ঈশ্বর, ঈশান, ভগবান ইত্যাদি বলা হয়। যখন ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণের অতীত, তখন তাঁহার নির্বিশেষ ভাব। যখন তিনি ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির সাহায্যে সক্রিয় হইয়া জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করেন, তখন তাঁহার সবিশেষ ভাব বা জগতের সহিত মিলিতভাব। ব্রহ্মের নির্বিশেষভাবই তাঁহার স্বরূপে অবস্থান।

নির্বিশেষ ভাবে ব্রহ্মের যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা স্বরূপ লক্ষণ। তাঁহার এই লক্ষণগুলি চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনশীল। ব্রহ্মের

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ—বিশ্বানুগতা ও বিশ্বাতীগতা

স্বরূপ লক্ষণ—তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ (৩); অথবা, তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ। ব্রহ্মের সবিশেষভাবে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা তটস্থ লক্ষণ। এই লক্ষণগুলি অস্থায়ী ও পরিবর্তন-

(২) ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।—ঋক, ১।১৬৪।৩৯

(৩) সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।—তৈঃ উঃ, ২।১।৩

জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় বলিলে দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব ধরিয়া লইতে হয়। ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, সেই কারণ তিনি জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় হইতে পারেন না। অতএব তিনি জ্ঞানস্বরূপ বা অনুভবস্বরূপ।

শীল। ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ—তিনি জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা। (৪) তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্ম শুধু জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা নহেন; তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন। (৫) কিন্তু জগতে তিনি অনুপ্রবিষ্ট বলিয়া নিঃশেষিত হন না। তিনি যখন সবিশেষ ভাবে জগতে অনুপ্রবিষ্ট, তখন তিনি—বিশ্বানুগ। আর যখন তিনি নির্বিশেষ ভাবে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকেন না, তখন তিনি—বিশ্বাতীগ। তাঁহার একাংশে জগৎ ব্যাপ্ত (৬) এবং সেই অংশে তিনি বিশ্বানুগ বা বিশ্বব্যাপক। জগতের অতীতরূপে শুদ্ধ-মুক্ত-অনাবৃত স্বভাবে তাঁহার অবশিষ্ট অংশ অবস্থিত এবং সেই অংশে তিনি বিশ্বাতীগ বা বিশ্বাতীত। বস্তুতঃ ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড ও নিষ্কল—তাঁহার অংশ নাই। কেবল আমাদের বুঝিতে সুবিধার জন্য অংশচ্ছলে শ্রুতির উপদেশ। বিশ্বানুগ অবস্থায় অন্তর্যামীরূপে তিনি বিশ্বের শাসক ও নিয়ামক। নির্বিশেষ বা নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রকাশ করা যায় না বলিয়া শ্রুতি অনেক ক্ষেত্রে নেতিবোধক শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তিনি ইহা নহেন, তিনি

(৪) যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।—তৈঃ উঃ, ৩।১

(৫) তৎ সৃষ্ট্বা। তদেবানুপ্রাবিশৎ।—তৈঃ উঃ, ২।৬

এই অনুপ্রবেশের অর্থ ইহা নহে যে, তিনি জগতের বাহিরে কোন স্থান হইতে আসিয়া জগতে প্রবেশ করিলেন। ইহার তাৎপর্য—গৃহনির্মাণের পূর্বে যে স্থানে আকাশ ছিল, গৃহনির্মাণের পরও সেই স্থানে আকাশ থাকে, তবে তখন গৃহের ভিতর আকাশ অনুপ্রবিষ্ট। আকাশের ন্যায় ব্রহ্ম সর্বত্র বর্তমান, জগতের সৃষ্টির পর তাঁহার অনুপ্রবেশ গৃহের মধ্যে আকাশের অনুপ্রবেশের মত।

(৬) পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।—ঋক, ১০।৯০।৩; গীঃ, ১০।৪২

তাহা নহেন, ইত্যাদি। যথা—তিনি শব্দবিহীন, স্পর্শবিহীন, রূপবিহীন, রসবিহীন, গন্ধবিহীন (১) ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রুতির প্রতিপাদ্য সগুণ ব্রহ্ম অথবা নির্গুণ ব্রহ্ম, এই বিষয়ে আর্যঋষিগণের ভিতর মতবিরোধ থাকিলেও সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম মূলে যে একই বস্তু, তাহাতে কোন মতভেদ নাই। উপনিষদে নির্গুণ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক মন্ত্র এবং সগুণ-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক মন্ত্র মিশ্রিতভাবে আছে। এমন কি, একই উপনিষদ্-মন্ত্রের কতকাংশ নির্গুণ-প্রতিপাদক এবং কতকাংশ সগুণ-প্রতিপাদক। ইহার কারণ পরিস্ফুট। নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম মূলতঃ অভিন্ন। কেবল আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য ব্রহ্মের এই দুই ভাবকে পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করা হয়।

নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম মূলতঃ এক বস্তু

ব্রহ্ম যখন বিশ্বব্যাপক বা বিশ্বানুগ, তখনো তিনি বিশ্বাতীত বা বিশ্বাতীগ। তাঁহার এই বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতীগ ভাবদ্বয় যুগপৎ বিদ্যমান। ব্রহ্মের এই দুই ভাবে অবস্থিতি কেবল উপনিষদের মন্ত্রেই যে আছে, তাহা নহে। বেদ-সংহিতায়ও এই তত্ত্ব সুস্পষ্ট। ঋকমন্ত্র স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন—ব্রহ্ম বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপক হইয়া পঞ্চ স্থূল ভূতের ও পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের দ্বারা গঠিত জগৎকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন। (২) ইহাই ব্রহ্মের যুগপৎ বিশ্বানুগতা ও বিশ্বাতীগতা। ঋক-মন্ত্র আরো বলিতেছেন—চর্মচক্ষুতে যেমন আকাশকে দেখা যায়, জ্ঞানিগণ তেমনি দিব্য চক্ষুতে সর্বব্যাপক

(১) অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।—কঃ উঃ, ১।৩।১৫; বৃঃ উঃ, ৩।৮।৮

(২) স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।

—ঋক, ১০।৯০।১

পরমাত্মার বা ব্রহ্মের সেই পরম পদ দর্শন করেন। (১) এখানে ব্রহ্মের নির্বিশেষ ভাবে স্বরূপে অবস্থানই তাঁহার পরম পদ বা শ্রেষ্ঠ অবস্থান।

তুরীয় ব্রহ্ম, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট—এই চারিটি ব্রহ্মের চারি রূপ বা অবস্থা। জগতের অতীত নিত্য, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার,

ব্রহ্মের রূপচতুষ্টয় এবং কারণ-ব্রহ্ম ও কার্য-ব্রহ্ম

শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-অনাবৃত স্বভাবে অবস্থিত, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, নির্গুণ ব্রহ্ম—পরব্রহ্ম বা তুরীয় ব্রহ্ম। সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম যখন ব্রহ্ম-শক্তি বা মায়া সমাগমে আমি বহু হইব ও সৃজন করিব এই ইচ্ছাযুক্ত হন, তখন তিনি—মায়াধীশ ঈশ্বর। এই অবস্থায় তিনি মায়াযুক্ত হইলেও মায়ার অধীন হন না। সৃষ্টির আরম্ভে সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম যখন সমস্ত জীবের সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টিরূপ ধারণ করেন, তখন তিনি—হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা। এই অবস্থায় তিনি স্বেচ্ছায় মায়াধীন। সৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম যখন সমস্ত জীবের স্থূল শরীরের সমষ্টিরূপ ধারণ করেন, তখন তিনি—বিরাট বা বৈশ্বানর (২)। মায়াযুক্ত কিন্তু মায়াধীশ ব্রহ্মকে বা ঈশ্বরকে বলা হয়—কারণ-ব্রহ্ম। হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটের কারণস্বরূপ বলিয়া ঈশ্বরকে বলা হয়, কারণ-ব্রহ্ম। হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট ঈশ্বরের কার্য বলিয়া তাহাদের বলা হয়, কার্য-ব্রহ্ম। কারণ হইতে কার্যের উদ্ভব, অতএব কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ অভিন্ন।

(১) তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥
—ঋক, ১।২২।২০

(২) হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট ব্রহ্মের সমষ্টিগত রূপ। তাহা ছাড়া প্রত্যেক জীবের ভিতর তাঁহার ব্যষ্টিগত রূপও আছে। ব্যষ্টিগতভাবে তিনি প্রত্যেক জীবের সুষুপ্তিতে প্রাজ্ঞরূপে, স্বপ্নে তৈজসরূপে এবং জাগ্রতে বিশ্বরূপে কল্পিত।

তাই, কারণ-ব্রহ্ম ও কার্য-ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। তুরীয় ব্রহ্ম কার্য-কারণের অতীত। সেই নির্গুণ তুরীয় ব্রহ্মের উপাসনা দুঃসাধ্য, যেহেতু তিনি নির্গুণ হওয়ায় আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না। যাঁহাকে জানিতে বা বুঝিতে পারি না, তাঁহার ধ্যান-ধারণা-উপাসনা দুঃসাধ্য। আমরা যত কিছু উপাসনা করি, সে সব সগুণ ব্রহ্মের বা কারণ-ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের। নিরাকারবাদিগণও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন না। তাঁহারাও সগুণ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের উপাসক। (১)

যে শক্তির সাহায্যে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করেন, তাহা ব্রহ্মেরই শক্তি—ব্রহ্মশক্তি। (২) নির্গুণ ব্রহ্ম এই শক্তিযোগে সগুণ হন। এই শক্তির বিভিন্ন নাম—অব্যক্ত, মায়া, প্রকৃতি, প্রধান, অবিদ্যা ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন নাম। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তিই অগ্নিকে জগদ্বাসীর নিকট জানাইয়া দেয়, তেমনি ব্রহ্মশক্তিই ব্রহ্মকে জগদ্বাসীর নিকট জানাইয়া দেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ব্রহ্মে এই শক্তি লীন হইয়া থাকেন এবং তখন তিনি অব্যক্ত—পরাশক্তি—সচ্চিদানন্দময়ী। এই শক্তির উন্মেষে নির্গুণ ব্রহ্মে জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ার

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি

---

(১) ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত আধুনিক নিরাকার উপাসনার সহিত নির্গুণোপাসনার কোন সাদৃশ্য নাই। তাঁহারা অবতার বা মূর্তি পূজা করেন না বটে, কিন্তু ব্রহ্মের নাম-রূপ-গুণ-ঐশ্বর্যাদি অবলম্বনে ভক্তিপূর্বক তৎপ্রতি চিত্তবৃত্তি সমর্পণ করেন। ইহাও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা।

(২) অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তিঃ—অর্থাৎ, অব্যক্তনামধারিণী পরমেশ্বরের বা ব্রহ্মের শক্তি।—শ্রীশঙ্করাচার্য, বিঃ চূঃ ১০৮

সঞ্চার হয় এবং তখন নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ হন। ব্রহ্মের জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া তাঁহার শক্তিরূপে স্বাভাবিকী। (১) তিনি এই শক্তির সাহায্যে সমস্ত বিশ্ব শাসন করিতেছেন। (২) এই শক্তি চিন্ময়ী। ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, অখণ্ড; তাঁহার এই চিতিশক্তিও একা, অদ্বিতীয়া ও অখণ্ডা। প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মের পুংভাব বা স্ত্রীভাব নাই। সেই নিমিত্ত শ্রুতি প্রায় সর্বত্র 'তৎ' শব্দের দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের নির্দেশ করিয়াছেন। 'তৎ' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। উপাসনা-ভেদে সগুণ ব্রহ্ম বা কারণ-ব্রহ্ম কখনো পুরুষ, কখনো স্ত্রী। শক্তিস্বরূপিনী জগজ্জননী ভাবে তাঁহাকে দেখিলে, তিনি মাতা। আর জগতের বীজপ্রদ (৩) জনক ভাবে তাঁহাকে দেখিলে, তিনি পিতা। বস্তুতঃ, এক সগুণ ব্রহ্ম বা কারণ-ব্রহ্মই একাধারে দুই—পিতা ও মাতা, সর্বেশ্বর ও সর্বেশ্বরী। সগুণ ব্রহ্মের একাধারে এই পিতৃ-মাতৃত্ব-ভাব ঋক-মন্ত্রে পরিস্ফুট। ঋগ্বেদ বলিতেছেন—হে সকলের আশ্রয়স্থল, শত শত শুভ কর্মের সম্পাদক পরমাত্মন্! তুমিই আমাদের সকলের পিতা ও মাতা, তজ্জন্য তোমাকে আমরা উত্তমরূপে মনন করি। (৪)

ব্রহ্মাণ্ডের অর্থ, বিশ্ব বা জগৎ। সগুণ ব্রহ্মের বা কারণ-ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের চিতিশক্তিই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ। ব্রহ্মাণ্ড একটি নহে।

---

(১) স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ। —শ্বেঃ উঃ, ৬।৮

(২) য ইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।—শ্বেঃ উঃ, ৩।২

(৩) সংবৎসরে বপত এক এষাম্।—অর্থাৎ, ব্রহ্ম সৃষ্টিকালে বীজ বপন করেন।

—ঋক, ১ | ১৬৪ | ৪৪

(৪) ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো বভূবিথ। অধা তে সুম্নমীমহে ॥

—ঋক, ৮ | ৯৮ | ১১

ব্রহ্মের চিতিশক্তিরূপ মহাচিৎগগনে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান। (১)

ব্রহ্মাণ্ড

হিন্দুশাস্ত্রের মতানুসারে ব্রহ্ম যেমন অনাদি-অনন্ত, ব্রহ্মাণ্ডও তেমনি অনাদি-অনন্ত। পরব্রহ্ম এক। তিনি সঙ্কল্প করিলেন—আমি বহু হইব, ব্যক্ত হইয়া প্রকাশ পাইব। (২) তখন ব্রহ্মশক্তির সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির সঙ্কল্পও তাঁহার জাগিল। তখন তিনি হইলেন সগুণ ব্রহ্ম। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য নাম-রূপের ভিতর দিয়া তিনি এক হইয়াও বহু হইলেন। এই এক হইতে বহু হওয়া, তাঁহার লীলা। (৩) তিনি অনাদি-অনন্ত, তাঁহার এই লীলাও অনাদি-অনন্ত। এই এক হইতে বহু হওয়ার লীলা ছাড়িয়া তিনি কোন দিন ছিলেন না—থাকেন না—থাকিবেন না। তিনি নিজেই এই ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ দুই। কুম্ভকার মৃত্তিকার দ্বারা ঘট প্রস্তুত করে। এখানে ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার স্বয়ং, কিন্তু উপাদান কারণ সে স্বয়ং নহে—মৃত্তিকারূপ স্বতন্ত্র পদার্থ।

---

(১) এই মহাচিৎগগণকে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান Hyper Space নামে অভিহিত করিয়া বলেন—আমরা যে সৌরজগৎ (Solar Universe) দেখিতেছি, তাহা ছাড়া যে আরো কত সৌরজগৎ ঐ সীমাহীন মহাকাশে আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; বস্তুতঃ সৃষ্টিমণ্ডলে একটি বিশ্ব নহে, একাধিক অসংখ্য বিশ্বের এক সুন্দর বিশ্ব-সংহতি (Galaxy of Universes) বিদ্যমান।

(২) তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়—ছাঃ উঃ. ৬ | ২ | ৩

(৩) লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্—লোকের ন্যায় লীলামাত্র। —বেঃ দঃ, ২ | ১ | ৩৩

তাৎপর্য—কোনরূপ প্রয়োজন-সাধনের জন্য যে সগুণ ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করেন, তাহা নহে। ইহা তাঁহার স্বভাববশতঃ লীলারূপ প্রবৃত্তি। যেমন লৌকিক জগতে কেবলমাত্র চিত্ত-বিনোদনের জন্য সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন মহারাজারও বিনা প্রয়োজনে কন্দুকাদি ক্রীড়ায় প্রবৃত্তি দেখা যায়, সেইরূপ।

বাহির হইতে মৃত্তিকার উপাদান না পাইলে, সে ঘট নির্মাণ করিতে পারে না। ব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ ঠিক সে রকম নহে। ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়। তাঁহার বাহিরে কোন পদার্থ নাই। তাই, তিনি বাহিরে কোথাও হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার নিজের ভিতর হইতে নিজের শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদন করিয়াছেন। যেমন মাকড়সা নিজের নাভী হইতে নিজের শক্তিতে তন্তু নিঃসৃত করিয়া তন্তুজাল রচনা করে, সেইরূপ। (১) প্রভেদ এই যে, তন্তুজাল রচনার পর মাকড়সা সেই জালের সর্বত্র অনুস্যূত থাকে না, কিন্তু ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সর্বক্ষণ অনুস্যূত। তিনি অনন্ত, তাঁহার শক্তি অনন্ত, এই ব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধও অনন্ত।

ব্রহ্মাণ্ডের তিন অবস্থা—সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির অর্থ প্রত্যক্ষীভূত হওয়া, স্থিতির অর্থ কিছুকাল প্রত্যক্ষীভূত থাকা, এবং লয়ের অর্থ অপ্রত্যক্ষীভূত বা অদৃশ্য হওয়া। কোন বস্তুকে দেখিতে না পাইলে যে ধরিয়া লইতে হইবে তাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা নহে। লয়ের অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ড অদৃশ্য হইলেও, তাহার যাবতীয় উপাদান বীজরূপে অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকে। সৃষ্টির অবস্থায় সেই অব্যক্ত বীজগুলি নানা নামে নানা রূপে পুনরায় ব্যক্ত হয়। সৃষ্টির পর লয়, লয়ের পর সৃষ্টি, আবার সৃষ্টির পর লয়। এই প্রকারে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-প্রবাহ অনাদি অনন্ত কাল চলিয়াছে। বিরাম নাই। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বীজ, আবার বীজ হইতে অঙ্কুরের উদ্ভব—সেইরূপ। এই ক্রম

---

(১) যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ * * * তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥

—মুঃ উঃ, ১।১।৭

চলিয়াছে অবিরাম। (১) ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে প্রলয় অবধি বলা হয়, এক কল্প। কল্পারম্ভে সৃষ্টি এবং কল্পান্তে প্রলয়। মাকড়সা যেমন নিজের রচিত তন্তুজালকে কিছুকাল পরে আবার নিজের নাভীতে গুটাইয়া লয়, তেমনি ব্রহ্ম কল্পারম্ভে ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া আবার কল্পান্তে নিজের ভিতর তাহাকে গুটাইয়া লয়েন অর্থাৎ লীন করেন। কল্পারম্ভে তিনি পূর্বকল্পের অনুরূপ সৃষ্টি রচনা করেন। (২)

পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থের জড়দেহসমষ্টিই ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল রূপ, ইহা তাহার বিশ্বজড়ত্বের রূপ, এবং ইহার নাম—বিরাট। ব্যষ্টিগত প্রত্যেক জীবের পাঞ্চভৌতিক জড় দেহ এই বিরাটের অঙ্গীভূত।

ব্রহ্মাণ্ডের তিন রূপ —স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ

দেব-মানব-পশু-পক্ষী ইত্যাদি সকল চেতন জীবের সূক্ষ্ম অন্তরিন্দ্রিয়ের সমষ্টিই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম রূপ; ইহা তাহার বিশ্ব-চেতনার রূপ, এবং ইহার নাম—হিরণ্যগর্ভ। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড সগুণ ব্রহ্মে লীন হইলে, অব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে তখন তাহার কারণ রূপ; এই কারণ রূপের নাম—কারণ-ব্রহ্ম, বা সগুণ ব্রহ্ম, বা ঈশ্বর। কারণ হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূল উদ্ভূত। তাই, কারণ-ব্রহ্ম হইতে হিরণ্যগর্ভ এবং

(১) আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রায় সেই কথা বলেন। বর্তমান বিশ্ব (Universe) যে এই ভাবেই চিরদিন আছে ও থাকিবে, তাহা নহে। ইহার উৎপত্তি বা প্রকাশ (manifestation), স্থিতি (maintenance), ও নাশ (dissolution) আছে। বর্তমান বিশ্ব ক্রমশঃই শক্তির ক্ষয়ে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। শেষে এমন একদিন আসিবে, যেদিন ইহা একেবারে নিঃশক্তি হইয়া মৃত হইবে। এই অবস্থার নাম—heat death।

(২) সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥

—ঋক, ১০।১৯০।৩

হিরণ্যগর্ভ হইতে বিরাট উৎপন্ন হয়। হিরণ্যগর্ভ যেন সগুণ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের সূক্ষ্ম শরীর এবং বিরাট যেন তাঁহার স্থূল শরীর। হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট এই দুই আমাদের পূজ্য, কেননা এই দুইটিই ঈশ্বরের শরীর।

[দুই]
অধ্যাত্মবাদ।

ক্ষর আত্মা অপেক্ষা উচ্চতর অক্ষর আত্মা বা অধি-আত্মা আছে, এই সত্যের বা তত্ত্বের নাম—অধ্যাত্মবাদ। অধি-আত্মাকে পূর্ণভাবে প্রথম আবিষ্কার করেন হিন্দুর সনাতন ধর্মশাস্ত্র—বেদ।(১) অন্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থে তাহারই একটু আধটু ছায়াপাত দেখা যায়। অধি-আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পারসিক ধর্মগ্রন্থ গাথা মুখর, যেহেতু পারসিক কৃষ্টি বৈদিক কৃষ্টির যমজ ভ্রাতা। ইস্‌লামের কোরাণ এই সম্বন্ধে একেবারে নির্বাক। কোরাণে যে বিচারের দিনে পুনরুত্থান (Resurrection) মতবাদ প্রচারিত, তাহা ঠিক আত্মার অমরত্ববাদ নহে এবং তাহাতে

হিন্দুধর্মে অধ্যাত্মবাদ পূর্ণ, অন্য ধর্মে নহে

(১) অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাঽস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং।

—কঃ উঃ, ১।২।২০

অর্থাৎ—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং বিশাল হইতে বিশালতর এই আত্মা প্রত্যেক জীবের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত।

সেই আত্মার নাশ নাই, দেহের ধ্বংসে তাহার ধ্বংস হয় না—ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।—কঃ উঃ ১।২।১৮। অক্ষর=যাহার ক্ষয় হয় না।

দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। (২) পরবর্তীকালে ইস্‌লামের অন্তর্গত সুফী সম্প্রদায় পারসিকগণের গাথা হইতে আহরণ করিয়া ইস্‌লামের ভিতর অধ্যাত্মবাদ প্রবিষ্ট করাইয়াছেন। খ্রীষ্টপন্থীর বাইবেল এই অধি-আত্মাকে কিছুমাত্র প্রকাশ করিয়াছেন স্পিরিট (Spirit) শব্দের (৩) সাহায্যে। তাঁহারা যে আত্মার অমরত্ব (Immortality of the Soul) স্বীকার করেন, তাহারো কিছুটা ভিত অধ্যাত্মবাদের উপর। তবে, খ্রীষ্টপন্থীর Spirit বা Soul এবং বেদে কথিত অক্ষর আত্মা সম্পূর্ণ এক নহে। হিন্দুশাস্ত্রে যাহা ব্যষ্টিগত জীবাত্মা (Individual Self) বলিয়া কথিত, খৃষ্টপন্থিগণের Spirit বা Soul শব্দে অনেকটা তাহাই বুঝায়। খৃষ্টপন্থিগণ পরমাত্মার (Supreme Self বা Universal Spirit) সন্ধান পান নাই।

জীবের তিন শরীর ও পঞ্চ কোষ

হিন্দুশাস্ত্রের মতানুসারে, জীবের তিন শরীর—স্থুল, সূক্ষ্ম ও কারণ। এই তিন শরীর আবার পঞ্চ কোষে বিভক্ত—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ। পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে উত্তর-মীমাংসা-দর্শনের আলোচনাকালে এই বিষয়ে

---

(২) পুনরুত্থান মতবাদে মৃত ব্যক্তির কবরের মধ্যে মৃত দেহ মাটিতে লয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অল্-অজব্ নামক একখানা অস্থি কেবলমাত্র লয় প্রাপ্ত হয় না। বিচারের দিন আসিলে, আল্লা চল্লিশ দিন বারিবৃষ্টি করিবেন, তাহাতে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির কবরস্থ ঐ এক একখানা অস্থি হইতে তাহাদের সম্পূর্ণ দেহ গজিয়া উঠিবে। সেই নবদেহে তাহারা আল্লার সমীপে হাজির হইয়া কৃতকর্মের শুভাশুভ ফল গ্রহণ করিবে।

(৩) ক্রুশবদ্ধ ঈশা (Jesus) শেষ মুহূর্তে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন—Father, into Thy hands I commend My spirit ; এখানে spirit শব্দের অর্থ, দেহাতিরিক্ত জীবাত্মা। ঈশা ঐ বাক্য উচ্চারণে জগৎ-পিতা পরমেশ্বরের হস্তে তাঁহার জীবাত্মাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। [Bible, St. Luke, XXIII—46]

কিছু বলা হইয়াছে। জীবের অন্তরে অবস্থিত প্রত্যগাত্মার বা জীবাত্মার আবরণস্বরূপ এই পঞ্চ কোষ। (৪) অন্নময় কোষ স্থূল; তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, প্রাণময় কোষ; তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, মনোময় কোষ; তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, বিজ্ঞানময় কোষ; এবং তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, আনন্দময় কোষ। কোষগুলি স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়াছে। অন্নময় কোষের ভিতর প্রাণময়, তাহার ভিতর মনোময়, তাহার ভিতর বিজ্ঞানময় এবং তাহার ভিতর আনন্দময় কোষ। অন্নময় কোষ স্থূলতম ও বাহ্যতম, আর আনন্দময় কোষ সূক্ষ্মতম ও অন্তরতম। এই আবরণগুলি যেন একের পর এক জীবাত্মাকে প্রত্যেক জীবের আধারে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। স্থূল শরীরে কেবলমাত্র অন্নময় কোষ; সূক্ষ্ম শরীরে প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ; এবং কারণ-শরীরে শুধু আনন্দময় কোষ। জীব স্থূল শরীরে স্থূল লোকে বা পৃথিবীতে বাস করে, সূক্ষ্ম শরীরে সূক্ষ্ম লোকে বা মনোময় জগতে বাস করে এবং কারণ-শরীরে চৈতন্যময় লোকে বাস করে।

স্থূল শরীর পঞ্চভূতাত্মক। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চ ভূতের বা জড় পদার্থের সমবায়ে স্থূল শরীর নির্মিত। ইহা জড়।

স্থূল শরীর

এই জড় শরীরের উপাদানসমূহের ভিতর অস্থি, মাংস, মেদ, মজ্জা ইত্যাদিতে ক্ষিতি; রক্ত, মূত্র প্রভৃতিতে অপ বা জল; দেহের আভ্যন্তরিক উষ্ণতাই তেজ বা অগ্নি; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে মরুৎ বা বায়ু এবং মুখ, ফুসফুস ও উদরের শূন্যস্থানে ব্যোম বা আকাশ। এই পঞ্চভূতাত্মক স্থূল দেহকে অন্নময় কোষ বলা হয় এই জন্য যে, ইহার গঠন-পোষণ-বর্ধন নির্ভর করে অন্নের বা স্থূল খাদ্যের উপর। পিতার ভুক্ত অন্নে যে শুক্র জন্মে, তাহা হইতে উদ্ভব

(৪) তৈঃ উঃ—ব্রহ্মবল্লী অধ্যায়।

হয় পুত্রের স্থূল দেহ। এই স্থূল শরীরের সাহায্যে আমরা বহির্জগতের সহিত আদান-প্রদান করি।

সূক্ষ্ম শরীর গঠিত সতেরটি অবয়বে। সতেরটি অবয়ব—পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের প্রজ্ঞামাত্রা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রজ্ঞামাত্রা, মন এবং বুদ্ধি। পঞ্চ প্রাণের বা প্রাণশক্তির পাঁচ প্রকার ক্রিয়ার নাম—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। (১) বাক্-পানি-পাদ-পায়ু-উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, অর্থাৎ এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা শারীরিক কর্ম করি। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, অর্থাৎ ইহাদের সাহায্যে বহির্জগতের বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞান আমরা আহরণ করি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় স্থূল শরীরের অন্তর্ভুক্ত যন্ত্রবিশেষ মাত্র; প্রকৃতপক্ষে, তাহাদের কিছুমাত্র কার্যশক্তি নাই। তাহাদের পিছনে আছে সূক্ষ্ম প্রজ্ঞামাত্রা। সেই সূক্ষ্ম প্রজ্ঞামাত্রাগুলির শক্তিতেই এই ইন্দ্রিয়গণ শক্তিমান ও ক্রিয়াশীল। কর্ণের দ্বারা শব্দ শুনা যায়। এখানে কর্ণ স্থূল যন্ত্রস্বরূপ এবং স্থূল শরীরের অংশবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে,

সূক্ষ্ম শরীর

(১) মূলতঃ প্রাণশক্তি এক। কিন্তু প্রাণবায়ুর বৃত্তিভেদে বিবিধ নাম সঙ্কল্পিত। নাসিকার দ্বারা হৃদয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস, মুখ্য প্রাণের বা প্রাণবায়ুর কাজ। মল-মূত্রাদির নিঃসরণ, অধোগমনশীল অপান বায়ুর কাজ। দেহের পুষ্টিসাধন এবং ভুক্ত-পীত অন্ন-জলাদির পরিপাকের দ্বারা রস-রক্ত-শুক্র-পুরীষাদি করণ, সমান বায়ুর কাজ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্ধিস্থানের ও অঙ্গের উন্নয়ন সাধন, ঊর্ধ্বগমনশীল উদান বায়ুর কাজ। বীর্যবত্তা ও বলসাধ্য কর্ম, সর্বনাড়ীগমনশীল সর্বদেহস্থ ব্যানবায়ুর কাজ। দেহের মধ্যে পঞ্চ প্রাণের পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দিষ্ট। হৃদ্দেশে প্রাণবায়ু, গুহ্যদেশে অপানবায়ু, নাভিমণ্ডলে সমানবায়ু, কণ্ঠদেশে উদানবায়ু এবং সর্বশরীরে ব্যানবায়ু। এই পঞ্চ প্রাণবায়ু দেহ-যন্ত্র-পরিচালনার উপকরণ। ইহা দেহযন্ত্র হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেই মৃত্যু। [প্রঃ উঃ—৩।৫-৭]

শব্দ শুনার শক্তি কর্ণের নাই। তাহার পিছনে আছে এক সূক্ষ্ম প্রজ্ঞামাত্রা, যাহার শক্তিতে কর্ণ শক্তিমান ও ক্রিয়াশীল ; অর্থাৎ, কোন শব্দ কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র কর্ণ সেই শব্দকে ঐ প্রজ্ঞামাত্রার সাহায্যে আমাদের শ্রুতিগোচর করে। এই সূক্ষ্ম প্রজ্ঞামাত্রাসমূহ সূক্ষ্ম শরীরের অংশ বা অবয়ব, যদ্যপি চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়গোলকগণ স্থূল শরীরের অংশ বা অবয়ব। মরণকালে স্থূল শরীর ছাড়িয়া সূক্ষ্ম শরীর যখন চলিয়া যায়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই সূক্ষ্ম প্রজ্ঞামাত্রাগুলিও চলিয়া যায়। সেই নিমিত্ত মৃত্যুর পর চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়যন্ত্রসমূহ স্থূল দেহে থাকা সত্ত্বেও তাহারা শক্তিহীন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দেহের বাহিরে থাকায়—বাহ্যেন্দ্রিয়। মন দেহের অভ্যন্তরে থাকায়—অন্তরিন্দ্রিয়। মন সূক্ষ্ম শরীরের অংশ বা অবয়ব এবং দশ বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রবর্তক। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক বা সংশয়াত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম—মন। তাৎপর্য—চিত্তের যে বৃত্তির দ্বারা কোন বিষয়ে নিশ্চিত হইতে না পারিয়া, ইহা কি উহা এইরূপ সংশয়াপন্ন অবস্থা আনয়ন করে, তাহাই মন। মনের পর বুদ্ধি। বুদ্ধিও সূক্ষ্ম শরীরের অংশ বা অবয়ব। নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তির নাম—বুদ্ধি। তাৎপর্য—চিত্তের যে বৃত্তি সাহায্যে কোন বিষয়ে নিশ্চিত ধারণা করা যায়, তাহাই বুদ্ধি। এই সপ্তদশ অবয়ব-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরের তিন কোষ—বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময়। বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ নামে অভিহিত হয়, এবং এই কোষে অবস্থানে বিজ্ঞানের কাজ করে। মন পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া মনোময় কোষ নামে অভিহিত হয়, এবং এই কোষে অবস্থানে মননের কাজ করে। পঞ্চপ্রাণ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত হয়,

এবং এই কোষে অবস্থানে প্রাণ-সঞ্চারের কাজ করে। এই কোষত্রয়ের মধ্যে বিজ্ঞানময় কোষ জ্ঞানশক্তিযুক্ত, অতএব কর্তৃরূপ ; মনোময় কোষ ইচ্ছাশক্তিযুক্ত, অতএব করণ-রূপ ; এবং প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তিযুক্ত, অতএব কার্য-রূপ। (১) এই কোষত্রয়ের সমবায়ে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীর। সূক্ষ্ম শরীরের প্রকাশ ঐ তিন রূপে—কর্তৃরূপে, করণরূপে ও কার্যরূপে।

জীবের যত কিছু চিত্ত-সংস্কারের দ্বারা গঠিত কারণ-শরীর। কারণ-শরীরে এই সংস্কাররাশি অতি সূক্ষ্ম বীজের ন্যায় অবস্থিত। বীজ হইতে তদনুরূপ গাছের জন্ম, তাই বীজকে বলা হয় গাছের কারণ। সেই রকম প্রত্যেক জীবের চিত্তসংস্কার তাহার তদনুরূপ চরিত্র ও জীবন গড়িয়া তোলে। তাই, এই বীজরূপী চিত্তসংস্কারকে বলা হয় জীবের কারণ-শরীর। সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীর উৎপন্ন হয় কারণ-শরীর হইতে এবং তাহাতেই লীন হয়। কারণশরীরে কেবলমাত্র আনন্দময় কোষ। সেই শরীরে জীবের কোন কর্ম থাকে না, এবং কর্মজনিত সুখ-দুঃখাদির ভোগও থাকে না। কেবলমাত্র চিত্তসংস্কারগুলি থাকে বীজের মত নিষ্ক্রিয় অবস্থায়। সেই হেতু এই শরীরে পূর্ণ বিশ্রান্তি এবং বিশ্রান্তি-জনিত এক আনন্দ ব্যতীত আর কিছুর আস্বাদন হয় না ; তাই, ইহাতে এক আনন্দময় কোষ। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা আনন্দস্বরূপ। জীবাত্মা কারণ-শরীরে আনন্দময় কোষে পরমাত্মার অতিশয় সান্নিধ্যে থাকায়, সেই আনন্দস্বরূপের আনন্দ তাঁহার উপর প্রতিবিম্বিত হয় এবং সেই হেতু জীবাত্মা এই কোষে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করেন। (২)

কারণ-শরীর

(১) বেঃ সাঃ—৮৯

(২) বিঃ চূঃ—২০৭

কারণশরীরের একমাত্র বৃত্তি, অজ্ঞানের দ্বারা সম্যক আত্মজ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখা। ইহার মর্ম, কারণশরীরে অজ্ঞান বা অবিদ্যা বিদ্যমান থাকে। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা জীবের। জাগ্রতে তাহার স্থূল শরীর কাজ করে; স্বপ্নে স্থূল শরীরের কাজ থাকে না, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর কাজ করে; সুষুপ্তিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর কাজ করে না, কিন্তু কারণশরীর বিদ্যমান থাকিয়া এক আনন্দের আস্বাদন করে। জাগ্রদবস্থায় কর্মজনিত সুখ-দুঃখ দুই ভোগ করিতে হয়। স্বপ্নাবস্থায় কখনো সুস্বপ্ন, কখনো দুঃস্বপ্ন, দেখার ফলেও সুখ-দুঃখের ভোগ অনিবার্য। সুষুপ্তিতে বা গভীর নিদ্রায় স্বপ্নদর্শন হয় না, কাজেই সুখ-দুঃখের ভোগ হয় না, এমন কি পুত্রশোক পর্যন্ত থাকে না—থাকে এক আনন্দের অনুভূতি। সুষুপ্তিতে আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয়। আত্মার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান, স্বরূপে অবস্থান। (৩) স্থূল শরীরের ভিতর সূক্ষ্ম শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীরের ভিতর কারণশরীর।

হিন্দুশাস্ত্রের মতানুসারে, স্থূল শরীর যেমন অচেতন, সূক্ষ্মশরীর ও কারন-শরীর এই দুইটিও তেমনি অচেতন। সূক্ষ্ম শরীরের অবয়ব বুদ্ধি-মন-প্রজ্ঞামাত্রা প্রভৃতি সব অচেতন। মন ও বুদ্ধি যে বস্তুতঃ অচেতন বা জড়, তাহা প্রতিপন্ন হয় কিছু দিন অন্নগ্রহণ বন্ধ করিলে। তখন মনের স্মৃতিশক্তি লোপ পায় এবং বুদ্ধির ক্রিয়া নিবৃত্ত হইয়া যায়। (৪) আজকাল কঠিন অস্ত্রোপচারকালে ক্লোরোফর্ম (Chloroform) প্রয়োগে মন-বুদ্ধির কাজ বন্ধ করা হয়। ক্লোরোফর্ম, একটি জড়

(৩) সুষুপ্তিকে স্বপিতি কহে। স্বং অপি ইতো গতো ভবতি ইতি স্বপিতি। অর্থাৎ, যে অবস্থায় জীব আত্মস্বরূপের মধ্যে বিলীন হয়, তাহাই স্বপিতি।—ছাঃ উঃ, ৬।৮।১

(৪) ছান্দোগ্যোপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৭ম খণ্ডে শ্বেতকেতুর উপাখ্যান দ্রষ্টব্য।

পদার্থ। মন-বুদ্ধি জড় না হইলে ঐ জড় পদার্থের বশীভূত হইতে পারিত না, অথবা তাহারা জড় ভুক্তান্নের উপর নির্ভর করিত না। স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এই তিন শরীরের কোনটি চেতনার অভাবে নিজে কাজ করিতে পারে না, যেমন ইট-পাথর পারে না। একমাত্র আত্মা চেতন। সেই চিন্ময় আত্মা এই তিন শরীর হইতে ভিন্ন; তিনি আছেন জীবের অন্তরতম দেশে বা কারণ-শরীরের অভ্যন্তরে। মন-বুদ্ধি সেই চেতন আত্মার সন্নিধানে থাকায় চিন্ময় বলিয়া বোধ হয়, আলোকের কাছে কোন স্ফটিকস্তম্ভ থাকিলে তাহাকে যেরূপ দীপ্তিমান দেখায় সেইরূপ। এই চিন্ময় আত্মার দুই বিভাব—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর পরমাত্মারূপে বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই পরমাত্মা কর্তা ও ভোক্তা নহেন, অর্থাৎ তিনি কর্ম করেন না বা কর্মজনিত সুখ-দুঃখরূপ ফল ভোগ করেন না। তিনি সাক্ষী-চৈতন্য-স্বরূপ বিশ্বরঙ্গমঞ্চে কেবল প্রকৃতির অভিনয় দেখিয়া যান। এই পরমাত্মা সকল জীবের এক ও অখণ্ডনীয়। তাঁহার যে অংশ ব্যষ্টিগত জীবের আধারে অনুপ্রবিষ্ট তাহাও চেতন, তবে প্রত্যেক জীবের শরীরত্রয় অন্য জীব হইতে পৃথক্ থাকায়, সেই অংশ জীবে জীবে বিভিন্ন। শরীরত্রয়ের দ্বারা আচ্ছাদিত জীবভূত সেই চেতনাংশ—জীবাত্মা। এই জীবাত্মাই কর্তা ও ভোক্তা। ইনি জীবের অচেতন সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরকে পরিচালিত করেন এবং কর্মজনিত সুখ-দুঃখাদি ফল ভোগ করেন। কেবল জীবের কারণ-শরীরে অবস্থানকালে জীবাত্মার কোন কর্ম থাকে না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগস্থল এই কারণ-শরীর। এই জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে বেদ এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট সমসম্বন্ধযুক্ত দুইটি পক্ষী মিত্ররূপে একই

জীবাত্মা ও পরমাত্মা

বৃক্ষে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে একটি বৃক্ষের ফলকে স্বাদের জন্য ভক্ষণ করে এবং অন্যটি ফলকে ভক্ষণ না করিয়া সব দিক দেখিতে থাকে। (১) এই বর্ণনায় বৃক্ষটি জগৎ, আর দুইটি পক্ষীর একটি জীবাত্মা এবং অন্যটি পরমাত্মা। পিঞ্জরমুক্ত পক্ষী যেমন পিঞ্জর ছাড়িয়া আকাশে উড়িয়া যায়, দেহমুক্ত আত্মাও তেমনি দেহ ছাড়িয়া ঊর্ধে চলিয়া যান। এই নিমিত্ত শ্রুতি এখানে পক্ষীরূপে আত্মার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুই বিভিন্ন আত্মা নহেন—একই চেতন আত্মার দুই রূপ বা বিভাব মাত্র। পরমাত্মাই অক্ষর আত্মা। হিন্দুশাস্ত্রে অধ্যাত্মবাদের এই নিগূঢ় তত্ত্ব।

[তিন]

কর্মবাদ।

এই জগৎ কর্মভূমি। জীবমাত্রেই কর্মের অধীন। কর্ম ছাড়া কোন জীব থাকে না—থাকিতে পারে না। প্রত্যেক কর্মের ফল আছে, কোন কর্ম নিষ্ফল নহে। কারণ ব্যতীত কার্য হয় না, কার্য ব্যতীত কারণ হয় না। কর্মবাদের ভিত্তি এই কার্যকারণবাদের উপর।

কর্ম ও কর্মফল —কার্যকারণবাদ

কর্ম ত্রিবিধ—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। চিন্তাও কর্ম—মানসিক কর্ম। কথন-ভাষণাদি, বাচিক কর্ম। দর্শন-শ্রবণ-গমনাদি, কায়িক কর্ম। যাহা কিছু ফল প্রসব করে, তাহাই কর্ম। কর্ম—কারণ। প্রত্যেক কর্মের তদনুরূপ ফল আছে। যেমন কর্ম তেমনি ফল। আম গাছের বীজ আম গাছই উৎপন্ন করে, কাঁঠাল গাছের বীজ কাঁঠাল গাছই উৎপন্ন

(১) দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

—ঋক, ১ | ১৬৪ | ২০

করে। আম গাছের বীজ কাঁঠাল গাছ, আর কাঁঠাল গাছের বীজ আম গাছ উৎপন্ন করে না। নারীর গর্ভেই নরের জন্ম, ঘোটকীর গর্ভে ঘোটকের জন্ম, শৃগালীর গর্ভে শৃগালের জন্ম। ইহার বৈপরীত্য হয় না। সেইরূপ যে রকমের কর্ম, সেই রকমের ফল সে প্রসব করে। শুভকর্মের ফল, শুভ; অশুভ কর্মের ফল, অশুভ। কর্মের ফল প্রকট হয় শুধু বহির্জগতে নহে—অন্তর্জগতেও। প্রত্যেক কর্ম সেই কর্মীর অন্তর্জগতে সুখ বা দুঃখ উৎপাদন করে এবং তাহার চিত্তের উপর তদনুরূপ রেখাপাত করে। শুভ কর্মের ফল, সুখ; অশুভ কর্মের ফল, দুঃখ। শুভ কর্মের ফলে চিত্তের উপর শুভ রেখাপাত হয় এবং অশুভ কর্মের ফলে অশুভ রেখাপাত হয়। জীব কর্মাধীন। ঈশ্বর কর্মফলদাতা মাত্র। প্রত্যেক জীবকে নিজের কর্মফল ভোগ করিতেই হইবে। তবে প্রত্যেক জীবের স্বীয় কর্মফলানুযায়ী সুখ বা দুঃখ ঈশ্বর তাহাকে দিয়া থাকেন মাত্র। অতএব, ইহাতে ঈশ্বরে বৈষম্য বা নির্দয়তা-দোষ আসে না। (১) ইহার নাম—কর্মবাদ। বৌদ্ধধর্ম এবং জৈনধর্মও এই কর্মবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। জৈনধর্মে এই কর্মবাদের স্থান সকলের উপরে।

ক্রমাগত এক প্রকারের কর্মের অনুষ্ঠানে চিত্তের উপর একই প্রকারের রেখাপাত হয় এবং তাহার ফলে চিত্ত সেই প্রকার হইয়া যায়; অন্তরে ভাব-প্রবৃত্তি তদনুরূপ হয়। ইহাই চিত্ত-সংস্কার। (২) এই

(১) বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি ॥ —বেঃ দঃ, ২।১।৩৪

(২) সংস্কার ত্রিবিধ—উপাসনাজনিত, বাহ্যকর্মজনিত, ও বিষয়ানুভবজনিত উপাসনাও মানসিক কর্ম, তাই উপাসনার দ্বারা চিত্তের উপর অনুরূপ রেখাপাত হয়। বাহ্য কর্মের দ্বারা যে রেখাপাত হয়, ইহা সুস্পষ্ট। আবার বিষয়-ভোগের সময় সুখ-দুঃখাদির অনুভব যে হয়, তাহারও রেখাপাত হয় চিত্তের উপর। [বৃঃ উঃ, ৪।৪।২]

কর্মশক্তি ও চিত্তসংস্কার

চিত্তসংস্কার আবার গঠন করে চরিত্রকে। যাহার যেরূপ চিত্তসংস্কার, তাহার সেরূপ চরিত্র। পরিদৃশ্যমান ক্রিয়াশীল জগতে সর্বত্র সকল ব্যাপারে মানবের চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। এমন কোন ব্যাপার ঘটে না যাহার মাঝে মানবের চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি নাই। চিত্তসংস্কার হইতে উদ্ভূত চরিত্রই মানবের এই চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তিকে রূপদান করে বা রূপায়িত করে। যাহার চরিত্র যে রকম, তাহার চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি সেই রকম। ক্রমাগত সাধন-ভজনের ফলে সাধকের চিত্তসংস্কার সাধু হয়, চরিত্র সাধু হয় এবং চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি সাধু হয়। ক্রমাগত চুরি-ডাকাতির ফলে চোর-ডাকাতের চিত্তসংস্কার অসাধু হয়, চরিত্র অসাধু হয় এবং চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তি অসাধু হয়। এই সত্য মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষিত। কর্মের ভিতর যে শক্তি জীবের চিত্ত-সংস্কার গঠিত করে, তাহাই কর্ম-শক্তি। এই কর্মশক্তির প্রভাব কেবল ইহজন্মেই আবদ্ধ নহে। পূর্ব পূর্ব জন্মের অসংখ্য কর্মের কর্মশক্তির সাহায্যে যে চিত্ত-সংস্কার সংগঠিত হয়, শিশু জন্মগ্রহণ করে সেই চিত্তসংস্কার লইয়া। সেই সংস্কারকে চলিত ভাষায় বলা হয়—অদৃষ্ট। ইহ জন্মের নয় বলিয়া তাহা দেখা যায় না, অর্থাৎ তাহাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না, কাজেই অদৃষ্ট। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহাকে শিশুর সহজাত জ্ঞান (innate ideas) বলেন, তাহাও শিশুর পূর্বজন্মার্জিত কর্মোদ্ভূত চিত্তসংস্কার ব্যতীত আর কিছু নহে। যে ব্যক্তির যে সংস্কার, সেইটি তাহার বিশেষত্ব। দুই মানুষের সংস্কার সম্পূর্ণ এক প্রকার নহে। সংস্কার যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি জাতিগত। এক জাতির মনোবৃত্তি প্রকাশ পায় এক বিশেষরূপে সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর। তাহাই হইল সেই জাতির জাতীয় সংস্কার। এই জাতীয় সংস্কারের

বহিপ্র্রকাশে আমরা বুঝিতে পারি, কোন ব্যক্তির কোন জাতি—আমরা বুঝিতে পারি ইনি ইংরাজ, ইনি ফরাসী, ইনি মার্কিন, ইনি ভারতীয় ইত্যাদি। এক কথায়—সংস্কারকে কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত, ভাবে মানবের বীজ বলা যাইতে পারে। এক রকমের বীজ যেমন সেই রকমের গাছ সৃষ্টি করে, তেমনি এক রকমের সংস্কার সৃষ্টি করে সেই রকমের মানুষ—কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত। বীজের মত সংস্কারের উৎপাদিকা শক্তি আছে। জীবের কারণ-শরীরে এই সংস্কারগুলি অতি সূক্ষ্ম বীজের ন্যায় অবস্থান করে। এক স্থূল শরীর নাশের পর জীবাত্মা নূতন স্থূল শরীরে এই সূক্ষ্ম সংস্কার-বীজ-সহ (১) কারণ-শরীর এবং সূক্ষ্ম শরীর লইয়া প্রবেশ করেন। স্থূল শরীরের নাশে কারণ-শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর নাশ প্রাপ্ত হয় না।

হিন্দুশাস্ত্রের মতানুসারে, কর্মফলানুযায়ী জীবের কর্ম তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যে অতীত কর্মের ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা—প্রারব্ধ। যে অতীত কর্মের ফল এখনো ফলিতে আরম্ভ করে নাই, কিন্তু রাশীকৃত হইয়া আছে, তাহা—সঞ্চিত। যে কর্ম এখনো করা হয় নাই, কিন্তু করিতে উদ্যত, তাহা—ক্রিয়মান বা আগামী।

কর্মফলানুযায়ী কর্ম তিন শ্রেণীর—প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মান

শাস্ত্রকারগণ এই তিন শ্রেণীর কর্মকে তিনটি বাণের সঙ্গে উপমা দিয়াছেন। যথা—কোন ব্যক্তি তাহার লক্ষ্যের প্রতি একটি বাণ ধনু হইতে নিক্ষেপ করিয়াছে, একটি বাণ তূণের মধ্যে সঞ্চিত রাখিয়াছে, আর একটি বাণ নিক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে ধনুতে যোজনা করিতেছে।

(১) তং বিদ্যাকর্মণী সমন্বারভেতে পূর্বপ্রজ্ঞা চ—অর্থাৎ উপাসনাজনিত, বাহ্যকর্ম-জনিত ও বিষয়ানুভবজনিত এই ত্রিবিধ সংস্কারই পরলোকগামী জীবাত্মার অনুগামী হয়।

—বৃঃ উঃ, ৪।৪।২

যে বাণটি সে ধনু হইতে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে প্রারব্ধ কর্মের উপমা। যে বাণটি সে তাহার তূণের মধ্যে সঞ্চিত রাখিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঞ্চিত কর্মের উপমা। যে বাণটি সে নিক্ষেপের অভিপ্রায়ে ধনুতে যোজনা করিতেছে, তাহার সঙ্গে ক্রিয়মান কর্মের উপমা। যেমন নিক্ষিপ্ত বাণকে আর ফিরাইতে পারা যায় না, তেমনি প্রারব্ধ কর্মের ফলকে আর গতিরুদ্ধ করিতে পারা যায় না। এই কারণ, প্রারব্ধের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী, ভোগের দ্বারাই প্রারব্ধের ক্ষয় হয়। প্রারব্ধের ফলভোগের উদ্দেশে জীবকে ইহজন্মে বর্তমান স্থূল দেহ গ্রহণ করিতে হয়। বর্তমান দেহে যে সুখ-দুঃখ (২) ভোগ হয়, সে সব ঐ প্রারব্ধকর্মফলজনিত। তাহা ভোগ করিতেই হইবে। (৩) যাঁহারা জীবন্মুক্ত তাঁহাদিগকেও বর্তমান দেহে ঐ প্রারব্ধজনিত সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সঞ্চিত কর্মের নাশ হয়। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা, অথবা ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে নিমিত্তভাবে (৪) কর্ম করিলে, ক্রিয়মান কর্মের ফলও আর ভোগ করিতে হয় না।

প্রসঙ্গক্রমে দৈব ও পুরুষকার সম্পর্কে কিছু বলা যাইতে পারে। এই বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে বহু গবেষণা হইয়াছে। প্রারব্ধকর্মজনিত যাহা, তাহাকে বলা হয়—দৈব বা অদৃষ্ট বা ভাগ্য। তাহার উপর মানুষের

(২) দেহের সহিত মনের নিকট সম্বন্ধ। তাই এখানে দৈহিক ও মানসিক উভয়বিধ সুখ-দুঃখ বুঝিতে হইবে। ভোগ্যবিষয়ের আনুকূল্যে সুখ, আর বিপর্যয়ে দুঃখ—বিষয়ানামানুকূল্যে সুখ দুঃখো বিপর্যয়ে।—বিঃ চূঃ, ১০৫

(৩) জ্যোতিষিক হস্তরেখা বা কোষ্ঠী বিচার করিয়া যে ভাগ্যফল বলিয়া থাকেন, তাহা অনেকটা আমাদের প্রারব্ধকর্মফলসম্বন্ধে।

(৪) আমি কর্তা নহি, আমি শুধু অন্তর্যামী নারায়ণের যন্ত্রস্বরূপ কার্য করিতেছি—এই প্রকার বুদ্ধিতে কর্ম-সম্পাদন।

হাত নাই। পুরুষের যাহা কর্ম তাহা—পৌরুষ বা পুরুষকার। (৫)

দৈব ও পুরুষকার

পুরুষকার মানুষের আয়ত্তাধীন। সঞ্চিত কর্ম ও ক্রিয়মান কর্ম এই দুইটি মানুষের পুরুষকারের অধীন। ভোগদাতৃত্বশক্তির তারতম্যানুসারে প্রারব্ধ তিন প্রকার—মন্দ, তীব্র ও তীব্রতর। সময় থাকিতে প্রতিকার না করিলে, এই তিন প্রকারের প্রারব্ধ-ভোগ অনিবার্য। তবে মানুষ যত্নশীল হইয়া যথাসময়ে প্রতিকার অবলম্বনে পুরুষকারের সাহায্যে মন্দ ও তীব্র প্রারব্ধকে ইহজন্মে ফলদানের পূর্বেই নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। কেবলমাত্র তীব্রতর বা অত্যন্ত প্রবল প্রারব্ধকে ইহজন্মে ভোগের দ্বারা ক্ষয় করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। দৃষ্টান্ত—কোন ব্যক্তি প্রারব্ধবশতঃ কোন রোগে আক্রান্ত হইলে, সে যদি যত্নশীল হইয়া সুচিকিৎসায় সেই রোগের উপশমে সক্ষম হয়, তবে বুঝিতে হইবে তাহার সেই প্রারব্ধ মন্দ বা তীব্র হইলেও তীব্রতর নহে। কিন্তু যদি যত্নশীল হইয়া সুচিকিৎসার পরও সেই রোগের উপশমে সে অক্ষম হয়, তবে বুঝিতে হইবে সেই প্রারব্ধ তীব্রতর। মহর্ষি বশিষ্ঠদেব যোগবাশিষ্ঠে পুরুষকারকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বস্তুতঃ দৈব কথাটি অর্থশূন্য। ইহজন্মের নিজের কর্মই পরজন্মে প্রারব্ধ বা দৈবরূপে কাজ করে। পুরুষকার দুই প্রকার—প্রাক্তন বা পূর্বজন্মের এবং ঐহিক বা

(৫) পুরি শেতে ইতি পুরুষঃ, দেহের ভিতর যিনি অবস্থিত তিনি পুরুষ। পুরি শয়নাৎ বা পুরুষঃ, অথবা দেহের মধ্যে যিনি শায়িত তিনি পুরুষ। সেই নিমিত্ত জ্ঞান-দৃষ্টিতে পুরুষ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—আত্মা। দেহ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি আত্মার আচ্ছাদন ও আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া তাহারা পুরুষ নহে। তাই পুরুষকার শব্দের অর্থ, আত্মার বল বা শক্তি।

ইহজন্মের। প্রাক্তন পুরুষকারই দৈব বলিয়া খ্যাত। ইহজন্মের প্রবল পুরুষকার প্রাক্তন পুরুষকারকে পরাজিত করিতে পারে, তবে সেই পুরুষকার শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রয়োগ করা কর্তব্য, নচেৎ নিষ্ফল হয়। জ্ঞান-কর্ম-উপাসনা ইত্যাদি সাধনমূলক কর্মই শাস্ত্রসম্মত পুরুষকার। কাম বা বাসনা, সকল কর্মের মূলে। অশুভ বাসনা হইতে অশুভ কর্মের এবং শুভ বাসনা হইতে শুভ কর্মের উদ্ভব। হিন্দুশাস্ত্রমতে, শাস্ত্রবিহিত কর্মই শুভ কর্ম এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মই অশুভ কর্ম। প্রাক্তন পুরুষকার বা দৈব বা প্রারব্ধ বশতঃ চিত্তে প্রথমে অশুভ বাসনার উদয় হয়। তাই প্রয়োজন, ঐহিক পুরুষকারের প্রয়োগে শুভ বাসনার দ্বারা সেই অশুভ বাসনার জয়। এই প্রচেষ্টার নাম—সাধনা।

হিন্দুধর্মের কর্মবাদ নিন্দনীয় নহে

অনেকে হিন্দুধর্মের এই কর্মবাদকে নিন্দা করিয়া বলেন যে, এই কর্মবাদই হিন্দুকে নিরুদ্যম ও নিঃশক্তি করিয়া ফেলিয়াছে। যদি কর্মফলের হাত হইতে আমার নিস্তার না থাকে, যদি আমার পূর্বজন্মের কর্মজনিত চিত্তসংস্কার বর্তমান জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তবে ইহজীবনে আমার কর্ম-স্বাধীনতা বলিয়া কিছু নাই। যাহা অদৃষ্টে আছে তাহাই হইতেছে ও হইবে—এই বসিয়া বসিয়া থাকি, আলস্যে দিন কাটাই এবং কর্মের শক্তি-উদ্দীপনা যেন ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলি। প্রকৃতপক্ষে, এইরূপ অভিযোগ হিন্দুশাস্ত্রে কর্মবাদের বিরুদ্ধে করা চলে না। সে কর্মবাদ ঠিক ঐ প্রকার নহে। তাহার মুখ্য কথা এই। প্রত্যেক কর্মের ফল আছে এবং সেই কর্মফল আমাকে নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবে। অতীত কর্মের ফল ভোগ করিতেছি বর্তমানে, বর্তমান কর্মের ফল ভোগ করিব ভবিষ্যতে। নিক্ষিপ্ত বাণের মত

যে অতীত কর্মের ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার উপর আমার হাত নাই; কিন্তু যে অতীত কর্মের ফল সঞ্চিত আছে এবং যে বর্তমান কর্ম আমি এখনো করি নাই, সেই সকল কর্মফলের উপর আমার সম্পূর্ণ হাত আছে। তাহারা আমার ইচ্ছাধীন। পুরুষকারের সাহায্যে তাহাদের গতি রুদ্ধ করিতে পারি। এখানেই কর্মস্বাধীনতা। আমার অতীত কর্মের ফল বর্তমান, ইহা সত্য; তবে বর্তমানে এমন কর্ম করিতে পারি, যাহার ফলে ভবিষ্যৎ নূতন ধরণের হইতে পারে। শুভ বাসনার দ্বারা অশুভ বাসনাকে জয় করিয়া শুভ কর্ম করিতে পারি। শুভ বাসনা লইয়া শুভ কর্মের অনুষ্ঠানে প্রাক্তন কর্মফলজনিত সংস্কার ও সংস্কারজাত চরিত্রের পরিবর্তন-পরিমার্জন আমাতে সম্ভব। এখানেই পুরুষকার—কর্ম-স্বাধীনতা। এই সম্ভাবনা আছে বলিয়াই তো সাধক সাধনা করে—দস্যু রত্নাকর মহামুনি বাল্মীকি হয়। জীবনের এ পরিবর্তন আজো অনেক স্থলে দেখা যায়। হিন্দুর কর্মবাদের সার কথা—মানুষ একেবারে অদৃষ্টের দাস নহে, সে নিজেই নিজের অদৃষ্টনিয়ন্তা, সে নিজেই নিজের ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিতে পারে কর্মশক্তির প্রয়োগে। অতএব, হিন্দুর কর্মবাদে উদ্যমহীনতার—শক্তিহীনতার—স্থান আদৌ নাই; স্থান যথেষ্ট আছে আত্মনির্ভরতার—ক্রিয়াশীলতার।

[চার]

জন্মান্তরবাদ ও পরলোকবাদ।

(ক) জন্মান্তরবাদ।

শ্রীশ্রীগীতায় শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। অর্থাৎ—যে কেহ জন্মে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিৎ এবং যে কেহ মরে তাহার জন্ম অবধারিত। তিনি অর্জুনকে আরো

বলিয়াছেন—হে অর্জুন, আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে; আমি সে সব জানি; কিন্তু হে পরন্তপ, তুমি তাহা জান না। (১) ইহার নাম—জন্মান্তরবাদ। উপনিষদ্‌ও বলিয়াছেন—একটি জোঁক যেমন একটি তৃণের উপর আসিয়া সেই পুরাতন তৃণটিকে ছাড়িয়া নূতন তৃণ গ্রহণ করে, তেমনি জীবাত্মা পুরাতন স্থূল দেহ ছাড়িয়া নূতন স্থূল দেহ ধারণ করেন। (২) অনেকের ধারণা, জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে বেদসংহিতায় কিছু নাই, ইহা বেদের পরবর্তী সময়ে প্রবর্তিত। এই ধারণা ঠিক নহে। বেদসংহিতায় পুনর্জন্মবাদের সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। ঋকমন্ত্র স্পষ্ট বলিতেছেন—পৃথ্বীমাতা পুনরায় আমাদের সত্তা দান করুণ, দ্যুলোকে দেবগণ আমাদের নূতন জীবন দান করুণ, চন্দ্রদেব আমাদের পুনরায় তনু দান করুণ এবং পূষণ আমাদের পুনরায় বাক্‌শক্তি ও শান্তি দান করুণ। (৩) ইহা পুনর্জন্মবাদের কথা।

জন্মান্তরবাদ বেদসম্মত

যথার্থতঃ, জীবাত্মার জন্ম বা মৃত্যু নাই। জীবাত্মার কারণ-শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর সহ এই স্থূল পাঞ্চভৌতিক জগতে স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীরগ্রহণকে বলা হয়—জন্ম। আর, তাঁহার কারণ-শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর সহ এই স্থূল পাঞ্চভৌতিক শরীরত্যাগকে বলা হয়—মৃত্যু। প্রকৃতপক্ষে, জন্ম-মৃত্যু হয় এই স্থূল শরীরের—জীবাত্মার নহে। কারণ-শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া স্থূল শরীর যখন বিকৃত হয়,

---

(১) গীঃ—৪।৫

(২) বৃঃ উঃ—৪।৪।৩

(৩) পুনর্নো অসুং পৃথিবী দদাতু পুনর্দ্যৌর্দেবী পুনরন্তরিক্ষম।
পুনর্নঃ সোম স্তন্বং দদাতু পুনঃ পুষা পথ্যাং যা স্বস্তিঃ॥

—ঋক, ১০।৫৯।৭

তখনই হয় স্থূল শরীরের মৃত্যু। (৪) সূক্ষ্মদেহের সূক্ষ্মতাহেতু স্থূল দেহ হইতে তাহার নিষ্ক্রমণকালে পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ তাহাকে দেখিতে পায় না এবং কোন স্থূল বস্তু তাহার গতিরোধ করিতে পারে না। (৫) জীবিত ব্যক্তির দেহে যে উষ্ণতা তাহা সূক্ষ্ম দেহের। (৬) জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম, আবার জন্মের পর মৃত্যু। সৃষ্টিমণ্ডলে এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র—ভবচক্র বা সংসার। যতদিন না পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার পূর্ণ মিলন হয়, ততদিন জীবকে সৃষ্টিমণ্ডলে এই ভবচক্রের অধীন থাকিতে হয়। জন্মান্তরবাদ অধিরূঢ় কর্মবাদের উপর। পূর্বজন্মে অনুষ্ঠিত কর্মসমূহের ফলস্বরূপ সূক্ষ্ম সংস্কাররাশি অবস্থান করে জীবের কারণ-শরীরে। স্থূল দেহের অবসানে জীবাত্মা এই সংস্কাররাশির সাহায্যে পরিচালিত করেন সূক্ষ্মশরীরের বুদ্ধি-মন-প্রাণ-প্রজ্ঞামাত্রা এই সকলকে এবং সেই পরিচালনার ফলে গঠিত হয় তদনুরূপ নূতন এক স্থূল শরীর। এই নূতন এক স্থূল শরীর গ্রহণের নাম—পুনর্জন্ম। সাধনার দ্বারা যতদিন না—যতজন্ম না—প্রাক্তন কর্মফলজনিত সংস্কাররাশি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়, ততদিন ততজন্ম জীবের স্থূল শরীর গ্রহণ অনিবার্য। পূর্বজন্মের সংস্কার যে ইহজন্মে বিদ্যমান, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যেমন—এক পিতামাতার পাঁচ পুত্র পাঁচ প্রকার বিভিন্ন মনোবৃত্তিসম্পন্ন। কেহ সদাচারী, কেহ কদাচারী, কেহ আস্তিক, কেহ নাস্তিক, কেহ কবি, কেহ গাণিতিক

জন্ম ও মৃত্যু—
ভবচক্র

(৪) জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীব ম্রিয়তে ইতি।
—ছাঃ উঃ, ৬।১১।৩

(৫) সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥— বেঃ দঃ, ৪।২।৯

(৬) অস্যৈব চোপপত্তেরেষ ঊষ্মা ॥— বেঃ দঃ ৪।২।১১

ইত্যাদি। এমন কি, দুই যমজ পুত্র এক মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয় না, যদ্যপি তাহারা একই সময়ে একই গর্ভে উৎপন্ন। এক পিতামাতার রক্ত-বীর্যে জন্ম হইলেও তাহাদের মধ্যে এই মনোবৃত্তির তারতম্য, পূর্বজন্মে কৃত কর্মজনিত সংস্কারের তারতম্য-হেতু। শিশু মৃত্যু কি তাহা জানে না, তথাপি তাহাকে কেহ মারিতে উদ্যত হইলে সে ভয় পায়। এই মরণত্রাস তাহার পূর্বজন্মের সংস্কার মাত্র। পূর্ব পূর্ব জন্মে সে মরণক্লেশ অনুভব করিয়াছে, তাহার সংস্কার শিশুর সূক্ষ্ম শরীর ইহজন্মেও বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছে। সেই কারণ, তাহার এই মরণত্রাসরূপ সহজাত সংস্কার। (১) কোন কোন লোকের এবং যোগসিদ্ধ পুরুষের পূর্ব জন্মের স্মৃতি লাভ হয়, ইহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ আমরা মাঝে মাঝে পাইয়া থাকি। যোগিগণের পূর্বজন্মস্মৃতিলাভসম্পর্কে মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলিয়াছেন—সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্॥ (২) অর্থাৎ— সংস্কার সাক্ষাৎকার হইলে পূর্বজন্মের জ্ঞান হয়। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, পূর্বজন্মকৃত কর্মসমূহের রেখাপাত বা অঙ্কন হইয়া যায় আমাদের সূক্ষ্মশরীরে অধিমানস স্তরে এবং তাহাই চিত্তসংস্কার। কারণ-শরীরে সেই প্রাক্তন সংস্কাররাশি ইহজন্মেও বিদ্যমান থাকে। এখানে ঐ যোগসূত্র সেই সংস্কাররাশিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন যে, নিজের বা অপরের চিত্তনিহিত প্রাক্তন সংস্কাররাশিতে ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপ

---

(১) জীবের সহজাত সংস্কারের দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান যাইতে পারে বাবুই পাখীর বাসা-নির্মাণ-কৌশল, মৌমাছির চাকের কক্ষ-নির্মাণ-কৌশল, হাঁসের ছানার জন্মমাত্র জলে সাঁতার দেওয়া, বানর-শাবকের গর্ভ হইতে বাহির হইয়াই বৃক্ষ-শাখা-ধারণে আত্মরক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি।

(২) যোঃ সূঃ—৩।১৮

ক্রিয়াত্মক সংযমের দ্বারা উহাদের সাক্ষাৎকার হইলে, যোগিগণ নিজের বা অপরের পূর্বজন্মসম্বন্ধীয় ঘটনাবলীর জ্ঞানলাভ করিতে পারেন।

অন্য ধর্ম-দর্শনে জন্মান্তরবাদের ছায়াপাত

কেবলমাত্র হিন্দুধর্মে যে জন্মান্তরবাদ গৃহীত, তাহা নহে। পুরাকালে অর্ফিয়স্(Orpheus), পিথাগোরস্(Pythagoras), এম্পিডক্লিস্(Empedocles), প্লেটো (Plato) প্রভৃতি গ্রীক মনীষী ও দার্শনিকগণ পুনর্জন্ম বিশ্বাস করিতেন; মিশরীরাও (Egyptians) বিশ্বাস করিতেন। খ্রীষ্টীয় ধর্মে জন্মান্তরবাদ না থাকিলেও, ঈশার গুরু জোহন (John the Baptist) যে পূর্বজন্মে এলায়াস্ (Elias) ছিলেন, এই কথা ঈশা (Jesus) স্বয়ং প্রচার করিয়াছিলেন। জার্মানদেশীয় প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্মবিৎ Dr. Julius Muller জন্মান্তরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। সুফীসম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান জন্মান্তর-বিশ্বাসী। বৌদ্ধধর্ম পূর্ণরূপে জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থে বুদ্ধদেবের ৫৫০টি পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত কথিত। এই সকল জন্মের ভিতর দিয়া সাধনা করিতে করিতে তিনি শেষে গৌতম সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্ণ সিদ্ধিলাভে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। জৈনধর্মের জন্মান্তরবাদ সম্পূর্ণরূপে গৃহীত। অধুনা পাশ্চাত্যের একাধিক বিদ্বজ্জন জন্মান্তরবাদের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়াছেন। এমন কি, প্রখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ Prof. Huxley বলিয়াছেন যে, জন্মান্তরবাদ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই স্থূল জগতে স্থূলদেহধারী জীব চতুর্বিধ—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। জরায়ু হইতে জাত মনুষ্য, পশু প্রভৃতি—জরায়ুজ। অণ্ড হইতে জাত বিহঙ্গ-ভুজঙ্গাদি—অণ্ডজ। স্বেদ হইতে জাত মশকাদি—স্বেদজ। ভূমি ভেদ পূর্বক উদ্ভূত তরুলতাদি—উদ্ভিজ্জ। এই

চারি প্রকার জীবই চেতন। চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মা প্রত্যেক জীবের স্থুল দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত। জীবসকলের ব্যষ্টিগত জীবাত্মা চৈতন্যাংশে এক হইলেও, জীবে জীবে চৈতন্যপ্রকাশের মাত্রার তারতম্য আছে। সেই কারণ এক জাতির জীব, আর এক জাতি হইতে ভিন্ন। উদ্ভিজ্জ জীবে চৈতন্যের বিকাশ সর্বাপেক্ষা কম, তাই তাহারা জড়বৎ মনে হয়। ইহা উদ্ভিজ্জ অপেক্ষা কিছু বেশী স্বেদজ জীবে, তদপেক্ষা আরো বেশী অণ্ডজ জীবে, তদপেক্ষা আরো বেশী জরায়ুজ জীবে। আবার, জরায়ুজ জীবের ভিতর মনুষ্যজাতির মধ্যেই চৈতন্যের পূর্ণ প্রকাশ। মনুষ্যজাতি ব্যতীত অন্য জাতির অন্তরে আত্মচৈতন্যবোধ নাই এবং জ্ঞান-তন্ত্রও নাই। আত্মচৈতন্যবোধের ও জ্ঞান-তন্ত্রর অভাবে মানবেতর জীব স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহাদের বিবেক-বুদ্ধি নাই। প্রত্যেক জীবের আধারে ব্যষ্টিগত জীবাত্মা সর্বব্যাপক পরমাত্মার সহিত মিলন-প্রয়াসী। সেই নিমিত্ত জীবজগতে জীবের ক্রমোচ্চ বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়া জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনাভিমুখী এক স্বাভাবিক প্রগতি সুপ্রকাশিত। জীবলোকে উদ্ভিজ্জ জীব নিকৃষ্টতম এবং মানব শ্রেষ্ঠতম স্তরে। হিন্দুশাস্ত্র বলেন যে, স্বাভাবিক প্রগতি অনুসারে উদ্ভিজ্জ জীবও ক্রমোবিকাশের ঊর্ধ্বমুখী ধারানুযায়ী ধাপে ধাপে উঠিয়া একদিন-না-একদিন মানবত্ব লাভ করিবে। (১) হিন্দুশাস্ত্র আরো বলেন যে,

যোন্যন্তর-গ্রহণ

(১) বর্তমান পাশ্চাত্য জীববিজ্ঞানের বিবর্তন-ক্রমে এই ক্রমোবিকাশের ধারা স্বীকৃত। ইহার মতে—ক্ষুদ্র সরীসৃপ, পরে পক্ষী-পশু-বানর এবং সর্বশেষে মানুষ। এই বিবর্তনের ক্রম।

চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া তবে মনুষ্যজন্ম। (২) তাৎপর্য—জীব নিম্নতম স্তর হইতে স্বাভাবিক প্রগতি অনুসারে উঠিতে উঠিতে, অসংখ্য মানবেতর নিকৃষ্ট জন্ম অতিক্রম করিয়া, তবে মনুষ্যজন্ম লাভ করে। এই হেতু মনুষ্যজন্ম দুর্লভ। মানবত্বের ভিতর দেবত্ব ও পশুত্ব এই দুই ভাব নিহিত। মানবের আধারে সাধনার দ্বারা পূর্ণভাবে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ অর্জিত হইলে, মানব দেবত্ব লাভ করিতে পারে। অন্যপক্ষে, সাধনার অভাবে সত্ত্বগুণের বিলোপে তমোগুণের প্রাবল্যে মানব পতিত হইয়া পশুত্ব লাভ করিতে পারে। মানবের এই অভ্যুদয় ও পতন সম্পূর্ণ সাংস্কারিক। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মানবের চিত্তে বা অধিমানস স্তরে প্রত্যেক কর্মের চিত্র অঙ্কিত হইয়া যায়। ইহাই সংস্কার। শুভ কর্মের অনুষ্ঠানে শুভ সংস্কার, আর অশুভ কর্মের অনুষ্ঠানে অশুভ সংস্কার। শুভ সংস্কারের ফলে অভ্যুদয়, আর অশুভ সংস্কারের ফলে পতন। জীবাত্মা বর্তমান মানব-দেহের অবসানে যে পুনরায় মানব-দেহ গ্রহণ করিবেন, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই; তিনি মানবেতর জীবের দেহও গ্রহণ করিতে পারেন। ইহার নাম—যোন্যন্তর-গ্রহণ। বেদ-সংহিতায় যোন্যন্তর-গ্রহণের আভাষ পাওয়া যায়। ঋকমন্ত্র মানবের মরণোত্তর অবস্থা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—চক্ষুঃ সূর্যলোকে অর্থাৎ তেজপুঞ্জে চলিয়া যাক্ এবং জীবাত্মা বায়ুতে মিশিয়া যাক্; স্বকৃত ধর্মানুসারে দ্যুলোকে অথবা পৃথিবীলোকের জলে অর্থাৎ জলচররূপে, কিংবা কল্যাণকর হইলে ওষধিতে অর্থাৎ

---

(২) বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণে ৮৪ লক্ষ যোনি—স্থাবর জন্ম ২২ লক্ষ যোনি, জলচর ৯ লক্ষ, কূর্ম ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ, বানর ৪ লক্ষ, তারপর মনুষ্য যোনি। পাশ্চাত্যের বিবর্তন-ক্রমের সঙ্গে ইহার মিল দেখা যায়। যোনির অর্থ, জাতি বা জন্মস্থান।

উদ্ভিজ্জ লতাগুল্মাদিরূপে স্থূল শরীর ধারণ করিয়া অবস্থান করে। (৩) ইহজন্মে ক্রমাগত অশুভ কর্মের অনুষ্ঠানে যদি কোন মানুষ সত্ত্বগুণ বিসর্জন দিয়া তমোগুণকে বিশেষভাবে আশ্রয় করে, তবে তাহার চিত্তসংস্কারও সেই ভাবে গঠিত হয়। এই চিত্তসংস্কার তাহার কারণ-শরীরে বীজের মত থাকিয়া যায় স্থূল শরীরের অবসানে। তাই, পরজন্মে এই কারণ-শরীর হইতে যে সূক্ষ্ম শরীর এবং সেই সূক্ষ্ম শরীর হইতে যে স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়, তাহা পশুরূপেই হয়। তাহাকে বলে, তির্যকযোনিপ্রাপ্তি। তির্যকযোনির অর্থ, পশুপক্ষীর জাতি। (৪)

জন্মান্তরবাদে এক আশ্বাসের বাণী—সাধনা কখনো বিফল হয় না। আত্মোপলব্ধিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। তাহার জন্য প্রয়োজন দিব্যজীবনযাপন। চিত্তশুদ্ধির সাহায্যে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি না হইলে দিব্যজীবনলাভ হয় না। দিব্যজীবনলাভের প্রচেষ্টাই সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ এক জন্মে সম্ভব নয়। তবে ইহজন্মে সাধনার পথে যতটুকু অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা চিত্তসংস্কাররূপে কারণ-শরীরে থাকিয়া যায়। স্থূল শরীরের নাশে কারণ-শরীরের নাশ হয় না। কারণ-শরীর কল্পান্তস্থায়ী। ইহজন্মে সাধনার পথে যেখানে যাত্রা শেষ করি, পরজন্মে আবার সাধনার পথে সেখান হইতে অগ্রসর হই। (৫) এই

জন্মান্তরবাদে আশ্বাস-বাণী

(৩) সূর্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্রতে হিতমোষধীষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥ —ঋক্, ১০।১৬।৩

(৪) পুনর্জন্ম কর্মের উপর নির্ভর করে। যদি লোক পশুর মত কাজ করে, তবে সে পশুযোনিতে আকৃষ্ট হবে। * * * * পশু থেকে যদি মানুষ হতে পারে, মানুষ থেকে পশু হবে না কেন? মূলেতে তো সবই এক। —স্বামী বিবেকানন্দ, কথোপকথন।

(৫) গীঃ, ৬।৪৩

ভাবে যত্নশীল সাধক পুরুষকারের সাহায্যে জন্ম-জন্মান্তর সাধনার পথে চলিতে থাকে, যতদিন—যত জন্ম—সিদ্ধিলাভ না হয়। শেষে তাহার সিদ্ধিলাভ সুনিশ্চিত।

(খ) পরলোকবাদ।

এই পৃথিবী, ইহলোক। ইহা স্থূল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এই স্থূল লোক ছাড়া অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম লোক আছে, এই বিশ্বাস—পরলোক-বাদ। মৃত্যুর পরই যে জীবাত্মা স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া এই স্থূললোকে আবির্ভূত হন, তাহা নহে। অর্থাৎ—মৃত্যুর পরই মানুষের পুনর্জন্ম হয় না। মৃত্যুর পর কিছুকাল মানবের জীবাত্মা বা মানবাত্মা (১) কারণ-শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর সহ সূক্ষ্মলোকে অবস্থান করেন। স্থূল শরীরের সঙ্গে স্থূল জগতের যেমন সম্বন্ধ, সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে সূক্ষ্ম জগতের বা সূক্ষ্ম লোকের তেমনি সম্বন্ধ। আধার—আধেয়। স্থূল শরীর বিচরণ করে স্থূল জগতে বা জড় জগতে। স্থূল জগৎ—আধার ; স্থূল শরীর—আধেয়। সূক্ষ্ম শরীর বিচরণ করে সূক্ষ্ম জগতে বা সূক্ষ্ম লোকে। সূক্ষ্ম লোক—আধার ; সূক্ষ্ম শরীর—আধেয়। পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা পাঞ্চভৌতিক স্থূল জগতের জ্ঞানলাভ করি, কিন্তু সূক্ষ্ম লোকের জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। সেই নিমিত্ত এই ব্রহ্মাণ্ডে সূক্ষ্মলোক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহলোক বা স্থূল জগৎ—কর্মভূমি। এখানে আমরা বার বার আসি কর্মের জন্য—সাধনার

(১) স্থূলশরীরধারী জীবগণের ভিতর মানবই শ্রেষ্ঠ। মানবত্বের মধ্যে জীবত্বের পূর্ণ বিকাশ। তাই, এই প্রসঙ্গে জীবাত্মা বলিতে মানবাত্মা বুঝিতে হইবে।

জন্ম—যতদিন, যতজন্ম, সিদ্ধিলাভ না হয়। সূক্ষ্ম লোক—ভোগভূমি। স্থুল দেহ ত্যাগের পর সেখানে আমরা অবস্থান করি কিছুকাল, ইহলোকে অনুষ্ঠিত কর্মের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখাদি-ভোগের জন্য। সূক্ষ্মলোকে সূক্ষ্মদেহে জীবাত্মা সুখ-দুঃখাদি-ভোগ করেন। (১) সুখ-শান্তি-ভোগের নাম—স্বর্গ-ভোগ। আর, দুঃখ-যন্ত্রণা-ভোগের নাম—নরক-ভোগ। ইহলোকে অনুষ্ঠিত শুভ কর্মের ফলে স্বর্গ-ভোগ এবং অশুভ কর্মের ফলে নরক-ভোগ সূক্ষ্ম লোকে করিতে হয়। ইহলোকে অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্মের ফল-ভোগ পরলোকে বা সূক্ষ্মলোকে হয় না। কেবলমাত্র মানসিক পাপপুণ্যরূপ কর্মের ফলভোগ পারলৌকিক সূক্ষ্মদেহে হয়, কিন্তু ইহজগতে স্থুলদেহকৃত কর্মের ফল সূক্ষ্মদেহের ভোগ্য নহে—তাহা স্থুলদেহের ভোগ্য। সেই নিমিত্ত সূক্ষ্মলোকে সুখ-দুঃখাদি বা স্বর্গ-নরকাদি ভোগের পর, স্থুলদেহভোগ্য ভুক্তাবশিষ্ট কর্মফল-ভোগের উদ্দেশে জীবাত্মা পুনরায় স্থুলদেহগ্রহণে স্থুলজগতে ফিরিয়া আসেন। ইহার নাম—পুনর্জন্ম।

স্থুল লোক লইয়াই ব্রহ্মাণ্ড নহে। ব্রহ্মাণ্ডে স্থুল লোক এবং সূক্ষ্ম লোক দুই আছে। এই সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডে সূক্ষ্মত্বের তারতম্যহেতু সূক্ষ্মলোক অসংখ্য। পরলোক বলিলে ঐ অসংখ্য সূক্ষ্মলোকের সমষ্টিকে বুঝায়। মোটামুটি বুঝাইবার অভিপ্রায়ে হিন্দুশাস্ত্র বলেন যে, এই

সূক্ষ্মলোকের সংখ্যা, নাম ও অবস্থা।

ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দশ ভুবন বা লোক বিদ্যমান। স্থুললোক, পৃথিবী। ইহা হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতমরূপে সপ্ত লোক উপরে এবং অধস্তন সপ্তলোক পর পর নীচে বিদ্যমান। (২) পৃথিবী হইতে উপর দিকে

(১) বৃঃ উঃ—৪।৪।৪ ; ৪।৪।৬

(২) বেঃ সাঃ—১০৪

সপ্তলোক—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য। (৩) পৃথিবীর নীচে সপ্তলোক—অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল। চৈতন্যময় সগুণ ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এই ব্যাপকতা ডিম্বের উপর তাহার খোসার ন্যায় নহে, দুগ্ধের ভিতর ঘৃতের ন্যায়—ক্ষীরে সর্পিরিব। (৪) অর্থাৎ, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণুতে অণুতে ব্যাপক। অতএব, চতুর্দশ লোকের প্রত্যেকটিতে তাঁহার চৈতন্যাংশ বর্তমান। তাঁহার সেই চৈতন্যাংশ সেই লোকের কেন্দ্রীয় শক্তি। প্রত্যেক লোকের তাই এক এক চিন্ময় কেন্দ্রীয় শক্তি আছে। এই শক্তিকে সেই লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা হয়। কোন কোন হিন্দুশাস্ত্রে এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের নামানুযায়ী লোকসমূহের নামকরণ হইয়াছে। যেমন—যে লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি, সেই লোকের নাম অগ্নিলোক। এই ভাবে পৃথিবীর উর্ধে সপ্তলোকের নাম হইয়াছে—অগ্নিলোক, বায়ুলোক, বরুণলোক, আদিত্যলোক, ইন্দ্রলোক, প্রজাপতিলোক ও ব্রহ্মলোক। ইহা ব্যতীত সূক্ষ্মশরীরী পিতৃপুরুষগণ যে সূক্ষ্মলোকে বাস করেন, তাহার নাম—পিতৃলোক। হিন্দুশাস্ত্রে এই যে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লোকের তালিকা দেওয়া আছে, তাহা সম্পূর্ণ নহে। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভে অসংখ্য লোকের নাম ও অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব। শাস্ত্রকারগণ কেবল বিষয়বস্তু বুঝাইবার উদ্দেশে কতকগুলি লোকের নাম ও অবস্থান বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। কোথাও কোথাও স্থূল পৃথিবী বাদে সমস্ত সূক্ষ্ম লোককে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে—পিতৃলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোক।

(৩) সত্যলোকের অপর নাম, ব্রহ্মলোক।

(৪) শ্বেঃ উঃ, ১।১৬

পিতৃলোকে সূক্ষ্মশরীরী পিতৃপুরুষগণ, দেবলোকে সূক্ষ্মশরীরী দেবতাগণ এবং ব্রহ্মলোকে সূক্ষ্মশরীরী হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা অবস্থান করেন। (১)

মানবাত্মার উৎক্রান্তি-- দেবযান ও পিতৃযান মার্গ

স্থূল শরীরের অবসানে মানবের জীবাত্মা বা মানবাত্মা কি প্রকারে স্থূল শরীর ও স্থূল জগৎ ছাড়িয়া সূক্ষ্মলোকে বা লোকান্তরে গমন করেন, সেই বিষয়ে প্রসঙ্গতঃ কিছু বলা যাইতে পারে। স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম ও কারণশরীর সহ জীবাত্মার নিষ্ক্রমণই উৎক্রান্তি। প্রধাণতঃ শ্রেয়োকামী মানব দুই শ্রেণীর—(ক) সগুণ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের উপাসক ও যোগসাধনরত ; এবং (খ) সাধনা-উপাসনা-বিহীন হইয়া স্বর্গকামনায় কেবল যজ্ঞ-দান-তপস্যাদি শাস্ত্রবিহিত শুভ কর্মে রত ও সদাচারী। প্রথম শ্রেণীকে বিদ্বান এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে অবিদ্বান বলা হয়। মৃত্যু-কালে বিদ্বানের মস্তকস্থিত সুষুম্না নাড়ীর ভিতর দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া এবং অবিদ্বানের চক্ষু-মুখাদি অপরাপর যে কোন দেহাবস্থিত ছিদ্র দিয়া মানবাত্মার উৎক্রান্তি হয়। (২) তারপর, স্থূল লোক ছাড়িয়া বিদ্বান বা সগুণ ব্রহ্মোপাসক দেবযান মার্গে (৩) ব্রহ্মলোকে এবং অবিদ্বান বা কেবলকর্মী ও সদাচারী পিতৃযান মার্গে চন্দ্রলোকে গমন করেন। দেবযানকে উত্তরায়ণমার্গ এবং পিতৃযানকে দক্ষিণায়ন মার্গ কহে। (৪)

---

(১) ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষকে পিতৃলোক বলা হয়, যেহেতু পিতৃগণ ভুবর্লোকে বাস করেন। ভূলোককে মনুষ্যলোক বলা যায়, যেহেতু মনুষ্যগণ ভূলোকে বাস করে। স্বর্গ-লোকে দেবতাগণ বাস করেন, সেই নিমিত্ত ইহাকে দেবলোক বলা যাইতে পারে। সত্যলোকে ব্রহ্মা বাস করেন, তাই তাহাকে ব্রহ্মলোক বলা হয়।

(২) কঃ উঃ—২।৩।১৬ ; বেঃ দঃ—৪।২।১৭ ; বৃঃ উঃ—৪।৪।২

(৩) দেবযানমার্গের অন্য নাম, ব্রহ্মপথ।

(৪) প্রঃ উঃ, ১।৯-১০

দেবযানমার্গে গমনকারী যথাক্রমে অর্চিঃ বা অগ্নি, অহঃ বা দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ, সংবৎসর, দেবলোক, বায়ু, সূর্য, চন্দ্রমা ও বিদ্যুৎ, বরুণ, ইন্দ্র এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। পরম পুরুষের নির্দেশানুযায়ী এক অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোক হইতে বিদ্যুৎ-লোকে আসিয়া দেবযান-যাত্রীকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। (১) ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির পর তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না। কেননা, তাঁহার চিত্ত সর্বদা ব্রহ্মে সমর্পিত হওয়ায় তাঁহার কোনরূপ বাসনা থাকে না, বাসনার একান্ত অভাবে কোনরূপ কার্যারম্ভের সম্ভাবনাও থাকে না, তাই তাঁহার কর্মফলভোগের প্রশ্ন উঠে না এবং প্রত্যাবর্তনের কোন হেতুও থাকে না। যিনি নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, মৃত্যুকালে তাঁহার মানবাত্মার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া উৎক্রান্তি হয় বটে, কিন্তু দেবযানে আর গমনের প্রয়োজন হয় না। স্থূল দেহ হইতে উৎক্রান্ত হইয়াই সেই মানবাত্মা পরব্রহ্মে লীন হইয়া যান। নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মোপাসকের ভিতর এই প্রভেদ। পিতৃযান-মার্গের যাত্রী যথাক্রমে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন (২), পিতৃলোক ও চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। চন্দ্রলোকই স্বর্গ। চন্দ্রলোকে পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের পর ভুক্তাবশিষ্ট কর্মফলভোগের উদ্দেশে তাঁহাদের পুনর্জন্ম হয়, অর্থাৎ স্থূলশরীরগ্রহণে

(১) ছাঃ উঃ—৫।১০।২

(২) দেবযান ও পিতৃযান মার্গের বিবৃতিতে অর্চিঃ, অহঃ, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, সংবৎসর, ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ইত্যাদির যে উল্লেখ আছে, সেই সকল শব্দের দ্বারা তৎ তৎ অভিমানিনী দেবতা বা কেন্দ্রীয় চিন্ময়ী শক্তিকে বুঝিতে হইবে। যেমন—অহঃ বা দিবসের অর্থ দিবসের অভিমানিনী দেবতা, ধূমের অর্থ ধূমাভিমানিনী দেবতা ইত্যাদি। মৃত্যু যখনই হোক না কেন, বিদ্বানের দেবযানে এবং অবিদ্বানের বা কেবল-কর্মীর পিতৃযানে গতি হয়।

পুনরায় তাঁহাদের এই স্থূললোকে বা পৃথিবীতে আসিতে হয়। (৩) প্রত্যাবর্তন-কালে তাঁহাদিগকে পিতৃযানমার্গেই ফিরিয়া আসিতে হয়। তবে পিতৃযানে চন্দ্রলোকে আরোহণের যে ক্রম তাহা চন্দ্রলোক হইতে অবতরণের সময় ঠিক সেই রকম থাকে না। অবতরণকালে ভুক্তাবশিষ্ট কর্মের সহিত জীবাত্মা বা মানবাত্মা চন্দ্রলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধূম, ধূম হইতে অভ্র বা বর্ষণশীল মেঘ এই ক্রমে অবতরণ বা প্রত্যাবর্তন করেন। বর্ষণশীল মেঘ হইতে বৃষ্টি এবং বৃষ্টি হইতে পৃথিবীতে তাঁহারা অবতরণ করেন। পৃথিবীতে অবতরণের পর তাঁহারা পৃথিবীজাত ধান্য, যব, তিল, মাষকলায় ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রীর বা অন্নের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়েন। সেই খাদ্যসামগ্রী ভক্ষণান্তে ভক্ষণকারী পুরুষের যে শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত তাঁহারা সংযুক্ত হয়েন। পশ্চাৎ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে শুক্র স্ত্রীযোনিতে নিষিক্ত হইলে, স্ত্রীগর্ভাশয়ে তাঁহারা অবশিষ্ট প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগের জন্য ভোগোপযোগী স্থূল শরীর গ্রহণ করেন। (৪)

যোগী-উপাসক এবং স্বর্গকামী কেবলকর্মী ব্যতীত আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে। তাহাদের যোগ-উপাসনা তো নাই এবং শাস্ত্রবিহিত সাধু ইষ্টজনক কর্মও নাই। শুধু তাহাই নহে, তাহারা কেবল শাস্ত্রনিষিদ্ধ অসাধু অনিষ্টকর কর্মে রত এবং কদাচারী। যথা—দস্যু, তস্কর ইত্যাদি। তাহাদের জন্য দেবযান বা পিতৃযান মার্গ নহে, ইহা ছাড়া এক তৃতীয় মার্গ। মৃত্যুর পর তাহারা সূক্ষ্মশরীরে সংযমনী নামক যমপুরে গমন করে, সেখানে কিছুকাল

তৃতীয় মার্গ—নিকৃষ্ট

(৩) বৃঃ উঃ—৬।২।১৬

(৪) রেতঃসিগ্ যোগোঽথ। যোনেঃ শরীরম্।—বেঃ দঃ, ৩।১।২৬-২৭। ছাঃ উঃ—৫।১০।৫-৬; বৃঃ উঃ—৬।২।১৬

নিজ নিজ দুষ্কর্মানুযায়ী যমদত্ত নরক-যন্ত্রণা-ভোগ করিয়া ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। (৫) পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা কীট, পতঙ্গ, দংশ, মশক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবদেহধারণে জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের মৃত্যু হয় শীঘ্র এবং জন্ম হয় বারংবার। (৬) কীট-পতঙ্গাদির দেহে প্রাক্তন কর্মফল ভোগের দ্বারা ক্ষয় হওয়ার পর, পুনরায় তাহারা মানব-দেহ প্রাপ্ত হয়।

পরলোকবাদ বেদসম্মত

কেহ কেহ বলেন যে, উপনিষদে পরলোকের কথা থাকিলেও, বেদের সংহিতাভাগে ইহা নাই। তাঁহাদের এই উক্তি ভ্রান্তিযুক্ত। ঋক-সংহিতার বহু স্থানে পিতৃলোকের ও দেবলোকের কথা আছে। (৭) ঋকমন্ত্র এক স্থানে স্পষ্ট বলিতেছেন—হে জীবাত্মা, তুমি স্থূল শরীর ও স্থূললোক ত্যাগ করিয়া ঐহিক ইষ্টাপূর্ত্তাদি শুভকর্মের ফলে সেই শ্রেষ্ঠ পিতৃলোকে গমন কর। (৮)

অন্য ধর্মে পরলোকবাদের প্রতিবিম্ব

কেবলমাত্র হিন্দুধর্মেই যে পরলোক বা সূক্ষ্মলোক স্বীকৃত, তাহা নহে। পারসিক ধর্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম, ইস্লাম প্রভৃতি অন্য ধর্মেও ইহার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। স্বর্গ-নরকের কল্পনা ঐ সকল ধর্মেও স্থান পাইয়াছে। তাঁহারাও বলেন যে, ইহলোকই সর্বস্ব নহে—ইহলোকে শুভ ও অশুভ কর্মের ফলে পরলোকে মানুষের স্বর্গ বা নরক প্রাপ্তি হয়। ইহলোক-সর্বস্ব হইলে জগতে ধর্মাচরণ লোপ পায়—ইহা খাঁটী কথা।

(৫) সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ ॥—বেঃ দঃ, ৩।১।১৩

(৬) ছাঃ উঃ—৫।১০।৮ ; বৃঃ উঃ—৬।২।১৬

(৭) Vedic Culture, p. 337

(৮) সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্টাপূর্তেন পরমে ব্যোমন্।—ঋক, ১০।১৪।৮

[পাঁচ]

মুক্তিবাদ।

সৃষ্টিমণ্ডলে সমস্ত জীব জন্ম-মৃত্যুর অনন্ত প্রবাহের মাঝে ছুটিয়া চলিয়াছে—বিরাম নাই। জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর আবার জন্ম। পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুই সংসার। (১) ইহজগতে ভোগ্যবিষয়সম্ভার সম্মুখে স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে। কিন্তু ঐ বিষয়ভোগে প্রকৃত নিরাবিল ও দুঃখলেশশূন্য সুখ মিলে না—ভোগাকাঙ্খার নিবৃত্তি হয় না। যত খাই, তত চাই। অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তি নাই। পরিণামে দুঃখ। স্থূল দেহের বিকার আছে। মানুষ রোগ-শোক-জরা-বার্দ্ধক্যের অধীন। দুঃখময় এই শরীর-ধারণ। স্থূল শরীর ত্যাগের পর সূক্ষ্ম শরীরে সূক্ষ্মলোকেও কর্মফলজনিত সুখ-দুঃখ-ভোগ অনিবার্য। সূক্ষ্ম-লোকেও সুখভোগ ক্ষণস্থায়ী। আমরা চাই নিরাবিল ও দুঃখলেশশূন্য অবিমিশ্র সুখ বা ভূমানন্দ—যে আনন্দের শেষ নাই। (২) জন্ম-মৃত্যুরূপী ভবচক্রের অবিরাম আবর্তনের ভিতর তাহা লাভ করা যায় না। তাহাকে লাভ করিতে হইলে এই ভবচক্রের হাত হইতে মুক্ত হইতে হইবে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা ঐ ভূমানন্দ লভ্য। সেই হেতু ভূমানন্দের অপর নাম, ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই মুক্তি। মুক্তির অর্থ, ভবচক্র বা সংসার হইতে মুক্তি। পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তিনিই লীলার নিমিত্ত স্বয়ং

মুক্তির মর্ম—মুক্তিবাদ ও জন্মান্তরবাদ অবিরোধী

(১) দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্বর্গের অন্তর্গত মোক্ষের আলোচনাকালে সংসারসম্বন্ধে বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে।

(২) দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে বিষয়সুখ ও ভূমানন্দ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে।

অবিদ্যার বা অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সংযোগে, ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক জীবের আধারে জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠিত। জীবাত্মা যেন পরমাত্মার বিকৃত রূপ—পরমাত্মা জীবাত্মার স্বরূপ। অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া স্বরূপ ছাড়িয়া জীবাত্মা যেন বিকৃত রূপে জীব-শরীরে অবস্থান করিতেছেন। সেই হেতু তিনি প্রকৃতিজাত কাম-কর্মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এই কাম-কর্মের শৃঙ্খলই তাঁহাকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। জ্ঞানভূমিতে জীবাত্মার স্বরূপে বা পরমাত্মাতে অবস্থান হইলে, এই অজ্ঞানজনিত কাম-কর্মের শৃঙ্খল কাটিয়া যায়, তখন তিনি সংসার হইতে মুক্ত হন। স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। (৩) ইহার নাম—মুক্তিবাদ। জন্মান্তরবাদের সহিত মুক্তিবাদের বিরোধ নাই। মুক্তির পর আর পুনর্জন্ম হয় না ; কিন্তু যতদিন মুক্তি না হয়, ততদিন পুনর্জন্ম আছে এবং ততদিন জন্ম-মৃত্যুর ভবচক্র বা সংসারও বিদ্যমান থাকে। মুক্তির পর পুনর্জন্ম নাই, ইহা যেমন সত্য—যতদিন মুক্তি না হয় ততদিন পুনর্জন্ম আছে, ইহা তেমনি সত্য।

মুক্তির পাঁচ অবস্থা

হিন্দুশাস্ত্রে সাধারণতঃ পঞ্চবিধ মুক্তি উল্লিখিত—সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য, সার্ষ্টি ও নির্বাণ। (৪) প্রকৃতপক্ষে, এই পাঁচটি মুক্তির পাঁচ প্রকার নহে। মুক্তি একই প্রকার, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মলাভই মুক্তি। ব্রহ্ম এক প্রকার ব্যতীত নানা প্রকার নহেন ; অতএব, মুক্তিও স্বরূপতঃ এক প্রকার ব্যতীত নানা

---

(৩) স্বরূপাবস্থিতির্মুক্তিঃ।—যোঃ বাঃ, উৎপত্তিপ্রকরণ।

(৪) মুক্তিন্ত শৃণু মে পুত্র সালোক্যাদি চতুর্বিধং।
সালোক্যং লোকপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ সামীপ্যং তৎসমীপতা॥
সাযুজ্যং তৎস্বরূপত্বং সার্ষ্টিস্তু ব্রহ্মণো লয়ং।
ইতি চতুর্বিধা মুক্তিনির্বাণঞ্চ ততঃপরং।—হেমাদ্রৌ ধর্মশাস্ত্রম্।

প্রকার হইতে পারে না। সেই কারণ বলা যাইতে পারে যে, শাস্ত্রোক্ত ঐ পঞ্চবিধ মুক্তি—এক মুক্তিরই পঞ্চবিধ অবস্থা। সাধনার পথে উঠিতে থাকিলে এই পাঁচ অবস্থা ক্রমোচ্চ ভাবে সাধকের উপলব্ধি হয় মাত্র। সালোক্যের অর্থ, সহলোক—সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরের সহিত একলোকে অবস্থিতি। সামীপ্যের অর্থ, সমীপস্থ হওয়া—পরমেশ্বরের সহিত একত্র অবস্থিতি। সাযুজ্যের অর্থ, সহযোগ—পরমেশ্বরে যুক্ত হইয়া অবস্থিতি; ব্রহ্মের ভাবভেদের লয়ের নাম, সাষ্টি; এই অবস্থায় নির্গুণ-সগুণ ব্রহ্মের ভেদ থাকে না, ব্রহ্মের তখন এক ভাব। নির্বাণের অর্থ, লীন হওয়া—পরব্রহ্মের মহান্ সত্তায় জীবাত্মার লয়। মুক্তির এই পাঁচ অবস্থার ভিতর একটি ক্রমোচ্চ স্তর বিদ্যমান। (৫) মুক্তি-সাধকের সাধনার পথে প্রথম অনুভূতি হয় সালোক্য অবস্থার। এই অবস্থায় তিনি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন যে, সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পান যে, মহাসমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত অনন্ত বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মসমুদ্রে ভূলোক ও দ্যুলোক ইত্যাদি সব ভাসমান, তিনি ভূলোকের অধিবাসী হইলেও ঐ অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রের গর্ভেই অবস্থিত। ইহাই সাধকের সালোক্য মুক্তি, বা পরমেশ্বরের সহিত একলোকে অবস্থিতি। সাধনার পথে আরো উঠিলে অনুভূতি হয় সামীপ্য অবস্থার। এই অবস্থায় সাধক যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পান যে, সকল স্থানেই পরমেশ্বরের উজ্জ্বল চক্ষুঃ জ্বলিতেছে, যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই পরমেশ্বরের চক্ষুঃ জাজ্বল্যমান—বিশ্বতশ্চক্ষুর। ইহাই সাধকের সামীপ্য মুক্তি, বা পরমেশ্বরের সহিত একত্র অবস্থিতি। সাধনার পথে আরো উঠিলে অনুভূতি হয় সাযুজ্য অবস্থার। এই অবস্থায় সাধক উপলব্ধি করেন যে, শিশু যেমন মাতৃবক্ষে স্তনদুগ্ধপানে

(৫) স্বর্গীয় শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষাল কৃত—মুক্তি এবং তাহার সাধন।

নিযুক্ত থাকে, তেমনি তাঁহার ব্যষ্টিগত জীবাত্মা যেন সেই বিশ্বব্যাপী পরমাত্মায় সংযুক্ত হইয়া অমৃতধারাপানে মগ্ন। ইহাই সাধকের সাযুজ্য মুক্তি। সাধনার পথে আরো উঠিলে অনুভূতি হয় সার্ষ্টি অবস্থার। এই অবস্থায় সাধক উপলব্ধি করেন যে, জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তারূপী সগুণ ব্রহ্ম এবং বিশ্বাতীত নির্গুণ ব্রহ্ম এক বস্তু, তাঁহাদের মধ্যে ভেদ নাই। ইহাই সাধকের সার্ষ্টি মুক্তি। সাধনার পথে আরো উঠিলে সাধকের জীবাত্মা পরমাত্মায় বা পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, অর্থাৎ তিনি তখন তাঁহার ব্যষ্টিগত সত্তা অনন্ত ব্রহ্মসত্তায় হারাইয়া ফেলেন। ইহাই সাধকের নির্বাণ মুক্তি। নির্বাণ মুক্তির পর আর পুনর্জন্ম হয় না। (১) সগুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ সালোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসকগণ সার্ষ্টি ও নির্বাণ মুক্তি লাভ করেন।

জ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ

ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মলাভই মুক্তি। শাস্ত্র বলিয়াছেন—ঋতে জ্ঞানাৎ ন মুক্তি, জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি বা ব্রহ্মদর্শন হয় না। বেদ-মন্ত্র বলিতেছেন—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যপন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। অর্থাৎ—সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে, পরমপদ-প্রাপ্তির জন্য দ্বিতীয় পথ নাই। (২) এই বেদমন্ত্রেও মুক্তি যে জ্ঞানগম্য তাহাই বলা হইয়াছে। (৩) এখন প্রশ্ন—সেই জ্ঞানটি কি প্রকার? সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, জীবজগৎ সমস্তই ব্রহ্ম—এই তত্ত্বজ্ঞান। ব্রহ্ম এক এবং

(১) অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।—বেঃ দঃ, ৪।৪।২২

(২) যজুঃ—৩১।১৮

(৩) এই বেদমন্ত্রে যে 'মৃত্যু' শব্দ আছে, তাহার অর্থ জড়দেহের নাশরূপ ভৌতিক মৃত্যু নহে। ইহার অর্থ জন্ম-মরণরূপ ভবচক্রে জীবাত্মার বন্ধন; কেননা, বস্তুতঃ এই বন্ধনই জীবের মৃত্যু। ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই ভববন্ধনরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়।

তাঁহাতে নানাত্ব নাই, নানাত্ব যাহা দেখিতেছি তাহা অজ্ঞানপ্রসূত ও কল্পিত, এক পরমাত্মা বা ব্রহ্ম এই বিশ্বের সর্বত্র বিদ্যমান এবং এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ পরমার্থতঃ তাঁহারই শক্তির বা ঐশ্বর্যের প্রতিবিম্বস্বরূপ—এইরূপ যে সুস্পষ্ট নিশ্চয়, তাহাই তত্ত্বজ্ঞান বা সম্যক্ জ্ঞান (৪)। শ্রুতি বলিয়াছেন—প্রতিবোধবিদিতং মতং। (৫) অর্থাৎ—প্রতি বুদ্ধি-প্রত্যয়ের প্রত্যগাত্মারূপে ব্রহ্ম যখন বিদিত হন, তখনই লাভ হয় প্রকৃত জ্ঞান। বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যাত্মশাস্ত্রপাঠে শাস্ত্রজ্ঞানী হওয়া যায়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া যায় না। তত্ত্বজ্ঞান—বোধিজাত। ইহা উৎপন্ন হয় সাধনার সাহায্যে সাধকের বিবেক বা প্রজ্ঞা হইতে। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে শাস্ত্রজ্ঞানের প্রয়োজন থাকে না। সেই অবস্থায় সাধকের আর অহং-বোধ থাকে না, অর্থাৎ 'আমি ও আমার' এই জ্ঞান থাকে না। তখন সর্বত্র ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের বিদ্যমানতাই দর্শন হয়; সাধক নিজেও সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের, এই বোধ দৃঢ় হয়। এই অবস্থায় তাঁহার আর ভোগ-বাসনা থাকে না, কাম-কর্মের প্রবৃত্তি থাকে না, কাম-কর্মের নাশ হয়। (৬) কাম-কর্মের নাশই গ্রন্থিভেদ এবং গ্রন্থিভেদই মুক্তি।

(৪) অনাদ্যন্তাবভাসাত্মা পরমাত্মেহ বিদ্যতে।
ইত্যেব নিশ্চয়ঃ স্ফারঃ সম্যক্‌জ্ঞানং বিদুর্বুধাঃ॥ —যোঃ বাঃ, উপশমপ্রকরণ।

(৫) কেঃ উঃ—২।৪

(৬) শ্রীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—সকাম কর্ম, বিষয়ভোগের চিন্তা এবং বিষয়-ভোগের বাসনা এই তিনটি সংসার-বন্ধনের হেতু; সর্বদা সর্বত্র সর্বতোভাবে ব্রহ্মদর্শনের এবং ব্রহ্মের সহিত একত্ব-বোধের দৃঢ় বাসনার দ্বারা এই তিনটির লয় হয়। সকাম কর্মের নাশে বিষয়ভোগ-চিন্তার নাশ এবং বিষয়ভোগচিন্তার নাশে বিষয়ভোগ-বাসনার নাশ হয়। ব্রহ্মানুভূতি বা ব্রহ্মজ্ঞানের বাসনা বিশেষভাবে প্রকাশিত হইলে, চিত্তে 'আমি ও আমার' ভাব এবং আমার বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষা লুপ্ত হয়। —বিঃ চূঃ, ৩১৬-৩১৭

ব্রহ্মের দুইভাব—নির্গুণ ও সগুণ। নির্গুণ ব্রহ্ম ধারণাতীত। সেই নিমিত্ত নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা দুঃসাধ্য। সচরাচর আমরা জগতের স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তারূপে সগুণ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকি। যে উপাসক যাহার ধ্যান বা চিন্তা করেন, তিনি সেই ধ্যেয় বস্তুর রূপ লাভ করেন। (১) সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহা সগুণ ব্রহ্মের। এইরূপ উপাসকের সগুণ-ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়। স্থূল দেহের অবসানে তাঁহার সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর সহ জীবাত্মা মস্তকে সুষুম্না নাড়ীর ভিতর দিয়া উৎক্রান্ত হইয়া দেবযানমার্গে কার্যব্রহ্মের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের বা ব্রহ্মার লোকে গমন করেন। ইহাই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি। এই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির পর সগুণ উপাসক ব্রহ্মলোকে এক কল্পকাল ব্রহ্মার সহিত অবস্থান করেন। কল্পান্তে মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মলোকের বিনাশকাল উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মলোকবাসী সকল সূক্ষ্মশরীরী জীব নির্গুণ ব্রহ্মের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া, ব্রহ্মাসহ নির্গুণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন এবং নির্গুণ পরব্রহ্মের সত্তায় লীন হইয়া যান। সেই সঙ্গে সগুণ উপাসকের জীবাত্মাও পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন। তাঁহাদিগকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। এইভাবে সগুণ ব্রহ্মোপাসকের স্থূলশরীরনাশের পর দেবযানমার্গে ঐ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির নাম—ক্রমমুক্তি। ক্রমমুক্তিকে সাযুজ্য মুক্তি বলিতে পারা যায়। (২) যদি কোন উপাসক ইহজন্মেই নির্গুণ ব্রহ্মের

মুক্তি তিন প্রকার—ক্রমমুক্তি, বিদেহ মুক্তি ও জীবন্মুক্তি

(১) ইহাকে তৎক্রতুন্যায় কহে।

(২) ক্রমমুক্তিতে ব্রহ্মলোকে অবস্থান-কালে জীবাত্মার ব্রহ্মার মত অনিমাদি কতকগুলি ঐশ্বর্যলাভ হয়; কিন্তু ব্রহ্মার বৈকৃতিক সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি শক্তি তাঁহার লাভ হয় না।

উপাসনায় সমর্থ হন, তবে তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। বর্তমান স্থূল দেহের অবসানে তাঁহার জীবাত্মা সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর সহ সুষুম্না নাড়ীর ভিতর দিয়া উৎক্রান্ত হইয়া, একেবারে নির্গুণ ব্রহ্মে বা পরব্রহ্মে লীন হইয়া যান; তাঁহাকে আর দেবযানমার্গে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয় না। বর্তমান স্থূল দেহের নাশেই তাঁহার সদ্যমুক্তি হয়, ইহার নাম—বিদেহমুক্তি। বিদেহমুক্তিকে নির্বাণমুক্তি বলিতে পারা যায়। প্রারব্ধ কর্মফলভোগের জন্য বর্তমান দেহ। অতএব, বর্তমান স্থূল দেহের অবসান না হওয়া অবধি নির্গুণ উপাসকের নির্বাণমুক্তি হয় না। এই স্থূলদেহটাই নির্বাণমুক্তির প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, ঐ কর্মফলভোগের দ্বারা ইহার ক্ষয়ের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যদি কোন নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক বর্তমান স্থূল দেহে সম্পূর্ণভাবে পরব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারেন এবং বর্তমান দেহের প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও স্বরূপে বা পরব্রহ্মে অবস্থান করিতে সমর্থ হন, তবে জীবদ্দশাতেই এই স্থূলশরীরে তিনি মুক্তিলাভ করেন। সেই মুক্তির নাম—জীবন্মুক্তি। জীবন্মুক্ত পুরুষের অহংবোধ—'আমি ও আমার' বোধ ও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-বোধ — আদৌ থাকে না। তাঁহার জীবাত্মা এই স্থূল দেহেই পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হন। তাঁহার জড় দেহটি থাকে কেবল প্রারব্ধক্ষয়ের জন্য। দেহপাত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার দেহযন্ত্রটি যেন আপনাআপনিই কাজ করিতে থাকে। দেহপাত হইলে আর তাঁহাকে দেহধারণ করিতে হয় না। (৩)

---

(৩) কোন কোন আচার্য জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না, ক্রমমুক্তি ও বিদেহমুক্তি এই দুইটি স্বীকার করেন। আচার্য শঙ্কর জীবন্মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার কৃত বিবেকচূড়ামণিতে জীবন্মুক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন [বিঃ চূঃ, ৪২৮-৪৪১]

হিন্দুধর্মে মুক্তিই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু মুক্তির সাধনা অতীব কঠিন। দুই এক জন্মে সিদ্ধিলাভ হয় না। জন্ম-জন্মান্তর এই সাধনার পথে চলিতে হয়। ইহজন্মের সাধনা নষ্ট হয় না। ইহার সংস্কার সূক্ষ্মশরীরে অঙ্কিত হইয়া যায়। সেই সংস্কারানুযায়ী পুনর্জন্ম হয়। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। (১) ইহজন্মে সাধনার পথে যতদূর অগ্রসর হওয়া যায়, পরজন্মে তাহার পর হইতে আবার অগ্রগতি আরম্ভ হয়। হিন্দুধর্ম আরো বলেন যে, মুক্তি অবশেষে অবশ্যম্ভাবী।

জীবগণের সূক্ষ্মগতি উর্ধ্বমুখী—অতএব মুক্তি সুনিশ্চিত

একজন্মে-না-একজন্মে জীবের মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত। প্রত্যেক জীবের সূক্ষ্মগতি উর্ধ্বমুখী। সকল জীবই মুক্তির অভিমুখে অজ্ঞাতসারে স্বভাবতঃ চলিয়াছে। তরু-লতা-উদ্ভিদাদি নিম্নতম জীবসমূহও একদিন মুক্তিলাভ করিবে। স্বাভাবিক প্রগতি অনুসারে তাহারাও ক্রমশঃ ধাপে ধাপে উঠিয়া একদিন-না-একদিন মানবজন্ম লাভ করিবে। স্থূললোকে স্থূলশরীরী জীবজন্মের মধ্যে মানবজন্ম শ্রেষ্ঠ। মানবদেহে জ্ঞানতন্তু থাকায় এবং চৈতন্যের অধিকতম বিকাশ হওয়ায় মুক্তি-সাধনার যথেষ্ট সম্ভাবনা। কাজেই আজ যে উদ্ভিদ্, সে-ও একদিন-না-একদিন মানবজন্মলাভে মুক্তিসাধনায় ব্রতী হইতে পারিবে।

[ছয়]

ত্যাগবাদ।

হিন্দুধর্মের মতে, ত্যাগই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ত্যাগের দ্বারা যে শক্তিলাভ হয়, তাহা অজেয়—সর্বজয়ী। (২) ত্যাগেনৈকে

---

(১) ১৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ত্যাগই মহাশক্তি। যাহার ভিতর এই মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, সে সমগ্র জগৎকে গ্রাহ্যের ভিতর আনে না। —স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতে বিবেকানন্দ।

অমৃতত্বমানশুঃ (১), ত্যাগের দ্বারা মহাত্মাগণ অমৃতত্বলাভ করিয়াছিলেন। সেই অমৃতত্ব—ভূমানন্দ। ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যং ; (২) — অর্থাৎ, যাহা ভূমা তাহাই অমৃত বা অবিনাশী এবং যাহা অল্প তাহা মর্ত্য বা বিনাশশীল। সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের বা সগুণ ব্রহ্মের সর্বব্যাপকত্বের সাক্ষাৎ অনুভূতিতে যে আনন্দ লাভ হয়, তাহাই ভূমানন্দ ।(৩) ভোগপরায়ণ স্বার্থসঙ্কুচিত চিত্তে বিষয়ভোগে অল্প সুখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে সেই মহান্ ভাবের অনুভূতি সুদূর-পরাহত এবং ভূমানন্দলাভ অসম্ভব। ভূমানন্দ লাভ করিতে প্রয়োজন, স্বার্থবলির দ্বারা চিত্ত-সম্প্রসারণ। ইহার নাম —ত্যাগবাদ।

শ্রুতির এই সনাতন সত্য ক্রমশঃ রূপায়িত হইয়া উঠে উত্তরকালে সকল হিন্দুশাস্ত্রের মাঝে নানা রঙ্গে নানা দিকে। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ হিন্দুর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, ও সামাজিক জীবনের সুগঠন-সুপরিচালনের উদ্দেশে যে সব মানবধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু এই ত্যাগবাদ। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য ব্যক্তির জীবনে রিপু বা শত্রু বলিয়া পরিগণিত। স্বার্থান্ধ ভোগপরায়ণ মানবের ভোগলালসাই কাম। সেই কাম-তৃপ্তির পথে প্রতিবন্ধ ঘটিলে, দেখা দেয় ক্রোধ। লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য এ সবেরও আদিকারণ ঐ কাম। এইগুলি ব্যক্তিকে স্বার্থকেন্দ্রিক এবং চিত্তকে কলুষিত করিয়া ক্রমে ক্রমে আসুরিক ভাবাপন্ন করিয়া তোলে, তাহার দিব্যজীবনলাভের পরিপন্থী হয়। অতএব, এইগুলি রিপু বা শত্রু। ব্যক্তির সত্তায় ত্যাগভাব জাগ্রত না হইলে, এই সকল

(১) কৈঃ উঃ, ১।২

(২) ছাঃ উঃ—৭।২৪।১

(৩) ১৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রিপুর হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। ত্যাগবাদ বিসর্জন দিয়া ধর্মাচরণ হয় না। (৪)

যাঁহারা নিবৃত্তিমার্গের সাধক, অর্থাৎ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী, তাঁহাদের পক্ষে শুভ ও অশুভ সর্বপ্রকার বাসনা-ত্যাগের বিধি। যাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গের সাধক, অর্থাৎ গৃহী, তাঁহাদের নিত্যকর্মের মধ্যে পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধি। গৃহস্থের পঞ্চঋণ-পরিশোধের নাম — পঞ্চযজ্ঞ। পঞ্চঋণ — দেবঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, নৃ-ঋণ ও ভূতঋণ। এখানে দেবগণের, পিতৃগণের, ঋষিগণের, নৃগণের ও ভূতগণের উদ্দেশ্যে স্বার্থত্যাগের বা স্বার্থবলির নাম — যজ্ঞ।

হিন্দুশাস্ত্রে ব্যক্তির বা সমাজের স্বাধিকারের কথা নাই, আছে স্বধর্মপালনের কথা। (৫) স্বধর্মের অর্থ, স্বীয় কর্তব্য। কর্তব্যের অর্থ, অপরের প্রতি নিজের করণীয়। স্বার্থ-ত্যাগের কথা। কর্তব্যপালনে হয় স্বার্থবলি, চিত্তশুদ্ধি ও হৃদয়-প্রসারণ। নচেৎ পরমাত্মার অনুভূতি আসে না। ক্ষুদ্র স্বার্থ-সঙ্কুচিত কাম-কলুষিত চিত্তে সেই মহান্, উদার, পবিত্র, অক্ষর আত্মার সাক্ষাৎকার অসম্ভব। স্বাধিকারমত্তজীব—ক্ষমতাপ্রয়াসী, স্বার্থকেন্দ্রিক, লোভী ও অহঙ্কারী। তাই, তাহার সঙ্গে অন্যের সংঘর্ষ অনিবার্য। অনবরত অন্যের সহিত স্বার্থ-সংঘর্ষে সুখ-শান্তি পাওয়া যায় না। সেই নিমিত্ত হিন্দুশাস্ত্রে স্বাধিকারের স্থান নাই। হিন্দুশাস্ত্র তাই নির্দেশ

(৪) ত্যাগই ধর্মের আরম্ভ—ত্যাগই ধর্মের সমাপ্তি।

—স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতে বিবেকানন্দ।

(৫) পাশ্চাত্য দেশে কর্মের অর্থ, স্বাধিকারভোগ (exercise of rights) আমাদের সমাজে কর্মের অর্থ, স্বধর্ম-পালন।

—স্বামী প্রজ্ঞানন্দকৃত, ভারতের সাধনা।

দিয়াছেন—পুত্রের প্রতি পিতামাতার কর্তব্যের বিষয়, পিতামাতার স্বাধিকারের বিষয় নহে; পিতামাতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যের বিষয়, পুত্রের স্বাধিকারের বিষয় নহে; স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যের বিষয়, স্ত্রীর স্বাধিকারের বিষয় নহে; স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্যের বিষয়, স্বামীর স্বাধিকারের বিষয় নহে; ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর কর্তব্যের বিষয়, ভগ্নীর স্বাধিকারের বিষয় নহে; ভগ্নীর প্রতি ভ্রাতার কর্তব্যের বিষয়, ভ্রাতার স্বাধিকারের বিষয় নহে; প্রতিবেশীর প্রতি নিজের কর্তব্যের বিষয়, নিজের স্বাধিকারের বিষয় নহে; সমাজের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্যের বিষয়, ব্যক্তির স্বাধিকারের বিষয় নহে; ব্যক্তির প্রতি সমাজের কর্তব্যের বিষয়, সমাজের স্বাধিকারের বিষয় নহে; রাজার প্রতি প্রজার কর্তব্যের বিষয়, প্রজার স্বাধিকারের বিষয় নহে; প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্যের বিষয়, রাজার স্বাধিকারের বিষয় নহে। হিন্দুর কি ব্যক্তিগত, কি পারিবারিক, কি সামাজিক জীবনে এই সকল শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্যের বা স্বধর্মের মাঝে সর্বদা হৃদয়ে জাগাইয়া দেয় ত্যাগভাব। ব্যক্তির শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্যসম্পর্কে প্রসঙ্গতঃ একটি কথা স্মরণযোগ্য। হিন্দুশাস্ত্র এ কথা বলেন না যে, সর্বদেশে সর্বকালে সর্বাবস্থায় ব্যক্তির কর্তব্য একই প্রকার। জগৎ বৈচিত্র্যময়, ব্যবহার বৈচিত্র্যময়। পরিবেশের বিচিত্রতাহেতু ব্যক্তির কর্তব্যও নানারূপী। যেমন—বর্ণাশ্রমভেদে ব্যক্তির কর্তব্য বিভিন্ন। ব্রাহ্মণের কর্তব্য এক প্রকার, ক্ষত্রিয়ের আর এক প্রকার। গৃহীর কর্তব্য এক প্রকার, সন্ন্যাসীর আর এক প্রকার।

পঞ্চম অধ্যায়।

বর্ণাশ্রমধর্ম ও সামান্যধর্ম।

হিন্দুধর্ম্মের (১) দুই ভাব—সামান্য ও বিশেষ। জাতি-কুল-অবস্থা-নির্বিশেষে হিন্দুমাত্রেরই নীতিসম্মত আচরণীয় শুভ কর্ম—সামান্যধর্ম্ম। হিন্দুসমাজে বিশেষ বিশেষ কালে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ বিশেষ পরিবেশে ব্যক্তিগত হিন্দুর নীতিসম্মত আচরণীয় শুভ কর্ম—বিশেষধর্ম্ম। (২) বর্ণাশ্রমধর্ম বিশেষধর্ম্মের মধ্যগত। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমের বিভাগবশতঃ যে সকল কর্ম প্রত্যেক বর্ণীর ও প্রত্যেক আশ্রমীর বিশেষ বিশেষ ভাবে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট, সেই সকল আচরণীয় কর্ম—বর্ণাশ্রমধর্ম। এইস্থলে এক বর্ণান্তর্গত বা আশ্রমান্তর্গত ব্যক্তির শাস্ত্রবিহিত কর্ম, অন্য বর্ণান্তর্গত বা আশ্রমান্তর্গত ব্যক্তির অনুষ্ঠেয় নহে। ইহাই ধর্মের বিশেষ রূপ বা ভাব। প্রথমে বর্ণাশ্রমধর্ম এবং পশ্চাৎ সামান্য ধর্ম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

সামান্য ও বিশেষ ধর্ম

[এক]

বর্ণধর্ম।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণ। এখানে বর্ণ শব্দের অর্থ, শুক্লপীতাদি গাত্রের রঙ নহে—চরিত্রের রূপ। প্রকৃতপক্ষে, এক এক বর্ণ—এক এক শ্রেণী। যে ব্যক্তি যে শ্রেণীর অন্তর্ভূত,

---

(১) এখানে ধর্মশব্দে ধর্মাচরণ বুঝিতে হইবে।

(২) ৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাহার ভিতর সেই শ্রেণীর চরিত্র-বিকাশ হয় স্বভাবতঃ। একজন ব্রাহ্মণের ভিতর ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর, একজন ক্ষত্রিয়ের ভিতর ক্ষত্রিয়-শ্রেণীর, একজন বৈশ্যের ভিতর বৈশ্য-শ্রেণীর এবং একজন শূদ্রের ভিতর শূদ্র-শ্রেণীর চরিত্র রূপায়িত হইয়া উঠে। হিন্দুসমাজে এই চারি শ্রেণী-বিভাগের নাম—বর্ণ-বিভাগ বা চাতুর্বর্ণ্য। এই বিভাগ গুণকর্মানুযায়ী। কেবলমাত্র হিন্দুসমাজে যে গুণকর্মানুযায়ী এই শ্রেণী-বিভাগ, তাহা নহে। সভ্য মানবসমাজে সর্বত্রই এইরূপ শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। পাশ্চাত্য সমাজেও প্রচারক (missionary), যোদ্ধা (military), বণিক্ (merchant) এবং শ্রমজীবী (labourer) এই চারি শ্রেণী বিদ্যমান। সকল মানুষের গুণ-কর্ম কখনো এক হইতে পারে না। ইহা প্রকৃতির নিয়ম নহে। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণযুক্তা। এই তিন গুণের সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি হয় না, বৈষম্যাবস্থায় সৃষ্টি। জীবমাত্রেই প্রকৃতিজাত। মানবও প্রকৃতিজাত। যেহেতু মানব প্রকৃতিজাত ও সৃষ্টিমণ্ডলের ভিতর, সেই হেতু তাহার মাঝে ঐ ত্রিগুণের বৈষম্য সর্বদা বর্তমান। কাহারও অন্তরে সত্ত্বগুণ বেশী এবং রজঃ ও তমঃ গুণ কম, কাহারও অন্তরে রজোগুণ বেশী এবং সত্ত্ব ও তমোগুণ কম, আবার কাহারও অন্তরে তমোগুণ বেশী এবং সত্ত্ব ও রজোগুণ কম। এক পিতামাতার চারি পুত্রের অন্তর্বৃত্তি এক নহে। গুণবৈষম্য-হেতু তাহাদের মধ্যে চরিত্র-বৈষম্য। সকল মানুষ সমান, এইরূপ সাম্যবাদ কথার কথা মাত্র। গুণ-বৈষম্যে বুদ্ধি-বৈষম্য এবং বুদ্ধিবৈষম্যে ক্রিয়াবৈষম্য ঘটে, ইহা পরীক্ষিত সত্য। আর্যহিন্দুসমাজের সংগঠন-কালে প্রাচীন আর্যঋষিগণ এই সত্যের উপলব্ধিতে গুণ-কর্মের বৈষম্যানুযায়ী এই বর্ণবিভাগ বা শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন সমাজের

চাতুর্বর্ণ্য

অভ্যুদয়কল্পে। যে শ্রেণীর যে কর্মে অধিকার, সেই শ্রেণীর সেই কর্ম বিহিত না হইলে, পূর্ণাঙ্গ সমাজের কাজ সুশৃঙ্খলায় চলিতে পারে না—বিপ্লব উপস্থিত হয়। আজো সকল সভ্য সমাজ এই মূলনীতি মানিয়া চলে। (১)

চাতুর্বর্ণ্যের বিভাগ গুণকর্মানুযায়ী এবং ইহার সৃষ্টি আর্যহিন্দু সমাজের অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনানুসারে স্বভাবতঃ

আর্যহিন্দুসমাজে চারি বর্ণের সৃষ্টি যে একই সময়ে হইয়াছিল, তাহা নহে। সমাজের ক্রমোবিকাশের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনানুসারে ইহাদের সৃষ্টি হয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। আর্যগণের আদি বাসস্থান, সুমেরু বা উত্তর মেরুপ্রদেশ। (২) সেই যুগ সত্যযুগ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। সেই যুগে আর্যহিন্দুসমাজের বিস্তৃতি হয় নাই—মাত্র এক ব্রাহ্মণ বর্ণই ছিল। শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব। (৩) পরবর্তী কালে আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিলে, ভারতের আদিবাসী অনার্যগণের সঙ্গে তাঁহাদের সংঘর্ষ ঘটে। আর্যগণকে শত্রুজ্ঞানে অনার্যগণ দলে দলে রণোন্মত্ত হইয়া আক্রমণ করিতে লাগিল। সর্বদা তাহাদের সহিত যুদ্ধে রত থাকিতে হইত আর্যগণকে। এই অবস্থায় আর্যহিন্দুসমাজ প্রয়োজন বোধ করিলেন এক শ্রেণী যোদ্ধার। আর্যব্রাহ্মণগণ ছিলেন সাত্ত্বিক বেদস্তোতা। তাঁহাদের দ্বারা যুদ্ধকার্য সম্ভব ছিল না। এই কারণ,

(১) বর্তমান সাম্যবাদের জন্মস্থান, রুশদেশ। সেই দেশেও যোগ্যতানুসারে শ্রেণী-বিভাগ আছে। অধ্যাপককে যোদ্ধার কাজ, আর যোদ্ধাকে অধ্যাপকের কাজ দেওয়া হয় না। অর্থগত শ্রেণীবিভাগও তথায় ধীরে ধীরে দেখা দিয়াছে। পূর্বে ব্যক্তিগত অর্থ বা সম্পত্তি নিষিদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু আজকাল কিছু পরিমাণ রাখা বিহিত হইয়াছে।

(২) ১—৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) বৃঃ উঃ—১।৪।১১
আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃনাং হংস ইতি স্মৃতঃ।—মহাভারত

আর্যগণের মধ্যে যাঁহারা রাজসোদ্রিক্ত হইয়া অনার্যদমনে, আর্যরাজ্য-বিস্তারে, বলবীর্যসঞ্চারে ও পূর্বোক্ত সাত্ত্বিক বেদস্তোতাগণের রক্ষণে ব্রতী হইলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় উপাধি লাভ করিয়া ক্ষত্রিয় বর্ণ বা শ্রেণী-ভুক্ত হইলেন। এই সময়টি শাস্ত্রে ত্রেতাযুগ বলিয়া কথিত। পরবর্তী-কালে রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আর্যহিন্দুসমাজের আরো বিস্তৃতি ঘটিল। সমাজের সংগঠন-সংরক্ষণের উদ্দেশে কৃষিবাণিজ্যাদির সাহায্যে সমাজের ধনসম্পত্তির উৎপাদন-বর্ধনের জন্য প্রয়োজন বোধ হইল আর এক শ্রেণী লোকের। বেদস্তোতা ব্রাহ্মণের বা যুদ্ধরত ক্ষত্রিয়ের দ্বারা এই সকল কাজ সম্ভব ছিল না। সমাজের সেই প্রয়োজন মিটাইতে যে সকল আর্য রজোতামসিক গুণে উদ্রিক্ত হইয়া কৃষি-বাণিজ্যাদিতে ব্রতী হইলেন, তাঁহারা বৈশ্য উপাধি লাভ করিয়া বৈশ্যবর্ণ বা বৈশ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন। আর্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ—আর্যের তিন বর্ণ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। এইভাবে আর্যগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। অনার্য-গণের সহিত যুদ্ধকালে যে সকল অনার্য পরাজিত হইয়া বিজয়ী আর্যগণের বশ্যতা স্বীকার করিল, তাহাদিগকে আর্যগণ দাস বলিতেন। আর্যসংস্কৃতির ও আর্যসভ্যতার অভাবে তাহারা সে যুগে আর্যগণের কোন শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে নাই। বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষতা না থাকায় তাহারা শ্রমের কাজ ব্যতীত অন্য কাজের অনুপযুক্ত ছিল। সেই নিমিত্ত, বিজেতা আর্যগণ সেই বিজিত অনার্যগণকে দাসরূপে শ্রমের বা সেবার কাজে নিযুক্ত করিলেন। (৪) তাহাদের অন্তরে তমোগুণের প্রাধান্য ছিল। বিজিত অনার্যগণ ছিল জিতদাস। ইহা

---

(৪) বৈদিক যুগে এক প্রকার দাস প্রথা ছিল। গবাশ্বাদির মত দাস-দাসীর আদান-প্রদান চলিত। ঋকমন্ত্রে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ঋষিগণ যজ্ঞস্থলে যেমন গবাশ্বাদি দক্ষিণা পাইতেন, তেমনি দক্ষিণাস্বরূপ দাস-দাসীও পাইতেন।—বেদ-প্রবেশিকা।

ছাড়া ক্রীতদাসও ছিল। ভারতে বিস্তীর্ণ ভূমিলাভের পর, কৃষি ইত্যাদি কাজের জন্য শ্রমজীবী লোক বেশী না থাকায়, আর্যগণের সম্মুখে এক সমস্যা উপস্থিত হয়। জিতদাসের সংখ্যা বেশী ছিলনা। সেই কারণ, আর্যগণ গোধন ইত্যাদি দিয়া শ্রমজীবী অনার্যগণকে ক্রয় করিতেন। তাহারা ছিল ক্রীতদাস। এই জিতদাস ও ক্রীতদাস সমূহ আর্যগণের বশ্যতা স্বীকার করিলেও আর্যগণের ধর্ম-সংস্কার-উপাসনা গ্রহণ করে নাই। তাই, আর্যহিন্দুসমাজে তাহাদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়। একস্থানে ঋকমন্ত্রে (১) দেবরাজ ইন্দ্র বলিতেছেন—আমি দস্যুকে আর্যনাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছি। এখানে দস্যু শব্দের অর্থ শত্রু। সেকালে আর্যগণ অনার্যগণকে শত্রুবোধে দস্যু বলিতেন। (২) জিতদাস ও ক্রীতদাস বংশানুক্রমে ক্রমশঃ সংখ্যায় অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাহারা কালবশে পূর্বপুরুষ অনার্যগণের ধর্মাচরণ বিস্মৃত হইয়া আর্যগণের ধর্মভাবে প্রভাবান্বিত হয়। বৈদিক যুগের অবসানে সমাজ-ব্যবস্থাপক স্মার্ত ঋষিগণ, তাহাদের সেই পরিবর্তিত ও সংশোধিত অবস্থা দেখিয়া, তাহাদিগকে আর্যহিন্দুসমাজে প্রবেশাধিকার দান করেন এবং তাহাদের জন্য এক পৃথক্ বর্ণ বা শ্রেণী নির্দিষ্ট করেন। তাহাই চতুর্থ বর্ণ—শূদ্র। (৩) ইহাতে সমাজের এক অভাবও পূরিত হয়। পরবর্তী কালে আচারভ্রষ্ট ত্রৈবর্ণিক আর্যগণও সমাজে পতিত হইয়া শূদ্রবর্ণ

(১) ঋক, ১০।৪৯।৩

(২) মণ্ডলেশ্বর স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিকৃত—উপাসনা।

(৩) মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—বর্ণত্বাৎ ধর্মমর্হতি ; অর্থাৎ এখন দাসগণ বর্ণ সংজ্ঞায় পরিণত, অতএব ইহাদিগকে আচারপ্রভব ধর্ম দিতে হয়।

—উপাসনা।

প্রাপ্ত হইত। ভ্রষ্টাচারী পতিত আর্যগণের নাম—দ্বিজবন্ধু। (৪) যে কারণেই হৌক, মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুকে বেদাধিকার দেন নাই। পশ্চাৎ মহর্ষি বেদব্যাস তাহাদের এই অভাব পূরণ করেন। তিনি মহাভারত রচনা করিয়া, তাহার মাধ্যমে বৈদিক সত্যসমূহ বর্ণনির্বিশেষে স্ত্রী-পুরুষ সকলের কাছে প্রচার করেন। বেদের সার সত্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে নিহিত। এই গীতা মহাভারতের অন্তর্গত। গীতা-মহাভারতে স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধুর পূর্ণ অধিকার। তন্ত্র বেদানুগামী। শাস্ত্রকারগণ তন্ত্রশাস্ত্রেও তহাদের পূর্ণ অধিকার দিয়াছেন। এইরূপ আলোচনায় ইহা পরিস্ফুট যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি হয় গুণকর্মানুযায়ী এবং আর্যহিন্দুসমাজের অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজনানুসারে। (৫) গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন (৬)—চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ, গুণকর্মের বিভাগানুযায়ী আমাকর্তৃক চারি বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য—রাজাজ্ঞায় রাজবিধানে, অথবা কোন সমাজপতি পুরুষপুঙ্গবের দ্বারা, এই চারি বর্ণ সৃষ্ট হয় নাই; ইহা সমাজের স্বাভাবিক প্রগতির ফলে স্বভাবতঃই হইয়াছে। যাহা সমাজের প্রয়োজন মিটাইতে স্বভাবতঃ উদ্ভূত হয়, তাহা ভগবানের সৃষ্টি বুঝিতে হইবে—মানুষের সৃষ্টি নহে।

(৪) বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মপ্লাবনের সময় অনেক ত্রৈবর্ণিক আর্যহিন্দু বৌদ্ধ হন। পরে তাঁহারা পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আসেন; কিন্তু উপবীতত্যাগী হওয়ায় শূদ্রশ্রেণীতে প্রবেশ করেন।

(৫) শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে আদিতে এক ব্রাহ্মণবর্ণ ছিল এবং রাষ্ট্রপুরুষ পূর্ণভাবে কর্মকরণে অসমর্থ হওয়ায় প্রয়োজনবোধে পর পর ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের সৃষ্টি করিলেন।—বৃঃ উঃ, ১।৪।১১-১৩

(৬) গীঃ—৪।১৩

কেহ কেহ বলেন যে, চাতুর্বর্ণ্যের উল্লেখ বেদ-সংহিতায় নাই, ইহা পরবর্তীকালে স্মৃতির অনুশাসনে প্রবর্তিত হয়। ইহা ভুল ধারণা।

চাতুর্বর্ণ্যের প্রবর্তন বৈদিক যুগে

চতুর্বেদের ভিতর ঋগ্বেদ প্রাচীন, আবার ঋগ্বেদের ভিতর নিবিদ্ প্রাচীনতম অংশ। নিবিদ্সকলের শেষে একই প্রকারের প্রার্থনা সন্নিবিষ্ট—

প্রেদং ব্রহ্ম
প্রেদং ক্ষত্রং
প্রেদং সুন্বন্তং যজমানমবতু।

অর্থাৎ—ইহা প্রকৃষ্টরূপে ব্রহ্মসম্প্রদায়কে ও ক্ষত্রসম্প্রদায়কে রক্ষা করুক এবং সোমাভিষবকারী যজমানকে রক্ষা করুক। (১) এখানে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণের এবং ক্ষত্রসম্প্রদায়ের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-বর্ণের স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নিবিদের সময় বৈশ্যবর্ণের উৎপত্তি হয় নাই; তাই, বৈশ্যের উল্লেখ নাই। নিবিদ্ ব্যতীত ঋগ্বেদের পরবর্তী অংশেও বর্ণোল্লেখ দেখা যায়। প্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তে (২) চাতুর্বর্ণ্য-সৃষ্টির কথা সুবিদিত। কেহ কেহ বলেন, এই সূক্ত প্রক্ষিপ্ত। ইহাকে বাদ দিলেও ঋগ্বেদের অন্যত্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নাম পাওয়া যায়। (৩)

---

(১) বেদ-প্রবেশিকা।

(২) ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥—ঋক, ১০।৯০।১২; যজুঃ, ৩১।১১

প্রকৃতপক্ষে, ইহা একটি রাষ্ট্রপুরুষের বর্ণনা। এই পুরুষের মুখ—ব্রাহ্মণ, বাহু—ক্ষত্রিয়, উরু—বৈশ্য এবং পদ—শূদ্র।

(৩) যথা—ঋক, ৮।৩৫।১৮

এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই তিন বর্ণের বিষয় কথিত। ঋকমন্ত্রসমূহে ভরতবংশীয়, ইক্ষাকুবংশীয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজগণের বংশাবলীও পাওয়া যায়। সে সময় শূদ্রকে দাস বলা হইত। বহু ঋকমন্ত্রে এই দাসসম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়।—উপাসনা।

ঋগ্বেদে গৃৎসমদের সূক্তে (৪) 'পঞ্চকৃষ্টি' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ্ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত সমাজের কথা শ্রুত হওয়া যায়। (৫) যজুর্বেদ বলিয়াছেন—হে পরমাত্মন! এই জগতে তুমি বেদপ্রচারের জন্য ব্রাহ্মণকে, রাজ্যপালনের জন্য ক্ষত্রিয়কে, পশু আদি প্রজা রক্ষার জন্য বৈশ্যকে এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্য শূদ্রকে উৎপন্ন কর। (৬) এই সকল বেদমন্ত্রপাঠে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, চাতুর্বর্ণ্য বৈদিক যুগে প্রবর্তিত হইয়াছিল। তবে এ কথা ঠিক যে, উত্তরকালে সমাজ-ব্যবস্থাপক স্মার্ত ঋষিগণ বর্ণাশ্রমধর্মের প্রবর্তক না হইলেও—প্রতিষ্ঠাতা। বর্ণাশ্রমধর্মের বিশদ্ ব্যাখ্যা স্মৃতিশাস্ত্রে।

গুণকর্মানুযায়ী চারি বর্ণের শাস্ত্রবিহিত বৃত্তি সম্পর্কে এই স্থলে কিছু বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের বৃত্তি

ব্রহ্মণ্ + ষ্ণ = ব্রাহ্মণ্। বেদ, শব্দব্রহ্ম। যিনি শব্দব্রহ্ম বা বেদমন্ত্র ধারণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ। ইহাই ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। ব্রাহ্মণের গুণ সত্ত্বপ্রধান। সাত্ত্বিক কর্মই ব্রাহ্মণের ব্রত। তাঁহাদের মুখ্য কর্ম ছিল বেদমন্ত্রের উচ্চারণ। মন্ত্রোচ্চারণ মুখের কাজ। তাই, ব্রাহ্মণ রাষ্ট্রপুরুষের মুখ বা মুখজাত বলিয়া কীর্তিত। মনু মহারাজ বলিয়াছেন—পঠন, পাঠন, যজ্ঞ করা ও করান, দান এবং প্রতিগ্রহ বা গ্রহণ এই কয়টি

(৪) ঋক্—২।২।১০

(৫) বেদ-প্রবেশিকা।

(৬) ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণং ক্ষত্রায় রাজন্যং মরুদ্ভ্যো বৈশ্যং তপসে শূদ্রং * * *

—যজুঃ, ৩০।৫

ব্রাহ্মণের বৃত্তি। (৭) এইগুলি সাত্ত্বিক বৃত্তি। গীতা বলিয়াছেন—বাহ্যেন্দ্রিয়ের ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম; কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা; অন্তর্বহিঃশৌচ, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান ও তত্ত্বানুভূতি এবং শাস্ত্রে ও ভগবানে বিশ্বাস এই কয়টি ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম। (৮) এইগুলি সত্ত্বগুণোদ্ভূত।

ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি

ক্ষৎ+ত্রৈ+ড=ক্ষত্র। এই 'ক্ষত্র' শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ইয়' প্রত্যয় যোগে ক্ষত্রিয় শব্দ নিষ্পন্ন। যিনি ক্ষৎ অর্থাৎ নাশ হইতে রক্ষা করেন, তিনি ক্ষত্রিয়। ইহাই ক্ষত্রিয় শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। ক্ষত্রিয়ের গুণ স্বত্ত্বরাজসিক। ওজঃ বা বীর্য রজোগুণের পরিচায়ক। সমাজকে শত্রুর হাতে নাশ হইতে রক্ষা করিতে বীর্য বা বাহুবলের আবশ্যক। বাহুবলই ক্ষত্রিয়ের মুখ্য কাজ। তাই, ক্ষত্রিয় রাষ্ট্রপুরুষের বাহু বা বাহুজাত বলিয়া কল্পিত। মনু মহারাজ বলিয়াছেন—প্রজারক্ষণ অর্থাৎ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি এই কয়টি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। (৯) এই সত্তরাজসিক বৃত্তি। গীতা বলিয়াছেন—পরাক্রম, তেজ, ধৃতি, কর্মকুশলতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দানে মুক্তহস্ততা

(৭) অধ্যাপন মধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥

—মনু, ১।৮৮

(৮) শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥

—গীঃ, ১৮।৪২

(৯) প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েস্ব প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥

—মনু, ১।৮৯

এবং শাসনক্ষমতা এই কয়টি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম। (১) এইগুলি রজোগুণোদ্ভূত।

বৈশ্য ও বৈশ্যের বৃত্তি

বিশ+ষ্য = বৈশ্য। বেদে 'বিশঃ' ও 'জনাঃ' একার্থবোধক। অর্থ—প্রজাবর্গ। প্রাচীন আর্য-হিন্দুসমাজে বেদপ্রচারক ব্রাহ্মণ এবং সমাজরক্ষী অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয় বাদে অবশিষ্ট আর্যগণ কৃষি-বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত হইয়া অর্থোৎপাদনে রত হইলেন। তাঁহাদের সংখ্যা ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী, সেই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বিশ বা প্রজাবর্গ বা জনসাধারণ বলা হইত। তাঁহারাই বৈশ্য। বৈশ্যের গুণ রজোতামসিক। কৃষি-বাণিজ্যাদির কাজে উরুবলই প্রধান অবলম্বন। তাই, বৈশ্য রাষ্ট্র-পুরুষের উরু বা উরুজাত বলিয়া কল্পিত। মনু মহারাজ বলিয়াছেন—পশুপালন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, সর্বপ্রকার ব্যবসা, কুসীদ ও কৃষিকাজ এই কয়টি বৈশ্যের বৃত্তি। (২) এইগুলি রজোতামসিক বৃত্তি। গীতা বলিয়াছেন—কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজাত কর্ম। (৩) এইগুলি রজোতামসিক গুণোদ্ভূত।

'শুচ' ধাতু হইতে শূদ্র শব্দ নিষ্পন্ন। শুচ+রু+অ =শূদ্র। অর্থ—

শূদ্র ও শূদ্রের বৃত্তি

শোকদ্বারা আক্রান্ত। শোচতি ইতি শূদ্রঃ—যে শোকগ্রস্ত, সে শূদ্র। ইহাই শূদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। বিজিত অনার্যগণ বিজয়ী

(১) শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥—গীঃ, ১৮।৪৩

(২) পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিকপথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥—মনু, ১।৯০

(৩) কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।—গীঃ, ১৮।৪৩

আর্যগণের দাস ছিল। জিতদাস ও ক্রীতদাস উভয়েরই চিত্ত শোকগ্রস্ত থাকিত। (৪) আর্যাধিকারের পূর্বে ভারতভূমি ছিল অনার্যগণের নিজের দেশ এবং তাহারা ছিল স্বাধীন। আর্যাধিকারের পর নিজের দেশ হইল পরের দেশ, ছিল স্বাধীন হইল পরাধীন—এই অবস্থা-বিপর্যয়ে তাহাদের চিত্ত শোকগ্রস্ত হওয়া খুব স্বাভাবিক। এই কারণ, উত্তরকালে এই দাসগণ আর্যহিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া চতুর্থ বর্ণে পরিণত হইলে তাহাদের উপাধি হইল—শূদ্র। শ্রুতি আর এক কথা বলিয়াছেন—স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণম্, ঈশ্বর শূদ্রজাতীয় পূষার সৃষ্টি করিলেন। (৫) পূষার অর্থ, পোষণকর্তা। যিনি পোষণকর্তা তিনি শূদ্র। শ্রুতির এই বচন খুব তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রমজীবী শূদ্রের শ্রমের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি অপর তিন বর্ণ পুষ্টিলাভ করে, অতএব শূদ্র পূষা বা পোষণকর্তা। শূদ্রবর্ণ সমাজের পাদ, ভিত্তি বা আশ্রয়স্বরূপ। তাই, শূদ্র রাষ্ট্রপুরুষের পদ বা পদজাত বলিয়া কল্পিত। যেমন পদদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ দাঁড়াইতে সক্ষম, তেমনি শূদ্রের সেবার উপর নির্ভর করিয়া রাষ্ট্রপুরুষ দাঁড়াইতে সক্ষম। মনু মহারাজ বলিয়াছেন—নিন্দা, দ্বেষ ও অভিমান বর্জনে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সেবা শূদ্রের বৃত্তি। (৬) গীতাও বলিয়াছেন—পরিচর্যা শূদ্রদিগের স্বভাবজাত কর্ম। (৭) শূদ্রবর্ণে তমোগুণের প্রাধান্য। শূদ্রের এই সকল বৃত্তি ও কর্ম তমোগুণোদ্ভূত। তমঃ অর্থাৎ

(৪) উপাসনা।

(৫) বৃঃ উঃ—১।৪।১৩

(৬) একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥—মনু, ১।৯১

(৭) পরিচর্যাত্মকং, কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥—গী:, ১৮।৪৪

অজ্ঞানতার অন্ধকার। সে যুগে শূদ্রগণ আর্যশিক্ষা-সংস্কৃতির অভাবে মূর্খ ছিল। এই মূর্খতাই তাহাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার। বিদ্যারহিত হওয়ায় তাহারা শ্রমের বা সেবার কাজ ব্যতীত অন্য কাজের অযোগ্য ছিল।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এই চাতুর্বর্ণ্যবিভাগ হইয়াছিল গুণকর্মানুযায়ী —হিন্দুসমাজের যেন চারি শ্রেণী। এক এক বর্ণ বা শ্রেণী, সমাজের বা রাষ্ট্রপুরুষের এক এক অঙ্গ। রাষ্ট্রদেহকে সজীব ও সচল রাখিতে হইলে, চারি বর্ণের কোনটিকে বাদ দেওয়া চলে না। তাহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ বিহিত কর্ম যথাযথ সাধনের উপরই রাষ্ট্রের জীবনীশক্তি নির্ভর করে। প্রাচীন ঋষিগণ প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে এই সত্য দর্শন করিয়া এই বর্ণবিভাগ করিয়াছিলেন।

বর্ণান্তর-প্রাপ্তি

জন্মগত জাতিভেদ তখন ছিল না। অধুনা এক শ্রেণীর লোক বুদ্ধিজীবী, যথা—উকিল, ডাক্তার, বিচারক ইত্যাদি; আর এক শ্রেণীর লোক শিল্পজীবী, যথা—কুমার, কামার, ছুতার ইত্যাদি; আর এক শ্রেণীর লোক শ্রমজীবী, যথা—কৃষক, মজুর ইত্যাদি। এই যে শ্রেণীবিভাগ, ইহা ঠিক জন্মগত নহে—গুণ-কর্মগত। উকিলের পুত্র যে উকিল হইবে, কুমারের পুত্র যে কুমার হইবে, কৃষকের পুত্র যে কৃষক হইবে, তাহার কোন মানে নাই। উকিলের পুত্র যদি নিরক্ষর হয় ও তাহার জীবনধারণের উপায়ান্তর না থাকে, তবে সে কৃষক হইতে পারে। কুমারের পুত্র ছুতারের ব্যবসা অবলম্বনে ছুতার হইতে পারে। কৃষকের পুত্র উচ্চশিক্ষালাভে উকিল হইতে পারে। সমাজে কোন বাধা নাই। সেই রকম প্রাচীন কালে এক বর্ণের বা শ্রেণীর হিন্দু, নিজ গুণকর্মানুযায়ী ও যোগ্যতানুসারে অন্য তিন শ্রেণীর যে কোন শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া, তৎশ্রেণীভুক্ত হইতে

পারিতেন। মনু মহারাজ বলিয়াছেন—গুণকর্মানুযায়ী শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে পারে এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র হইতে পারে, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে। (১) সেকালে এইরূপ বর্ণান্তরপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ পরশুরাম ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হন। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। ক্ষত্রিয় পৃষধ্র শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। ক্ষত্রিয় ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল হন। নাভাগাদিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। পৌরাণিক সৃষ্টিবিবরণীতে বর্ণান্তরপ্রাপ্তির উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। (২) ইহা হইল প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। ঐতিহাসিক যুগেও গুণকর্মানুযায়ী বর্ণান্তরপ্রাপ্তির কাহিনী কিছু কিছু পাওয়া যায়। (৩) এখানে মাত্র দুই একটার উল্লেখ করা গেল। উৎকলের ময়ূরভঞ্জের ভঞ্জরাজবংশ, সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। প্রায় সাত শত বৎসর পূর্বে, ঐ বংশের একজন ক্ষত্রিয় রাজকুমার উড়িষ্যার 'বউদ্' নামক গড়জাতে যাইয়া, সেখানকার ব্রাহ্মণ-রাজ্য লাভ করিয়া, তিনি এবং তদ্বংশীয়গণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন। মেবারের মহারাণা সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া সর্বজনবিদিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত ডি, আর, ভাণ্ডারকর মহাশয় শিলা-লেখ-সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাস্তবিকপক্ষে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বপ্প ছিলেন ব্রাহ্মণ—তিনি

(১) শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ।— মনু, ১০।৬৫

অধুনা কোন কোন আচার্যের মতে, এই শ্লোকের অর্থ ইহা নয় যে, গুণকর্মানুযায়ী ইহজন্মেই বর্ণান্তরপ্রাপ্তি হয়। ইহার প্রকৃত অর্থ—ইহজন্মের গুণকর্মানুযায়ী কর্মফল-স্বরূপ পরজন্মে তদনুরূপ বর্ণে ও বংশে তাহার জন্ম হয়।

(২) শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যকৃত—চতুর্বর্ণ-বিভাগ।

(৩) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুকৃত—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।

আনন্দপুরবাসী নাগর-ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত। তিনি ক্ষত্রিয়োচিত রাজকার্যে লিপ্ত হওয়ায় ক্ষত্রিয় হন এবং তাঁহার বংশধরগণও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হন। যোধপুরে বন্ধারা নামক জাতি আদিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে তন্তুবায়ের ব্যবসা গ্রহণে ব্রহ্মক্ষত্রী বলিয়া পরিচিত হন।

প্রাচীন আর্যহিন্দুসমাজে এক বর্ণের হিন্দু অন্য বর্ণে বিবাহ করিতে পারিত। ইহার নাম—অসবর্ণ-বিবাহ। সেকালে চতুর্বর্ণের ভিতর সহভোজনও চলিত। বৈদিকযুগে একত্র পানাহারের ব্যবস্থা ছিল। অথর্ববেদ বলিয়াছেন—তোমাদের পান একসঙ্গে হৌক, অন্নভোজন একসঙ্গে হৌক; তোমাদিগকে একসঙ্গে এক মৈত্রীবন্ধনে যুক্ত করিয়াছি। (৪) কলিকালে পরাশর-স্মৃতি অনুসরণীয়, ইহা শাস্ত্রের কথা। সেই পরাশর-স্মৃতি বলেন—যে সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রিয়াবান এবং শুচিব্রতধারী তাঁহাদিগের গৃহে ব্রাহ্মণরা সর্বদা হব্যেকব্যে ভোজন করিবে। (৫) মহাভারতে জানা যায় যে, পাণ্ডবগণের বনবাসকালে স্বয়ং দ্রৌপদী রন্ধন করিয়া বাহ্মণদের ভোজন করাইতেন। অতীত কালে বৈশ্য ছিল রন্ধনকর্তা। (৬)

জন+ক্তি=জাতি। জনন বা জন্ম—জাতি। জাতিভেদের অর্থ, জন্মগত ভেদ। আদিতে চতুর্বর্ণ-বিভাগ হইয়াছিল গুণকর্মানুযায়ী—জন্মানুযায়ী নহে। সেই নিমিত্ত সেকালে চতুর্বর্ণ-বিভাগে জাতিভেদের স্থান ছিল না। সেই গুণকর্মগত চাতুর্বর্ণ্যপ্রথা ক্রমশঃ কেমন করিয়া

জাতিভেদ ও পঞ্চম বর্ণ

(৪) সমানী প্রপা সহ বোঽন্নভাগঃ সমানে যোক্ত্রে সহ বো যুনজ্মি।—অথর্ব, ৩।৩০।৬

(৫) ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যোবা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ
তদ্‌গৃহেষু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেষু নিত্যশঃ॥

(৬) শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য কৃত—জাতিভেদ।

জাতিভেদে পরিণত হইল, তাহা ভাবিবার কথা। ইহা যে অল্প দিনে হইয়াছিল, তাহা নহে। বেদবিদ্যার পঠন-পাঠন-রক্ষণের কাজ ছিল ব্রাহ্মণের। পিতা পুত্রকে ইহা শিক্ষা দিলেন। পুত্র আবার তাঁহার পুত্রকে শিক্ষা দিলেন। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে পিতা-পুত্র-পরম্পরায় এই বৃত্তি জন্মগত অধিকারে দাঁড়াইয়া গেল। ব্রাহ্মণ পিতার পুত্রও বেদজ্ঞ হইয়া ব্রাহ্মণ হইতে লাগিলেন। বেদবিদ্যার শিক্ষা-সংরক্ষণ ব্রাহ্মণ-সন্তানের যেন সহজাত সংস্কারে পরিণত হইল। এক পুরুষে যে এইরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা নহে—দুই চার পুরুষের পর। (৭) তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ের প্রজা-রক্ষণ ও অস্ত্রবিদ্যা ক্ষত্রিয়-সন্তানের এবং বৈশ্যের কৃষিবাণিজ্যবিদ্যা বৈশ্য-সন্তানের ক্রমে ক্রমে পিতাপুত্রপরম্পরায় জন্মগত অধিকারে দাঁড়াইয়া গেল। আজকালও কার্যকর শিল্প পুরষানুক্রমে এক এক শ্রেণীর লোকের ভিতর আবদ্ধ থাকার প্রবণতা দেখা যায়। যেমন—তন্তুবায়ের পুত্র সাধারণতঃ তাঁতের কাজ শিখিতে চায় ও শিখে, কুম্ভকারের পুত্র সাধারণতঃ কুম্ভকারের কাজ শিখিতে চায় ও শিখে, স্বর্ণকারের পুত্র সাধারণতঃ স্বর্ণকারের কাজ শিখিতে চায় ও শিখে। ঠিক এই প্রকারে চাতুর্বর্ণ্য ক্রমশঃ জন্মগত বা জাতিগত হইয়া পড়ে। শ্রমজীবী শূদ্রের পুত্র শিক্ষালাভে অগ্রসর হইত না, কাজেই শূদ্রবৃত্তিই অবলম্বন করিত। বর্তমানকালেও দেখা যায় যে, নিরক্ষর কৃষক-মজুরের সন্তান সাধারণতঃ লেখাপড়া শিখিতে চায় না। চাতুর্বর্ণ্য জন্মগত বা বংশগত হওয়ার পর যে জাতিভেদের সৃষ্টি, ইহাও তখনকার সমাজের অভ্যুদয়ের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল, সমাজের প্রয়োজন

---

(৭) গুণগত জাতিই আদি, স্বীকার করি; কিন্তু গুণ দু'চার পুরুষে বংশগত হয়ে দাঁড়ায়।

—স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতে বিবেকানন্দ।

মিটাইতে স্বভাবতঃ ঘটিয়াছিল।(১) ঠিক কোন সময়ে এই নিয়মের সূত্রপাত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন যে, ঋগ্বেদের ঋষি গৃৎসমদের পুত্র শৌনক এই জন্মগত জাতিভেদ সমাজের হিতকর বলিয়া, ইহার প্রবর্তনের প্রয়াসী হয়েন। (২) জাতিভেদপ্রথা প্রবর্তিত হওয়ার পর কুলধর্মের উৎপত্তি। এক এক বংশের বা কুলের বিশিষ্ট আচরণীয় কর্ম—কুলধর্ম। কুলধর্মের বৈশিষ্ট্য-রক্ষার্থে ক্রমে ক্রমে অসবর্ণ-বিবাহ এবং সহভোজনপ্রথা অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে। এক নূতন বর্ণের সৃষ্টি হয়—পঞ্চম বর্ণ। তাহার স্থান শূদ্রের নীচে—নমোশূদ্র।

বর্তমান পরিস্থিতি

জাতিভেদপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় চাতুর্বর্ণ্য জন্মগত অধিকারে দাঁড়াইল। যে বর্ণে যাহার জন্ম, সেই তাহার জাতি ; তাহাতে সেই বর্ণের গুণ-কর্ম-বৃত্তি কিছু থাক আর না-থাক। ব্রাহ্মণ-সন্তান নিরক্ষর মূর্খ হইলেও ব্রাহ্মণ, শূদ্র-সন্তান সুপণ্ডিত হইলেও শূদ্র। ক্রমশঃ জাতি-সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষহেতু সমাজ-বন্ধন ক্রমে ক্রমে কঠোর হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, বেদমন্ত্রের বা শাস্ত্রের পঠন-পাঠনই সমাজের শ্রেষ্ঠ কাজ। ক্ষত্রিয়গণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, বাহুবলের অনুশীলনই সমাজের শ্রেষ্ঠ কাজ। বৈশ্যগণ প্রচার করিতে লাগিলেন যে, কৃষিবাণিজ্যাদির দ্বারা ধনোৎপাদনই সমাজের শ্রেষ্ঠ কাজ। কাহার বৃত্তি সমাজে শ্রেষ্ঠ, তাহা লইয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই

(১) সমাজের পশ্চাতে যখন তাৎকালিক আবশ্যকতার বেগ লাগে, তখন আত্মরক্ষার জন্য আপনা-আপনি কতকগুলি আচারের আশ্রয় লয়। ঋষিরা ঐসকল আচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র * * * ঐ প্রকার জাতিভেদবিষয়েও।

—স্বামী বিবেকানন্দ, পত্রাবলী।

(২) বেদ-প্রবেশিকা।

তিন বর্ণের ভিতর মনোবিবাদের সূচনা হয়। প্রধানত্বের দাবীতে প্রথম সংঘর্ষ বাধে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ক্ষমতাহ্রাসে, আর ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের ক্ষমতাহ্রাসে তৎপর হইলেন। এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সংঘর্ষ বহুদিন অবধি চলে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র, বেন, নহুষ, নিমি প্রভৃতি পৌরাণিক উপাখ্যান তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব এবং জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী আবির্ভূত হইয়া, যথাক্রমে বৌদ্ধধর্ম ও জৈন ধর্ম প্রবর্তন করেন। কাহারো কাহারো মতে, ব্রাহ্মণ্যসমাজের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ এই নবপ্রচারিত দুই ধর্মের সহায় হয়েন। ক্ষত্রিয়ের জ্ঞানবলে ও বাহুবলে এবং বৈশ্যের অর্থবলে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম অধিষ্ঠিত হয়। সেই সময় আর্যহিন্দুসমাজের অভ্যন্তরে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যের প্রমাণ বহুতর বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) ভারতে বৌদ্ধধর্মের লয়ের পর, হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানকালে ব্রাহ্মণ্যসমাজের পুনরায় অভ্যুদয় ঘটে। তখন ব্রাহ্মণ্যসমাজ খুব সতর্কতা অবলম্বন করেন। সেই সময় আর্যহিন্দু-সমাজকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে, তাঁহারা কঠোর বিধি-নিষেধের বেড়াজালে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলেন। মনে হয়, অস্পৃশ্য পঞ্চম বর্ণের উদ্ভব সেই কালে। যাহাদের মধ্যে শুচিতার অভাব, যাহারা কদাচারী ও অপরিচ্ছন্ন, তাহাদের পঞ্চম বর্ণের অন্তঃপাতী করা হয়। তাহারাই শেষে হয় অস্পৃশ্য। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলমান-শাসন স্থাপিত হইলে, আর্যহিন্দুসমাজে এই অস্পৃশ্যতাবাদ আরো প্রকট হয়। হিন্দু জনসাধারণের ভিতর মুসলমান-বিদ্বেষ জাগাইবার অভিপ্রায়ে, মুসলমান-সংস্পর্শ পর্যন্ত অশুচিজনক বলিয়া শাস্ত্রনিবন্ধে ঘোষণা করা

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।

হয়। যাহারা সমাজ-নির্দেশ অমান্য করিয়া মুসলমান-সংস্পর্শে আসিত এবং মুসলমানের সহিত সামাজিক আদানপ্রদান করিত, তাহারাও অস্পৃশ্য হইত। ইহা অতীতের ইতিহাস। কালপ্রবাহে বর্তমান কালে জাতিভেদপ্রথা যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা সমাজের ও রাষ্ট্রের মঙ্গলজনক নহে। এখন জাতিগত বৃত্তি নাই বলিলেই হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-সন্তান আর শাস্ত্রের পঠন-পাঠন-রক্ষণ করেন না, জীবিকানির্বাহের জন্য অন্য বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয়-সন্তান আর অসিধারণে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন না, জীবিকানির্বাহের জন্য অন্য বর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করেন। বৈশ্যসন্তান এবং শূদ্রসন্তান সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। অপর দিকে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই মূল চারি বর্ণের ভিতর নানা শাখার সৃষ্টি হইয়াছে। এক এক শাখা, এক এক উপজাতি। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে নানা শাখার ব্রাহ্মণ। তদ্রূপ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র জাতির মধ্যে। এক শাখার সঙ্গে অন্য শাখার বিবাহাদি অবধি হয় না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা তাহাই হইয়াছে। বিরাট আর্যহিন্দুসমাজ আজ খণ্ডবিখণ্ডিত। সংহতিশক্তির একান্ত অভাব। অস্পৃশ্যতা আজ হিন্দুজাতির ক্ষয়রোগ। অস্পৃশ্যগণ নিজধর্মে অনুকূল আশ্রয় না পাইয়া, পরধর্ম গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। এই ক্ষয়রোগে বিশেষতঃ বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ ক্ষয়িত হইয়াছে ও হইতেছে। আজ হিন্দুসমাজে কেবল ভেদ—ভেদ—ভেদ। উচ্চ বর্ণের হিন্দু নিম্ন বর্ণের হিন্দুকে নীচ মনে করেন, নিম্ন বর্ণের হিন্দু উচ্চ বর্ণের হিন্দুকে লাঞ্ছিত করিতে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। তাঁহাদের মধ্যে একতা নাই। হিন্দুসমাজের বাহিরে সতর্ক শত্রু, আর ভিতরে অন্তর্বিবাদ। এই বর্তমান পরিস্থিতি। সমাজহিতৈষীমাত্রেই বলিবেন যে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন আশু হওয়া উচিত।

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি নমোশূদ্র সকলেই রাষ্ট্রপুরুষের এক এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—এই ধারণা প্রত্যেক হিন্দুর সুদৃঢ় হওয়া উচিত। সমাজের কাজে সকল বর্ণের হিন্দুরই আবশ্যকতা। যেমন ব্রাহ্মণের, তেমনি তথাকথিত অস্পৃশ্য চণ্ডাল-হরিজন প্রভৃতিরও। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া উচ্চ বর্ণের হিন্দু নিম্নবর্ণের হিন্দুর প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করিবেন না। নিম্নবর্ণের হিন্দু উচ্চ বর্ণের হিন্দুর প্রতি যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া, উচ্চ বর্ণের হিন্দুর শাস্ত্রবিহিত গুণ অর্জন করিতে প্রয়াসী হইবেন। (১) গুণার্জন ব্যতীত উচ্চ বর্ণের প্রকৃত অধিকারী হওয়া যায় না। ইহজন্মে উচ্চ বর্ণের শাস্ত্রবিহিত গুণরাশি অর্জন করিলে, পরজন্মে উচ্চবর্ণে জন্মলাভ সুনিশ্চিত। বর্তমান শাস্ত্রাচার্যগণ এ কথা বলেন। চারি বর্ণের জাতিগত বৃত্তির লোপ হইয়াছে, ইহা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া এতদিনের এই জাতিভেদপ্রথার সহসা সমূলে উৎপাটন দুঃসাধ্য। তাহাতে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লবের সম্ভাবনা। অতএব, মূল জন্মগত জাতি-বিভাগ বর্তমানে থাকে থাকুক। তবে এক এক জাতির অভ্যন্তরে যে সব শাখার বা উপজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের লয়সাধন প্রথমে কর্তব্য। এক জাতির হিন্দু অন্য জাতির বৃত্তি যে গ্রহণ করিতেছে, তাহার নিবারণও দুঃসাধ্য, যেহেতু তাহা অনেক ক্ষেত্রে জীবিকানির্বাহের উদ্দেশে। তবে যিনি যে জাতিতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকুন না কেন, তিনি যে জাতির বৃত্তিগ্রহণ করিবেন, সেই জাতির শাস্ত্রবিহিত বৃত্তি শ্রদ্ধাসহকারে আয়ত্ত করিতে যত্নবান হইবেন। শ্রদ্ধা থাকিলে ইহা

পরিবর্তনের পথ

(১) উচ্চতর বর্ণকে নীচু করিয়া জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা হইবে না, নিম্ন জাতিকে উন্নত করিতে হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ. ভারতে বিবেকানন্দ।

অসম্ভব নহে। যিনি যাজকের বা ধর্মপ্রচারকের বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তিনি শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রবিহিত ব্রাহ্মণবৃত্তি আয়ত্ত করিবেন। যিনি অস্ত্রধারী হইয়া সামরিক বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তিনি শাস্ত্রবিহিত ক্ষত্রিয়বৃত্তি আয়ত্ত করিবেন। যিনি বৈশ্যবৃত্তি বা শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তিনিও সেইরূপ শাস্ত্রবিহিত বৈশ্য বা শূদ্রবৃত্তি আয়ত্ত করিবেন। অবশ্য প্রয়োজনবোধে শাস্ত্রবিহিত জাতিবৃত্তিকে বর্তমান কালোপযোগী করিয়া লওয়া যাইতে পারে। মনে হয়, আজ ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র থাকিলে, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের পরামর্শানুসারে রাষ্ট্র-বিধানে জাতিবৃত্তিবিষয়ক স্মৃতিনিবন্ধসমূহকে এতদিনে বর্তমান কালোপযোগী করা হইয়া যাইত। অস্পৃশ্যতাবাদই বর্তমান হিন্দু-সমাজের ঘোর কলঙ্ক। ভিন্নধর্মাবলম্বিগণ বেশীভাগ এই কলঙ্ক দেখাইয়াই হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেন। সুখের বিষয়, এই কলঙ্ক-মোচনের অভিপ্রায়ে সম্প্রতি এক রাষ্ট্রবিধান হইয়াছে। অতীতে সমাজে অস্পৃশ্যতাবাদের উৎপত্তি যে কারণেই হইয়া থাকুক, আজকাল তাহার স্থান আদৌ নাই। হিন্দুধর্মের সার বাণী—শ্রীভগবান সর্বভূতে অবস্থিত। এই বাণীর যথার্থ অনুসরণে পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদিও অস্পৃশ্য হইতে পারে না, মানুষ তো দূরের কথা। এই অস্পৃশ্যতা এক মহাপাপ মানবতার প্রতি। আর্যহিন্দুসমাজে বর্ণবিদ্বেষের স্থান নাই। সকলেই এক জন্মভূমির সন্তান। কেহ বড়, কেহ ছোট—এই ভেদজ্ঞান বেদানুমোদিত নহে। ঋগ্বেদ বলিতেছেন—মানবসমাজে কেহ বড় নয়, কেহ ছোট নয়, কেহ মধ্যম নয়; সকলেই সোৎসাহে বিশেষভাবে ক্রমোন্নতির প্রযত্ন করিতেছে। (২) এই সকল বেদবচন

(২) তে অজ্যেষ্ঠা অকনিষ্ঠাস উদ্ভিদো ঽমধ্যমাসো মহসা বি বাবৃধুঃ।

—ঋক, ৫।৫৯।৬

অনুধাবন করিলে বর্ণ-বিদ্বেষের স্থান মিলে না—অস্পৃশ্যতা তো দূরের কথা। ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, চোর, বিমাতৃগামী এবং যে ব্যক্তি তাহাদের সংসর্গ করে সে—এই পঞ্চবিধ ব্যক্তি মহাপাতকী। ইহা স্মৃতির অনুশাসন। (৩) উপনিষদেও পঞ্চবিধ মহাপাতকের কথা আছে। (৪) বর্ণনির্বিশেষে ইহা প্রযোজ্য। যে জাতিতেই যাহার জন্ম হোক্ না কেন, সে যদি ঐরূপ কোন আচরণে মহাপাতক হয়, তবে আর্যহিন্দুসমাজের কাছে সেই পতিত। এক্ষেত্রেও অস্পৃশ্যতার প্রশ্ন উঠে না। একটি কথা। বর্তমানে সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না; কিন্তু তাহার প্রণালীসম্বন্ধে মতানৈক্য আছে। প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা না করিয়া, পরোক্ষভাবে চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত। (৫) ইদানীম্ হিন্দুসাধারণের সমাজ-সংস্কারের চেতনা কিছু জাগিয়াছে। এখন চাই তীব্র আন্দোলন ও গণশিক্ষার ব্যবস্থা।

(৩) ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাপকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥

—মনু, ১১।৫৫

(৪) ছাঃ উঃ—৫।১০।৯

(৫) সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার * * * পরোক্ষভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতে বিবেকানন্দ।

[দুই]

'আশ্রমধর্ম'।

ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রম। প্রত্যেক আশ্রমের শাস্ত্রবিহিত কর্ম—আশ্রমধর্ম। যে আশ্রমে যাহা কর্তব্য,

তাহাই সেই আশ্রমের ধর্ম। আশ্রমধর্মও বিশেষ ধর্ম। আশ্রমভেদে আশ্রমধর্মের বিভিন্নতা। ব্রহ্মচারীর আশ্রমধর্ম এক, গৃহীর আর এক, বানপ্রস্থের আর এক এবং সন্ন্যাসীর আর এক। এক আশ্রমীর পক্ষে অন্য আশ্রমীর ধর্মপালন নিষিদ্ধ। যিনি ব্রহ্মচারী তিনি গৃহীর বা বানপ্রস্থের বা সন্ন্যাসীর ধর্ম পালন করিবেন না। যিনি গৃহী তিনি ব্রহ্মচারীর বা বানপ্রস্থের বা সন্ন্যাসীর ধর্মপালন করিবেন না। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর সম্বন্ধেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। এই কারণ, প্রত্যেক আশ্রমের বিশিষ্ট ধর্ম শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। মানবজীবনের চরম লক্ষ্য, মুক্তি। আর্য্যঋষিগণ সেই লক্ষ্যের অভিমুখে মানবজীবনকে প্রথম হইতে শেষ অবধি সুনিয়মে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়ে, সমগ্র মানবজীবনকে ক্রমোচ্চ অবস্থা-ভেদে চারি আশ্রমে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এমন বিজ্ঞানসম্মত সুযুক্তি-সমন্বিত জীবন-বিভাগ আর কোন ধর্মে নাই। অধুনা জীব-বিজ্ঞান স্বীকার করেন যে, জীবনের অবস্থা প্রথম হইতে শেষ অবধি একরূপ নহে। প্রতি দশ বৎসর অন্তর মানবের দেহ ও মন দুই বদলাইয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। শৈশবে যে দেহ-মন থাকে, যৌবনে তাহা থাকে না এবং যৌবনে যাহা থাকে, বার্ধক্যে তাহা থাকে না। অতএব, ব্যক্তিগত মানবের দেহ-মন যখন পরিবর্তনশীল, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যরক্ষার্থে তাহার জীবনের অবস্থারও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই অবস্থাভেদকে ভিত্তি করিয়া আর্যঋষিগণ মানবজীবনকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। মানবের পরমায়ু মোটামুটি এক শত বৎসর ধরিয়া লইয়া, মানবজীবনকে তাঁহারা চারি অবস্থায় বিভাগ করেন। পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত, ব্রহ্মচর্য; তাহার উর্ধ্ব হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত, গার্হস্থ্য; তাহার উর্ধ্ব হইতে পঁচাত্তর বৎসর বয়স পর্যন্ত,

আশ্রম-বিভাগ

বানপ্রস্থ ; এবং তাহার উর্ধ হইতে এক শত বৎসর বয়স পর্যন্ত, সন্ন্যাস।

কেহ কেহ বলেন যে, এই আশ্রম-বিভাগের উৎপত্তি বৈদিক যুগের অন্তকালে। ইহা ভুল। ঋগ্বেদে আশ্রমচতুষ্টয়ের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে গৃহী ঋষিগণের পরিচয় বহুস্থানে পাওয়া যায় ; ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসের কথাও লক্ষিত হয়। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—ব্রহ্মচর্যপূর্বক বিদ্যালাভ করতঃ উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া, যৌবনপ্রাপ্তিতে যিনি গার্হস্থ্য-আশ্রমে প্রবেশ করেন, তিনিই দ্বিজত্বলাভে প্রসিদ্ধ হইয়া শ্রেষ্ঠ হন। (১) এই মন্ত্রে পরিষ্কার ভাবে ব্রহ্মচারীর সমাবর্তন উৎসবের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বানপ্রস্থ-সম্বন্ধে ঋগ্বেদ স্পষ্ট বলিয়াছেন—বানপ্রস্থকে বন্য জন্তু হনন করে না, অন্যান্য প্রাণীও হনন করে না ; ইঁহারা সুমিষ্ট ফল খাইয়া শান্তিময় জীবন যাপন করেন। (২) সন্ন্যাসসম্বন্ধেও ঋগ্বেদ বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাসিগণ পরিব্রাজকরূপে দিগ্ভ্রমণ করেন (৩) ; তাঁহারা সত্যধারণের উপদেশ করিয়া ও পরমাত্মার উপাসনার দ্বারা শুদ্ধ হইয়া, যোগবলে সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন করেন। (৪) অনেকের ধারণা, বৈদিক ঋষিগণ সকলেই গৃহী ছিলেন। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। তাঁহাদের ভিতর

চতুরাশ্রম-বিভাগ বেদসম্মত—বৈদিক ঋষিগণ সকলেই গৃহী ছিলেন না

---

(১) যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগৎস উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। —ঋক, ৩।৮।৪

(২) ন বা অরণ্যানি র্হন্ত্যন্যশ্চেন্নাভি গচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধায় যথাকামং নি পদ্যতে॥
—ঋক, ১০।১৪৬।৫

(৩) দিশি দিশি পরিব্রাজক দিশাংপত। —ঋক. ৯।১১৩।২

(৪) শ্রদ্ধাং বদন্ৎ সোম পরিস্কৃত ইন্দ্রায়েংদো পরিস্রব॥
—ঋক, ৯।১১৩।৪

সন্ন্যাসীও ছিলেন। শ্বেতকেতু, দুর্বাসা, কঠ, সংবর্তক, শুকদেব, বামদেব, জাবাল প্রভৃতি ঋষিগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋভু, জড়ভরত, নিদাঘ, ঋষভ প্রভৃতি রাজর্ষিগণও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণও যে সকলে গৃহী ছিলেন, তাহা নহে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১১৭ সূক্তের দ্রষ্টা ছিলেন ভিক্ষু আঙ্গিরস। ইনি সন্ন্যাসী ঋষী। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী ঋষিগণ ব্রহ্মধ্যান করেন। (৫) বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের ভিতর যাঁহারা গৃহী ছিলেন, তাঁহারা সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁহারা ধ্যান-তপস্যা-যোগ সাধনা করিয়া দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন এবং ঋগ্বেদে তাঁহারা দেবপুত্র বলিয়া অভিহিত। (৬) ব্যাস-বশিষ্ঠ-অত্রি প্রভৃতি প্রখ্যাত মহর্ষিগণ গৃহী ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা ছিলেন উচ্চকোটির গৃহী। পূর্বজন্মের সুকৃতিবশতঃ তাঁহাদের ত্যাগ-সংযম-সত্যের সাধনা ছিল অতুলনীয়—তাঁহারা ছিলেন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। এইবার প্রত্যেক আশ্রম ও তাহার বিশিষ্ট ধর্ম সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

(৫) স ইদ্ বনে নমস্যুভির্বচস্যতে —ঋক, ১৷৫৫৷৪

(৬) Vedic Culture

(ক) ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

ব্রহ্ম + চর + ণিন্ = ব্রহ্মচারী। ব্রহ্ম অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম বা বেদ যিনি অধ্যয়ন করেন, তিনি ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারীর

ধর্ম—ব্রহ্মচর্য। (১) মানবজীবনের যে অবস্থায় ব্রহ্মচর্য পালনীয়, তাহা—ব্রহ্মচর্যাশ্রম। আধুনিক ভাষায় আমরা ইহাকে ছাত্রাবস্থা বলিতে পারি। সেকালে বেদাধ্যয়ন ও বেদালোচনা হইত আচার্যের গৃহে। তাই, প্রত্যেক দ্বিজ-বালককে বিদ্যাদাতা আচার্যের গৃহে যাইয়া কিছুকাল থাকিতে হইত। ইহার নাম, গুরুকুলে বাস। আচার্যসমীপে যাওয়ার নাম, উপনয়ন। আজকাল অনেকটা বালকের পাঠশালায় ভর্তি হওয়ার মত। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রুতির মতে আর্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ—অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই তিন বর্ণ আর্য। শূদ্র অনার্যমধ্যে গণ্য ছিল। উপনয়ন-সংস্কার—বেদজন্ম। বেদপন্থী আর্যগণের এই বেদ-জন্মের বা উপনয়নের অধিকার ছিল, অনার্যগণের ছিল না। অতএব, গুরুকুলে বাসের জন্য উপনয়ন-সংস্কার (২) কেবল ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই তিন বর্ণের হইত, শূদ্রের হইত না। কি রাজপুত্র, কি নিঃস্ব-পুত্র, সকল দ্বিজ-বালককে গুরুগৃহে সমভাবে থাকিতে হইত। আট বৎসর বয়সে ঐ সব বালকের উপনয়ন-সংস্কারের বিধি ছিল। এই

ব্রহ্মচর্যাশ্রম—
গুরুকুলে বাস

(১) ব্রহ্মচর্য শব্দের ইহাই মুখ্য সংজ্ঞা। ইহা ব্যতীত আর এক সুপ্রচলিত সংজ্ঞা আছে। বীর্যধারণং ব্রহ্মচর্যং—শরীরস্থ বীর্য বা শুক্রকে অবিচলিত ও অবিকৃত অবস্থায় ধারণ করার নাম, ব্রহ্মচর্য। ইহা গৌণ সংজ্ঞা। ব্রহ্মচারীর বীর্যধারণ প্রধান গুণ ; তাহা হইতে এই গৌণ সংজ্ঞা হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন—ব্রহ্মচর্যং তপোত্তমম্, ব্রহ্মচর্যই উত্তম তপস্যা। এই শাস্ত্র-বচনে ব্রহ্মচর্যের গৌণ সংজ্ঞা অর্থাৎ বীর্যধারণ বুঝায়। বীর্যধারণ যে উত্তম তপস্যা, ইহা খ্রীষ্ট ধর্মেও স্বীকৃত। ঈশা (Jesus) ও তাঁহার শিষ্যগণ ঊর্ধ্বরেতা ব্রহ্মচারী ছিলেন।

(২) উপনয়ন শব্দের অর্থ, নিকটে গমন। দ্বিজবালকের বেদাধ্যয়নার্থ আচার্যগৃহে গমনই উপনয়ন।

সংস্কারের প্রধান অঙ্গ—বৈদিক গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষালাভ এবং যজ্ঞোপবীত-ধারণ। (৩) যজ্ঞোপবীতধারণে বালকের দ্বিতীয় জন্ম (৪) বা বৈদিক জন্ম (৫) হয় বলিয়া আর্যগণের নাম, দ্বিজ। উপনয়নের পর গুরুকুলে বাসের নিয়ম ছিল, আট হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স অবধি—এই সময়টাই ছাত্রজীবন। সুশ্রুত দেহতত্ত্বসম্পর্কে বলেন—আষোড়শাদ্বৃদ্ধিঃ, আপঞ্চ-বিংশতে যৌবনং। অর্থাৎ, ষোল বৎসর হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স অবধি, পুরুষের শরীরস্থ সমস্ত ধাতুর বৃদ্ধি হয় এবং পঁচিশ বৎসর হইতে যৌবনের আরম্ভ। সেই নিমিত্ত, স্মৃতিতে বালকের পঁচিশ বৎসর বয়স অবধি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রজীবনযাপনের বিধান। ইহা দেহবিজ্ঞানসম্মত। যৌবনের আরম্ভে বিবাহের বিধি এবং বিবাহের পর গৃহস্থাশ্রম। সেকালে বাল-বিবাহের নিয়ম ছিল না।

পুরাকালে এই গুরুকুলগুলিই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়, লোকালয় হইতে দূরে নির্জন অরণ্যের মাঝে। এই স্থান ছিল ছাত্রজীবনের উপযোগী।

গুরুকুলে ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্যব্রতপালন

গুরুকুলে গমনের পর বালককে আচার্য সদাচারাদি শিক্ষা দিয়া মৌঞ্জীবন্ধন করাইতেন। মৌঞ্জীবন্ধনের অর্থ, মেখলাধারণ; মুঞ্জতৃণনির্মিত সূত্রের নাম মেখলা, কটিদেশে এই মেখলাধারণই মৌঞ্জীবন্ধন। এই মৌঞ্জীবন্ধনের

(৩) উপনয়নের সঙ্গেসঙ্গেই যে উপবীতধারণ হইত, তাহা নহে। দ্বিজবালকের গুরুগৃহে গমনের অনেক পরেও উপবীত-সংস্কার হইত। সেই কারণ, উপনয়নই যে উপবীত-সংস্কার, তাহা নহে। আজকাল গুরুগৃহে বাস নাই। তাই, এখন উপবীত-সংস্কারকেই চলিত ভাষায় উপনয়ন বলা হয়।

(৪) মাতৃগর্ভে পাঞ্চভৌতিক স্থূল দেহের জন্মই প্রথম; তারপর, উপনয়ন-সংস্কারে যে বৈদিক জন্ম, তাহা দ্বিতীয়।

(৫) বৈদিক জন্মের অর্থ, গুরুকুলবাসে বেদাধ্যয়নের শাস্ত্রসম্মত অধিকার লাভ।

দ্বারা বালককে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করা হইত। ইহা ছিল মুখ্য অনুষ্ঠান। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মচারী বালককে অজিন বা মৃগচর্ম, দণ্ড, কমণ্ডলু, কৌপীন, জটা ও উপবীত ধারণ করিতে হইত। এই গুলি গৌণ। ব্রহ্মচর্যব্রতের সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এই সব ধারণের নিয়ম। ব্রহ্মচারীকে যে সকল সদাচার পালন করিতে হইত, তাহাই ব্রহ্মচর্যধর্ম। যেমন—গুরুসেবা, প্রাতঃস্নান, বীর্যধারণ, সন্ধ্যাগায়ত্রীজপ, আহার-বিহার-সংযম, কঠিন শয্যায় শয়ন, কায়মনোবাক্যের পবিত্রতাসাধন, ব্যায়াম, বেদাধ্যয়ন, নিষিদ্ধ-আহার-বর্জন, একাকী শয়ন, নৃত্যগীতাদি-পরিবর্জন ইত্যাদি। গুরুকুলে সর্বদা গুরুর কৃপাদৃষ্টির মাঝে কঠোর ব্রহ্মচর্যপালনে বালকগণের দেহমনের পরিপুষ্টির সঙ্গেসঙ্গে দৃঢ় নৈতিক চরিত্র গঠিত হইত। ছাত্রজীবনই চরিত্রগঠনের প্রকৃষ্ট কাল এবং ভাবী জীবনের ভিত্তি।

ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ—নৈষ্ঠিক ও উপকুর্বাণ; উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারীর সমাবর্তন

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরুকুলবাসের পর গুরুর আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মচারীর গৃহে ফিরিয়া আসার সময় যে সংস্কার হইত, তাহার নাম—সমাবর্তন বা প্রত্যাগমন। সমাবর্তন ব্যাপারটি অনেকটা একালের উপাধি লইয়া ছাত্রের বাড়ী ফেরার মত। বেদবিদ্যার অন্ততঃ কিয়দংশ আয়ত্ত করিতে না পারিলে আচার্য সমাবর্তনের অনুমতি দিতেন না। সকল ব্রহ্মচারীই যে নির্দিষ্টকাল গুরুগৃহে অধ্যয়ন শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিত, তাহা নহে। অধিকাংশই ফিরিয়া আসিত, কিন্তু কেহ কেহ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরুগৃহেই জীবন অবসান করিত। যাহারা ফিরিয়া আসিত, তাহারা—উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী। যাহারা আর ফিরিয়া আসিত না, তাহারা—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। কেবল উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারীর সমাবর্তন-সংস্কার হইত। সমাবর্তন-সংস্কারে ব্রহ্মচারীকে মৌঞ্জী-অজিন-দণ্ড-কমণ্ডলু ত্যাগ

করিয়া স্নান (১) করিতে হইত এবং আচার্যকে যথাসাধ্য গুরুদক্ষিণা দিতে হইত। সেই সময় আচার্য তাহাকে কতকগুলি নীতিগর্ভ উপদেশ দিতেন। তাহা অনেকটা একালের বিশ্ববিত্থালয়ের সমাবর্তন উৎসবে উপাধিধারিগণের প্রতি বিশ্ববিত্থালয়ের উপাধ্যক্ষের বিদায়ী সম্ভাষণের (২) মত। সমাবর্তনকালে আচার্য শিষ্যকে যে উপদেশ দিতেন, তাহা শ্রুতি সংক্ষেপতঃ এইরূপ বলিয়াছেন (৩)—সত্য বলিবে, ধর্মানুষ্ঠান করিবে; বেদাধ্যয়নে অনবহিত হইবে না; আচার্যকে দক্ষিণাস্বরূপ ধন দিয়া, তাঁহার আদেশে গৃহস্থাশ্রমে যাইয়া, বিবাহের পর সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে; সত্য হইতে বিচ্যুত হইও না; ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইও না; আত্মরক্ষাবিষয়ে অনবহিত হইও না; বিভবলাভার্থক মঙ্গলজনক কার্যে প্রমাদগ্রস্ত হইও না; দেবকার্যে ও পিতৃকার্যে ভ্রান্ত হইও না; মাতাকে দেবতার মত জ্ঞান কর; পিতাকে দেবতার মত জ্ঞান কর; আচার্যকে দেবতার মত জ্ঞান কর; অতিথিকে দেবতার মত জ্ঞান কর; যে সকল কর্ম অনিন্দিত তাহাই অনুষ্ঠান কর, অন্য কর্ম নহে; আমাদের শাস্ত্রবিহিত সদাচারই তোমার অনুষ্ঠেয়, অপরগুলি অনুষ্ঠেয় নহে; যে সকল ব্রাহ্মণ আমাদিগ হইতে শ্রেষ্ঠতর, তুমি তাঁহাদিগকে আসনাদি দিয়া তাঁহাদের শ্রম দূর করিবে; শ্রদ্ধা-সহকারে দান করিবে, অশ্রদ্ধার সহিত করিবে না; সামর্থ্যানুসারে দান করিবে; বিনয়সহকারে দান করিবে; সভয়ে দান করিবে; মিত্রভাবে

(১) এই স্নানের তাৎপর্য, ব্রহ্মচর্যব্রতোদ্‌যাপন। স্নানের পর ব্রহ্মচারীকে বলা হইত স্নাতক, একালে উপাধিধারীকে যেমন বলা হয় graduate। সমাবর্তনের পর গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তিকেও বলা হইত স্নাতক।

(২) Convocation Address.

(৩) তৈঃ উঃ—১।১১।১-৪

দান করিবে; যদি কর্ম বা আচার সম্বন্ধে তোমার সংশয় উপস্থিত হয়, তবে ঐ সময়ে ঐ স্থানে যে সকল বিচারক্ষম, কর্মপরায়ণ, কর্মাদিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত, অনিষ্ঠুর ও নিষ্কাম ব্রাহ্মণ থাকিবেন তাঁহারা ঐ প্রকার কর্মে বা আচারে যেরূপ নিরত থাকেন, তুমিও উহাতে তদ্রূপ রত থাকিবে; (৪) ইহাই বিধি, ইহাই উপদেশ, ইহাই বেদরহস্য, ইহাই ঈশ্বরাজ্ঞা।

প্রাচীনকালে দ্বিজবালকের ন্যায় দ্বিজকন্যাগণেরও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিধি ছিল, তবে গুরুগৃহে নহে। অথর্ববেদ বলিয়াছেন (৫)—

দ্বিজকন্যাগণের ব্রহ্মচর্যাশ্রম

ব্রহ্মচর্য অবলম্বনের পর কুমারী কন্যা যুবা পতি লাভ করিবে। কন্যাগণের আট বৎসর হইতে ষোল বৎসর বয়স অবধি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিধি—তখন তাহারা কুমারী। সুশ্রুত বলেন—নারী তু ষোড়সে, অর্থাৎ ষোল বৎসর বয়স হইতে নারীর যৌবনারম্ভ। তাই, নারীর পক্ষে ষোল বৎসর বয়স অবধি ব্রহ্মচর্যাশ্রম। সেকালে ষোল বৎসরের পূর্বে দ্বিজকন্যার বিবাহ হইত না। পুরাকালে দ্বিজকন্যাগণের যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ছিল, তাহার প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। হারীত বলেন—দুই প্রকার স্ত্রী, ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ; তন্মধ্যে ব্রহ্মবাদিনীদের উপনয়ন, সমিদাহুতি, বেদাধ্যয়ন ও নিজগৃহে ভিক্ষাচরণ বিহিত; সদ্যোবধূদের উপনয়ন করিয়া বিবাহ করাইবে। (৬) ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে

(৪) তাৎপর্য—বিচারক্ষম, শ্রেষ্ঠ ও মহৎ ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত কর্মের ও আচারের অনুষ্ঠান করিবে।

(৫) ব্রহ্মচর্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্। —অথর্ব, ১১।৫।১৮

(৬) দ্বিবিধা হি স্ত্রিয়ঃ ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চেতি। তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাম্ উপনয়নং অগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে তু ভৈক্ষচর্যেতি, সদ্যোবধূনাং উপনয়নং কৃত্বা বিবাহকার্য্যশ্চেতি।

দ্বিজবালকগণের সহিত দ্বিজকন্যাগণের প্রভেদ এই যে—দ্বিজ-বালকগণকে গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন করিতে হইত, কিন্তু দ্বিজকন্যাগণকে সেইরূপ গুরুগৃহে যাইয়া থাকিতে হইত না। দ্বিজকন্যাগণ স্বগৃহে পিতা, পিতৃব্য ও ভ্রাতার নিকট বেদাধ্যয়ন করিত এবং সদাচারপালন ও ভিক্ষাচরণ করিত। ব্রহ্মচারিণী কুমারীগণের মৌঞ্জীবন্ধন, বৈদিকগায়ত্রীমন্ত্রলাভ ও উপবীতিধারণ এই সব হইত; কিন্তু অজিন-কৌপীন-জটা-ধারণ তাহাদের হইত না। তাহাদের সমাবর্তন-সংস্কারেরও আবশ্যকতা ছিল না। কুমারীগণের ব্রহ্মচর্যাশ্রম সম্বন্ধে যমসংহিতা ইহাই বলিয়াছেন। (৭) সেকালে স্বগৃহে কুমারীদের বেদাধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্যপালনের পক্ষে যে কোনরূপ অসুবিধা ছিল, তাহা নহে। প্রত্যেক দ্বিজবালককে আট বৎসর বয়সে গুরুগৃহে যাইতে হইত। পঁচিশ বৎসর বয়সে সে গুরুগৃহে সমাবর্তনের পর, আচার্যের অনুমতি লইয়া, স্বগৃহে ফিরিয়া আসিত এবং বিবাহ করিয়া গৃহী হইত। অন্ততঃ একখানা বেদ অধ্যয়নের পর বেদবিদ্যার কিয়দংশ আয়ত্ত করিতে না পারিলে, আচার্য গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিতেন না। এই নিয়ম থাকায় ইহা দাঁড়াইয়াছিল যে, প্রত্যেক দ্বিজ গৃহীই বেদবিদ্যাপারদর্শী এবং ব্রহ্মচর্য-ব্রতজ্ঞ ছিলেন। এক কথায়, সেকালে এই প্রচলিত নিয়মানুসারে দ্বিজাতিসমাজে মূর্খের স্থান ছিল না। দ্বিজাতিসমাজে গৃহিগণ যখন

(৭) পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে।
অধ্যয়নঞ্চ বেদানাং সাবিত্রীবাচনং তথা;
পিতা পিতৃব্যো ভ্রাতা বা নৈনামধ্যাপয়েৎ পরঃ।
স্বগৃহে চৈব কন্যায়া ভৈক্ষচর্যা বিধীয়তে।
বর্জয়েৎ অজিনং চীরং জটাধারণমেব চ ॥

এইরূপ ছিলেন, তখন দ্বিজকন্যাগণের স্বগৃহে পিতা, পিতৃব্য বা ভ্রাতাকে আচার্যরূপে পাইয়া বেদাধ্যয়নের ও ব্রহ্মচর্যব্রতপালনের পক্ষে কোন অসুবিধা ছিল না।

(খ) গৃহস্থাশ্রম।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পঁচিশ বৎসর বয়সে গুরুগৃহে সমাবর্তন-সংস্কারের পর দ্বিজযুবক গুরুর আজ্ঞানুসারে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিবাহের পর গৃহী হইত। গৃহীর অবস্থা—গার্হস্থ্য বা গৃহস্থাশ্রম। গৃহীর যে সব শাস্ত্রবিহিত কর্ম, তাহা—গৃহস্থধর্ম। গার্হস্থ্যে বিবাহ-সংস্কারই মুখ্য। সমাবর্তনের পর তবে বিবাহের অধিকার। বিবাহের অধিকারের পর স্বগৃহে আসিয়া বিবাহ করিতেই হইবে, এই ছিল নিয়ম। বিবাহ না করিলে গৃহস্থ হয় না, গৃহপতি হয় না, সম্পূর্ণ সামাজিকতা পাওয়া যায় না। গৃহস্থদিগের সমষ্টি—সমাজ। প্রত্যেক গৃহী, সমাজের অঙ্গ। বেদবিহিত সমস্ত ধর্মকর্ম সপত্নীক অনুষ্ঠান করিতে হয়। বিবাহিতা পত্নী পতির অর্ধাঙ্গিনী। প্রত্যেক ধর্মকর্মের অনুষ্ঠানে পতির বামদিকে পত্নীর আসন।

মুখ্য গৃহস্থ-ধর্ম—বিবাহ

বৈদিক যুগে বৈদিক যজ্ঞই ছিল গৃহীর প্রধান ধর্মকর্ম। বিবাহের সময় পতি-পত্নীকে সাগ্নিক হইতে হইত, অর্থাৎ গৃহে অগ্নিস্থাপন করিতে হইত। তাহার নাম—অগ্ন্যাধান। অগ্ন্যাধানের পর আহবনীয় অগ্নিতে প্রতিদিন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিতে হইত। প্রাতঃকালে সূর্যদেবতার উদ্দেশ্যে এবং সন্ধ্যায় অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়ার নাম—অগ্নিহোত্র যজ্ঞ। ইহা ছিল নিত্যকর্ম। ইহা ব্যতীত

গৃহীর ধর্মকর্ম ও ত্রিবর্গ-সাধন

আহিতাগ্নি গৃহস্থকে প্রত্যেক অমাবস্যায় ও প্রত্যেক পূর্ণিমাতে একটি ইষ্টিযাগ করিতে হইত। অমাবস্যার ইষ্টিযাগ—দর্শযাগ। পূর্ণিমার ইষ্টিযাগ—পূর্ণমাসযাগ। কালক্রমে আর্যহিন্দুসমাজে বৈদিক যাগযজ্ঞ অপ্রচলিত হইয়া পড়িল। তখন সমাজব্যবস্থাপক ঋষিগণ গৃহীর পক্ষে ব্যবস্থা করিলেন পাঁচ প্রকার যজ্ঞ—পঞ্চ মহাযজ্ঞ। দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ। দেবযজ্ঞের অর্থ, দেবতাগণের উদ্দেশ্যে বেদমন্ত্রসহ অর্ঘ্যাঞ্জলিদান। ঋষিযজ্ঞের অর্থ, ঋষিগণের রচিত বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন। পিতৃযজ্ঞের অর্থ, পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির অনুষ্ঠান ও অর্ঘ্যাঞ্জলিদান। ভূতযজ্ঞের অর্থ, মানুষ ভিন্ন পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি অন্য জীবসমূহকে আমাদের খাদ্যের কিছু অংশ দেওয়া। নৃযজ্ঞের অর্থ, গৃহাগত অতিথির এবং দরিদ্র নারায়ণের সেবা। চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রত্যেক গৃহীর শাস্ত্রবিহিত সদাচার পালনীয়। চতুর্বর্গের ভিতর ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গ গৃহস্থাশ্রমের সেব্য। পূর্বে এই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। (১) প্রথমেই ধর্ম বা ধর্মাচরণ, শাস্ত্রবিহিত ধর্মকর্ম। পঞ্চমহাযজ্ঞ এই ধর্মাচরণের অন্তর্ভুক্ত। তাহা ছাড়া, ব্রত-দান-উপবাস ইত্যাদি। তাহার পর অর্থ, ধর্মানুমোদিত উপায়ে অর্থোপার্জন। তাহার পর কাম, ধর্মসম্মত অভ্যুদয়ের কামনা। গৃহী বিষয়ভোগ করিবেন শাস্ত্রবিহিত উপায়ে ও সংযতচিত্তে—অসংযত ভাবে নহে। শাস্ত্র বলেন যে, গৃহী কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে স্ত্রীসঙ্গ না করিয়া, ঈশ্বরের জীবস্রোতরক্ষাকল্পে পুত্রার্থে স্ত্রীসঙ্গ করিবেন। সেই কারণ, শাস্ত্রে ঋতুকাল ব্যতীত অন্য সময়ে স্ত্রীসঙ্গ নিষেধ। ঋতুকালে রাত্রিতে

(১) ৪৩-৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

স্বদারগমন—ঋতুর্গমন। ইহাই পুত্রার্থী গৃহীর ব্রহ্মচর্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্মচর্যমেব তদ্ যদ্রাত্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে। (১) গৃহস্থাশ্রমে কর্মত্যাগ শাস্ত্রবিহিত নহে। ধর্মানুমোদিত কামনাসহকারে গৃহীকে কর্ম করিতে হইবে। তবে নিষ্কাম কর্মই প্রশস্ত। গৃহী কেবলমাত্র নিজের অভ্যুদয়ের কামনা লইয়া স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে কর্ম করিবেন না। স্বগোষ্ঠীর, স্বসমাজের, স্বজাতির, স্বদেশের সকলের উন্নতির জন্য ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে (২) যথাসাধ্য কাজ করিবেন। ইহাই গৃহীর নিষ্কামকর্মসাধনা। এই প্রকার নিষ্কামকর্মসাধনায় রাগদ্বেষাদিরূপ চিত্তমল পরিষ্কৃত হইয়া যায়, তখন মুক্তি-সাধনার অধিকার জন্মে। মুক্তিই চতুর্থ বর্গ, বা মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। অতএব, গৃহস্থাশ্রমে শাস্ত্রবিহিত ত্রিবর্গের সাধনা কখনো মুক্তি-সাধনার বিরোধী হইতে পারে না। গৃহস্থাশ্রমে শাস্ত্রবিহিতভাবে ধম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গের সেবায়, মুক্তিসাধনার পথ ক্রমশঃ খুলিয়া যায়।

গৃহস্থাশ্রম—জ্যেষ্ঠাশ্রম

শাস্ত্রে গৃহস্থাশ্রম জ্যেষ্ঠাশ্রম বলিয়া কথিত। কেননা, গৃহস্থাশ্রমের আশ্রয়ে অন্য আশ্রমগুলি স্থির থাকে। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী এই তিন

(১) প্রঃ উঃ, ১।১৩

গৃহীর ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে ঈশার শিষ্য সেন্টপলও (Saint Paul) খ্রীষ্টশিষ্যগণকে বলিয়াছেন—But this I say, brethren, the time is short : it remaineth, that both they that have wives be as though they had none :

—Bible, I. Corinthians, VIII, 29

(২) যদ্যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥

—মঃ নিঃ তঃ, ৮।২৩

আশ্রমীকে গৃহস্থই অর্থদানে ও অন্নদানে ধারণ বা রক্ষা করেন। তাই, মনু মহারাজ বলিয়াছেন—যেমন বায়ুকে আশ্রয় করিয়া সকল প্রাণী জীবন-ধারণ করে, তেমনি গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করিয়া সকল আশ্রম জীবন-ধারণ করে। (৩)

(গ) বানপ্রস্থাশ্রম।

শাস্ত্র বলেন—পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পর যখন মাথার চুল সাদা ও দেহের মাংস কুঞ্চিত হইতে থাকিবে, তখন গৃহী গৃহ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে আশ্রয় লইবেন। (৪) এই অরণ্যবাস—বানপ্রস্থাশ্রম। অনেকটা একালের অবসরপ্রাপ্ত জীবন। পুত্রের নিকট স্ত্রীকে রাখিয়া, অথবা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া, অরণ্য-বাসের বিধি ; তবে স্ত্রী সঙ্গে থাকিলেও তাহার প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি থাকিবে না। বানপ্রস্থাশ্রম

বানপ্রস্থাশ্রম—বিশ্বের শিক্ষা-সংগঠন-ক্ষেত্র

যে সম্পূর্ণ লোকসংসর্গরহিত ছিল, তাহা নহে। সাঙ্গোপাঙ্গ অগ্নিহোত্র-সহ এই আশ্রমে যাওয়ার নিয়ম। ইহা ভিন্ন বানপ্রস্থাশ্রমে বিদ্যার্থিগণকে বিদ্যাদানের বিধি ছিল। এই বানপ্রস্থাশ্রমেই উপনিষদের মহান্ তত্ত্বসমূহ প্রকাশিত হয়। বানপ্রস্থগণই সেকালে গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মচারিগণকে দীক্ষা-শিক্ষা দিতেন। তাঁহারা মাঝে মাঝে বড় বড় আলোচনা-সভায় বেদবিদ্যার এবং সমাজ-জাতি-রাষ্ট্রের সংগঠনাদি বিষয়েও আলোচনা করিতেন। এক কথায়, এই বানপ্রস্থাশ্রমই ছিল সেকালে বিশ্বের শিক্ষাকেন্দ্র ও সংস্কার-সংগঠন-

---

(৩) যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব আশ্রমাঃ॥

(৪) গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলী পলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥

ক্ষেত্র। গার্হস্থ্যের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অবস্থা, ব্রহ্মচর্যাশ্রম; আর সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত হওয়ার অবস্থা, বানপ্রস্থাশ্রম।

(ঘ) সন্ন্যাসাশ্রম।

জীবনের তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ পঞ্চাশ হইতে পঁচাত্তর বৎসর বয়স অবধি বানপ্রস্থাশ্রমে থাকার পর, চতুর্থ ভাগে বা পঁচাত্তর বৎসর বয়সে সকল সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের নিয়ম। বানপ্রস্থাশ্রমে স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে, তাহাকে পুত্রের কাছে রাখিয়া সন্ন্যাস লওয়ার বিধি। (১) সর্বংসংবিন্ন্যাসং সন্ন্যাসং (২)—অনাত্মবিষয়ক সমস্ত মনোবৃত্তি সম্যক্ প্রকারে ন্যাস বা ত্যাগই সন্ন্যাস। অনাত্ম-বিষয়ক সমস্ত মনোবৃত্তি ত্যাগের অর্থ, সর্বপ্রকার বিষয়ভোগের কামনা ত্যাগ—বিষয়বৈরাগ্য। জীবনের যে অবস্থায় ইহা সম্ভব, তাহা—সন্ন্যাসাশ্রম। সন্ন্যাসাশ্রমের সাধ্য বস্তু সেই চরম পুরুষার্থ—মুক্তি। এই নিমিত্ত, ইহার অন্য নাম—মোক্ষাশ্রম বা কৈবল্যাশ্রম। ভিক্ষাচর্যার দ্বারা জীবনধারণ করিতে হয় বলিয়া সন্ন্যাসীকে ভিক্ষু বলা হয়। (৩) সর্বত্যাগের উচ্চ আদর্শ এই সন্ন্যাসাশ্রমে। সমাজের সম্মুখে সর্বত্যাগের এই উচ্চ আদর্শ না থাকিলে, জনসাধারণের চিত্তে ব্রহ্মনিষ্ঠার ও আধ্যাত্মিকতার ভাব পূর্ণভাবে জাগ্রত হয় না। সন্ন্যাসহীন সমাজ ভোগসর্বস্ব ও অশান্তির আকর হইয়া পড়ে। কেবল হিন্দুধর্মেই যে সন্ন্যাসপ্রথা, তাহা নহে। অপর যে কয়টি প্রাচীন ধর্ম এখনো জীবিত, তাহাদের প্রত্যেকের ভিতর সন্ন্যাস-

সন্ন্যাসাশ্রমের মর্ম ও বিভিন্ন নাম

---

(১) বনেষু চ বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষোভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান পরিব্রজেৎ॥ ———মনু, ৬।৩৩

(২) নিঃ উঃ

(৩) বৌদ্ধগণ সন্ন্যাসীকে ভিক্ষুই বলেন। সন্ন্যাসীর অপর নাম যতি ও পরিব্রাজক।

প্রথা বিদ্যমান কোন-না-কোন প্রকারে। যথা—বৌদ্ধ, জৈন, রোম্যান্ ক্যাথলিক্ খ্রীষ্টধর্ম, ইস্লাম, দাদুপন্থী, কবীরপন্থী ও নানকপন্থী।

সন্ন্যাসাশ্রমের শাস্ত্রবিহিত কর্ম—সন্ন্যাসধর্ম। সন্ন্যাস অর্থে সর্বকর্মত্যাগ নহে—সর্বকামনাত্যাগ এবং সকাম কর্মের ত্যাগ। (১) মুক্তি জ্ঞানগম্য। ব্রহ্মজ্ঞান বিনা মুক্তি হয় না। ব্রহ্মনিষ্ঠা বিনা ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। সেই ব্রহ্মনিষ্ঠার পরিপোষক যে সব শাস্ত্রবিহিত কর্ম, তাহা সন্ন্যাসীর অনুষ্ঠেয়। শুধু ব্রহ্মনিষ্ঠার প্রতিবন্ধক যে সকল গৃহস্থাশ্রমের কর্ম, তাহাই সন্ন্যাসীর পরিত্যাজ্য। সন্ন্যাসীর গৃহ নাই, সমাজ নাই। কাজেই স্বগোষ্ঠীর ও স্বসমাজের প্রতি গৃহীর যাহা কর্তব্য সন্ন্যাসীর তাহা নহে। সন্ন্যাসীর জাতি নাই। অতএব, ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির জাতিবৃত্তিও তাহার নাই। অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমে বর্ণধর্ম প্রযোজ্য নহে। পুত্রৈষণা—বিত্তৈষণা—লোকৈষণা এই তিন এষণা বা কামনা গৃহীর সকল প্রকার সকাম কর্মের প্রসূতি। পুত্রৈষণার অর্থ, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বংশরক্ষার কামনা। বিত্তৈষণার অর্থ, ধনোপার্জনের কামনা। লোকৈষণার অর্থ, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখভোগের কামনা। সেই হেতু, উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাসীকে এই তিন প্রকার এষণা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচরণ করিতে হইবে। (২) সর্বকামনাত্যাগের মোটামুটি অর্থ, এই ত্রিবিধ এষণা-ত্যাগ। সন্ন্যাসাশ্রমের বিহিত কর্মের মধ্যে চারিটি মুখ্য—ধ্যান, শৌচ বা

সন্ন্যাসধর্ম—ত্রিবিধ এষণার পরিত্যাগ

(১) কাম্যানাং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।

—গীঃ ১৮।২

(২) পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি ;

—বৃঃ উঃ, ৩।৫।১

সদাচার ও ইন্দ্রিয়সংযম, ভিক্ষান্নভোজন এবং নিত্য নির্জনে অবস্থান। (১) এইগুলি সন্ন্যাসীর নিত্য, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কর্ম; ইহারা ব্রহ্মনিষ্ঠার পরিপোষক। ইহা ভিন্ন লোককল্যাণকর বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র সন্ন্যাসীর জন্য উন্মুক্ত। যেমন—জনসাধারণের মাঝে ধর্মবুদ্ধির উদ্রেক-সাধন, সদাচারের প্রতিষ্ঠা, সত্য বর্ণাশ্রমধর্মের রক্ষণপ্রয়াস, ভগবদ্ভক্তির উদ্দীপন এবং অধ্যাত্মবিদ্যাপ্রচার। এই সকল জনহিতকর কার্য সন্ন্যাসীর অনুষ্ঠেয়। (২) উদ্দেশ্যের পার্থক্যবশতঃ সন্ন্যাস দুই প্রকার—বিদ্বৎ ও বিবিদিষু। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর সম্পূর্ণ চিত্তবিশ্রান্তির উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া যাঁহারা অরণ্য বা পর্বতাদি নির্জন দেশে চলিয়া যান, তাঁহারা বিদ্বৎ সন্ন্যাসী। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভেচ্ছায় সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া মঠাদিতে থাকেন এবং শমদমাদিসাধনে ব্রহ্মবিদ্যাভ্যাস করেন, তাঁহারা বিবিদিষু সন্ন্যাসী। বিদ্বৎ সন্ন্যাসীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পুরাকালে ঋষিযুগে। যেমন—মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি। গৃহস্থাশ্রম চিত্তবিশ্রান্তির সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। সেই কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর, এমন কি জীবন্মুক্ত হইয়াও, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যাদি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া

লক্ষ্যভেদে সন্ন্যাস দ্বিবিধ—বিদ্বৎ ও বিবিদিষু

(১) ধ্যানং শৌচং তথা ভিক্ষা নিত্যমেকান্তশীলতা।
ভিক্ষোশ্চত্বারি কর্মানি পঞ্চমং নোপপদ্যতে ॥
—শ্রীমৎ স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতীজীকৃত, সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী।

(২) রহসি জনপদে বা সর্বকল্যাণকারী।
হ্যপদিশতি চ লোকান্ ব্রহ্মচারী পরিব্রাট্ ॥ —সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী।

যতিবর শ্রীশঙ্করাচার্য স্বয়ং জনকল্যাণার্থে দিগ্বিজয়, মঠস্থাপন, বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা, গ্রন্থপ্রণয়ন ইত্যাদি কাজ করিয়াছিলেন। শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, ও শ্রীরামকৃষ্ণও জনহিতকর কাজ করিয়াছিলেন।

ছিলেন। বর্তমান কালে সর্বত্র বিবিদিষু-সন্ন্যাস প্রচলিত, বিদ্বৎসন্ন্যাস আর নাই। বিদ্বৎ ও বিবিদিষু এই উভয়বিধ সন্ন্যাসী পরমহংস (১) নামে অভিহিত।

সন্ন্যাসের কাল-নির্ণয়—ক্রম-সন্ন্যাস ও অক্রম-সন্ন্যাস

সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের কাল সম্পর্কে উপনিষদ্ প্রথমে বলিয়াছেন—ব্রহ্মচর্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, তদন্তর বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে এবং তাহার পর সন্ন্যাসগ্রহণ করিবে। (২) তাৎপর্য—ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সংযমসাধনার পর আদর্শ গৃহী হওয়ার অধিকার জন্মে, সংযমী হইয়া গৃহস্থাশ্রমে শাস্ত্রবিহিত প্রবৃত্তিধর্মপালনের পর চিত্তশুদ্ধি হইলে নিবৃত্তিমার্গে চলিবার অধিকার জন্মে, নিবৃত্তিমার্গের প্রথমে বানপ্রস্থাশ্রমে কিছুকাল নিবৃত্তিসাধনার পর সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার জন্মে এবং তখন সন্ন্যাসাশ্রমে মুক্তিরূপ পূর্ণনিবৃত্তিসাধনায় রত হওয়া যায়। সকল আশ্রমের চরম বিকাশ, সন্ন্যাস। এইভাবে ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্য, গার্হস্থ্যের পর বানপ্রস্থ এবং বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাস এই আশ্রমক্রমানুসারে সন্ন্যাস—ক্রমসন্ন্যাস। ইহা ব্যতীত উপনিষদ্ আর এক প্রকার সন্ন্যাসের কথা বলিয়াছেন—যেদিনই বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সেদিনই সন্ন্যাসগ্রহণ করিবে। (৩) এইরূপ সন্ন্যাস—অক্রমসন্ন্যাস। প্রকৃত বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই সন্ন্যাসগ্রহণ কর্তব্য, তাহা ব্রহ্মচর্য বা গার্হস্থ্য

(১) পরং+অহং+সঃ=পরমহংস। আমি সেই পরব্রহ্ম, ইহা যিনি জানিয়াছেন বা জানিতে চেষ্টা করেন, তিনি পরমহংস।

(২) ব্রহ্মচর্যং সমাপ্য গৃহী ভবেদ্ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেদ্ বনী ভূত্বা প্রব্রজেদ্ * * *

—জাঃ উঃ, ৪

(৩) যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ * * *

—জাঃ উঃ, ৪

বা বানপ্রস্থ যে কোন আশ্রম হইতেই হৌক্। (৪) তাৎপর্য—যিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, প্রকৃত বিষয়বৈরাগ্য উদয় হইলে, সেই আশ্রম হইতেই তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ বিধেয়। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। এই বিষয়বৈরাগ্য মর্কটবৈরাগ্য বা শ্মশানবৈরাগ্য নহে, ইহা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল বিষয়ে তুচ্ছতাবুদ্ধি। সন্ন্যাসের ভিত্তি—যথার্থ বিষয়বৈরাগ্য। অন্য যত গুণই থাকুক না কেন, চিত্তে যথার্থ বিষয়বৈরাগ্য না উৎপন্ন হইলে সন্ন্যাসগ্রহণ অবৈধ। চিত্ত সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ বা রাগদ্বেষাদিকলুষরহিত না হইলে, এইরূপ যথার্থ বিষয়বৈরাগ্যের উদয় হয় না। অতএব, এই অক্রমসন্ন্যাস অত্যন্ত শুদ্ধচিত্ত, যথার্থ বৈরাগ্যবান, পুরুষপুঙ্গবদের জন্য বিহিত। যাঁহারা তাদৃশ হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে ক্রমসন্ন্যাস প্রশস্ত। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে শাস্ত্র বলিয়াছেন—যাহারা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদাধ্যয়ন এবং গৃহস্থাশ্রমে পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান না করিয়া মুক্তির ইচ্ছায় সন্ন্যাসগ্রহণ করে, তাহারা অধোগামী হয়। (৫) ইহার মর্ম, এইপ্রকার ব্যক্তিগণের ক্রমসন্ন্যাস অবলম্বনীয়। পুরাকালে ক্রমসন্ন্যাসই সুপ্রচলিত ছিল। বৈদিক ঋষিগণও ক্রমসন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ক্রমসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ক্বচিৎ কদাচিৎ অক্রমসন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন; যথা—শুক, দুর্বাসা, শঙ্কর প্রভৃতি। শুক আজন্মসন্ন্যাসী। দুর্বাসা ও শঙ্কর ব্রহ্মচর্যাশ্রম

---

(৪) ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা * * *

—জাঃ উঃ, ৪

(৫) অনধীত্য দ্বিজো বেদানমুৎপাদ্য তথাত্মজান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ ॥

—স্মৃতিবচন।

হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। (৬) ব্রহ্মচর্য ও গার্হস্থ্য প্রবৃত্তিমার্গে; বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গে। প্রবৃত্তিমার্গে সাধনার পর নিবৃত্তিমার্গে সাধনার যোগ্যতা আসে। ইহাই সাধারণ নীতি। সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের সঙ্গেসঙ্গে যে সকল বিবিদিষু সন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞানলাভে মুক্ত হন, তাহাও নহে। সন্ন্যাসদীক্ষার পর বিবিদিষু সন্ন্যাসী নিবৃত্তিমূলক মুক্তি-সাধনার পথে পথিক হয়েন মাত্র। যাঁহার পূর্বজন্মের সুকৃতি খুব বেশী, সেই বিবিদিষু সন্ন্যাসী পুরুষকারসাহায্যে ইহজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানলাভে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। অবশিষ্ট যাঁহারা তাঁহারা এই নিবৃত্তির পথে চলিতে চলিতে জন্মজন্মান্তরে অবশেষে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হয়েন। বিদ্বৎসন্ন্যাসী জীবন্মুক্ত।

বেদে যেমন সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত, তন্ত্রেও তেমনি সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত।

বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ন্যাস—সন্ন্যাসে অধিকার-নিরূপণ—সন্ন্যাসীর বর্জনীয়

তন্ত্রে সন্ন্যাসাশ্রমকে অবধূতাশ্রম এবং সন্ন্যাসীকে অবধূত বলা হয়। (৭) বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ন্যাসে প্রক্রিয়াভেদ আছে। বৈদিক সন্ন্যাস-সংস্কার ও তান্ত্রিক সন্ন্যাস-সংস্কার বিভিন্ন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের বা দ্বিজাতির বৈদিক সন্ন্যাসে অধিকার আছে, কিন্তু শূদ্রের নাই। দ্বিজাতির উপনয়ন-সংস্কারে বৈদিক জন্ম হয়, তাই তাঁহাদের বৈদিক সন্ন্যাসে অধিকার আছে। (৮) শূদ্রের উপনয়ন-

---

(৬) আজকাল বালসন্ন্যাসী অনেক দেখা যায়। ইহা ঠিক শাস্ত্রসঙ্গত নহে। তাঁহারা সকলেই যে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া সন্ন্যাসের অধিকারী, এ কথা বলা যায় না। ইহার ফলে কিছু অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা চলে না।

(৭) সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী।

(৮) যদি কোন কারণবশতঃ কোন দ্বিজাতির উপনয়ন না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তান্তে উপবীত করিয়া সন্ন্যাস দেওয়ার নিয়ম।

সংস্কার নাই, বৈদিক জন্মও হয় না। সেই নিমিত্ত, তাঁহাদের বৈদিক সন্ন্যাসে অধিকার নাই। তান্ত্রিক সন্ন্যাসে সকল বর্ণের অধিকার, শূদ্রেরও অধিকার আছে। দ্বিজস্ত্রীগণের উপনয়ন-সংস্কারে বৈদিক জন্মের বিধি আছে। সেই কারণ, তাঁহাদেরও বৈদিক সন্ন্যাসে অধিকার আছে। (১) শূদ্রাণীর সে অধিকার নাই, তবে তান্ত্রিক সন্ন্যাসে অধিকার আছে। কেহ কেহ মনে করেন স্ত্রীজাতির সন্ন্যাসে অধিকার নাই, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। (২) এখানে শাস্ত্রপ্রচলিত সন্ন্যাস-নিয়মের কথা বলা হইল। অধুনা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। সন্ন্যাসাচার্যগণ কোন শূদ্র বা শূদ্রাণীকে প্রকৃত বৈরাগ্যবান্ ও সন্ন্যাসের উপযুক্ত দেখিলে, তাঁহাকে বৈদিক সন্ন্যাসে দীক্ষা দিয়া থাকেন। এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। (৩) সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের পর, পূর্বাশ্রমের সকল সম্পর্ক ত্যাগ করার নিয়ম। সন্ন্যাসী পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র, কন্যা, জ্ঞাতি প্রভৃতি কুটুম্ববর্গের সহিত একদিনও বাস করিবেন না বা তাহাদের অন্ন গ্রহণ করিবেন না। সন্ন্যাসীর অন্ন চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের কাহারো

---

(১) অদ্যাপি প্রসিদ্ধ দশনামী জুনা আখড়ার বহু নারী কুম্ভমেলা উপলক্ষে সন্ন্যাস-সংস্কারে দীক্ষিত হইয়া থাকেন।

(২) মহাভারতের প্রখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—ভিক্ষুকীত্যনেন স্ত্রীণামপি প্রাক্‌বিবাহাৎ বা বৈধব্যাৎ ঊর্ধ্বং সন্ন্যাসে অধিকারোঽস্তি। অর্থাৎ, স্ত্রীজাতির বিবাহের পূর্বে কুমারী অবস্থায় বা পরে বৈধব্যাবস্থায় সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার আছে।

—মহাভারতের শান্তিপর্বে সুলভা-উপাখ্যান।

(৩) এমন কি, অ-হিন্দু নারীকেও বৈদিকসন্ন্যাস দেওয়া হইয়াছে। পঞ্জাবে লুধিয়ানার খান্নাবাসী প্রসিদ্ধ পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী ত্রিবেণী পুরী মহারাজ একজন আইরিশ (Irish) মহিলাকে বৈদিক সন্ন্যাস দিয়াছেন। তাঁহার বর্তমান নাম, ওমানন্দ পুরী। ইনি ভারতীজী মহারাজের পরিচিত এবং লেখক তাঁহাকে দেখিয়াছেন।

গ্রহণযোগ্য নহে। (৪) সকল বর্ণে ও সকল আশ্রমেই ভ্রষ্টাচারী আছে, ইহা সত্য। আদর্শের ভূমিতে স্ব স্ব বর্ণে ও স্ব স্ব আশ্রমে যিনি আদর্শ-বর্ণী ও আদর্শ-আশ্রমী, তিনি শ্রেষ্ঠ। সামাজিকতার দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ সর্ববর্ণের গুরু এবং সন্ন্যাসী সর্ববর্ণের ও সর্ব-আশ্রমের গুরু। ইহা শাস্ত্রের কথা।

বর্তমানে আশ্রম-বিপর্যয় ও তাহার প্রতিকার

বর্তমান কালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বানপ্রস্থাশ্রম লুপ্ত। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা আজীবন ব্রহ্মচারী কিছু কিছু আছেন। তাঁহারা অর্ধসন্ন্যাসী। ঋষিযুগের সে ঋষি নাই—সে গুরুকুল নাই—সে ব্রহ্মচর্যাশ্রম নাই—সে উপনয়ন-সংস্কার নাই—সে বেদাধ্যয়ন নাই—সে সমাবর্তন-সংস্কার নাই—সে উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারীও আর নাই। ইদানীং বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীগণ যে শিক্ষালাভ করে, তাহা ধর্মবিবর্জিত। নীতিধর্মের শিক্ষাসুযোগ নাই, ব্রহ্মচর্যপালন তো দূরের কথা। আছে মাত্র গৃহস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম। গৃহী যাঁহারা আছেন, তাঁহারা প্রাচীন কালের সেই গার্হস্থ্যধর্ম পালন করেন না—ধর্মার্থকাম এই ত্রিবর্গের শাস্ত্রবিহিত সেবা আর তাঁহাদের নাই। এখন ধর্মকে বাদ দিয়া প্রধানতঃ অর্থ ও কাম এই দুইটিই তাঁহাদের সেব্য। ধর্মানুমোদিত না হইলেও, যে কোন উপায়ে হৌক্ অর্থ ও কামের সাধনা চাই—অনেকের যেন এই ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সন্ন্যাসাশ্রম যাহা আছে, তাহাতে ক্রমসন্ন্যাসপ্রথা লুপ্তপ্রায়। অক্রমসন্ন্যাসই প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব, হিন্দু আজ আশ্রমচ্যুত—এ কথা বলিতে পারা যায়।

মানবজীবনের চরম লক্ষ্য—মুক্তি। সেই লক্ষ্যের অভিমুখে ধর্মানুষ্ঠানের ভিত্তিতে চতুর্বর্গসেবার আদর্শে প্রাচীন ঋষিগণ যে চারি

---

(৪) সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী।

আশ্রমের বিভাগ করিয়াছিলেন, তাহা কতদূর যুক্তিসম্মত সে বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। জীবনের সকল স্তরেই তাঁহারা ভাগবত-চৈতন্য ও ত্যাগভাবকে জাগ্রত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আজ আশ্রমবিচ্যুত হিন্দুসমাজ সেই মহান্ ভাবের বিসর্জন দিয়া ভোগসর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে। পাশ্চাত্যের ভোগবাদ আজ যেন তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। আজ হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে যে দুঃখ-দৈন্যের প্রকট মূর্তি দেখা দিয়াছে, তাহার মূল কারণ হিন্দু-সমাজের এই আদর্শ-বিচ্যুতি। বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতিবিধানার্থে প্রয়োজন, হিন্দুসমাজে সেই প্রাচীন আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। অবশ্য সেই আদর্শকে বর্তমান কালোপযোগী করিয়া লইতে হইবে। হিন্দু-শাস্ত্র যুগধর্ম স্বীকার করেন। প্রথমেই আবশ্যক, ব্রহ্মচর্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। যতদূর সম্ভব প্রাচীন গুরুকুলের অনুকরণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠন—ধর্মবর্জিত শিক্ষার পরিবর্তে ধর্মযুক্ত শিক্ষার প্রচলন। ছাত্র-ছাত্রীগণের নীতিধর্মপালনে চরিত্রগঠন—শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ইহাই আদি কথা। আজ যাহারা ছাত্র-ছাত্রী, কাল তাহারা গৃহপতি-গৃহকর্ত্রী এবং সমাজ ও দেশের নায়ক-নায়িকা হইবে। তাহারাই হিন্দুসমাজের ও হিন্দুজাতির মেরুদণ্ড। ছাত্রজীবনে চরিত্র গঠিত না হইলে, তাহারা কখনো আদর্শ গৃহপতি-গৃহকর্ত্রী নায়ক-নায়িকা হইতে পারে না। বর্তমানকালে বালক-বালিকার অর্ধেক শিক্ষা স্বগৃহে পিতামাতার কাছে। পিতামাতা উন্নতচরিত্রের না হইলে স্বগৃহে সৎশিক্ষার অভাবে বালক-বালিকাগণের চরিত্রগঠন সুকঠিন। তারপর আবশ্যক, প্রাচীন গৃহস্থাশ্রমের ত্রিবর্গ-সেবাকে বর্তমান কালোপযোগী করিয়া গৃহিগণের সম্মুখে ধরা, যাহাতে সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা গার্হস্থ্যজীবনকে সুন্দরভাবে

গড়িয়া তুলিতে পারেন। গার্হস্থ্যজীবনের জ্বালাযন্ত্রণার অর্ধেক লাঘব তখনই সম্ভব। আজকাল সে অরণ্যবাস নাই, কাজেই বানপ্রস্থাশ্রমও আর নাই। বানপ্রস্থের পুনর্প্রচলন নিষ্প্রয়োজন হইলেও, অবসরপ্রাপ্ত হিন্দু পুত্রাদির উপর সংসারের ভার দিয়া নিবৃত্তিমার্গে চলিতে চেষ্টা করিতে পারেন। চেষ্টা থাকিলে স্বগৃহেও সংসার-বিরক্ত হইয়া নির্জনে সাধনভজনে কালাতিপাত করা যায়। ইহা ছাড়া অবসরপ্রাপ্ত হিন্দু প্রাচীন বানপ্রস্থাশ্রমের বিশ্বহিতার্থে আত্মদানের ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া অনেক জনহিতকর কাজ নিষ্কামচিত্তে করিতে পারেন। নিষ্কামকর্মও নিবৃত্তিমার্গের প্রাথমিক সাধনা। সন্ন্যাসগ্রহণ প্রতি হিন্দুর ইচ্ছাধীন হওয়া উচিত। যথার্থ বিষয়বৈরাগ্যের উদয়ে সন্ন্যাসে যাঁহার দৃঢ়মতি হইবে, তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে পারেন। বর্তমানকালে মানুষের আয়ু আর একশত বৎসর নাই—এখন সাধারণতঃ পঁচাত্তর বৎসর দাঁড়াইয়াছে। অতএব, ক্রমসন্ন্যাস ষাট্ বৎসর বয়সে গ্রহণীয়। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্যের মঠানুশাসনের আদর্শানুযায়ী সন্ন্যাসাশ্রমকেও বর্তমান কালোপযোগী করিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত। সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের কাছে হিন্দুসমাজ ঋণী, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। (১)

বর্ণাশ্রমধর্ম কালবশে যতই বিকৃত হোক না কেন, তাহার আশ্রয়েই আর্যহিন্দুধর্ম সেই সুদূর বৈদিক যুগ হইতে আজ অবধি বিশ্বের মাঝে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভারতে কত রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে, তত্রাচ এই সনাতন ধর্ম ধরাশায়ী হয় নাই।

---

(১) সন্ন্যাসীরা হাল ধরে আছে বলিয়াই সংসারে গৃহস্থের নৌকা ডুবছে না।
—স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতে বিবেকানন্দ।

[তিন]

সামান্য ধর্ম।

পূর্বে (১) বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক বর্ণের ও প্রত্যেক আশ্রমের শাস্ত্রবিহিত কর্ম—বিশেষ ধর্ম। ইহা ভিন্ন বর্ণাশ্রমনির্বিশেষে মানবমাত্রেরই আচরণীয় কতকগুলি শাস্ত্রবিহিত কর্ম আছে। সেইগুলির নাম—সামান্য ধর্ম। সামান্য ধর্ম সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। (২) সদাচার, সামান্য ধর্ম। মানব এবং মানবেতর নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে পার্থক্য এই সদাচারের আচরণে। মানবের উদ্দেশ্য—দিব্যজীবনযাপন। তাহা করিতে হইলে, কতকগুলি সদাচারপালন অবশ্য কর্তব্য। সদাচারপালনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি হইলে তবে দিব্যজীবনলাভ হয়। মানবেতর নিকৃষ্ট জীবের সে উদ্দেশ্য না এবং সেই নিমিত্ত তাহাদের ভিতর সদাচারপালনের প্রেরণাও দেখা দেয় না। মনু মহারাজ বলিয়াছেন—আচার প্রভবো ধর্মঃ, সদাচার হইতে ধর্মের উদ্ভব। মহর্ষি বশিষ্ঠও বলিয়াছেন—আচারঃ পরমো ধর্মঃ সর্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ ; সকলের সদাচরণই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, ইহা সুনিশ্চিত। দক্ষ প্রজাপতিও বলিয়াছেন—সদাচারই প্রথম ধর্ম এবং চতুর্বর্ণের সকলের সদাচরণই ধর্মপালন। (৩) সেই নিমিত্ত,

সদাচার মানবজাতির সামান্য ধর্ম—প্রায় সকল ধর্মে সদাচার-পালনের বিধি

(১) ১৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) আচারঃ প্রথমো ধর্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত এব চ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাম্ আচারো ধর্মপালনম্।
—দক্ষ-সংহিতা।

প্রায় সকল ধর্মের আদিকথা—সদাচার। বৌদ্ধধর্মে অষ্টাঙ্গিক মার্গের ভিতর সদাচরণই মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। (৪) এক কথায়, বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি—সদাচার। ইহুদী ধর্মে ঈশ্বরের দশাদেশের (Ten Commandments) মধ্যে অহিংসা, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য, অ-কাম, অ-লোভ, সত্য ইত্যাদি সদাচার-পালনের কথা। পারসিক ধর্মেও কায়মনোবাক্যে শৌচসাধন, সত্যপালন, সংযমসাধন, জীবদয়া, অতিথিসংকার, দানাদিরূপ সংকর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি সদাচরণের বিধি। পারসিক ধর্মে সত্য-কথনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ইস্লামেও জীবদয়া, সত্যকথন, দান, শৌচসাধন, নিষ্কামকর্মসাধন ইত্যাদি সদাচার-পালনের কথা আছে। জৈন ধর্মে এবং শিখ ধর্মেও সদাচরণের কথা। সেইরূপ হিন্দুধর্মও বর্ণাশ্রমনির্বিশেষে প্রত্যেক হিন্দুকে সদাচার-পালনের কথা বলিয়াছেন। সদাচার-পালনসম্বন্ধে হিন্দুধর্মগ্রন্থে মানবচরিত্র যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষিত, অন্য ধর্মগ্রন্থে তেমন নহে। ইহাই পার্থক্য।

কাহাকে কাহাকে সদাচার কহে, তাহার পরিচয় হিন্দুধর্মগ্রন্থের প্রায় সর্বত্র। এই বিষয়ে স্মৃতিসংহিতা, পুরাণ ও মহাভারতই সর্বাপেক্ষা মুখর। এখানে দুই একটি শাস্ত্রোক্তি উল্লেখ করা যাইতেছে।

হিন্দুশাস্ত্রে সদাচারের বিশ্লেষণ—অহিংসা, সত্য, শৌচ ও সংযম এই চারিটি মূল

মনু মহারাজ বলেন—ধৃতি বা ধৈর্য, ক্ষমা, দম বা বাহেন্দ্রিয়ের বশীকরণ, অস্তেয় বা অচৌর্য, শৌচ, মনঃসংযম, ধী বা বিচারবুদ্ধি, বিদ্যা বা জ্ঞানসাধন, সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্মলক্ষণ, অর্থাৎ সদাচার। বিষ্ণুসংহিতা বলেন—ক্ষমা, সত্য, মনঃসংযম, শৌচ, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অহিংসা, গুরুসেবা, তীর্থসেবা, জীবদয়া, সরলতা,

(৪) এই সুমহান্ অষ্টপন্থার ভিতর মিথ্যা, পরিবাদ, শ্রুতিকটু বাক্য, বৃথালাপ

লোভশূন্যতা, দেব-দ্বিজ-পূজা এবং দ্বেষবর্জন এই কয়টি সামান্যধর্ম বা সদাচার। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ বা অনাবশ্যক দ্রব্যের প্রতি লোভশূন্যতা, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় বা শাস্ত্রপাঠ বা মন্ত্রপাঠ এবং ঈশ্বরপ্রণিধান বা ঈশ্বরে মনোনিবেশ এই দশটি মানবমাত্রেরই আচরণীয়। ভগবদ্গীতা বলেন—অভীরুতা, অন্তঃকরণের শুদ্ধি, জ্ঞান-যোগ-নিষ্ঠা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম, শ্রৌত ও স্মার্ত যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, পরদোষ প্রকাশ না করা, দীনে দয়া, লোভরাহিত্য, মৃদুতা, অসৎ চিন্তায় ও অসৎ কর্মে লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, শৌচ এবং অবৈরভাব এই কয়টি দৈবীসম্পৎ; অর্থাৎ, এই সদ্‌গুণসমূহ যিনি আয়ত্ত করিয়াছেন, তিনি দিব্যজীবনলাভের যোগ্য। এইগুলিও মানবমাত্রেরই আচরণীয়। শাস্ত্রকথিত এই সকল সদাচারের মূল চারিটি—অহিংসা, সত্য, শৌচ ও সংযম। এই মূল চারিটির রূপান্তর অপরগুলি, ইহা বলিতে পারা যায়। অতএব, সংক্ষেপে এই চারিটির ব্যাখ্যান কর্তব্য।

'হিনস্' ধাতুর উত্তর 'অ' প্রত্যয় যোগে 'হিংসা' শব্দ নিষ্পন্ন। হিনস্ ধাতুর অর্থ, প্রহার ও সংহার। তাই, হিংসা শব্দের অর্থ, প্রাণীপীড়ন। কায়, বাক্ ও মনের দ্বারা তিন প্রকারেই প্রাণীপীড়ন

অহিংসা

সম্ভব। হস্তের দ্বারা প্রহার-সংহারাদি, কায়িক হিংসা। বাক্যবাণে বিদ্ধ করা, বাচনিক হিংসা। মনে মনে কাহারো পীড়নার্থ চিন্তা, মানসিক হিংসা। সেই নিমিত্ত,

---

ইত্যাদি পরিবর্জনে সত্য-শিষ্ট ও সন্ধিবাক্য কথন; প্রাণীহত্যা, চৌর্য ও ইন্দ্রিয়-সেবা হইতে বিরতি; লোভ-দ্বেষ-বর্জন প্রভৃতি প্রধান।

—অনগারিক ধর্মপালকৃত, ভগবান বুদ্ধের উপদেশ।

অহিংসা শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ—কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা সর্বভূতের পীড়া উপস্থিত না করা। (১) অহিংসা—মহাব্রত। এই মহাব্রতপালনের জন্য শ্রুতি মানবমাত্রকেই আদেশ করিয়াছেন—মা হিংস্যাৎ সর্বভূতানি, সর্বভূতের হিংসা করিবে না। সনাতন হিন্দুধর্মের শেষ ও চরম তত্ত্ব, সর্বভূতাত্মবাদ। এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ, একই আত্মা প্রত্যেক ভূতের মধ্যে অবস্থিত—ইহাই সর্বভূতাত্মবাদ। এক আত্মা যখন সকল ভূতের মধ্যে আছেন, তখন প্রাণীজগতে পীড়ক-পীড়িতের সম্বন্ধ থাকে না। অহিংসা মহাব্রত ইহার উপর অধিষ্ঠিত। মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব, কাজেই তাহার সম্মুখে এই মহান্ আদর্শ। কিন্তু পূর্ণভাবে এই মহাব্রতপালনে একমাত্র নিবৃত্তিমার্গে কন্দমূল (২) ও বৃক্ষফলাদি ভক্ষণকারী অরণ্যবাসী বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসীই সমর্থ, অপরে নহে। প্রবৃত্তিমার্গে গৃহীর পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। প্রাণীমাত্রই প্রবৃত্তির অনুগামী, প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং। তাই, প্রাণীমাত্রই হিংসা-শীল। এক প্রাণীর রক্ষণ, অন্য প্রাণীর ভক্ষণে। পিপীলিকা খায় মাছিকে, টিকটিকি খায় পিপীলিকাকে, ভেকাদি খায় টিকটিকিকে, সর্প খায় ভেককে, ময়ূর খায় সর্পকে, শৃগালাদি খায় ময়ূরকে, চিতাবাঘ খায় শৃগালকে, সিংহাদি খায় চিতাবাঘকে, শিকারী বধ করে সিংহাদিকে এবং শিকারীকে সংহার করে যমদূত। প্রাকৃতিক সৃষ্টির এই হিংসাত্মক নীতি। বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্ এবং যব-ধান্য-শাক-সব্জী ইত্যাদিও প্রাণী, তাহাদের প্রাণ আছে। অতএব, তাহাদের নাশসাধনও হয় হিংসাত্মক। (৩)

---

(১) মনোবাক্কায়ৈঃ সর্বভূতানামপীড়নং অহিংসা॥

(২) কন্দ=যাহা মাটির ভিতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; যেমন—ওল, আলু প্রভৃতি।

(৩) বেদে পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় আছে, চন্দ্রাদি লোকের ভোগ শেষ হইলে জীবাত্মা বৃষ্টিজল সহ যবাদিতে প্রবিষ্ট হয় এবং তাহা মনুষ্য কর্তৃক ভক্ষিত হইলে বীর্যরূপে স্ত্রীর যোনিতে

ভূগর্ভে নানা ক্ষুদ্র জীব বিদ্যমান। কৃষিকাজে তাহাদের নাশ হয়। সেই হেতু, কৃষিকাজও হিংসাত্মক। ইহা হইল ব্যষ্টির কথা। সমষ্টির য়া দেখিলে জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পরস্পর দ্বন্দ্ব ও পীড়নের প্রচেষ্টাকে হিংসাপ্রবণ বলিতে হয়। যুদ্ধবিগ্রহাদি তো হিংসামূলক নিঃসন্দেহ। গৃহীর সমাজ-জাতি-দেশ আছে, সমাজ-জাতি-দেশের প্রতি তাহার কর্তব্যও আছে। সমাজ-জাতি-দেশের রক্ষণকল্পে তাহার অস্ত্রধারণ বিধেয়। সেই নিমিত্ত বলা যাইতে পারে যে, প্রবৃত্তিমার্গে অহিংসা-মহাব্রতের পূর্ণ সাধন সম্ভব নহে। এই কঠোর সত্য উপলব্ধি করিয়া প্রবৃত্তিমার্গে অহিংসাসাধন সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলিয়াছেন (৪)—অহিংসন্ং সর্বভূতান্যন্যত্রতীর্থেভ্যঃ, শাস্ত্রে যে স্থলে হিংসার বিধান আছে তদ্ব্যতীত অন্য স্থলে হিংসা করিবে না। এই উপনিষদ্-মন্ত্রে তীর্থ শব্দের অর্থ, শাস্ত্র। শাস্ত্র বিধান দিয়াছেন যে, সমাজ-জাতি-দেশের রক্ষণার্থে ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও অপ-লায়নই স্বধর্ম। সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগে স্বর্গগমন হয়। রাষ্ট্রপরিচালন-ব্যাপারে রাজ্যকে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে রক্ষার উদ্দেশে রাজদণ্ড দেওয়া শাস্ত্রসম্মত, সেই রাজদণ্ড যদিও পীড়নাত্মক। যাহারা লুকাইয়া অগ্নি, বিষ, শস্ত্রাদির দ্বারা লোকের প্রাণনাশ করে এবং ধন, ক্ষেত্র, দার অপহরণ করে, তাহাদিগকে কহে আততায়ী। আততায়ীবধে পাপ হয় না—

নিষিক্ত হয়, তাহাতে পুত্রাদি উৎপন্ন হয়। পুত্র ব্রীহিযবাদি আহার ব্যতীত জন্মিতে পারে না। যব ব্রীহিতে যে জীব থাকে তাহার ধ্বংস হয় না। সেই পুনঃ জন্ম লয়। একারণ যবচূর্ণাদি ও অন্নগ্রহণে হিংসা হয় না।

—উপাসনা।

(৪) ছাঃ উঃ—৮।১৫।১

ইহা শাস্ত্রের বিধান। বৈশ্যের কৃষিকার্য স্বধর্ম বলিয়া শাস্ত্রে কথিত। সেই কারণ, শ্রুতি ব্যক্তি ও সমষ্টির আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে এবং সমাজের কল্যাণসাধনার্থে শাস্ত্রসম্মত উপায়ে হিংসাত্মক কার্যের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন, অন্য স্থলে নহে। ব্যক্তির নিজের কাম-তৃষ্ণা-পরিতৃপ্তির জন্য ত্রিবিধ হিংসা নিষিদ্ধ। গৃহীর পক্ষে ইহাই অহিংসাসাধন। অহিংসার প্রতিমূর্তি ভগবান বুদ্ধদেবও সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে প্রাণবধের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছিলেন। (৫) পূর্ণ অহিংসা-সাধনের ফল সম্পর্কে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—যখন চিত্তে দৃঢ়রূপে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন এইরূপ ব্যক্তির নিকট সর্প-ব্যাঘ্রাদি অপর জীবসমূহও আপন আপন স্বাভাবিক শত্রুতা ত্যাগ করিবে, অর্থাৎ এইরূপ হিংসাশূন্য ব্যক্তির হিংসা তাহারাও করিবে না। (৬)

সত্য

'সৎ' শব্দ হইতে 'সত্য' শব্দ নিষ্পন্ন। সৎ, অর্থাৎ যাহা বিদ্যমান। যাহা চিরবিদ্যমান তাহাই সত্য। সত্যের ক্ষয়-নাশ-বিকল্প নাই। ইহা সত্য শব্দের মৌলিক অর্থ। এই অর্থে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। সেই কারণ, শাস্ত্র বলিয়াছেন—সত্যই ব্রহ্ম। পরহিতের জন্য বাক্য ও মনের যে যথার্থ

---

(৫) সংগ্রামকারীকে দেখিতে হইবে তিনি যেন স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সত্য ও সদাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হন। যে শাস্তির যোগ্য, তাহাকে শাস্তি দিতে হইবে। হত্যাকারক বা ঘাতক প্রাণবধসময়ে চিন্তা করিবে যে, উহা অপরাধীর নিজের কৃত-কর্মের ফল।

—ভিক্ষু শীলভদ্রকৃত, বুদ্ধবাণী।

(৬) অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।

—যোঃ সূঃ, ২।৩৫

ভাব, তাহাকেও সত্য কহে। (১) ইহা এই শব্দের গৌণ অর্থ। সত্যসাধন বলিলে এই গৌণ অর্থই বুঝায়। সত্যভাষণের অর্থ, পরহিতার্থে (২) সরল চিত্তে অকপট বাক্য। সত্যভাষণ, সদাচারের প্রধান অঙ্গ। সেকালে সমবর্তনের সময় স্নাতককে বিদায়ী অভিভাষণে আচার্য উপদেশ দিতেন—সত্যং বদ, সত্য কথা বলিবে। তাহার কারণ, সত্যাচরণের উপর জগৎ প্রতিষ্ঠিত—সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত। সত্যের অপলাপে জগদ্ব্যাপার অচল হইয়া পড়ে। সত্যসংরক্ষণের উদ্দেশে সমাজ ও রাষ্ট্র যত কিছু ব্যবহারসম্বন্ধীয় বিধান রচনা করিয়াছেন। সকল ধর্মের নির্দেশ—সত্যাচরণ। তবে একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত। দেশ-কাল-পাত্র-নির্বিশেষে সকল অবস্থায় সকল সময়ে সত্যভাষণ সদাচার বলিয়া গ্রাহ্য নহে। পরহিতার্থে সত্যভাষণ কর্তব্য। যে ক্ষেত্রে পরের যথার্থ মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল ঘটিবে, সে ক্ষেত্রে সত্যভাষণ নীতিসম্মত নহে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্মের সূক্ষ্মা গতির আলোচনাকালে (৩) এই বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে, বিচারালয়ে কোন অপরাধীর বিচারকালে সাক্ষীর সত্যভাষণে যদি অপরাধীকে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়, তথাপি সেস্থলে সাক্ষীর সত্যভাষণ সদাচার ও নীতিসম্মত; কেননা, অপরাধীর ন্যায্য দণ্ডভোগ না হইলে সমাজের ও রাষ্ট্রের অমঙ্গল। যেহেতু সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক বড়, সেই হেতু এক্ষেত্রে ব্যক্তির অমঙ্গল ঘটিলেও সমাজের ও রাষ্ট্রের মঙ্গল অভিপ্রেত। অন্তরে সত্য

(১) পরহিতার্থং বাঙ্‌মনসোর্যথার্থত্বং সত্যং।

(২) পরহিতার্থের অর্থ, নিজের না হইয়া অপর ব্যক্তির বা সমষ্টির মঙ্গলের জন্য

(৩) ৪০-৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রতিষ্ঠিত হইলে, কোন ক্রিয়া না করিয়াই তাহার ফললাভ হয়। (১) তাৎপর্য—সত্যপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির বাক্‌সিদ্ধি লাভ হয়।

পরমেশ্বর সর্বভূতে অধিষ্ঠিত। শরীরধারী জীবের দেহ-মন যেন মন্দির এবং তাহার ভিতর অধিষ্ঠিত আছেন যেন দেববিগ্রহস্বরূপ শ্রীভগবান। দেবমন্দিরের পবিত্রতাসাধন যেমন করণীয়, দেহ-মনের পবিত্রতাসাধনও তেমনি করণীয়। দেহ-মনের মালিন্য দূর করার নাম—শৌচ বা পবিত্রতাসাধন।

শৌচ

শৌচ দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। দেহের শুদ্ধি, বাহ্য; আর মনের শুদ্ধি, আভ্যন্তর। এখানে দেহশুদ্ধির অর্থ বিলাসিতা নহে, মৃত্তিকা ও জলাদির দ্বারা দেহের ময়লা পরিষ্কার। মনঃশুদ্ধির অর্থ, সদ্‌গুণের দ্বারা মনের মালিন্য দূর। (২) মনের ময়লা সাধারণতঃ রাগ ও দ্বেষকে বলা হয়। (৩) রাগ-দ্বেষ রজোগুণের কাজ। চিত্তশুদ্ধির অর্থ, চিত্তকে রাগ-দ্বেষবর্জিত করা। ইহা সত্ত্বগুণের কাজ। সেই নিমিত্ত, চিত্তশুদ্ধির জন্য আবশ্যক সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি। আহারের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শ্রুতি বলেন—খাদ্যের সূক্ষ্মাংশের দ্বারা মন গঠিত। (৪)। এই কারণ, তামসিক আহারে তমোগুণের বৃদ্ধি, রাজসিক আহারে রজোগুণের বৃদ্ধি এবং সাত্ত্বিক আহারে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধির

---

(১) সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্। —যোঃ সূঃ, ২।৩৬

(২) শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং—বাহ্যমাভ্যন্তরন্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং, মনঃশুদ্ধিস্তথান্তরং॥
—যোগী যাজ্ঞবল্ক্য।

(৩) ৪২পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) অন্নময়ংহি সোম্য মনঃ·········
—ছাঃ উঃ, ৬।৬।৫

সহায়ক শুদ্ধ আহার বা সাত্ত্বিক আহার। আহারশুদ্ধৌ চিত্তশুদ্ধি (১), আহারশুদ্ধির দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। মনে কোন অপবিত্র ভাবের উদয় হইলে, সঙ্গেসঙ্গে তাহার প্রতিপক্ষ ভাবনা অবলম্বনে সেই অপবিত্র ভাবনা বিদূরিত হয়। যোগশাস্ত্রে চিত্তশুদ্ধির পক্ষে ইহা মহৌষধ বলিয়া গণ্য। (২) যেমন—পরদ্রব্যগ্রহণে চুরি করিবার ভাব মনে আসিলে, অচৌর্য মহাব্রত এই ভাবনা অবলম্বনে ঐ চুরির ভাব মন হইতে অপসারিত হয়। কোন বিষয়ে আসক্তি বা রাগ দূর করিতে, সেই বিষয়ে দোষদর্শন বা মিথ্যাদর্শন উচিত। যেমন—এই জড়দেহের ব্যাধিজনিত বিকারের কথা ভাবিলে এবং এই দেহ চিরস্থায়ী নহে ইহা উপলব্ধি করিলে, এই দেহের প্রতি আসক্তি দূর হইয়া যায়। কোন বিষয়ে আসক্তি না থাকিলে, তাহার প্রতিকূল বিষয়ে ঘৃণা বা দ্বেষও আর থাকে না। রাগ আছে বলিয়াই দ্বেষ আছে। রাগের বর্জনে দ্বেষেরও বর্জন হয়। বাহ্য ও আভ্যন্তর এই উভয়বিধ শৌচসাধন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, নিজ দেহকে অশুচিবোধে তৎপ্রতি অবজ্ঞা জন্মে এবং পরদেহের সংসর্গেও ঘৃণা দেখা দেয়। (৩) তখন মনে হয়, বিষ্ঠা-মূত্র-স্বেদ-কৃমি-ক্ষতাদির আধার এই অপবিত্র দেহের প্রতি এই আসক্তি কেন?

সংযম

সংযম দ্বিবিধ—বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম এবং মনঃসংযম। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, এই দশটি বাহ্যেন্দ্রিয়। ইহারা সর্বদা বহির্মুখী, অর্থাৎ বাহিরে ভোগ্যবিষয়সমূহের পশ্চাতে ধাবমান। মন, অন্তরিন্দ্রিয়। মনকে লইয়া ইন্দ্রিয়গণের

(১) ছাঃ উঃ, ৭।২৬।২

(২) বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্। —যোঃ সূঃ, ২।৩৩

(৩) শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ। —যোঃ সূঃ, ২।৪০

একাদশ সংখ্যা পূর্ণ হয়। এই মন স্বীয় সঙ্কল্পের সাহায্যে দশ বাহেন্দ্রিয়কে প্রবর্তিত করে। সেই কারণ, দশ বাহেন্দ্রিয়ের ও মনের সংযমসাধনের আবশ্যকতা। সংযমের অর্থ পীড়ন নহে—বশীকরণ বা নিয়মিত করণ। দশ বাহেন্দ্রিয়ের সংযম—দম। মনের সংযম—শম। এই দম-শম-সাধন সম্পর্কে শাস্ত্রে অনেক উপায় কথিত। এখানে বিশেষ ভাবে দুই একটা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে পুনঃপুনঃ নশ্বরত্বাদিদোষদর্শন, স্বল্পাহার ও সাত্ত্বিক আহার, অসৎসঙ্কল্পপরিত্যাগ, প্রলোভনের বস্তু হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে অন্যদিকে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি। মনঃসংযমের শ্রেষ্ঠ উপায়, শ্রীভগবানের উপাসনা। তাহার সহিত প্রাণায়াম ও ত্রাটক যোগ অভ্যাসে শীঘ্র ফললাভ হয়। ভজন-সঙ্গীতও একটি উপায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ছয়টি প্রবৃত্তির দমন—সংযম। এই প্রবৃত্তিগুলির আতিশয্যে মন বহির্মুখী হয় এবং ভাগবতজীবনলাভের জন্য যত্নবান হয় না। শ্রীভগবান আছেন অন্তরের অন্তরতম দেশে। মন অন্তর্মুখী না হইলে তাঁহার দর্শন মিলে না—ভাগবত-চৈতন্যের উদয় হয় না। এই ছয়টি প্রবৃত্তি অসংযত হইয়া পড়িলে, তাহাদিগকে রিপু বা শত্রু বলা হয়; কেননা, তাহারা মনকে বহির্মুখী করিয়া বিপথগামী করে। অতএব, সংযমসাধনায় রিপুদমন প্রধান কাজ। কাম হইতে অন্য রিপুগুলির উদ্ভব। কামই ষড়রিপুর আদি। নিজের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির কামনা—কাম। (১) এই কামনা বাধা

(১) আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।

... ...

কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।

—চৈতন্যচরিতামৃত।

প্রাপ্ত হইলে ক্রোধের উৎপত্তি হয়। নিজের ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির ব্যাপারে অন্য কেহ বাধা দিলে, তাহাকে শাস্তি দিবার প্রবৃত্তি আসে, সেই প্রবৃত্তি—ক্রোধ। (২) যে কোন উপায়ে অভিলষিত বস্তু পাইবার আকাঙ্খা—লোভ। লোভ অসংযত হইলে বিচারবুদ্ধির লোপ হয়, সেই অবস্থা—মোহ। অভিলষিত বস্তু পাওয়ার পর মনে এক গর্ব উপস্থিত হয়, সেই গর্ব—মদ। অভিলষিত বস্তু নিজে না পাইয়া অপরে পাইয়াছে দেখিলে মনে এক ক্ষোভ উপস্থিত হয়, সেই ক্ষোভ—মাৎসর্য। কাম-ক্রোধকে বশীভূত করিতে পারিলেই অন্য রিপুগুলিও বশীভূত হয়। ভোগ্যবিষয়ে দোষদর্শন এবং প্রতিপক্ষভাবনার দ্বারা কাম-ক্রোধ বশীভূত হয়।

(২) কোন ব্যক্তির প্রতি, অথবা সমাজের প্রতি, অথবা রাষ্ট্রের প্রতি কেহ অন্যায় আচরণ করিলে, তাহাকে শাস্তি দেওয়ার প্রবৃত্তিরূপ যে ক্রোধ, তাহা রিপু বলিয়া বর্জনীয় নহে; কেননা, তাহার মূলে নিজের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির কামনা নাই। যতিবর শ্রীমৎ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ বলিয়াছেন—ক্রোধ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করলে কাজ চলেনা; তাই লোকের শাসনের জন্য একটু ক্রোধ রাখতে হয়; সত্ত্বগুণের ক্রোধ রাখ্‌বি, রজঃ ও তমঃগুণের ক্রোধ বিষবৎ পরিত্যাগ কর্‌বি।

—স্বামী-শিষ্য-প্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সৃষ্টি ও প্রলয়।

[এক]

সৃষ্টিতত্ত্ব।

সৃষ্টিতত্ত্ব বা বিশ্বসৃষ্টিপ্রকরণ সকল ধর্মের ধর্মগ্রন্থেই আলোচিত হইয়াছে। হিন্দুধর্মগ্রন্থে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান। বেদাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র এই বিষয়ে কিছু-না-কিছু আলোচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ, সৃষ্টিরহস্য দুর্জ্ঞেয়। স্বয়ং ঋগ্বেদ বলেন—কে এই সব জানে এবং কেই তাহা বলিবে যে কোথা হইতে এই সৃষ্টি জাত এবং এই সৃষ্টি কি? দেবগণও সৃষ্টির পরে জাত, অতএব তাঁহারাই বা কি প্রকারে বলিবেন এই সৃষ্টি কাঁহা হইতে উৎপন্ন? (১) বিধাতার সৃষ্টি বিধাতাই জানেন। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন শাস্ত্রকার ঋষিগণ এই গূঢ়তত্ত্বসম্পর্কে নিজ নিজ ধীশক্তিপ্রয়োগে যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাই নিজ নিজ অভিমত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের ধীশক্তির তারতম্য ও দৃষ্টিকোণের ভেদবশতঃ মতভেদ অনিবার্য। হিন্দুধর্মগ্রন্থ বহু, সৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে মতবাদও বহু। এই বিষয়ে সচরাচর দুইটি মত প্রচলিত—(ক) বেদান্তের মত (২) এবং (খ) স্মৃতি-পুরাণাদির

(১) কো অদ্ধাবেদকইহপ্রবোচৎ কুত আজাত কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব।।

—ঋক, ১০।১২৯।৬

(২) বেঃ সাঃ, ৫৪-১২১

মত। এই স্থানে খুব সংক্ষেপে ঐ দুইটি মত সম্পর্কে কিছু বলা যাইতেছে।

(ক) বেদান্তের মতবাদ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ত্রিগুণাতীত নির্গুণ ব্রহ্মের নির্বিশেষ ও নিষ্ক্রিয় অবস্থাই তাঁহার স্বরূপে অবস্থান। তখন একমাত্র তিনিই ছিলেন, আর কিছু ছিল না। সেই অবস্থায় তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা জাগিল। তিনি সত্যকাম। তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই সৃষ্টির সূচনা। (৩) তাঁহার স্বীয় ব্রহ্মশক্তির সাহায্যে ত্রিগুণসংযুক্ত হইয়া সগুণ ও সক্রিয় হইলেন। এই ব্রহ্মশক্তিই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। (৪) ইহাকে মায়া বা মায়াশক্তিও বলা হয়। (৫) কি জন্য যে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম সিসৃক্ষাবশতঃ সগুণ ও সক্রিয় হইলেন, তাহা ধারণার অতীত—জ্ঞানের অতীত। এই কারণ, ইহাকে মায়াকল্পিত ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। তাই, তাঁহার এই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি—মায়াশক্তি। সাংখ্য-দর্শনের মতে, প্রকৃতি বা প্রধান অচেতন হইয়াও চৈতন্যময় পুরুষের সান্নিধ্যে থাকিয়া নিজেই সৃষ্টি করিতেছেন। বেদান্ত ইহা স্বীকার

(৩) এই বিশাল বিচিত্র বিশ্ব পরমেশ্বরের ইচ্ছাপ্রসূত, ইহা কেবলমাত্র হিন্দুশাস্ত্রের কথা নহে। খ্রীষ্ট ধর্মের বাইবেল এবং ইস্‌লামের কোরাণ অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। বাইবেল বলেন, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন—Let there be light and there was light ইত্যাদি [Genesis]। কোরাণও বলেন—পৃথিবী পরমেশ্বরের ঔরসজাত নহে; তিনি সৃষ্টি হৌক্ বলিবামাত্র জগতের সৃষ্টি হইল।

(৪) ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ। —নিঃ উঃ।

(৫) সা মায়া পালিনী শক্তিঃ সৃষ্টিসংহারকারিণী।

—জ্ঞাঃ সঃ তঃ।

করেন না। বেদান্তের মতে, অচেতন বস্তুর কার্য করিবার কোন প্রবৃত্তিই থাকিতে পারে না, কার্য করা তো দূরের কথা। কাজেই, অচেতনা প্রকৃতি কখনো সৃষ্টির কার্য করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, এই প্রকৃতি চৈতন্যাধিষ্ঠিতা—অচেতনা নহে। ইনি চিন্ময় ব্রহ্মেরই চিন্ময়ী শক্তি। মূলাবিদ্যাবশতঃ ত্রিগুণসংযুক্তা। বেদান্তমতে, ব্রহ্মের সিসৃক্ষাই বিশ্বসৃষ্টির নিমত্ত-কারণ এবং তাঁহার ব্রহ্মশক্তির বা মায়াশক্তিই ইহার উপাদান-কারণ। সৃষ্টি-বৈচিত্র্য অসংখ্য, কিন্তু মায়াশক্তি এক। সৃষ্টির বিকাশের স্তরে স্তরে ক্রিয়াভেদে মায়াশক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপ হয় মাত্র, মূলতঃ মায়াশক্তি একই। আধুনিক জড়বিজ্ঞানও ভাষান্তরে সেই কথা বলিতেছেন। জড়বিজ্ঞান পূর্বে বলিয়াছিলেন যে, বিশ্বসৃষ্টির শেষ চরম পদার্থ—সূক্ষ্ম পরমাণু (Atoms)। অধুনা সে মতের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন বলেন, পরমাণুরূপ পদার্থ (Matter) বলিয়া বস্তুতঃ কিছু নাই। বিশ্বসৃষ্টির মূলে আছে এক অব্যাকৃত শক্তিপ্রবাহ (Energy), ইহার নাম—প্রোটাইল (Protyle)। কালক্রমে সেই মূল শক্তিপ্রবাহে অসংখ্য তড়িতাণু (Electrons) ভাসিয়া উঠে। এই তড়িতাণু দ্বিবিধ—পুংজাতীয় (Positive) এবং স্ত্রীজাতীয় (Negative)। পুংজাতীয়—প্রোটন (Proton)। আর স্ত্রীজাতীয়—ইয়ন (Ion)। এই দ্বিবিধ তড়িতাণুর ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংহনন-সমাবেশের দ্বারা বিভিন্নজাতীয় পরমাণুর উৎপত্তি হয়। এইরূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি নব্বইটি মূল পদার্থের সৃষ্টি হয়। তারপর, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় (Chemical combination) বহুপ্রকার যৌগিক পদার্থের (Compound) সৃষ্টি

ব্রহ্মের সিসৃক্ষা সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ এবং চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি বা মায়াশক্তি সৃষ্টির উপাদান-কারণ—আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সহিত ইহার সামঞ্জস্য

হয়। শুধু তাহাই নহে। গতি, তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, চৌম্বক-শক্তি ও রসায়ন-শক্তি ঐ এক মূল শক্তির (Energy) ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ মাত্র। তাৎপর্য—ঐ এক মূল শক্তিপ্রবাহ (Energy) প্রকাশের তারতম্যহেতু গতি, তাপ ইত্যাদি নানারূপে ও নানা নামে দেখা দেয়। এক প্রোটাইলের (Protyle) কাঁপ-চাপ-তাপাদির বিভিন্নতায় পদার্থসকলের বিভিন্নতা। জড়বিজ্ঞানের ঐ মূল শক্তিপ্রবাহটি সাংখ্যের প্রকৃতির ও বেদান্তের মায়াশক্তির সহিত তুলনীয়। বেদান্তের সার কথা—শক্তি চিন্ময়ী। অন্ধ জড় শক্তি স্বাধীনভাবে কাজ করিতে অক্ষম। সৃষ্টিমণ্ডলের সর্বত্র এবং সৃষ্টির প্রত্যেক পরিণতিতে কার্যনির্বাহের জন্য চৈতন্যময় পুরুষ অধিষ্ঠিত। (১) এই সার সত্যের উপর বেদান্তের সৃষ্টিতত্ত্ব স্থাপিত।

শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম সৃষ্টির ইচ্ছায় মায়াশক্তির আবরণে ত্রিগুণ-সংযুক্ত হইলেন। ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। মায়াশক্তির সর্বোৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম, শান্ত ও উজ্জ্বল গুণ—সত্ত্ব; সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, স্থূল ও মলিন গুণ—তমঃ। রজোগুণ এই উভয়ের মধ্যবর্তী ও চঞ্চলধর্মপ্রযুক্ত, রজোগুণকে সত্ত্ব ও তমোগুণের পরিচালক বলা যাইতে পারে। মায়াশক্তি বা প্রকৃতির প্রথমে অব্যক্ত অবস্থা। এই অবস্থায় সত্ত্বাদি গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করে, অর্থাৎ ইহাদের কোনটি অপর দুইটিকে পরাভব করিয়া প্রধান হইবার চেষ্টা করে না। এই গুণসাম্যের অবস্থাই প্রকৃতির স্বরূপ—গুণসাম্যং প্রকৃতিঃ। এই

ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির বা প্রকৃতির গুণসাম্য তাঁহার স্বরূপ ও অব্যক্ত অবস্থা; গুণবৈষম্য তাঁহার ব্যক্ত

(১) প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাচার্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম যন্ত্র সাহায্যে উদ্ভিদের ও ধাতবপদার্থের প্রাণস্পন্দন রেখাঙ্কিত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, তাহাদের সকলের চৈতন্যময় প্রাণশক্তি আছে।

অবস্থা বা সৃষ্টি—সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন মহৎ, তারপর অহংতত্ত্ব, তারপর পঞ্চতন্মাত্র

অবস্থায় সৃষ্টি হয় না, কাজেই প্রকৃতি তখন অব্যক্ত। (২) তারপর, এই গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হইলে, একটি গুণ অপর দুইটিকে পরাভব করিয়া প্রধান হইয়া পড়িলে সৃষ্টির আরম্ভ ঘটে এবং সৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রকৃতি বিকৃত হইয়া ব্যক্ত হয়েন। ত্রিগুণ-বৈষম্যের আদিতে সত্ত্বগুণ অপর দুইটিকে পরাভব করিয়া প্রধান হয়। এই অবস্থায় পরমেশ্বরের ইচ্ছাসংযোগে সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতির প্রথম বিকার বা সৃষ্টি যাহা ঘটে, তাহার নাম—মহৎ। মহৎ বা মহৎ-তত্ত্বের অর্থ, ঈশ্বরের সৃষ্টিসম্বন্ধীয় বুদ্ধি। মানুষ কোন কাজ করিবার পূর্বে সেই বিষয়ে মনে মনে পরিকল্পন করে, ইহা স্বাভাবিক। সেইরূপ পরমেশ্বর যেন বিশ্বসৃষ্টির প্রাক্কালে সৃষ্টিবিজ্ঞানবিষয়ে পরিকল্পন করিলেন। তাঁহার এই পরিকল্পন—মহৎ, বা সৃষ্টিসম্বন্ধীয় বুদ্ধি। ইহার উৎপত্তি সর্বপ্রথমে। পশ্চাৎ প্রকৃতির দ্বিতীয় বিকার যাহা ঘটিল, তাহা রজোপ্রধান। ইহার নাম—অহংতত্ত্ব বা অহঙ্কারতত্ত্ব। পরমেশ্বরের সৃষ্টিসম্বন্ধীয় বুদ্ধি উৎপন্ন হওয়ার পর, তাঁহার যেন অহং বা আমিত্ব-বোধ উৎপন্ন হইল। ইহাই অহংতত্ত্ব বা অহঙ্কারতত্ত্ব। ইহার তাৎপর্য—সৃষ্টি করিতে যাইয়া পরমেশ্বর যেন আপনাকে সৃষ্টিকর্তারূপে সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করিলেন, তিনি যেন আপনাকে আমি বা অহং এবং সৃষ্টিকে ইহা বা ইদং বলিয়া বোধ করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বরের আমিত্ব-বোধ যে একেবারে ছিল না, তাহা নহে। আমিত্ব-বোধ না থাকিলে তাঁহার আদৌ সৃষ্টি করিবার

(২) সৃষ্টির প্রাক্কালে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ত্রিগুণসংযুক্ত হইলেও সৃষ্টিসম্বন্ধে যেন নিষ্ক্রিয় হইয়া নিদ্রিত থাকেন। তাঁহার এই অবস্থাকে শাস্ত্রকারগণ যোগনিদ্রা কহিয়া থাকেন।

ইচ্ছা উদিত হইত না। এই স্থলে পরমেশ্বরের অহংবোধ উৎপন্ন হওয়ার অর্থ এই যে, তিনি এক্ষণে আপনাকে আপনার সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করিলেন। তারপর, তমোপ্রধান প্রকৃতি বা মায়াশক্তির দ্বারা পরমেশ্বর আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর অর্থাৎ এই পঞ্চমহাভূতের পঞ্চসূক্ষ্মভূত সৃষ্টি করিলেন। এই পঞ্চসূক্ষ্মভূত —পঞ্চতন্মাত্র। পঞ্চতন্মাত্র—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। ইহারা যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ স্থূল মহাভূতের সূক্ষ্মাংশ বা তন্মাত্র। স্থূল আকাশে যে সূক্ষ্ম শক্তির সাহায্যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা শব্দতন্মাত্র। স্থূল বায়ুতে যে সূক্ষ্মশক্তির সাহায্যে স্পর্শন উৎপন্ন হয়, তাহা স্পর্শতন্মাত্র। স্থূল অগ্নিতে বা জ্যোতিঃতে যে সূক্ষ্মশক্তির সাহায্যে রূপের উৎপত্তি হয়, তাহা রূপতন্মাত্র। স্থূল জলে যে সূক্ষ্মশক্তির সাহায্যে রসের উৎপত্তি হয়, তাহা রসতন্মাত্র। স্থূল ক্ষিতিতে বা পৃথিবীতে যে সূক্ষ্মশক্তির সাহায্যে গন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা গন্ধতন্মাত্র। এই সূক্ষ্মশক্তিগুলি স্থূল পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্মাংশ। প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থায় গুণত্রয়ের বৈষম্য ঘটিলেও, গুণত্রয়ের কোন একটির সম্পূর্ণ অভাব ঘটে না। তিনটি গুণ সর্বদা সর্বাবস্থায় পরস্পর সংযুক্ত। তবে একটির প্রাধান্যলাভে, অন্য দুইটি তাহার বশীভূত হইয়া থাকে মাত্র। তাই, পঞ্চ তন্মাত্র যদিচ তমোপ্রধান প্রকৃতির সৃষ্টি, তথাপি তাহাদের ভিতর সত্ত্ব ও রজোগুণ সর্বদা বর্তমান। তমোগুণের কার্য—জড়তা। পঞ্চ মহাভূতে জড়তার আধিক্য দেখা যায়। সেই কারণ, পঞ্চ তন্মাত্রকে তমোপ্রধান প্রকৃতি হইতে জাত বলা হয়। তমোপ্রধান প্রকৃতি হইতে পঞ্চ তন্মাত্র যে একবারে একসময়ে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা নহে। প্রথমে সূক্ষ্ম আকাশের বা শব্দতন্মাত্রের

উদ্ভব। (১) সেই সূক্ষ্ম আকাশের কিয়দংশ সূক্ষ্ম বায়ুতে বা স্পর্শতন্মাত্রে পরিণত হয়। সূক্ষ্ম বায়ুর কিয়দংশ আবার সূক্ষ্মতেজে বা রূপতন্মাত্রে পরিণত হয়। সূক্ষ্মতেজের কিয়দংশ আবার সূক্ষ্ম জলে বা রসতন্মাত্রে পরিণত হয়। সূক্ষ্ম জলের কিয়দংশ আবার সূক্ষ্ম পৃথিবীতে বা গন্ধতন্মাত্রে পরিণত হয়। এই ক্রমানুসারে একটি সূক্ষ্ম ভূত হইতে আর একটির উৎপত্তি। যেটি উৎপাদক, সেটি প্রধান। যেটি উৎপন্ন, সেটি অপ্রধান। তাই, প্রথমোক্তগুলি প্রধান এবং শেষোক্তগুলি অপ্রধান। যথা—আকাশ প্রধান এবং বায়ু অপ্রধান।

পঞ্চ তন্মাত্রের বিভিন্ন সাত্ত্বিকাংশ হইতে উৎপন্ন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মশক্তি বা প্রজ্ঞামাত্রা

শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রের সত্ত্বহুল অংশ হইতে ক্রমান্বয়ে পৃথক্ পৃথক্ শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। অর্থাৎ—শব্দতন্মাত্রের সাত্ত্বিকাংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শতন্মাত্রের সাত্ত্বিকাংশ হইতে স্পর্শেন্দ্রিয়, রূপতন্মাত্রের সাত্ত্বিকাংশ হইতে দর্শনেন্দ্রিয়, রসতন্মাত্রের সাত্ত্বিকাংশ হইতে রসেন্দ্রিয় এবং গন্ধতন্মাত্রের সাত্ত্বিকাংশ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় সঞ্জাত। এই নিমিত্ত, শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ, স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শ, দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, রসেন্দ্রিয়ের বিষয় রস এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধ। যে তন্মাত্র হইতে যে ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব, বিষয়রূপী সেই তন্মাত্রে সেই ইন্দ্রিয় স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়—অন্য তন্মাত্রে বা বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না। যেমন—কর্ণের দ্বারা

(১) নব্য বাইবেলও (New Testament) সেই কথা বলেন—In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God [St. John, I-1]

শব্দই শোনা যায়, রূপদর্শন বা স্পর্শবোধ বা রসাস্বাদন বা গন্ধগ্রহণ হয় না। এখানে ইন্দ্রিয় শব্দে অস্থি-চর্ম-শিরাদির দ্বারা নির্মিত স্থূল কর্ণ-নেত্র-জিহ্বাদি স্থূলদেহের অঙ্গবিশেষকে বুঝায় না। যেমন আকাশাদি স্থূল ভূতসমূহের প্রত্যেকের সূক্ষ্ম শক্তি আছে, তেমনি কর্ণ-নেত্র-জিহ্বাদি স্থূল দেহাঙ্গবিশেষের প্রত্যেকের এক এক সূক্ষ্ম শক্তি আছে এবং সেই শক্তির সাহায্যে তাহারা সক্রিয় হয়। এখানে ইন্দ্রিয় শব্দের অর্থ, সেই সূক্ষ্ম শক্তি। এই সূক্ষ্ম শক্তির নাম —প্রজ্ঞামাত্রা। (২)

পঞ্চ তন্মাত্রের মিলিত সাত্ত্বিকাংশ হইতে উৎপন্ন বুদ্ধি ও মন

শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রের মিলিত সাত্ত্বিকাংশ হইতে বুদ্ধি ও মন সঞ্জাত। এই দুই অন্তঃকরণবৃত্তি প্রকাশাত্মক, অর্থাৎ জ্ঞানের প্রকাশক। প্রকাশাত্মক বলিয়া তাহারা সত্ত্বাংশসম্ভূত। যদি বুদ্ধি ও মন পঞ্চ তন্মাত্রের মিলিত বা একত্রীভূত সত্ত্বাংশ হইতে উদ্ভূত না হইয়া এক একটি বিশেষ তন্মাত্রের সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে সেই বিশেষ বিশেষ তন্মাত্রের প্রতি তাহারা অনুরক্ত হইত ; কিন্তু তাহা নহে। মন ও বুদ্ধি শব্দাদি সকল তন্মাত্রের প্রতি সমানভাবে অনুরক্ত।

শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রের পৃথক্ পৃথক্ রজোগুণাংশ হইতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের উদ্ভব। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—বাগিন্দ্রিয়, করণেন্দ্রিয়, চলনেন্দ্রিয়, নিঃসারণেন্দ্রিয় ও জননেন্দ্রিয়। শব্দতন্মাত্রের রাজসিক অংশ হইতে

(২) প্রজ্ঞামাত্রাগুলি সূক্ষ্ম জড় শক্তি—চেতন শক্তি নহে। ইহাদের স্থূল আধার, মস্তিষ্ক। আধুনিক দেহবিজ্ঞানে brain centres বলিয়া কথিত। মস্তিষ্ক হইতে ইহারা সূক্ষ্ম স্নায়ুসমূহের সাহায্যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-গোলক ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়-গোলক পরিচালিত করে। ১৫৯-১৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাক্য বা বাগিন্দ্রিয়, স্পর্শতন্মাত্রের রাজসিক অংশ হইতে করণেন্দ্রিয়, রূপতন্মাত্রের রাজসিক অংশ হইতে চলনেন্দ্রিয়, রসতন্মাত্রের রাজসিক অংশ হইতে নিঃসংরণেন্দ্রিয় এবং গন্ধতন্মাত্রের রাজসিক অংশ হইতে জননেন্দ্রিয় উদ্ভূত। এখানেও ইন্দ্রিয় শব্দে স্থূলদেহের অঙ্গস্বরূপ মুখ, হস্ত, পদ, পায়ু বা মলদ্বার ও উপস্থ বা লিঙ্গ বুঝায় না—তাহাদের অভ্যন্তরে যে সূক্ষ্মশক্তিগুলি আছে, সেই সকল সূক্ষ্মশক্তিকে বা প্রজ্ঞামাত্রাকে বুঝায়। ঐ সকল সূক্ষ্মশক্তিসমূহের স্থূল বাহ্য যন্ত্রস্বরূপ মুখ-হস্ত-পদ-পায়ু-উপস্থ। শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রের সম্মিলিত রজোগুণাংশ হইতে পঞ্চপ্রাণের উৎপত্তি। পঞ্চপ্রাণ—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রজ্ঞামাত্রা, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের প্রজ্ঞামাত্রা, পঞ্চপ্রাণ, বুদ্ধি এবং মন এই সপ্তদশ অবয়ব লইয়া জীবের সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহ গঠিত। দেহ-সৃষ্টির দুই ভাব—ব্যষ্টি ও সমষ্টি। দেহগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহুবুদ্ধির বিষয় হইলে, ব্যষ্টি; আর, সমস্ত দেহ এক হইয়া একবুদ্ধির বিষয় হইলে, সমষ্টি।

পঞ্চ তন্মাত্রের বিভিন্ন রজোগুণাংশ হইতে উদ্ভূত পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মাংশ বা প্রজ্ঞামাত্রা এবং মিলিত রজোগুণাংশ হইতে উদ্ভূত পঞ্চপ্রাণ

সূক্ষ্মদেহের সপ্তদশ অবয়ব—সূক্ষ্মদেহের সমষ্টি, হিরণ্যগর্ভ; এবং ব্যষ্টি, তৈজস

দৃষ্টান্ত—কোন বনে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অনেক বৃক্ষ আছে: সমস্ত বৃক্ষের সমষ্টিকে একবুদ্ধিতে দেখিয়া বন বলা যায় এবং বন বলিলে সেই বনের মধ্যে সমস্ত বৃক্ষকেই বুঝায়; অন্যপক্ষে, এক এক জাতীয় বৃক্ষকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখিয়া ব্যষ্টিবুদ্ধিতে বলা যায় ইহা বট, ইহা অশ্বত্থ, ইহা নারিকেল ইত্যাদি। সেইরূপ, বিশ্বে সমস্ত জীবের সমস্ত সূক্ষ্মদেহ একবুদ্ধির বিষয় হইলে বনের ন্যায় সমষ্টি হয়, আর প্রত্যেক জীবের আধারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহুবুদ্ধির বিষয় হইলে বৃক্ষের ন্যায়

ব্যষ্টি হয়। প্রতি সূক্ষ্মদেহে চৈতন্য বিদ্যমান; অতএব, সমস্ত সূক্ষ্মদেহের সমষ্টিগত চৈতন্য আছে এবং পৃথক্ পৃথক্ ব্যষ্টিগত চৈতন্যও আছে। অবশ্য সমষ্টিগত চৈতন্য ও ব্যষ্টিগত চৈতন্য চৈতন্যাংশে অভিন্ন; সমস্ত সূক্ষ্মদেহের সমষ্টিগত চৈতন্য—হিরণ্যগর্ভ। তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ ব্যষ্টিগত চৈতন্য—তৈজস। অগ্নি, আদিত্য, বরুণ ইত্যাদি অধিদৈবত দেবতাগণও সূক্ষ্মশরীরধারী—তৈজস। তাঁহারা স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের এক এক অংশের বা লোকের অধিষ্ঠাতা চৈতন্যময় পুরুষ। তাঁহাদেরও সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি ঐ পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের বা তন্মাত্রের সত্ত্ব ও রজোগুণ হইতে।

সূক্ষ্মশরীরধারী হিরণ্যগর্ভ, দেবতা ও তৈজসাদির উৎপত্তিকাল অবধি এই সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র (১) অপঞ্চীকৃত অবস্থায় থাকে। অপঞ্চীকৃতের অর্থ, অসংহত বা অমিলিত। এই অবস্থায় ইহারা কোন প্রকারে জগৎ-নির্মাণের উপযুক্ত হয় না। কালক্রমে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ইহাদের তামসাংশ সংহত বা পঞ্চীকৃত হয় এবং সূক্ষ্ম প্রজ্ঞামাত্রা-সমূহ ইহাদের সহিত সমবেত হয়। এই ভাবে সূক্ষ্ম তন্মাত্রগুলির তামসাংশের পঞ্চীকরণের ফলে স্থূলদেহের ও স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব ঘটে। এই পঞ্চীকরণ-প্রকরণের বর্ণনা শাস্ত্রে আছে। এক এক সূক্ষ্মভূতের বা তন্মাত্রের তামসাংশের অর্ধেকের সহিত অপর চারি চারি সূক্ষ্মভূতের তামসাংশের অষ্টমাংশ মিশ্রিত হইয়া, প্রত্যেকেই পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করে। সেই পরিণতিকে পঞ্চীকরণ কহে। পঞ্চীকরণের পর সূক্ষ্মভূতগুলি

পঞ্চ তন্মাত্রের তামসাংশের পঞ্চীকরণে পঞ্চ স্থূল মহাভূতের উদ্ভব—পশ্চাৎ পঞ্চ মহাভূতে পঞ্চগুণের অভিব্যক্তি

(১) তন্মাত্র ও প্রজ্ঞামাত্রাগণ অতি সূক্ষ্ম। সেই নিমিত্ত, ভাগবতে এই সকল সৃষ্টিকে ভাবরূপী বলা হইয়াছে—তাহাদের উপলব্ধি হয় কেবলমাত্র ভাবনার দ্বারা।

আর সূক্ষ্ম থাকে না, তখন স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্থূল পঞ্চমহাভূতে বা পঞ্চতত্ত্বে পরিণত হয়। স্থূল পঞ্চমহাভূত—আকাশ, বায়ু, অগ্নি বা তেজ, জল ও পৃথিবী বা ক্ষিতি। এই পঞ্চীকরণের পর শব্দ-তন্মাত্রের তামসাংশ হইতে স্থূল আকাশ, স্পর্শতন্মাত্রের তামসাংশ হইতে স্থূল বায়ু, রূপতন্মাত্রের তামসাংশ হইতে স্থূল তেজ বা অগ্নি, রসতন্মাত্রের তামসাংশ হইতে স্থূল জল এবং গন্ধতন্মাত্রের তামসাংশ হইতে স্থূল পৃথিবী সঞ্জাত হয়। পঞ্চীকরণের পর একটি স্থূল ভূতে অন্য চারিটির তন্মাত্রের তামসাংশও বর্তমান থাকে, তবে যাহাতে যে ভূতের সূক্ষ্ম তামসাংশ বেশী, তাহার নাম হয় সেই ভূতের নামানুযায়ী। যেমন— সূক্ষ্ম আকাশের বা শব্দতন্মাত্রের আট আনার সহিত সূক্ষ্ম বায়ুর বা স্পর্শতন্মাত্রের দুই আনা, সূক্ষ্ম তেজের বা রূপতন্মাত্রের দুই আনা, সূক্ষ্ম জলের বা রসতন্মাত্রের দুই আনা এবং সূক্ষ্ম পৃথিবীর বা গন্ধতন্মাত্রের দুই আনা মিশ্রিত হইয়া যে ষোল আনা স্থূলভূতের পরিণতি হয়, তাহাতে সূক্ষ্ম আকাশের বা শব্দতন্মাত্রের তামসাংশ বেশী অর্থাৎ আট আনা থাকায়, তাহার নাম হয়—আকাশ; সূক্ষ্ম বায়ুর আট আনার সহিত সূক্ষ্ম আকাশের দুই আনা, সূক্ষ্ম তেজের দুই আনা, সূক্ষ্ম জলের দুই আনা এবং সূক্ষ্ম পৃথিবীর দুই আনা মিশ্রিত হইয়া যে ষোল আনা স্থূল ভূতের পরিণতি হয়, তাহাতে সূক্ষ্ম বায়ুর তামসাংশ বেশী অর্থাৎ আট আনা থাকায়, তাহার নাম হয়—বায়ু। তেজ, জল ও পৃথিবী এই তিন স্থূল ভূতের নামকরণসম্বন্ধেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। (২) প্রকারান্তরে বর্তমান জড়বিজ্ঞানও এই পঞ্চীকৃত স্থূল

---

(২) পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পঞ্চতন্মাত্রের মিলিত সত্ত্বগুণ হইতে বুদ্ধি ও মন এবং মিলিত রজোগুণ হইতে পঞ্চ প্রাণ উদ্ভূত। সেখানে সেই গুণসমূহের

মহাভূত স্বীকার করেন। (৩) পঞ্চীকৃত হইলে আকাশাদি স্থূল ভূতসমূহে শব্দাদি গুণনিচয় অভিব্যক্ত হয়। আকাশে শব্দগুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শগুণ; তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ গুণ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস গুণ; এবং ক্ষিতিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণ। অপ্রধান ভূতে প্রধান ভূতের গুণ বিদ্যমান থাকে, তাহা ভিন্ন একটি নূতন গুণ যুক্ত হয়। অপ্রধানে যে নূতন গুণটি যুক্ত হয়, তাহাকে তাহার নিজের গুণ বলা যায়। যেমন— আকাশের গুণ শব্দ; সূক্ষ্ম বায়ু সূক্ষ্ম আকাশ হইতে উৎপন্ন, তাই অপ্রধান বায়ুতে প্রধান আকাশের শব্দগুণ বর্তমান থাকে এবং তাহা ভিন্ন নূতন স্পর্শগুণটি যে যুক্ত হয়, সেই স্পর্শগুণটিকে বলা হয় বায়ুর নিজের গুণ। এই ভাবে তেজের নিজের গুণ, রূপ; জলের নিজের গুণ, রস; এবং ক্ষিতির নিজের গুণ, গন্ধ।

সম্মিলন, পঞ্চীকরণ নহে। সেখানে পঞ্চ তন্মাত্র অসংহত থাকে, তবে তাহাদের সত্ত্ব ও রজঃ গুণগুলি মাত্র সম্মিলিত হয়। পঞ্চীকরণ-প্রকরণে পঞ্চ তন্মাত্রগণও মিলিত হইয়া যেন জমাট বাঁধিয়া যায়। এই প্রভেদ।

(৩) আধুনিক জড়বিজ্ঞানের ভাষায় আকাশকে Ether, বায়ুকে Gas, তেজকে Heat and Light, জলকে Liquid এবং ক্ষিতিকে Solid বলা যাইতে পারে। এই Ether, Gas, Heat and Light, Liquid এবং Solid লইয়া যে জড়-জগৎ গঠিত, এই কথা জড়বিজ্ঞানও বলেন। জড়বিজ্ঞানের মতে Nebula নামক এক বায়বীয় পদার্থ (gaseous substnce) প্রথমে ছিল। এই Nebula আকাশ-বায়ু-তেজের মিশ্রণজাত। ইহার ভিতর তেজ থাকায়, ইহা হইতে অনবরত তাপ ও আলোক বিকীর্ণ হইত। পশ্চাৎ সেই Nebula হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং বিচ্ছিন্নাংশ জমাট বাঁধিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদিতে পরিণত হয়।

এই পঞ্চীকৃত স্থূল পঞ্চ মহাভূত হইতে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য এই সপ্ত লোক উপরে এবং অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল এই সপ্ত লোক নীচে উৎপন্ন হয়। চতুর্দশ লোকের (১) আধার, ব্রহ্মাণ্ড। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ স্থূল দেহও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূর্ত। পৃথিবী হইতে ওষধি অর্থাৎ ধান্য-যবাদি উদ্ভিজ্জ জীবসকল উদ্ভূত হয়। ওষধি হইতে খাদ্য, খাদ্য হইতে শুক্র, এবং শুক্র হইতে অন্য জীবগণ উৎপন্ন। চতুর্বিধ স্থূল দেহেরও দুই ভাব—সমষ্টি এবং ব্যষ্টি। সমস্ত স্থূলদেহকে সমষ্টিরূপে এক স্থূলশরীর ধরিতে পারা যায়, আবার প্রত্যেক স্থূলদেহকে ব্যষ্টিরূপে পৃথক্ ভাবে ধরিতে পারা যায়। স্থূলদেহসমুদয়ের সমষ্টিগত চৈতন্য—বৈশ্বানর বা বিরাট। আর, প্রত্যেক স্থূলদেহের ব্যষ্টিগত চৈতন্য—বিশ্ব। প্রকৃতপক্ষে, চৈতন্যাংশে বিশ্ব ও বিরাট অভিন্ন।

পঞ্চীকৃত মহাভূত হইতে চতুর্দশ ভুবন ও চতুর্বিধ স্থূল দেহ উৎপন্ন—স্থূল দেহের সমষ্টি, বৈশ্বানর বা বিরাট; এবং তাহার ব্যষ্টি, বিশ্ব

জাগ্রদবস্থাতে বিশ্ব ও বিরাট ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বাহ্যজগতে স্থূলবাহ্যবিষয়সমূহ ভোগ করেন। সেই অবস্থায় দিক্, বায়ু, অর্ক প্রভৃতি অধিদৈবত দেবতাগণ ইন্দ্রিয়গণের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রিত করেন। সূক্ষ্ম প্রজ্ঞামাত্রাগুলি জড় শক্তি। তাহারা

ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাগণ কর্তৃক

(১) লোকের অর্থ, আবাস। হিরণ্যগর্ভ হইতে লতাগুল্মাদি পর্যন্ত অসংখ্য জীব সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ ধারণ করিয়া আছে। সেই কারণ, তাহাদের আবাসের বা লোকের সংখ্যা সূক্ষ্ম-স্থূল-ভেদে অসংখ্য। এখানে মাত্র মোটামুটি লোকসংখ্যা চতুর্দশ বলা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ তালিকা নহে।

ইন্দ্রিয়গণ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত—জীবাত্মার সহিত ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাগণের প্রভেদ

মস্তিষ্ক হইতে স্থূল ইন্দ্রিয়-গোলকগণকে পরিচালিত করে বটে, কিন্তু কোন চেতন শক্তির দ্বারা নিজেরা নিয়ন্ত্রিত না হইলে অপরকে পরিচালনা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। সেই হেতু শাস্ত্র বলেন যে, প্রজ্ঞামাত্রাগুলি এবং তৎসহ ইন্দ্রিয়গোলক-গুলি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এক এক চেতন শক্তির দ্বারা। সেই চেতন শক্তি— দেবতা। অধিদৈবত দেবতাগণের কেহ কেহ এই প্রকারে জীবের এক এক ইন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত হন।(১) দিক্‌দেবতা অধিষ্ঠিত হন শ্রবণেন্দ্রিয়ে, বায়ুদেবতা স্পর্শেন্দ্রিয়ে, অর্ক দর্শনেন্দ্রিয়ে, বরুণ রসেন্দ্রিয়ে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে। এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। বহ্নিদেবতা অধিষ্ঠিত হন বাগিন্দ্রিয়ে, ইন্দ্র করণেন্দ্রিয়ে, উপেন্দ্র বা বিষ্ণু চলনেন্দ্রিয়ে। যম নিঃসারণেন্দ্রিয়ে এবং প্রজাপতি জননেন্দ্রিয়ে। এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। চতুর্মুখ ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত হন বুদ্ধিতে এবং চন্দ্রদেবতা মনে। এই ভাবে ঐ সকল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিশ্ব ও বিরাট শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ উপলব্ধি করেন, কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁহারা বচন-গ্রহণ গমন-মলনিঃসারণ-জননাদির কাজ করেন, এবং বুদ্ধির সাহায্যে নিশ্চয় ও মনের সাহায্যে সংশয় অনুভব করেন।(২) ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাগণ ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা বটে, কিন্তু তাঁহারা ইন্দ্রিয়গণের কার্যের সুখ-দুঃখাদিরূপ ফলভোগ করেন না। একমাত্র জীবাত্মাই ভোক্তা, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবতাগণ নহেন। (৩) ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত

(১) ঐঃ উঃ ১।২।৪

(২) বেঃ সাঃ, ১১৫

(৩) বেঃ দঃ, ২।৪।১৪-১৬

দেবতাগণ হইতে জীবাত্মা স্বতন্ত্র। জীবাত্মা সাক্ষাৎ পরমাত্মার বা পরব্রহ্মের অংশস্বরূপ। পরমাত্মাই প্রকৃতিজাত দেহেন্দ্রিয়াদির দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া জীবাত্মা হইয়াছেন। তিনি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। শ্রুতি বলিয়াছেন—সৃষ্টির পর শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম সৃষ্টির ভিতর একাংশে অনুপ্রবেশ করিলেন। সেই নিমিত্ত, হিন্দুশাস্ত্র বলেন যে, সৃষ্টিমণ্ডলের সর্বত্র এক চৈতন্যময় পুরুষ অধিষ্ঠিত, জড়ের মধ্যেও তিনি। তিনিই সৃষ্টির প্রত্যেক পরিণতিতে স্বয়ং বর্তমান থাকিয়া, সৃষ্টির সকল অবস্থা আনয়ন করিয়াছেন—করিতেছেন—করিবেন। এই দৃষ্টিতে দেখিয়া বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর-হিরণ্যগর্ভ-বিরাট-তৈজস-বিশ্ব প্রভৃতি নাম সৃষ্টির ভিতর একাংশে অনুপ্রবিষ্ট সেই এক পরব্রহ্মেরই—সৃষ্টিক্রিয়ার পরিণতিভেদে তাঁহার নামের ভেদ মাত্র।

সৃষ্টির সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধ কি প্রকার, সেই বিষয়ে বেদান্তে প্রধানতঃ দুই মতবাদ আছে—বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ। ব্রহ্ম অপরিবর্তনশীল, নামরূপময় জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি মিথ্যা, ত্রিগুণাত্মক মায়াশক্তির দ্বারা কল্পিত এই জগৎ ব্রহ্মের উপর আরোপিত, অনিত্য জগৎকে অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশতঃ নিত্য বলিয়া বোধ হয় রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত—ইহাই বিবর্তবাদ। (৪) এই পরিদৃশ্যমান নামরূপময় সৃষ্ট জগৎ মিথ্যা নহে, ব্রহ্মই স্বেচ্ছায় স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির সাহায্যে বিকৃত হইয়া স্বয়ং এই জগৎ হইয়াছেন এবং অন্তর্যামীরূপে তাহার ভিতরে থাকিয়া জগতের শাসন-নিয়ন্ত্রন করিতেছেন, যেমন স্বর্ণনির্মিত সকল

সৃষ্টি ও পরব্রহ্মের সম্বন্ধবিষয়ে বেদান্তের দুই মতবাদ—বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ

(৪) ১২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

জিনিষই প্রকৃত স্বর্ণ তেমনি সৃষ্টিমণ্ডলের সকল বস্তুই প্রকৃত ব্রহ্ম—ইহাই পরিণামবাদ। (৫) অদ্বৈতবাদী গ্রহণ করেন বিবর্তবাদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী পরিণামবাদ।

(খ) স্মৃতি-পুরাণাদির মতবাদ।

সৃষ্টিতত্ত্বসম্পর্কে স্মৃতিপুরাণাদি বেদান্তের মতবাদ অনুসরণ করিয়াছেন, তবে সাধারণের সহজবোধ্য করার অভিপ্রায়ে বৈদান্তিক মতকে রূপক-উপাখ্যানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উপাখ্যানভাগে স্মৃতি এবং পুরাণের মধ্যেও কিছু কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

সৃষ্টি দ্বিবিধ—প্রাকৃত ও বৈকৃত

স্মৃতিপুরাণাদির মতে, সৃষ্টি দ্বিবিধ—প্রাকৃত ও বৈকৃত। প্রাকৃত সৃষ্টির অন্য নাম, সর্গ। বৈকৃত সৃষ্টির অন্য নাম, ব্রহ্মার সৃষ্টি। প্রথমে প্রাকৃত সৃষ্টি এবং পরে বৈকৃত সৃষ্টি। সূক্ষ্ম মহৎ বা মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূল পৃথিবী অবধি সৃষ্টিধারা, প্রাকৃত সৃষ্টি। পৃথিবীলোকে ল স্থূজীবাদির সৃষ্টি এবং সূক্ষ্মলোকে সূক্ষ্মশরীরী দেব-গন্ধর্বাদির সৃষ্টি—বৈকৃত সৃষ্টি বা ব্রহ্মার সৃষ্টি।

প্রথমে প্রাকৃত সৃষ্টি। পরমেশ্বরের ইচ্ছাসংযোগে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির গুণবৈষম্যের ফলে প্রথমে উৎপন্ন মহৎ বা মহত্তত্ত্ব, তারপর অহঙ্কারতত্ত্ব। ইহা যে বেদান্তের মত, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। পৌরাণিক শাস্ত্রকারগণ এই অহঙ্কারতত্ত্বকে আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও

প্রাকৃত সৃষ্টি

তামসিক এই তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। তামসিক অহঙ্কার বিকৃত হইয়া পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বা

(৫) ১৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পঞ্চ তন্মাত্র উৎপাদন করে। ঐ পঞ্চ তন্মাত্রের মিলিত সত্ত্বাংশে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের দ্বারা মন এবং রাজসিক অহঙ্কারের দ্বারা বুদ্ধি উদ্ভূত হয়। পঞ্চ তন্মাত্রের মিলিত রজঃ-অংশে রাজসিক অহঙ্কারের দ্বারা পঞ্চপ্রাণের উৎপত্তি। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পাঁচ তন্মাত্রের পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বাংশ হইতে যথাক্রমে শ্রবণেন্দ্রিয়-স্পর্শেন্দ্রিয়-দর্শনেন্দ্রিয়-রসেন্দ্রিয়-ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ রজঃ-অংশে যথাক্রমে বাগিন্দ্রিয়-করণেন্দ্রিয়-চলনেন্দ্রিয়-নিঃসারণেন্দ্রিয়-জননেন্দ্রিয় এই পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় রাজসিক অহঙ্কারের দ্বারা উৎপন্ন হয়। এখানেও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়ের অর্থ, ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মশক্তি বা প্রজ্ঞামাত্রা। স্মৃতি-পুরাণাদিতে প্রজ্ঞামাত্রাকে জীবাত্মার সহিত সংলগ্ন থাকায় আত্মমাত্রা কহে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের, বুদ্ধির ও মনের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতা-গণের উদ্ভব। পূর্বে বেদান্তমতের আলোচনাপ্রসঙ্গে এই দেবতাগণের কথা কথিত হইয়াছে। এতকাল পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বা তন্মাত্র যেন অসংহত বা অমিলিত অবস্থায় থাকে। এখন তাহারা মিলিত বা পঞ্চীকৃত হয়। এই পঞ্চীকরণ-প্রণালীও পূর্বে কথিত হইয়াছে। পুরাণের মতে, পরমেশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত ও আত্মমাত্রা-বিশিষ্ট জীবাত্মা কালক্রমে হিরণ্য বা স্বর্ণ ও সূর্যের ন্যায় দীপ্তিশালী একটা বৃহৎ অণ্ডরূপে পরিণত হয়, এবং আকাশ-বায়ু-জ্যোতিঃ-জল-পৃথিবী এই পাঁচ স্থূলভূতকে উৎপাদন করে। প্রথমে পঞ্চভূত একাকারে মিশ্রিত থাকায় অতিশয় তরল থাকে এবং পরে জমিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। প্রধান ভূতগুলি অপ্রধান ভূতগুলিকে বেষ্টন করিয়া তাহাদের আবরণস্বরূপ হইয়া থাকে। আকাশ বায়ুকে, বায়ু জ্যোতিঃকে, জ্যোতিঃ জলকে এবং জল পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া

রহে। (১) পৃথিবী তখন জলমগ্ন হয়। এই জলমগ্ন পৃথিবীকে জলগর্ভ হইতে উদ্ধারের জন্য পরমেশ্বর একদিকে পর্বতমালা সৃষ্টি করিয়া অন্য দিকে জলরাশি বা সমুদ্র স্থাপিত করেন। (২) পঞ্চীকৃত স্থূল ভূতসকল হইতে ভূরাদি লোকসকলের সৃষ্টি। এই অবধি প্রাকৃত সৃষ্টি।

এইবার বৈকৃত সৃষ্টি বা ব্রহ্মার সৃষ্টি। জলগর্ভ হইতে পৃথিবীকে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর নিয়ন্তারূপে জলেতে ব্যাপ্ত ছিলেন; সেই অবস্থায় তিনি নারায়ণ। নার অর্থাৎ জলে যিনি অবস্থিত তিনিই নারায়ণ। (৩) পূর্বোক্ত অণ্ডমধ্যে সলিলশায়ী নারায়ণের নাভিস্থল বা কেন্দ্র-শক্তি হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। হিরণ্যসদৃশ দীপ্তিশালী অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মার জন্ম বলিয়া তাঁহার অন্য নাম—হিরণ্যগর্ভ। (৪)

বৈকৃত সৃষ্টি বা ব্রহ্মার সৃষ্টি

(১) অধুনা ভূতত্ত্ববিদ্‌গণও নিরূপণ করিয়াছেন যে, ভূগর্ভের উত্তাপের আতিশয্যবশতঃ ভূতলস্থ জল বাষ্পাকারে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়াছিল এবং পরে পৃথিবীপৃষ্ঠ শীতল হইলে ঐ বাষ্পরাশি জলে পরিণত হইয়া পৃথিবীকে প্লাবিত ও বেষ্টন করিল।

(২) বাইবেলেও অনুরূপ উক্তি—And God said, Let the waters under heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.

—Bible, Genesis, I—9

(৩) বাইবেলের কথা—And the Spirit of God moved upon the face of the waters.

—Bible, Genesis, I—2

(৪) হিরণ্যসদৃশ দীপ্তিশালী সূক্ষ্ম শরীরসমূহের সমষ্টিগত চৈতন্যকে বেদান্তে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়।

১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মার আবির্ভাবের পর তিনি যে সৃষ্টি করিলেন, সেই সৃষ্টিধারা —বৈকৃত সৃষ্টি। প্রধানতঃ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মার সৃষ্টি এবং সেই সৃষ্টিতে জীব-সৃষ্টি মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। জীবের আবাসের জন্য ভূরাদি লোকসমূহের সৃষ্টি, এবং জীবের ভোগের জন্য শব্দাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের সৃষ্টি। যাহার সূক্ষ্ম অথবা স্থূল শরীর আছে, সেই জীব। জীবাত্মা সেই শরীরের দ্বারা আবৃত। সৃষ্টিব্যাপারে প্রথম ও শ্রেষ্ঠ জীব, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা স্বয়ং। তিনি সূক্ষ্মশরীরী। দেব-গন্ধর্ব-কিন্নরাদিও সূক্ষ্মশরীরী জীব। মনুষ্য-পশু-কীট-পতঙ্গ-তরু-লতা-গুল্মাদিও জীব, তবে তাহারা স্থূলশরীরী। পূর্বে বলা হইয়াছে যে স্থূল দেহ চতুর্বিধ—উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ। পরিদৃশ্যমান জগতের শৃঙ্খলানুযায়ী কার্যনির্বাহের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা প্রথমে সূর্য, চন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি অধিদৈবত দেবতাগণের সৃষ্টি করেন। এখানে সূর্য-চন্দ্রাদির কথনে সেই সেই নামের জড়পিণ্ডগুলি বুঝায় না; তাহাদের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম সঞ্চালিকা, সংযমনী চেতন শক্তিগুলির আধারস্বরূপ চৈতন্যময় পুরুষকে বুঝায়। তাঁহারাই অধিদৈবত দেবতা। তাঁহারা সত্ত্ব-রাজসিক; সত্ত্বগুণের প্রাবল্যহেতু নিজ নিজ অধিকারে শৃঙ্খলারক্ষায় প্রবৃত্ত। (৫) অধিদৈবত দেবতাগণের

---

(৫) পূর্বে ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা যে দেবতাগণের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা অধ্যাত্মদেবতা। তাঁহারা জীবদেহে ইন্দ্রিয়গণের কার্যশৃঙ্খলায় নিযুক্ত। আধ্যাত্মিকের সঙ্গে আধিদৈবিকের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যথা পিণ্ডে তথা ব্রহ্মাণ্ডে, যেমন জীবদেহে তেমনি ব্রহ্মাণ্ডে। বস্তুতঃ, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত অধ্যাত্ম দেবতাগণ অধিদৈবত দেবতাগণ হইতে ভিন্ন নহেন। শ্রুতি বলেন—বায়ু-বরুণাদি অধিদৈবত দেবতাগণই জীবদেহে ইন্দ্রিয়সমূহে অনুপ্রবিষ্ট। শ্রীশ্রীচণ্ডীও বলিয়াছেন—এক বিশ্বব্যাপিকা ব্রহ্মশক্তি চিন্ময়ী

সৃষ্টির পর ব্রহ্মা দিনরাত্রি, সংবৎসর, কাল, ঋতু, মেঘ ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করেন। তারপর, ব্রহ্মা মনন করা মাত্র তাঁহার কতকগুলি মানসপুত্র উদ্ভূত হন। এই মানসপুত্রগণের আদিতে চারি কুমার—সনৎ, সনক, সনন্দন ও সনাতন; এবং পশ্চাৎ স্বায়ম্ভূব মনু ও দশ প্রজাপতি। সনদাদি চারি কুমার ঊর্ধ্বরেতা মুনি। প্রতি কল্পান্তে প্রলয়কালে ব্রহ্মার সৃষ্টি লয় প্রাপ্ত হয় এবং সেই সঙ্গে বেদের তিরোভাব বা অপ্রকাশ ঘটে। পুনরায় কল্পারম্ভে ব্রহ্মার সৃষ্টিকালে বেদের আবির্ভাব বা প্রকাশ হয়। কল্পারম্ভে লুপ্ত বেদের বা ব্রহ্মবিদ্যার পুনঃপ্রচার করেন এই সনদাদি চারিজন কুমার। ব্রহ্মার সৃষ্টির আদিতে প্রয়োজন বেদের পুনঃপ্রকাশ বা ব্রহ্মবিদ্যার পুনঃপ্রচার। তাই, ব্রহ্মা প্রথমে এই চারি কুমারকে মানসপুত্ররূপে জন্মদান করেন। তারপর, আদি মনু এবং মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশ মুনি (১) তাঁহার মানসপুত্ররূপে উৎপন্ন হন। মরীচি প্রভৃতি দশ মুনি হইতে প্রজাগণ অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাদি জাত বলিয়া এই দশ মুনিকে প্রজাপতি বলা হয়। এই দশ প্রজাপতি যেন সৃষ্ট প্রাণিগণের পিতৃস্থানীয়। ব্রহ্মা আবার এই প্রজাপতিগণের

দেবী জীবদেহে ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী এবং ব্রহ্মাণ্ডে পঞ্চ স্থূল ভূতের ও পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের প্রেরয়িত্রী। [চণ্ডী—৫।৭৭]

(১) এই দশ মুনির মধ্যে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাতজন সপ্তর্ষি নামে পুরাণে খ্যাত। ঋগ্বেদের সপ্তর্ষির সহিত পুরাণের সপ্তর্ষির নামের কিছু বৈষম্য আছে। ঋগ্বেদের সপ্তর্ষি—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জামদগ্নি, কশ্যপ, গৌতম, অত্রি ও ভরদ্বাজ। পুরাণে ও ঋগ্বেদে অত্রি এবং বশিষ্ঠ এই দুইটি নামের মিল আছে, বাকীগুলি অমিল।

জনক। তাই, ব্রহ্মাকে প্রাণিগণের পিতামহ বলা হয়। প্রজাপতি মরীচির পুত্র, কশ্যপ। দক্ষ প্রজাপতির তের জন কন্যাকে কশ্যপ বিবাহ করেন। তাঁহার সেই পত্নীগণের গর্ভে দেবতা (২), দৈত্য, সর্প, পক্ষী প্রভৃতি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রাণীসকলের জন্ম হয়। এইরূপে প্রজাপতিগণ হইলেন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের জনক। আদি মনুও ব্রহ্মার মানসজাত। সেই কারণ, তাঁহার নাম—স্বায়ম্ভুব মনু। ব্রহ্মার অপর নাম, স্বয়ম্ভু। সেই স্বয়ম্ভুর মানসজাত বলিয়া আদি মনুর নাম, স্বায়ম্ভুব মনু। মনুষ্যগণ এই আদি মনুর বংশধর। তাই, মনুষ্যকে মানব কহে। ঋগ্বেদে আদি মনুকে বলা হইয়াছে পিতা মনু। পিতা মনু ঋগ্বেদে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি ঋগ্বেদের একজন প্রাচীনতম ঋষি এবং মানব-সমাজের আদি ব্যবস্থাপক। পরবর্তী সামাজিক বিধানকর্তা মনুগণ ঐ স্বায়ম্ভুব মনুর প্রবর্তিত ব্যবস্থা-নির্দেশকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পিতার ন্যায় পূজা করিতেন। ঋক্‌মন্ত্রে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রজাপতিগণের ও মনুর উৎপত্তি সম্পর্কে যাহা পৌরাণিক কাহিনী তাহাই খুব সংক্ষেপে এখানে উল্লিখিত হইল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই পৌরাণিক কাহিনীর ভিতর এক ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে। পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় সেই সত্যটি এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। (৩)

(২) অধিদৈবত ও অধ্যাত্ম দেবতাগণের কথা পূর্বে কথিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেবগণের সহায়ক এক উপদেবতা জাতি আছে। এখানে দেবতা শব্দে সেই উপদেবতা জাতিকে বুঝিতে হইবে। বিদ্যাধর, অপ্সর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ও ভূত—এইগুলি উপদেবতা জাতি এবং দেবগণের সহায়ক।

(৩) বেদ-প্রবেশিকা।

বৈবস্বত মনুর পূর্বের সময়কে দুই যুগে বিভাগ করা যাইতে পারে—প্রাজাপত্য যুগ ও মানব যুগ। প্রথমে প্রাজাপত্য যুগ। তখন সমাজ অতিশয় ক্ষুদ্র ছিল। কতকগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে পর্যবসিত ছিল। এক এক প্রজাপতি ছিলেন এক এক গোষ্ঠীপতি। তাঁহারা ছিলেন স্বাধীন ও স্ব স্ব প্রধান। পিতা মনু আবির্ভূত হইয়া ঐ গোষ্ঠীপতি প্রজাপতি-গণকে একত্র করেন এবং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া মানব-সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই সময়ে মানবযুগের আরম্ভ। পশ্চাৎ ভিন্ন ভিন্ন কালে এই সম্মিলিত মানব-সমাজের বিধানকর্তাগণ পিতা মনুর নামানু-সারে 'মনু' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বৈবস্বত মনুর অধিকারকালে তিনি সর্বপ্রথমে করের ব্যবস্থা ও করগ্রহণ করিয়া 'মনু' নাম পরিত্যাগ-পূর্বক 'রাজা' উপাধি ধারণ করেন। বৈবস্বত মনুই মানব-সমাজের সর্বপ্রথম রাজা। তাঁহার আবির্ভাব পিতা মনুর প্রায় ১৮০ বৎসর পরে।

মনুসংহিতায় যে সৃষ্টিপ্রকরণ উল্লিখিত, তাহা পুরাণকথিত প্রাগুক্ত সৃষ্টিপ্রকরণ হইতে কিছুটা অন্যরূপ। মনু মহারাজ বলিয়াছেন যে, পর-ব্রহ্ম বা পরমাত্মা প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিলেন এবং তারপর সেই জলগর্ভে স্বীয় শক্তিবীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত বীজ স্বর্ণনির্মিত ও সূর্যসদৃশ প্রভাযুক্ত একটি অণ্ড হইল। সেই

মনুসংহিতার সৃষ্টিপ্রকরণ

অণ্ডে সর্বলোকপিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করি-লেন। ভগবান ব্রহ্মা সেই অণ্ডমধ্যে ব্রাহ্মপরিমিত এক বৎসর কাল বাস করিয়া অণ্ড দ্বিধা হোক এই চিন্তা করিলেন। তাঁহার এই চিন্তামাত্র অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইল। ব্রহ্মা সেই দুই খণ্ডের উর্ধ্ব-খণ্ডে স্বর্গ এবং অধঃখণ্ডে পৃথিবী করিলেন। মধ্যভাগে আকাশ, অষ্ট দিক এবং চিরস্থায়ী সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয় প্রস্তুত করিলেন। (১)

(১) মনু, ১।৮-১৩

এখানে উর্ধ্বখণ্ডের অর্থ পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ জ্যোতিঃ, বায়ু ও আকাশরূপ তিনটি মহাভূতের আবেষ্টন। পৃথিবীর এই আবেষ্টনও অণ্ডের অন্তর্গত। বেদান্তের সৃষ্টিপ্রকরণে যেমন বৈকৃত সৃষ্টি বা ব্রহ্মার সৃষ্টি সম্বন্ধে উল্লেখ নাই, মনুসংহিতার সৃষ্টিপ্রকরণে তেমনি প্রাকৃত সৃষ্টির উল্লেখ নাই। কিন্তু পুরাণে এই দুই সৃষ্টিরই উল্লেখ আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—সৃষ্টির পর সৃষ্টির ভিতর সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর অনুপ্রবেশ করিলেন। এই শ্রুতিবচন ভিত্তি করিয়া ব্রহ্মের অনুপ্রবেশকেই স্মৃতি-পুরাণাদি ব্রহ্মার জন্মগ্রহণরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ইহা বিষ্ণুপুরাণের উক্তি হইতে সুস্পষ্ট। বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—বিষ্ণু অর্থাৎ সর্বব্যাপক পরমেশ্বর ব্রহ্মারূপে অণ্ডে বাস করিলেন, বিষ্ণুই ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। (১) প্রকৃতপক্ষে, পরব্রহ্মের জন্মগ্রহণ অসম্ভব; সৃষ্টিতে পরমেশ্বরের আবির্ভাব বুঝাইতেই ব্রহ্মার জন্মকথন।

সৃষ্টিতত্ত্ব যে বেদান্তে এবং স্মৃতি-পুরাণাদিতেই কথিত, তাহা নহে। বৈদিক যুগের আদি হইতেই এই বিষয়ে আলোচনা দেখা যায়।

ঋগ্বেদে সৃষ্টিতত্ত্ব

ঋগ্বেদেও সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচিত। বেদান্তের মতবাদ এবং স্মৃতিপুরাণাদির মতবাদ, এই উভয় মতবাদেরই বীজভূমি—ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, ইন্দ্র। তিনিই পরমেশ্বর—তিনিই সৃষ্টিকর্তা। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—এক ইন্দ্র স্বীয় মায়াশক্তির দ্বারা বিশ্বে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই ব্যষ্টিভাবে জীবাত্মারূপে জীবে জীবে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সহস্র ইন্দ্রিয়গণের মাধ্যমে সহস্র প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। (২)

---

(১) বিষ্ণুপুরাণ, ১।২

(২) রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ইয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ॥

—ঋক্, ৬।৪৭।১৮

এই ঋকমন্ত্রের উপর বেদান্তের মতবাদ অধিষ্ঠিত। ঋগ্বেদ আরো বলিয়াছেন—ইহাকে (বিশ্বজগৎকে) জল (কারণ সলিল) প্রথম গর্ভে ধারণ করেন (হিরণ্যগর্ভ অণ্ডরূপে); যাঁহাতে সর্ব দেবগণ সমবেত হয়েন, সেই জন্মহীন পুরুষের নাভিতে ব্রহ্মাণ্ড অর্পিত এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডে সকল ভুবন স্থান পায়। (১) এই ঋকমন্ত্র হইতে পুরাণে কারণসলিলশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি এবং স্মৃতি-পুরাণাদিতে অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মার জন্ম কল্পিত। প্রতি কল্পারম্ভে পূর্ব কল্পের অনুযায়ী সৃষ্টি পরমেশ্বর করেন, এই কথাও ঋগ্বেদে কথিত। ইহা একটি প্রসিদ্ধ ঋক্‌মন্ত্র; সর্ববেদীয় ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। সে মন্ত্র এই—যিনি সর্বগত, নিত্য ও বিকারহীন পুরুষ তিনি প্রদীপ্ত হইলেন; তারপর রাত্রি, সমুদ্রবৎ জলরাশি এবং সংবৎসর অর্থাৎ কাল উৎপন্ন হইল; আপন বিক্রমের দ্বারা মায়া স্ববশ করত: তিনি অহোরাত্র সৃষ্টি করিলেন; সেই বিধাতা সূর্য, চন্দ্র, স্বর্গ, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী পূর্ব পূর্ব কল্পের ন্যায় সৃষ্টি করিলেন। (২)

(১) তমিদ্ গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্যনাভা বধ্যে কমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ॥

—ঋক্, ১০।৮২।৬

(২) ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্য জায়ত।
ততো রাত্র্য জায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ।
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোঽজায়ত।
অহো রাত্রানি বিদধদ্বিশ্বস্যমিষতোবশী।
সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতাযথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষ মথোস্বঃ।

—ঋক্, ১০।১৯০।১-৩

কি ঋগ্বেদ, কি বেদান্ত, কি স্মৃতি-পুরাণাদি সকল হিন্দুশাস্ত্র একবাক্যে বলেন যে, সৃষ্টির আদি নাই। সৃষ্টির পর কিছুকাল স্থিতি, তারপর লয়। লয়ের পর আবার সৃষ্টি-স্থিতি, তারপর আবার লয়। এইরূপ এক প্রবাহ যেন চলিয়াছে অনাদি অনন্ত কাল। পরমেশ্বর অনাদি অনন্ত, তাঁহার এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের লীলাও অনাদি অনন্ত। প্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টি যাহা হয় তাহা একেবারে নূতন নয়, তাহা হয় পুরাতন কল্পের বা সৃষ্টির অনুযায়ী। প্রলয়ে জীব-জগতের কারণস্বরূপ বীজগুলি থাকিয়া যায়, ধ্বংস হয় না। প্রলয়ান্তে সেই সকল বীজ হইতে নামরূপময় বিচিত্র জীব-জগৎ আবার সৃষ্ট হয়। বীজ হইতে অঙ্কুর যেমন জন্মে, তেমন। বিশ্বের কারণ-বীজ প্রলয়ের গর্ভে থাকে বলিয়া প্রলয়ের অবস্থাকে বলা হয় কারণ-সলিল। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বীজ, আবার বীজ হইতে অঙ্কুর—এই প্রবাহ চলিয়াছে। ইহাতে বীজ প্রথমে অথবা অঙ্কুর প্রথমে, ঠিক বলা যায় না। সেইরূপ সৃষ্টি-প্রলয়-প্রবাহের ভিতর সৃষ্টি প্রথমে কি প্রলয় প্রথমে, ঠিক তাহা বলা যায় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বীজাঙ্কুরের মত সৃষ্টি-প্রলয়-প্রবাহের আদি নাই ও শেষ নাই।

[দুই]

প্রলয়তত্ত্ব।

এই নামরূপাত্মক পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিয়া সাধারণতঃ মনে হয় বুঝি ইহা চিরদিন এই ভাবেই আছে ও থাকিবে। এই বুদ্ধি ভ্রান্তিজাত। সুদূর অতীতে এই জগৎ ছিল না এবং সুদূর ভবিষ্যতে ইহা থাকিবে না। জীবের জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় এই জগতেরও জন্ম-মৃত্যু

আছে। নব্য ভূবিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন যে, কোটি কোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবী, চন্দ্র ইত্যাদি গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র এই সব ছিল না—ছিল এক জ্বলন্ত বায়বীয় পদার্থ (Nebula)। সেই পদার্থের কিছু কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া কালক্রমে শীতলত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারা জমিয়া এই সব গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রাদি হইয়াছে। পৃথিবী শীতলত্ব পাওয়ার পর ক্রমশঃ জীবজন্তুর বাসের উপযোগী হইয়া উঠে এবং তখন ভূ-পৃষ্ঠে নানা প্রকার জীবজন্তুর উদ্ভব হয়। জন্ম যেমন সত্য, মৃত্যুও তেমনি সত্য। জন্মই সৃষ্টি এবং মৃত্যুই ধ্বংস বা লয়। জীব-জগতে ধ্বংসের পরিচয় আমরা নিত্যই পাই—কি ব্যষ্টিতে, কি সমষ্টিতে। চক্ষুর সম্মুখে কত জীব মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে, তাহা আমরা সর্বদাই দেখি। সমষ্টিভাবেও এক এক শ্রেণীর জীব ধ্বংস বা লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, প্রাক্-মানবীয় যুগে (Mesozoic Age) ধরাপৃষ্ঠ গহন বন ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষাদিতে আচ্ছন্ন ছিল এবং অতিকায় অরণ্যচারী পশুগণ (Tyranno-Saurus) বিচরণ করিত। শূন্যপথে আকাশচারী অতিকায় গরুড়জাতীয় পক্ষিগণ (Pterodactyles) ভ্রমণ করিত। মানবীয় যুগের প্রারম্ভে সেই সকল জাতীয় জীব একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐরাবত হস্তী কিছুকাল পূর্বেও ছিল, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ মিলিয়াছে। তাহাদের অস্থিপুঞ্জও স্থানে স্থানে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ আর সেই ঐরাবত হস্তী নাই। কাজেই বলিতে হয়, লয় বা ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। পরিদৃশ্যমান জগতের ধ্বংসই প্রলয়। কেবল মাত্র হিন্দুশাস্ত্রকারগণই জগতের প্রলয়ের সিদ্ধান্ত করেন নাই। বর্তমান কালে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণও জগতের ভাবী প্রলয়ের

সৃষ্টি ও লয় ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে নিত্য সঙ্গী—নব্য ভূবিজ্ঞানেরও সেই কথা

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। (১) হিন্দুশাস্ত্রের কথা—যে ক্রমানুযায়ী সৃষ্টির পরিণতি, তাহার বিপরীত ক্রমানুযায়ী প্রলয়ের গতি।

বেদান্তের মতবাদ

বেদান্তের মতে, মাকড়সা যেমন ইচ্ছাবশতঃ আপনার উদর হইতে তন্তু সৃজন করিয়া পরে ইচ্ছা হইলে সেই তন্তু আবার আপনার উদর মধ্যে সংহরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সত্যকাম পরমেশ্বর ইচ্ছাক্রমে নিজ অব্যক্ত মায়াশক্তি হইতে এই বিশ্বকে প্রকাশ করিয়া পুনরায় ইচ্ছা হইলে এই ব্যক্ত বিশ্বকে নিজ অব্যক্ত মায়াশক্তিতে সংবরণ করেন। মায়াশক্তিতে বিশ্বের সংবরণ—প্রলয়। প্রলয়ের গতি এইরূপ। (২) প্রথমে ভূর্ভুবাদি চতুর্দশ ভুবন এবং চতুর্বিধ স্থূল দেহ পঞ্চ মহাভূতে বিলীন হয়; এই অবস্থায় বিশ্বনামক ব্যষ্টি স্থূলদেহধারী জীব এবং বিরাট বা বৈশ্বানর নামক সমষ্টি স্থূলদেহধারী জীব আর থাকে না। তারপর, আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত বিলীন হয় পঞ্চ সূক্ষ্মভূতে বা তন্মাত্রে এবং তখন এই তন্মাত্রগুলি অপঞ্চীকৃত বা অসংহত হইয়া পড়ে। তখন পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন এই সব সূক্ষ্মশরীরের অবয়ব পঞ্চ তন্মাত্রে বিলীন হয়;

---

(১) কিছু বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের Proctor, অষ্ট্রীয়ার Lohschmidt এবং অধ্যাপক Tay, Thompson ও Klansius প্রত্যেকেই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অধুনা Eddington ও Jeans প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, জগৎ ধ্বংসের পথে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছে, শেষে তাহার তাপমৃত্যু (heat-death) হইবে। সূর্য ক্রমশঃ শীতলত্ব পাইতেছে, অবশেষে সূর্যের তাপ থাকিবে না এবং তাহার অভাবে সৌর জগৎও থাকিবে না। Jeans বলেন—The universe cannot go on for ever; a time must come when its last erg of energy has reached the lowest rung on the ladder of descending availability. And at this moment the active life of the Universe must cease.

(২) বেঃ সাঃ, ১৩৯-১৪২।

তাহার ফলে তৈজস নামক ব্যষ্টি স্থূক্ষ্মশরীরধারী জীব এবং হিরণ্যগর্ভ নামক সমষ্টি স্থূক্ষ্মশরীরধারী জীব আর থাকেন না। অধিদৈবত এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত অধ্যাত্ম দেবতাগণও আর থাকেন না। তারপর, এই পঞ্চ তন্মাত্র প্রকৃতির বা মায়াশক্তির তমোগুণজাত বলিয়া তাহার তমোগুণে বিলীন হয়। অহংকারতত্ত্ব বিলীন হয় প্রকৃতির রজোগুণে এবং মহৎ-তত্ত্ব তাহার সত্ত্বগুণে। সেই সময় প্রকৃতির আর গুণ-বৈষম্য থাকে না। প্রকৃতিতে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ তিন গুণ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই অবস্থায় স্থষ্টির সম্পূর্ণ লয় ঘটে। প্রকৃতি তখন অব্যক্ত হয় এবং স্বরূপে অবস্থান করে। প্রকৃতির এই অব্যক্ত অবস্থায় স্থষ্টিমণ্ডলের বীজ-সমূহ সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না—স্থূক্ষ্ম সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে। সেই বীজ বা স্থূক্ষ্ম সংস্কারসমূহ হইতে পুনরায় পূর্বের তুল্য স্থষ্টি হয়। পরমেশ্বর মায়াশক্তির বা প্রকৃতির এই অব্যক্ত অবস্থার সহিত সংযুক্ত থাকেন এবং ইহাকে তাঁহার কারণ-শরীর বলা হয়। বেদান্তমতে, প্রলয় প্রধানতঃ দুই প্রকার—নিত্য প্রলয় এবং প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয়। দৃষ্টিরেব স্থষ্টি, দৃষ্টিই স্থষ্টি। যতক্ষণ নামরূপাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বোধগম্য হয় ততক্ষণ ইহা প্রকট, আর যখন তাহা হয় না তখন ইহা অপ্রকট। প্রত্যহ জীবের নিদ্রাকালে সুষুপ্তিতে তাহার ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি কোন কাজ করে না এবং সেই কারণ বাহ্য জগতের কোন অনুভূতি তাহার থাকে না, এমন কি নিজের ব্যক্তিত্ব-বোধও থাকে না। সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের কাছে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অপ্রকট হয়। ইহাও এক প্রকার প্রলয়। প্রত্যহ জীবের সুষুপ্তি অবস্থায় এইভাবে জগৎ অপ্রকট হয় বলিয়া ইহার নাম—নিত্য প্রলয়। উপরে বর্ণিত প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থায় বা সাম্যাবস্থায় যখন মহৎ-তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দশ ভুবন ও স্থূলদেহ সমস্ত বিলীন

হইয়া যায়, তখন তাহাকে বলা হয়—প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয়। সুষুপ্তিকালে নিত্য প্রলয়ে জীবের জাগ্রদাবস্থার সংস্কারগুলি বীজরূপে অন্তরে নিহিত থাকে, নিদ্রাভঙ্গে জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সেই সংস্কারগুলি হইতে পূর্ব স্মৃতিসমূহ পুনরায় উৎপন্ন হয়। সেইরূপ মহাপ্রলয়ে সৃষ্টি-মণ্ডলের সংস্কাররাশি বীজরূপে অব্যক্ত প্রকৃতিতে নিহিত থাকে এবং তাহা যেন পরমেশ্বরের সুষুপ্তির অবস্থা। সৃষ্টির প্রাক্-কালে প্রকৃতির গুণ-বৈষম্য ঘটিলে পরমেশ্বর যেন জাগ্রত হন এবং সৃষ্টিমণ্ডলের সংস্কার-বীজ হইতে তাঁহার পূর্ব স্মৃতি ফিরিয়া আসে। তখন তিনি পূর্বানুরূপ নূতন সৃষ্টি করেন। বেদান্তমতে, আরো এক প্রকার প্রলয় আছে—ঐকান্তিক প্রলয়। পূর্বে(১) বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের দুই ভাব—নির্বিশেষ ও সবিশেষ। প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয় যখন ঘটে, তখনো তাঁহার সবিশেষ ভাব। সেই অবস্থারও উপরে যখন তিনি নির্বিশেষভাবে স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁহাতে ত্রিগুণ আদৌ থাকে না—ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি বা প্রকৃতিও আর থাকে না। তখন ব্রহ্ম সম্পূর্ণ একক—একমেবাদ্বিতীয়ং। তিনি ব্যতীত আর কিছু নাই। তাঁহার কারণ-শরীরও আর থাকে না, সৃষ্টিমণ্ডলের সূক্ষ্ম সংস্কাররাশির বা বীজসমূহের ঐকান্তিক নাশ হয়। ইহার নাম—ঐকান্তিক প্রলয়। নিত্য প্রলয়ে ও মহাপ্রলয়ে সৃষ্টিমণ্ডলের সূক্ষ্ম সংস্কাররাশি বা বীজগুলি কারণরূপে অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, কিন্তু ঐকান্তিক প্রলয়ে সেই বীজগুলিও আর বিদ্যমান থাকে না।

পুরাণাদির মতে, প্রলয় দ্বিবিধ—প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয় এবং দৈনন্দিন প্রলয় বা নৈমিত্তিক প্রলয়। প্রাকৃত সৃষ্টির নাশ—প্রাকৃতিক প্রলয়। বৈকৃত সৃষ্টি বা ব্রহ্মার সৃষ্টির

পুরাণাদির মতবাদ

(১) ১৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নাশ—দৈনন্দিন প্রলয়। সৃষ্টিতত্ত্বপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, সূক্ষ্ম মহৎ বা মহৎ-তত্ত্ব হইতে স্থূল পৃথিবী পর্যন্ত হইল প্রাকৃতিক সৃষ্টি। আর ব্রহ্মার জন্মের পর তিনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক পরিদৃশ্যমান জগৎ যাহা সৃষ্টি করেন, তাহাই হইল ব্রহ্মার সৃষ্টি। প্রলয়-ক্রম সৃষ্টি-ক্রমের বিপরীত। সৃষ্টিকালে প্রথমে প্রাকৃতিক সৃষ্টি এবং পশ্চাৎ ব্রহ্মার সৃষ্টি। প্রলয়কালে প্রথমে ব্রহ্মার সৃষ্টির লয় বা দৈনন্দিন প্রলয় এবং পশ্চাৎ প্রাকৃত সৃষ্টির লয় বা মহাপ্রলয়। ব্রহ্মা যখন সৃষ্টি করেন তখন যেন তাঁহার জাগ্রদবস্থা, আর তাঁহার সৃষ্টির যখন লয় হয় তখন যেন তাঁহার সুষুপ্তির অবস্থা। যেমন জীবের জাগ্রদবস্থায় বাহ্য জগৎ প্রকাশিত হয় এবং সুষুপ্তিতে লয় প্রাপ্ত হয়, তেমন ব্রহ্মার জাগ্রদবস্থায় জগৎ-প্রপঞ্চ ব্যক্ত হয় এবং সুষুপ্তিতে তাঁহাতেই লুপ্ত হয়। জীব জাগ্রত থাকে দিবা-ভাগে এবং নিদ্রিত হয় রাত্রিভাগে। তাই, ব্রহ্মার জাগ্রদবস্থাকে ব্রহ্মার দিন এবং তাঁহার সুষুপ্তির অবস্থাকে ব্রহ্মার রাত্রি কহে। ব্রাহ্মীদিনের অবসানে ব্রাহ্মীরাত্রিতে যে প্রলয়, তাহাই দৈনন্দিন বা নৈমিত্তিক প্রলয়। দৈনন্দিন প্রলয়কালে প্রথমে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ ও চতুর্বিধ জীব লীন হইয়া যায় তাহাদের জন্মদাতা দশ প্রজাপতি ও স্বায়ম্ভুব মনুর অভ্যন্তরে। দেব-যক্ষ-কিন্নরাদি সূক্ষ্ম-শরীরী জীবগণও ঐভাবে প্রলীন হইয়া যান। সূর্য, দিনরাত্রি, সংবৎসর, কাল, ঋতু, মেঘ ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থ লয় প্রাপ্ত হয়। তারপর দশ প্রজাপতি, স্বায়ম্ভুব মনু এবং সনকাদি চারি কুমার ব্রহ্মার মানসজাত বলিয়া ব্রহ্মার মনের মধ্যে বিলীন হইয়া যান। পৃথিবী আবার জলমগ্ন হয়। বেদ-বিদ্যার লোপ বা অপ্রকাশ হয়। তখন সলিলশায়ী নারায়-ণের নাভিকমলে একমাত্র ব্রহ্মাই থাকেন এবং তখন ব্রহ্মার যেন নিদ্রাবস্থা। এই দৈনন্দিন বা নৈমিত্তিক প্রলয়ে প্রাকৃত সৃষ্টির কিছু লয়

হয় না। আকাশাদি পঞ্চ স্থূলভূত বিদ্যমান থাকে। নৈমিত্তিক প্রলয়ের অবসানে ব্রহ্মা পুনরায় জাগ্রত হন এবং সৃষ্টির কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি পূর্ব সৃষ্টির ন্যায় পুনরায় সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার এই দৈনন্দিন সৃষ্টি ও প্রলয়কে এক কল্প বলে। এই ভাবে কল্প-কল্পান্তর ব্রহ্মার সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে। ব্রহ্মার এই দিন-রাত্রি অনুযায়ী মাস ও বৎসর গণনার দ্বারা যে এক শত বৎসর হয়, তাহাই ব্রহ্মার পরমায়ু। এই এক শত ব্রাহ্মী বৎসর যাবৎ দৈনন্দিন প্রলয়ের পর প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয় উপস্থিত হয় এবং সেই মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মারও নাশ বা মৃত্যু ঘটে। মহাপ্রলয়ে সলিলশায়ী নারায়ণের নাভিকমলে ব্রহ্মা লয় প্রাপ্ত হন, পঞ্চ স্থূল ভূত অপঞ্চীকৃত হইয়া সূক্ষ্মভূতে বা তন্মাত্রে লীন হয়, সূক্ষ্ম তন্মাত্র বা আত্মমাত্রাগুলি অহংতত্ত্বে লীন হয়, অহংতত্ত্ব মহৎ-তত্ত্বে লীন হয় এবং পরিশেষে মহৎ-তত্ত্ব আদ্যা প্রকৃতির স্বরূপে লীন হয়। সেইকালে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ঘটায় প্রকৃতি অব্যক্ত হইয়া পড়ে। সলিলশায়ী নারায়ণও তখন থাকেন না। কেবলমাত্র সৃষ্টিমণ্ডলের সূক্ষ্ম সংস্কাররূপী বীজসমূহ প্রকৃতির উৎকৃষ্ট অংশে কারণদেহে অবস্থিতি করে। পরমেশ্বরও জীবের সখাস্বরূপ ঐ কারণদেহে অবস্থিতি করেন। স্মৃতি-পুরাণাদিতে ঐকান্তিক প্রলয়ের কথা অপ্রকাশিত।

[তিন]

কাল-বিভাগ।

হিন্দুশাস্ত্রে সৃষ্টি ও প্রলয়তত্ত্বের আলোচনায় কাল-বিভাগের কথা সহজে আসিয়া পড়ে। সৃষ্টি পরিণামী; অর্থাৎ, সৃষ্ট পদার্থমাত্রের পরিণাম বা পরিবর্তন আছে। কালই ঐ পরিণাম-সম্পাদক। নির্বিশেষভাবে ব্রহ্ম দেশ-কালাতীত। সেই অবস্থায় দেশও নাই, কালও নাই। সবিশেষভাবে সিসৃক্ষাবশতঃ যখন তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেন, তখন সৃষ্টিমণ্ডলের ভিতর দেশ (১) ও কালের উৎপত্তি হয়। সৃষ্টিমণ্ডলে সৃষ্টিপ্রবাহের ন্যায় কালপ্রবাহও অনাদি অনন্ত। মহাপ্রলয়ে সৃষ্টিমণ্ডলের সংস্কাররূপী বীজের সঙ্গে কাল-বীজও বিদ্যমান থাকে—ধ্বংস হয় না। পুনরায় সৃষ্টির সময় সেই বীজ হইতে কালের উৎপত্তি হয়। একমাত্র ঐকান্তিক প্রলয়ে ব্রহ্মের নির্বিশেষ অবস্থায় সৃষ্টি-মণ্ডলের সংস্কারবীজের সহিত কালের বীজও সমূলে ধ্বংস হয়। যাহার দ্বারা সৃষ্টিধারার পৌর্বাপর্যবোধ জন্মে, তাহাই কাল। কাল আছে বলিয়া কাল-বিভাগের কল্পনা অবশ্যম্ভাবী। বৈশেষিক দর্শনের মতে কাল এক, অখণ্ড ও নিত্য; তবে ব্যবহারের সুবিধার জন্য ক্ষণ, মুহূর্ত, দিন প্রভৃতি কালের বিভাগ বা অংশ কল্পিত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল মানব-সমাজে কাল-বিভাগ কল্পিত। সূর্য-চন্দ্রের উদয়-অস্ত অবস্থিতি-গতি অনুসারে দণ্ড-মুহূর্ত দিবা-রাত্রি সপ্তাহ-মাস ষড়ঋতু-সংবৎসর ইত্যাদি কালের ক্ষুদ্র হইতে ক্রমশঃ বৃহৎ ও বৃহত্তর বিভাগ সর্বদেশেই দেখা যায়। আধুনিক পণ্ডিতগণ শতাব্দী সহস্রাব্দী এই ভাবে কালের

হিন্দুশাস্ত্রে কাল-বিভাগের বিশালতা

(১) দেশ অর্থাৎ মহাকাশ (Hyper-Space), যে মহাকাশে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ঘটিতেছে।

আরো বৃহত্তর বিভাগ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এই বিষয়ে সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহারা প্রধানতঃ স্মৃতি-পুরাণাদিতে কালের যে বিশাল বিভাগ করিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। সৃষ্টিপ্রবাহের সহিত কালপ্রবাহ বিজড়িত। অতএব, সৃষ্টির সহিত কালের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সৃষ্টি ও প্রলয়ের গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা কালকে বৃহত্তর হইতে বৃহত্তম অংশে বিভক্ত করিয়াছেন—চতুর্যুগ, দৈবীযুগ, কল্প ও মন্বন্তর। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চতুর্যুগ। ইহা মানবের যুগ। এই চারি যুগে এক মহাযুগ, সেই মহাযুগকে দেবতার এক যুগ বা দৈবীযুগ কহে। এইরূপ এক সহস্র মহাযুগে বা দৈবীযুগে ব্রহ্মার একদিন বা দিবাভাগ, অর্থাৎ বার ঘণ্টা। (২) এই দিবাভাগে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। তারপর, এক সহস্র মহাযুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি বা রাত্রিভাগ, অর্থাৎ বার ঘণ্টা। ব্রহ্মার এই রাত্রিভাগে ব্রাহ্মী সৃষ্টির লয় বা নৈমিত্তিক প্রলয় ঘটে। ব্রহ্মার এক দিন বা দিবাভাগ—দিনকল্প বা সৃষ্টিকল্প। ব্রহ্মার এক রাত্রি বা রাত্রি-ভাগ—রাত্রিকল্প বা লয়কল্প। (৩) প্রতি সৃষ্টিকল্পে পর পর চৌদ্দজন মনুর আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক মনুর অধিকৃত কাল—মন্বন্তর। এই দিনকল্প ও রাত্রিকল্প লইয়া ব্রহ্মার চব্বিশ ঘণ্টা হয়। এইভাবে চব্বিশ ঘণ্টায় একদিন ধরিয়া মাস ও বৎসর গণনা করিয়া যে একশত বৎসর হয়, তাহাই ব্রহ্মার পরমায়ু। একশত ব্রাহ্মী বৎসরের অবসানে ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। অন্য কথায়, ব্রহ্মার ৩৬৫

---

(২) চতুর্যুগসহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে।—
বিষ্ণুপুরাণ।

(৩) কল্পান্তে প্রলয়, এই কথার তাৎপর্য এই যে সৃষ্টিকল্পের শেষে নৈমিত্তিক প্রলয়। কল্পান্তে পুনঃসৃষ্টি, এই কথার তাৎপর্য এই যে লয়কল্পের শেষে ব্রহ্মার দৈনন্দিন সৃষ্টি।

শত দিনকল্প ও রাত্রিকল্পের পর মহাপ্রলয়। (১) তখন ব্রহ্মার জীবনাবসান হয়। চতুর্যুগ ও চৌদ্দ মন্বন্তর সম্পর্কে আরো কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

চতুর্যুগ ও দৈবীযুগ এবং যুগধর্ম

হিন্দুশাস্ত্রমতে, সত্য—ত্রেতা—দ্বাপর—কলি এই চারি যুগ পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতেছে। সত্যের পর ত্রেতা, ত্রেতার পর দ্বাপর, দ্বাপরের পর কলি। আবার কলির পর সত্যযুগের আরম্ভ। এই প্রকারে চতুর্যুগ চক্রাকারে ঘুরিতেছে। সৃষ্টিকল্পান্তে নৈমিত্তিক প্রলয় বা ব্রহ্মার রাত্রি না হওয়া অবধি চতুর্যুগের এই আবর্তন চলিতে থাকে। নৈমিত্তিক প্রলয়ের শেষে পুনরায় যখন ব্রহ্মার দিবাভাগে দৈনন্দিন সৃষ্টির আরম্ভ হয়, তখন পুনরায় এই যুগাবর্তনও দেখা দেয়। মানবীয় বৎসর অনুযায়ী—সত্যযুগের পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর, ত্রেতাযুগের ১২৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপরযুগের ৮৬৪০০০ বৎসর এবং কলিযুগের ৪৩২০০০ বৎসর। চারি যুগে মোট ৪৩২০০০০ বৎসর। এই চারিযুগে এক মহাযুগ বা দৈবীযুগ। বর্তমান মহাযুগে কলিযুগের পাঁচ হাজার বৎসরেরও কিছু বেশী অতীত হইয়াছে। শাস্ত্রকারগণ বলেন যে, এই চারি যুগের যুগধর্ম সমান নহে। সত্যযুগে মিথ্যা ও পাপ ছিল না, ধর্ম ছিলেন পূর্ণ চতুষ্পাদ, মানুষের আকার ছিল বৃহৎ এবং পরমায়ু ছিল দীর্ঘতম। ত্রেতাযুগে মিথ্যা ও পাপ প্রবেশ করিল, ধর্ম হইলেন ত্রিপাদ, মানুষের আকার ও আয়ু কমিয়া গেল। দ্বাপরযুগে মিথ্যা ও পাপ বৃদ্ধি পাইল, ধর্ম হইলেন দ্বিপাদ, মানুষের আয়ু ও আকার আরো কমিয়া গেল। কলিযুগে মিথ্যা ও পাপ হইল প্রবল, ধর্ম হইলেন একপাদ, মানুষের আয়ু ও আকার আরো কমিয়া

---

(১) ইহা অবশ্য পুরাণের কথা। বেদান্তমতে ব্রহ্মার সৃষ্টি ও লয় নাই; অতএব ব্রাহ্মীকল্পের প্রশ্ন উঠে না।

গেল। দ্বাপরযুগ পর্যন্ত দেবতাগণ মর্তে আসিয়া মানুষকে দেখা দিতেন, কলিযুগে আর তাঁহারা মর্তে আসেন না ও দেখা দেন না। কলিযুগের শেষে ধর্ম লুপ্তপ্রায় হইলে কল্কী অবতার আবির্ভূত হইয়া ধর্মসংস্থাপন করিবেন এবং তখন সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। সত্যযুগের আরম্ভে আবার সেই যুগের ধর্ম ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। চারি যুগের সহিত চারি যুগ-ধর্মও এইভাবে চক্রবৎ আবর্তিত হইতেছে।

এক সহস্র মহাযুগে এক সৃষ্টিকল্প। ৪৩২০০০০ মানবীয় বৎসরে এক মহাযুগ। এই গণনায় ৪৩২ কোটি বৎসরে এক সৃষ্টিকল্প বা ব্রহ্মার একদিন, ৪৩২ কোটি বৎসরে এক রাত্রিকল্প বা ব্রহ্মার এক রাত্রি এবং ৮৬৪ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার চব্বিশ ঘণ্টা বা এক দিন-রত্রি।

কল্প ও মন্বন্তর

প্রত্যেক সৃষ্টিকল্পের ভিন্ন ভিন্ন নাম। আমাদের বর্তমান সৃষ্টিকল্পের নাম, শ্বেতবরাহ কল্প। (১) বিগত মহাপ্রলয়ের পর বহু সৃষ্টিকল্প ও রাত্রিকল্প অতীত হইয়াছে এবং হইবে, তারপর আবার মহাপ্রলয়। প্রত্যেক সৃষ্টিকল্পে চৌদ্দ জন মনুর আবির্ভাব হয়। মনুগণ জগতের অধীশ্বর বা ধর্ম-বিধান-দাতা। এক এক মনুর অধিকার-কালের নাম, মন্বন্তর। তাই প্রতি সৃষ্টিকল্পে চৌদ্দ মন্বন্তর। এক এক মন্বন্তর একাত্তর মহাযুগের কিছু বেশী, মানবীয় বৎসরের গণনায় ৩০ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭১ হাজার ৪ শত ২৮ বৎসর ৭ মাসের কিছু কম।

পুরাণে চৌদ্দ জন মনুর কথা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে পাঁচ জন মনু

মনুগণের সংখ্যা ও পরিচয়

এবং মনুসংহিতায় সাত জন মনু উল্লিখিত। ঋগ্বেদের পঞ্চ মনু—স্বায়ম্ভুব, বৈবস্বত, আপ্সব, সাবর্ণি

(১) সচরাচর কল্প বলিলে সৃষ্টিকল্পকে বুঝায়।

এবং সাম্বরণ। স্বায়ম্ভুব মনুই আদি মনু বা পিতা মনু। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। অন্য মনুগণ ব্রহ্মার মানসপুত্র নহেন। পিতা মনু ঋগ্বেদে সুপ্রসিদ্ধ। ইনি মানব-সমাজের প্রথম ধর্ম-বিধান-দাতা। তাঁহার ধর্ম-বিধানগুলিই মনুসংহিতাতে পাওয়া যায়।(১) ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে এই পাঁচ জন মনুও ছিলেন। মনুসংহিতার সপ্ত মনু—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ এবং বৈবস্বত। এই সাত মনুর ভিতর স্বায়ম্ভুব এবং বৈবস্বত ঋগ্বেদেও উল্লিখিত। স্বারোচিষ এবং চাক্ষুষ এই দুই জনের নাম ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের তালিকায় পাওয়া যায়। পুরাণের চৌদ্দ জন মনু—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি (রৌচ্য) এবং ইন্দ্রসাবর্ণি (ভৌত্য)। এই চৌদ্দ জনের মধ্যে স্বায়ম্ভুব, বৈবস্বত এবং সাবর্ণি এই তিন জন ঋগ্বেদেও দেখা যায়। পুরাণের এই চৌদ্দ জনের মধ্যে শেষ সাতটি সাবর্ণি-মনু বাদে অবশিষ্ট সাত মনুর নাম মনুসংহিতাতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে যেমন স্বায়ম্ভুব মনু সুপ্রসিদ্ধ, পুরাণে তেমনি বৈবস্বত মনু সুপ্রসিদ্ধ। পুরাণে কথিত চৌদ্দজন মনুর বংশ-পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়। ব্রহ্মার মানসজাত স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র, প্রিয়ব্রত ; এবং প্রিয়ব্রতের পুত্র, স্বারোচিষ মনু। প্রিয়ব্রতের অন্য পুত্র, উত্তম ; এবং উত্তমের পুত্র, ঔত্তম মনু। প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র, তামস মনু। প্রিয়ব্রতের আর এক পুত্র, রৈবত মনু। অঙ্গরাজের পুত্র, চাক্ষুষ মনু। কশ্যপের পুত্র, বিবস্বান ; এবং বিবস্বানের পুত্র, বৈবস্বত মনু। সূর্যপত্নী

(১) বর্তমান মনুসংহিতা মহর্ষি ভৃগুদ্বারা কথিত। মহর্ষি ভৃগু ছিলেন পিতা মনুর শিষ্য এবং পিতা মনুর আদেশানুযায়ী তিনি এই মনুসংহিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। পিতা মনু সম্বন্ধে ২৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সবর্ণার গর্ভজাত সাত সাবর্ণি মনু। বর্তমান শ্বেতবরাহকল্পে ছয় জন মনুর অধিকার-কাল শেষ হইয়া সপ্তম মনু অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর অধিকার চলিতেছে। ভগবতীর বরপ্রভাবে সুরথ রাজা ইহার পর সাবর্ণি নামক অষ্টম মনু হইবেন।(২) বর্তমান কল্পের নাম, শ্বেতবরাহকল্প; বর্তমান মন্বন্তরের নাম, বৈবস্বত মন্বন্তর। এখন এই বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ সংখ্যক মহাযুগ চলিতেছে, অর্থাৎ বর্তমান কল্পে বর্তমান মন্বন্তরে ইতিপূর্বে সাতাশটি মহাযুগ চলিয়া গিয়াছে। আবার, বর্তমান মহাযুগে এখন কলিযুগ চলিতেছে। পৌরাণিক কাল-বিভাগের ভাষায় সৃষ্টির বর্তমান কালের পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হইবে যে, শ্বেতবরাহকল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশসংখ্যক মহাযুগে কলিযুগের একপঞ্চাশৎ শতাব্দী চলিতেছে।

(২) একজন মনুর পুত্র যে উত্তরাধিকারসূত্রে মনু হইতে পারেন, তাহা নহে। মনু হইবার যোগ্যতা ও সামর্থ্য যাঁহার আছে তিনিই মনুত্ব লাভ করিতে পারেন স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত মনুত্ব লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু প্রিয়ব্রতের কয়েক-জন পুত্র ও পৌত্র মনু হইয়াছিলেন। স্বারোচিষ মন্বন্তরে রাজা সুরথের তপস্যায় প্রসন্না হইয়া দেবী তাঁহাকে মনুত্বলাভের বরদান করিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

দেবতা ও অবতার।

[এক]

দেবতা।

দেবতাশব্দের অর্থ ও দেবতার শরীর

'দিব্' ধাতু হইতে দেবতা শব্দ নিষ্পন্ন। দিব্ ধাতুর অর্থ, তেজ বা জ্যোতিঃ বিকিরণ। অতএব, দেবতা শব্দের ধাতুগত অর্থ, জ্যোতির্ময় জীব। দেবতাগণ থাকেন জ্যোতির্ময় লোকে। স্বর্গলোকই জ্যোতির্ময় লোক। সেই স্বর্গলোক সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কগণের দ্বারা সর্বদা জ্যোতিষ্মান্। সূক্ষ্মশরীরী দেবতাগণও সেই স্বর্গলোকের অধিবাসী। দেবতাগণের সূক্ষ্মশরীর—তৈজস, সদা দীপ্তিমান। তাঁহাদের তৈজস দেহকে মন্ত্রশরীরও কহে। তাঁহাদের সূক্ষ্মশরীর অন্নাদির ভোজনদ্বারা পরিপুষ্ট হয় না। কেবলমাত্র যাজকের উচ্চারিত পবিত্র মন্ত্রসাহায্যেই পরিপুষ্টি লাভ করে। সেই কারণ, দেবতাদের শরীর—মন্ত্র-শরীর। (১) প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতেছে যে, মন্ত্র কতকগুলি অর্থহীন শব্দসমষ্টিমাত্র নহে। এই শব্দসমষ্টি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন। পূর্বে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা ব্রহ্মশক্তি হইতে উৎপন্ন পঞ্চ সূক্ষ্ম তন্মাত্রের ভিতর, প্রথম উদ্ভব হয় শব্দতন্মাত্রের।

---

(১) স্বর্গে মন্ত্রশরীরাস্তে স্মৃতা মন্বন্তরেষ্বিহ।

—বায়ুপুরাণ, ৬৭।৪

এই শব্দতন্মাত্র হইতে অন্য সূক্ষ্ম তন্মাত্রগুলির উৎপত্তি। অতএব, শব্দতন্মাত্র ক্ষমতাশালী। ঋষিগণের যোগশক্তিপ্রভাবে অন্তরাকাশে শব্দসমূহ গ্রথিত হইয়া মন্ত্ররূপে ধ্বনিত হয় এবং তাঁহারা তাহা মুখে প্রকাশ করেন। কাজেই, ঋষিগণের উচ্চারিত এই মন্ত্রগুলি অলৌকিক শক্তিশালী ও বীর্যশালী। শাস্ত্রসম্মত উপায়ে এই মন্ত্ররাশির উচ্চারণে আকাশে যে স্পন্দন হয়, তাহাও অলৌকিক শক্তিশালী। স্বর্গলোকের অধিবাসী সূক্ষ্মশরীরী দেবতাগণ সেই আকাশ-স্পন্দনোদ্ভূত সূক্ষ্মশক্তি গ্রহণে পুষ্টিলাভ করেন। ইহাই দেবতাগণের মন্ত্র-শরীরের তাৎপর্য। দেবতাগণ পূজার অন্ন-মিষ্টান্নাদি নৈবেদ্য প্রকৃতপক্ষে ভোজন বা পান করেন না। নৈবেদ্যমধ্যে রসস্বরূপ সারাংশ বা অমৃত দর্শনমাত্রেই তৃপ্তিলাভ করেন। (২) কেবলমাত্র হিন্দুশাস্ত্রেই যে দেবতা ও স্বর্গলোক কথিত, তাহা নহে। খ্রীষ্টধর্মের, ইস্‌লামের এবং অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থাদিতেও ইহা স্বীকৃত। (৩)

দেবতা শব্দের প্রতিশব্দ সম্বন্ধে অমরকোষের বচন—অমরা নির্জরা দেবাস্ত্রিদশা বিবুধাঃ সুরাঃ ; অর্থাৎ, দেবতা শব্দের প্রতিশব্দ হইল অমর, নির্জর, দেব, ত্রিদশ, বিবুধ এবং সুর। এই ছয়টি শব্দ তুল্যার্থবাচক। ইহাদের প্রত্যেকটি তাৎ-

দেবতা শব্দের প্রতিশব্দ

(২) ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।
—ছাঃ উঃ, ৩।৬।১

(৩) খ্রীষ্টপন্থীর বাইবেল (Genesis) বলেন যে, মানুষের সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় দেবদূতগণ, অপ্সরাগণ ও সকল স্বর্গলোকস্থ জীব এবং স্বর্গ সৃষ্ট হইয়াছিল। ইস্‌লামপন্থীর কোরাণের মতে, পরমেশ্বরের আদেশ-পালনে চারি শ্রেণীর প্রধান দেবদূত নিযুক্ত—মাইকেল, গব্‌রিয়ল্, অজ্‌রিয়ল্ এবং ইস্‌রফিল্। মাইকেল রক্ষণকার্যে, গব্‌রিয়ল্ দৌত্যের কার্যে, অজ্‌রিয়ল্ সংহারের কার্যে এবং ইস্‌রফিল্ শেষ ঢকাবাদনের (last trumpet) কার্যে নিযুক্ত। ইহা ছাড়া, স্বর্গ, সপ্তম স্বর্গ, নন্দন-কানন ইত্যাদিও স্বীকৃত।

পর্যপূর্ণ। অমর, অর্থাৎ মৃত্যুহীন; কিন্তু এখানে দেবতাগণের অমরত্ব আপেক্ষিকভাবে বুঝিতে হইবে। দেবতাগণও জীব, যদিচ সূক্ষ্মশরীরী, এবং তাঁহাদেরও নাশ বা মৃত্যু ঘটে। তবে, মানবের আয়ুর তুলনায় তাঁহারা অমর। ব্রহ্মার প্রলয়ে বা নৈমিত্তিক প্রলয়ে ব্রহ্মার সৃষ্ট দেবতাগণের নাশ হয়, আর প্রাকৃতিক প্রলয়ে বা মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সৃষ্ট দেবতাগণের নাশ হয়। ৪৩২ কোটি মানবীয় বৎসরের পর এক নৈমিত্তিক প্রলয়; আবার, ইহার ৩৬৫ শতগুণ কাল পরে এক মহাপ্রলয়। দেবতাগণের মৃত্যু হয় এত কাল পরে এই নৈমিত্তিক প্রলয়ে ও মহাপ্রলয়ে। মানবের পরমায়ু বড় জোর মানবীয় এক শত বৎসর। কাজেই, মানবের এই পরমায়ুর তুলনায় দেবতাগণের পরমায়ু এত বেশী যে তাঁহাদিগকে অমর বলা যাইতে পারে। নির্জর, অর্থাৎ বার্ধক্যহীন; দেবতাগণের বার্ধক্য নাই। দেব, অর্থাৎ দীপ্তিশালী; দেবতাগণ জ্যোতির্ময়। ত্রিদশ, অর্থাৎ জন্ম-যৌবন-মৃত্যু এই তিন দশা বা অবস্থাবিশিষ্ট; মানবের জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি দশ দশা, কিন্তু দেবতাগণের মাত্র এই তিন দশা। বিবুধ, অর্থাৎ অতিশয় জ্ঞানী; মানুষের জ্ঞান সসীম, দেবতাগণের জ্ঞান অসীম। সুর, অর্থাৎ সুবুদ্ধিসম্পন্ন; দেবতাগণ উত্তমবুদ্ধিবিশিষ্ট।

দেবতাগণের শ্রেণীভেদ

সকল দেবতা যে এক শ্রেণীর, তাহা নহে। তাঁহারাও সৃষ্টি-মণ্ডলের ভিতর বলিয়া সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত ও প্রভাবান্বিত। সাধারণতঃ, দেবতাগণের সত্ত্ব ও রজঃগুণ প্রবল। তথাপি তমোগুণ অল্পাধিক মাত্রায় তাঁহাদের সকলের মধ্যে আছে। ত্রিগুণবৈষম্যনিমিত্ত কতক দেবতার মধ্যে সত্ত্বগুণের আতিশয্য, কতকের মধ্যে রজোগুণের আতিশয্য এবং কতকের মধ্যে তমোগুণের আতিশয্য। এই গুণবৈষম্যের ফলে

তাঁহারাও সকলে সমান নহেন। ইহা ভিন্ন প্রধানতঃ দেবতাগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—জাতিদেব এবং কর্মদেব। মানুষ শুভ কর্মের ফলে পরলোকে দেবত্ব পাইতে পারে। এইভাবে মানুষ হইতে যাঁহারা দেবতা হন তাঁহারা—কর্মদেব। আর, যাঁহারা জন্মাবধি দেবতা তাঁহারা—জাতিদেব। কর্মদেবগণের আবার একটি নিম্ন শ্রেণী আছে—আজানজদেব। স্মার্ত কর্মের উৎকর্ষহেতু যে সকল মানুষ দেবত্ব লাভ করেন, তাঁহারাই আজানজদেব। বৈদিক কর্মের উৎকর্ষহেতু যে সকল মানুষ দেবত্ব লাভ করেন, তাঁহারাই যথার্থ কর্মদেব। (৪) মানুষ বৈদিক কর্মের উৎকর্ষহেতু দেবত্ব পাইয়াছেন, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। অঙ্গিরাবংশীয় সুধন্বার পুত্র, রিভু। এই রিভু এবং বাজ তপস্যা দ্বারা দেবত্ব লাভ করেন। (৫) ইঁহারা ঋতু-দেবতা। আপ্তুত্রিত বৈদিক কর্মের ফলে দেবলোক প্রাপ্ত হন। (৬) মরুৎগণ পূর্বে মানুষ ছিলেন এবং পশ্চাৎ শুভকর্মের ফলে দেবতা হন। (৭)

দেবতাগণের সংখ্যা

কথায় বলে, দেবতা তেত্রিশ কোটি। সেই কারণ, হিন্দুধর্মদ্বেষিগণ বিদ্রূপ করিয়া বলেন যে, হিন্দু বহু-ঈশ্বর-বিশ্বাসী। যথার্থ তথ্য তাহা নহে। হিন্দুধর্মের মূল কথা—পরমেশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম্, তিনি এক এবং তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই। তিনি অনন্ত, তাঁহার মহিমা বা বিভূতি অনন্ত। সৃষ্টিমণ্ডলে তাঁহার সেই অনন্ত বিভূতি প্রকাশ পাইতেছে অনন্ত ধারায় অনন্ত রূপে। ইহাই তাঁহার লীলা। তাঁহার সেই অনন্ত বিভূতির এক একটি

(৪) তৈঃ উঃ, ২।৮।২-৩

(৫) ঋক্, ১।১৬১।২ ও ১।১১০।২

(৬) ঋক্, ৫।৪১।৪ ও ৩।১২।৬

(৭) ১০।৭৭।২ ঋক্,

এক এক শক্তির সাহায্যে প্রকাশ পায়। তিনি চেতন—তাঁহার এই শক্তিও চেতন। যে চেতন শক্তির সাহায্যে তাঁহার যে বিভূতিটি প্রকাশ পায়, তাহাই দেবতা বলিয়া কল্পিত। তাঁহার অসংখ্য বিভূতি অসংখ্য চেতন শক্তির সাহায্যে অসংখ্য রূপে প্রকাশ পাইতেছে। কাজেই, দেবতাও অসংখ্য। এই বিশাল সৃষ্টিমণ্ডলের যে অংশ পরমেশ্বরের যে চেতন শক্তির দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, (১) সেই অংশে সেই শক্তিই অধিষ্ঠাতা দেবতা। মূলতঃ পরমেশ্বর এক—তাঁহার চেতন শক্তিও এক—দেবতাও এক। যেমন একই বিদ্যুৎ তারের ভিতর অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিত হইয়া আলোক—তাপ—গতি ইত্যাদি নানাভাবে প্রকাশ পায়, তেমনি পরমেশ্বরের একই চেতন শক্তি নানা আধারে নানা ভাবে প্রকাশিত হয় এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলিই ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলিয়া কল্পিত। হিন্দুশাস্ত্রে এই যথার্থ তথ্যটি পুনঃ পুনঃ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং, মহৎ দেবতাগণের দেবত্ব এক। (২) পুনরায় বলিয়াছেন—এক সত্য পরমেশ্বরকে জ্ঞানিগণ ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, দিব্য, সুপর্ণ, গরুৎমান, যম, মাতরিশ্ব প্রভৃতি বহু দেবতার নামে অভিহিত করেন। (৩) উপনিষদ্ এক উপাখ্যানে এই তথ্যটি আরো পরিষ্কার করিয়াছেন। (৪) একদা শাকল্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে দেবতার

(১) এক পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রত্যেক অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করেন --যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ।
—শ্বেঃ উঃ,৫।২; বৃঃ উঃ, ৩।৭।৩-২৩।

(২) ঋক্, ৩।৫৫।১

(৩) ইন্দ্রং মিত্রং বরুণ মগ্নি মাহু রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।—ঋক্, ১।১৬৪।৪৬

(৪) বৃঃ উঃ, ৩।৯।১

সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সেই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি প্রথমে বলিলেন, দেবতার সংখ্যা ৩৩০৬। পুনরায় প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ। পুনরায় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, সেই সংখ্যা ছয়। পুনরায় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, সেই সংখ্যা তিন। এই প্রকার আরো পুনঃপুনঃ প্রশ্নের উত্তর-দানে তিনি বলিলেন সেই সংখ্যা দুই, দেড় এবং সর্বশেষে এক। মহর্ষি এই বিষয়ের উপসংহারে শেষ কথা বলিলেন যে, দেবতা এক। সেই সার কথা—একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই উপাখ্যানে এই প্রশ্নোত্তরের মর্ম —মূলতঃ পরমেশ্বররূপী এক দেবতা বহু নামে কল্পিত। চলিত ভাষায় তেত্রিশ কোটি দেবতার তাৎপর্য, সংখ্যায় তেত্রিশ কোটি নহে—দেবতা অসংখ্য। এক দেবাদিদেব পরমেশ্বরের অসংখ্য বিভূতি অসংখ্য দেবতারূপে কল্পিত। অতএব, হিন্দুধর্ম একেশ্বরবাদই প্রচার করেন।

এই অসংখ্য কল্পিত দেবতার অসংখ্য নাম-রূপের বর্ণনা অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুশাস্ত্র ব্যাখ্যানকল্পে কতকগুলি দেবতার নাম-গুণাদি বর্ণনা করিয়াছেন। সকল যুগে সকল হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত দেবতাগণের নাম-গুণাদি এক নহে। তাহাদের বর্ণনা বিভিন্ন। প্রধানতঃ, এই বিভেদ দ্বিবিধ—(ক) বৈদিক এবং (খ) পৌরাণিক।

(ক) বৈদিক দেবতা।

প্রথমে বৈদিক দেবতা। বৈদিক দেবতাগণের ভিতর প্রধান—যজ্ঞাহুতিভোজী দেবতা। তাঁহারা সংখ্যায় তেত্রিশ—ইন্দ্র, প্রজাপতি, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, এবং অষ্ট বসু। ইঁহারা জাতিদেব, বা জন্মাবধি দেবতা।

যজ্ঞাহুতিভোজী তেত্রিশ দেবতা

বৈদিক যজ্ঞের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানগুলির অধিদেবতা, অষ্টবসু; মধ্যাহ্নকালীন অনুষ্ঠানগুলির অধিদেবতা, একাদশ রুদ্র; সায়ংকালীন অনুষ্ঠানগুলির অধিদেবতা, দ্বাদশ আদিত্য। (১)

ইন্দ্র—ইনি দেবতাগণের রাজা। ঋগ্বেদে ইন্দ্রই পরমাত্মা—পরম পুরুষ। তাঁহার মহিমায় ঋগ্বেদ পূর্ণ। ইন্দ্রই নির্গুণ ব্রহ্ম, ইন্দ্রই সগুণ ব্রহ্ম। মায়ার দ্বারা ইন্দ্র নানারূপ ধারণ করেন। (২) তাঁহার চারি অসূর্য দেহ (৩)— জীব, জগৎ, ঈশ্বর ও পরমাত্মা। (৪) এখনো বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে ইন্দ্রের পূজা করা হয় "ইন্দ্রায় স্বাহা" এই মন্ত্রোচ্চারণে। বিদ্যুৎকে ইন্দ্রের বজ্র বলা হয়। নব্য বিজ্ঞান বলেন যে, বিদ্যুৎ জীবের অন্তরে ও বাহিরে সৃষ্টির সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং ইহা নানা আধারে নানা রূপে নানা প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে। অতএব, এই সৃষ্টিমণ্ডলে যে চেতন শক্তির সাহায্যে অন্তরে ও বাহিরে এই বিদ্যুৎ নিয়মিত ও পরিচালিত হয়, তাঁহাকে আধুনিক দৃষ্টিতে ইন্দ্র বলা যাইতে পারে।

প্রজাপতি—প্রজাগণের পতি, প্রজাপতি। প্রজা শব্দের অর্থ, সৃজ্যমান স্থাবর-জঙ্গমাত্মক প্রাণীসমূহ। যিনি এই প্রাণীসমূহের স্রষ্টা, তিনি প্রজাপতি। বেদে ইনি হিরণ্যগর্ভ, অর্থাৎ হিরণ্ময় ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার উদরে গর্ভবৎ বর্তমান সেই সূত্রাত্মা। জগৎপ্রপঞ্চসৃষ্টির পূর্বে হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মিয়াই জগতের

(১) ছাঃ উঃ—৩।১৬।১, ৩, ৫

(২) ঋক, ৬।৪৭।১৮

(৩) চত্বারি তে অসূর্যাণি নামাদাভ্যানি মহিষস্ত সন্তি।—ঋক্, ১০।৫৪।৪

(৪) উপাসনা।

অদ্বিতীয় কর্তা হন। তিনি অন্তরিক্ষ, দ্যুলোক এবং পৃথিবীকে ধারণ করেন। দেবতাগণ ও সকল প্রাণী তাঁহা হইতে উৎপন্ন। তিনি স্রষ্টা ও শাসক। তিনি জড় এবং চেতন পদার্থ-সমূহকে দমন করেন এবং প্রার্থীর প্রার্থনানুযায়ী বণ্টন করেন। ঋগ্বেদের হিরণ্য-গর্ভসূক্তে ঋষি বলিতেছেন—হে প্রজাপতি! তুমি ভিন্ন অন্য কেহই এই জড় ও চেতন পদার্থসকলের দমন করিতে পারে না; যে যে পদার্থের কামনা করিয়া আমরা তোমাকে হবিঃ প্রদান করিতেছি, আমাদের সেই সেই কামনা যেন সিদ্ধ হয়, আমরা যেন ধনৈশ্বর্যের অধিপতি হই। (১) যে বিশ্বব্যাপক চেতন শক্তির সাহায্যে জড়-চেতন পদার্থসমূহের সৃজন-দমন-বণ্টন হইতেছে, তাঁহাকে এস্থলে আধুনিক দৃষ্টিতে প্রজাপতি বলা যাইতে পারে।

আদিত্যগণ—সংখ্যায় দ্বাদশ। উপনিষদের মতে, বৎসরের দ্বাদশ মাসগুলি আদিত্য-সংজ্ঞায় অভিহিত। (২) যৎ তে ইদং সর্বম্ আদদানাঃ যান্তি তস্মাৎ আদিত্যাঃ ইতি—যেহেতু এই দ্বাদশ মাস সকল প্রাণীর আয়ুঃ গ্রহণ করিয়া এবং এমন কি পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ গ্রাস করিয়াও স্থিরভাবে অবিরত গমন করেন, সেই হেতু তাঁহারা আদিত্যপদবাচ্য। তাৎপর্য—নিত্য প্রাণিগণের মৃত্যু ঘটিতেছে, কিন্তু বার মাস ও সংবৎসর যেমন বহিয়া চলে তেমনি বহিয়া যায়, জীবসমূহের মৃত্যুতে অথবা জগতের ধ্বংসে মাস ও সংবৎসরের গতি রুদ্ধ থাকে না। দ্বাদশ আদিত্যের আর এক অর্থ আছে। প্রতিমাসে সূর্যের

---

(১) প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।
যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্॥
—ঋক্. ১০।১২১।১০

(২) বৃঃ উঃ, ৩।৯।৫

প্রতি রাশিতে অবস্থিতিকে উপলক্ষ্য করিয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ আদিত্যের কল্পনা। দ্বাদশ আদিত্য, অর্থাৎ দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশিতে অবস্থিত দ্বাদশ সূর্য। শতপথ ব্রাহ্মণে এই দ্বাদশ সূর্যের নাম—অংশ, ধাতা, ভগ, ত্বষ্টা, মিত্র, বরুণ, অর্যমা, পূষা, বিবস্বান, সবিতা, বিষ্ণু এবং অংশুমান। (৩) যে চেতন শক্তি কর্তৃক প্রত্যেক মাস নিয়মিত ও পরিচালিত হয়, তাঁহাকে এস্থলে আধুনিক দৃষ্টিতে আদিত্য বলা যাইতে পারে।

রুদ্রগণ—সংখ্যায় একাদশ। রুদ্র সংজ্ঞার তাৎপর্য এবং রুদ্রগণের নাম সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন উক্তি দেখা যায়। রোদয়তি ইতি রুদ্রঃ, যাঁহার কার্যে লোকে রোদনপরায়ণ হয় তিনি রুদ্র। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে উপনিষদ্ একাদশ রুদ্র বলিয়াছেন ; কেননা, মৃত্যুর সময় মরণশীল স্থূল দেহ হইতে এই একাদশ ইন্দ্রিয় যখন বহির্গত হন, তখন তাঁহারা মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের ক্রন্দন করান। (৪) পুরাণে ও ঋগ্বেদে অনুরূপ উক্তি দৃষ্টিগোচর হয়। পুরাণে একাদশ রুদ্রের নাম—মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাৎ, অহির্বুধ্ন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, কপালী, স্থাণু এবং ভগ। এই সকল নামের মধ্যে ঋগ্বেদে নির্ঋতি, অজৈকপাৎ, ও অহির্বুধ্ন এই তিনটি পাওয়া যায়। (৫) গণভুক্ত একাদশ রুদ্র ব্যতীত, রুদ্রনামধারী এক দেবতা ঋগ্বেদে বিশেষভাবে উল্লিখিত। সেখানে রুদ্রের প্রতিশব্দ, শিব। (৬) ঋগ্বেদে এই রুদ্রনামধারী

---

(৩) উপাসনা।

(৪) বৃঃ উঃ, ৩।৯।৪

(৫) উপাসনা।

(৬) ঋক্—১০।৩।৪, ১০।৯২।৯, ১০।১২৪।২

একক দেবতা—দেবাদিদেব মহাদেব। উপনিষদ্‌ও বলিয়াছেন—একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ, এক রুদ্রই ছিলেন এবং তিনি দ্বিতীয় কাহারও আকাঙ্খায় অবস্থান করেন নাই। (১) এখানেও রুদ্রনামধারী এক দেবতাকে বুঝাইতেছে—গণদেবতা নহে। এই উপনিষদ্‌-মন্ত্র মহাপ্রলয়কে ইঙ্গিত করে। মহাপ্রলয়ে পরমেশ্বর সর্বসংহারী রুদ্ররূপে নিখিল বিশ্ব সংহার করিয়া একক বর্তমান থাকেন। তিনি তখন বিশ্বের সংহর্তা বলিয়া রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। কেবল রোদন করান বলিয়াই যে তিনি রুদ্র, তাহা নহে। রুজং দ্রাবয়তি ভেষজেন ইতি রুদ্রঃ, যিনি ঔষধপ্রয়োগে রোগ দূর করেন তিনি রুদ্র। এখানে রুজ শব্দের অর্থ, রোগ। সেই রোগ দুই প্রকার—আধিব্যাধি এবং ভবব্যাধি। সংসার-দুঃখই ভবব্যাধি। তিনি এই উভয়বিধ ব্যাধি নাশ করেন। মর্ম—তিনি জীবের দেহ-মনের রোগ দূর করেন এবং জীবকে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিও দেন। অতএব, এক রুদ্রের দুই মূর্তি —প্রলয়কালে সংহারমূর্তি, আর উভয়বিধব্যাধিহররূপে মঙ্গলমূর্তি। (২) উপনিষদে রুদ্রস্তুতিতে রুদ্রের মঙ্গলময় মূর্তির স্তুতিও আছে; যথা—হে রুদ্র! তোমার যাহা মঙ্গলময়, প্রসন্ন ও পাপবিনাশক মূর্তি, সেই সুখতম মূর্তিতে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। (৩) ঋগ্বেদে তাঁহাকে ভেষজধারী দেবতাও বলা হইয়াছে (৪)। যে

(১) শ্বেঃ উঃ, ৩।২

(২) সর্বং রোদয়তি সংহরতি প্রলয়াদৌ, রুজং সংসারদুঃখং দ্রাবয়তি ইতি বা রুদ্রঃ।

—বিজ্ঞানভগবান।

(৩) যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।

তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি॥

—শ্বেঃ উঃ, ৩।৫

(৪) ঋক্‌, ১।১০৫

চেতন শক্তির দ্বারা জীবের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত ধ্বংস হয় এবং জীবের সকল প্রকার ব্যাধিরও নাশ হয়, সেই শক্তিকে আধুনিক দৃষ্টিতে রুদ্র বলা যাইতে পারে।

বসুগণ—সংখ্যায় আট। ঋগ্বেদে বহুবার উল্লিখিত, কিন্তু নামের নির্দেশ নাই। উপনিষদে তাঁহাদের আট নাম পাওয়া যায়—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, দ্যৌঃ, চন্দ্র এবং নক্ষত্র। (১) দৃশ্যমান সকল বস্তু এই আটটিতে নিহিত রহিয়াছে বা বাস করিতেছে, তাই তাহারা বসু—এতেষু হি ইদং সর্বং হিতমিতি তস্মাৎ বসবঃ ইতি। (২) এখানে অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কেবলমাত্র ঐ ঐ কতকগুলি তরল-কঠিন মূর্ত-অমূর্ত জড় আধার বুঝায় না। যে চেতন শক্তি তাহাদের প্রত্যেকটিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রত্যেককে নিয়মিত ও পরিচালিত করিতেছে, সেই চেতন শক্তিকে বুঝিতে হইবে। সেই চেতন শক্তিগুলিই এখানে দেবতা—অষ্টবসু। যেমন—অগ্নি বলিলে অগ্নির চেতনাভিমানী দেবতা বুঝিতে হইবে। অষ্টবসুর ভিতর প্রধান—অগ্নি। ঋগ্বেদ অগ্নির প্রশংসায় মুখর। তেত্রিশ যজ্ঞাহুতিভোজী দেবতার মধ্যে অগ্নি স্বয়ং স্বতন্ত্র এক দেবতা, তদ্ভিন্ন অন্য দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞাগ্নিতে হুত ঘৃতাদি দ্রব্যের সূক্ষ্মাংশ তাঁহাদের নিকট বহন করিয়া লইয়া যান বলিয়া অগ্নি তাঁহাদের প্রতিনিধি। (৩) ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রেই অগ্নির স্তুতি—অগ্নি মীডে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্॥ অর্থাৎ—সম্মুখে স্থিত, যজ্ঞের দেবতা, সব

(১) পুরাণে অষ্টবসুর নাম অন্য প্রকার। যথা—আপ, ধ্রুব, ধর, অনিল, অনল, সোম, প্রত্যুষ ও প্রভাষ।

—বিষ্ণুপুরাণ।

(২) বৃঃ উঃ, ৩।৯।৩

(৩) অগ্রং নয়তি ইতি অগ্নিঃ—হবিঃ-গ্রহণের জন্য যিনি দেবগণের অগ্রে গমন করেন, তিনিই অগ্নি।

ঋতুতে পূজনীয়, অভীষ্ট ফলদাতা এবং রত্নসমূহের ধারণকর্তা অগ্নিকে স্তুতি করি। ঋগ্বেদে অগ্নি সপ্তজিহ্ব এবং তাঁহার জিহ্বায় দেবগণ অবস্থিত। (৪) উপনিষদে অগ্নির সাতটি লেলায়মান জিহ্বার নাম—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং দেবী বিশ্বরুচী। (৫) এই সপ্ত জিহ্বায় আহুতি দিতে হয়। অগ্নির ছয়টি মুখ্য নাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায়—আহবনীয় অগ্নি, ভরত অগ্নি, বৈশ্বানর অগ্নি, পাবক অগ্নি, ইধ্যগ্নি এবং রক্ষোহা অগ্নি। (৬) এক অগ্নির ছয় প্রকার কার্য হইতে ছয় প্রকার নাম। অসুরোপাসক পারসিকগণও অগ্নির একনিষ্ঠ উপাসক।

প্রাগুক্ত তেত্রিশ যজ্ঞাহুতিভোজী প্রধান দেবতা ভিন্ন অন্য অপ্রধান বৈদিক দেবতাও আছেন। যথা—মরুৎগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ প্রভৃতি গণদেবতা এবং বিষ্ণু, বরুণ ও সোম।

অন্য অপ্রধান দেবতা

মরুৎগণ—সাধারণতঃ, সংখ্যায় উনপঞ্চাশ বলা হয়। (৭) আবার, সাত সংখ্যাও ঋগ্বেদে দেখা যায়। (৮) পুরাণে সপ্ত মরুতের নাম—আবহ, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ, উদ্বহ, সংবহ এবং পরিবহ। এক বায়ু-দেবতার মুখ্যতঃ সাত প্রকার কাজ হইতে এই সাত নাম। মরুৎ, অর্থাৎ বায়ু। বায়ুমণ্ডলাভিমানী চেতন শক্তিই মরুৎ বা বায়ু-দেবতা। মরুৎগণ কর্মদেব। পূর্বে তাঁহারা মনুষ্য ছিলেন, পশ্চাৎ স্তুতি ইত্যাদি শুভ কর্মের ফলে দেবত্ব প্রাপ্ত হন।

---

(৪) ঋক্, ১।৮৯।৭ ; ৩।৬।২

(৫) মুঃ উঃ, ১।২।৪

(৬) উপাসনা।

(৭) ঋক্, ৮।৪৬।২৬

(৮) উপাসনা।

বিশ্বদেবগণ—ইঁহাদের নাম ঋগ্বেদে নাই। অনেকের মতে, নাসত্যদ্বয় বা অশ্বিনীকুমারদ্বয়। সূর্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভে অশ্বীদ্বয়ের জন্ম। (১) ঋগ্বেদে বিশ্বদেবসূক্তে (২) ভগ, মিত্র, অদিতি, দক্ষ, মরুৎগণ, সূর্য, বরুণ, সোম এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি দেবতাগণকে সম্বোধনপূর্বক স্তুতি দেখা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরূরবা ও আদ্রবা এই দশটি দক্ষকন্যা বিশ্বার সন্তানকে 'বিশ্বদেবাঃ' নামে বলা হইয়াছে। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম—বৈশ্বদেব কর্ম। কোন কোন পণ্ডিতের (৩) মতে, ভগ—মিত্র—অদিতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভিন্ন ভিন্ন উপাসক ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যরূপে গ্রহণ করায়, সেকালেও উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহের সূচনা হয়। ঋগ্বেদে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (৪) যথার্থতঃ, দেব-দেবী নামে বহু হইলেও মূলে এক এবং এক পরমেশ্বরের বহু বিভূতিমাত্র, এই সত্যটি বিভিন্ন উপাসকগণের চক্ষে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পিতা মনু "বিশ্বদেবাঃ" বলিয়া সকল দেবতার মিলিত হোমের ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে সেকালে সাম্প্রদায়িক কলহের অবসান ঘটে। (৫)

(১) ঋক্, ১০।১৭।২

(২) ঋক, ১।৮৯

(৩) যেমন শ্রীউমেশ চন্দ্র বটব্যাল।

(৪) ঋক্, ৮।৩০।১-২

(৫) মানব-সমাজের ঋত্বিকগণ যখন সকল দেবকে সমস্বরে আহ্বান করিয়া বিশ্বদেব হোম করিতে শিখিল, তখন তন্মধ্যে তোমার দেবতা ছোট, আমার দেবতা বড়,—এই কথা লইয়া বিবাদ বিসংবাদের পথ চিরকালের জন্য নিরুদ্ধ হইল। এ বড় কম কথা নয়। —বেদ-প্রবেশিকা।

।—ইন্দ্রের অনুকূল সখা, ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা। (১) ইনি বেদে উপেন্দ্র। (২) ঋগ্বেদে কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্রের সখা বা সহচররূপে ইন্দ্রের কথায় বিষ্ণু মনুষ্যগণের নিবাসার্থ পৃথিবীদানের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ করিলেন। বিষ্ণুই দেবলোক, স্বর্গলোক ও মর্ত্যলোকের স্রষ্টা। (৩) বিষ্ণু বিশ্বব্যাপক—বিব্যাপ্নোতি বিশ্বং ইতি বিষ্ণু। ঋগ্বেদে বিষ্ণুসূক্তে বিষ্ণুর গুণকর্মসম্বন্ধে কিছু কিছু পাওয়া যায়। (৪) সেখানে বিষ্ণু অজেয় এবং সমস্ত জগতের রক্ষক বলিয়া কীর্তিত। যে বিশ্বব্যাপী চেতন পালনী শক্তি কর্তৃক বিশ্ব রক্ষিত হয়, তাহাই বিষ্ণুদেবতারূপে কল্পিত। বিষ্ণুসূক্তের প্রসিদ্ধ মন্ত্র—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্; আকাশের সর্বত্র প্রসারিত চক্ষু যেমন বাধাশূন্য ভাবে বিশদরূপে দর্শন করে, তেমনি জ্ঞানিগণ বিষ্ণুসম্বন্ধী পরম ধামকে অর্থাৎ বিষ্ণুলোককেও সর্বদা দর্শন করেন। অদ্যাপি দেব-দেবীর পূজার প্রারম্ভে আচমন-কালে এই বৈদিক মন্ত্র পাঠ্য।

বরুণ—জলরাজ্যের রাষ্ট্রপতি। ঋগ্বেদে আকাশ সমুদ্র বলিয়া কথিত। (৫) কেননা, মেঘ হইতে জল বর্ষিত হয় এবং মেঘের জন্ম আকাশে। তাই ঋগ্বেদ বলিয়াছেন যে, রাজা বরুণ অন্তরিক্ষে থাকেন। (৬) আকাশের মেঘ হইতে জলবর্ষণে ভূ-পৃষ্ঠে জল-রাশি সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত জলরাশি বেশী দেখা যায় দক্ষিণ

(১) ঋক্, ১।২২।১৯

(২) উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজঃ—অমরকোষ।

(৩) ঋক্, ১।১৫৪

(৪) ঋক্, ১।২২।১৬-২১

(৫) ঋক্, ১০।৯৮।৫

(৬) ঋক্, ১।২।৭

মেরুর দিকে। উত্তর মেরুর নিকটবর্তী স্থানসমূহ স্থলবহুল। সেই নিমিত্ত বরুণ আকাশরূপ সমুদ্রের সম্রাট এবং পৃথিবীতে দক্ষিণস্থ জলরাশির বা সমুদ্রের দেবতা। যে চেতন শক্তি কর্তৃক মেঘ হইতে জল বর্ষিত হয় এবং জলরাশি নিয়মিত ও পরিচালিত হয়, তিনিই বরুণ দেবতা।

সোম—এক মহান দেবতা। অগ্নির ন্যায় সোমের প্রশংসায় ঋগ্বেদ পরিপূর্ণ। প্রকৃত বৈদিক সোম যে কি, ইহা এক জটিল প্রশ্ন। পৃথিবীতে সোম নামক যে এক প্রকার লতা ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সোমলতার রস যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইত এবং ঋষিগণ পান করিতেন। ঋগ্বেদে ইহার ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। সোমরসের মাদকতাশক্তির বর্ণনাও পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে আবার এ কথাও আছে যে, সোমের আদিস্থান স্বর্গলোক এবং সেখান হইতে স্বয়ং ইন্দ্র শ্যেন পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া সোমকে পৃথিবীতে আনিয়া দিয়াছিলেন মনুষ্যগণের মঙ্গলের জন্য। (১) বেদমন্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে এ কথাও আছে—ব্রাহ্মণেরা যাহা প্রকৃত সোম বলিয়া জানেন, তাহা কেহই পান করিতে পায় না। (২) ঋগ্বেদে সোম সম্বন্ধে এই সকল বর্ণনা হইতে সহজেই অনুমেয় হয় যে, ইহা দ্ব্যর্থবোধক। বেদের ভাষা বিচিত্র। (৩) সোমরসের মুখ্যার্থ—

---

(১) ঋক্, ৮।১০০।৮

(২) ঋক্, ১০।৮৫।৩

(৩) বেদের ভাষার ভঙ্গী অতি বিচিত্র। লৌকিক ভাষার দ্বারা অলৌকিক বিষয় আলোচনা করিতে গেলে, সহজেই অনেক স্থলে শব্দের মুখ্যার্থ বর্জন করিয়া, তাহার গৌণার্থ লইতে হয়। যাঁহারা বেদের ভাষা নিগুঢ়রূপে বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এই বিষয়টি সর্বদাই মনে রাখা উচিত।

—বেদ প্রবেশিকা।

সোমলতার রস ; এবং গৌণার্থ—মধুবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। রসো বৈ সঃ, সেই পরম পুরুষ ব্রহ্ম রসস্বরূপ। তিনি আনন্দময়। তাঁহাকে লাভ করিলে ভূমানন্দ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবিদ্যার বা ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে তাঁহাকে লাভ করা যায় এবং সেই ভূমানন্দের আস্বাদন মিলে। সেই কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানকে মধুবিদ্যা কহে। পুষ্পের সার রস, মধু। ইহা অতি উপাদেয়। সকল জ্ঞানের সার, ব্রহ্মজ্ঞান। ইহা অতীব আনন্দপ্রদ, অতএব ইহা মধুর ন্যায় উপাদেয়। এই মধুবিদ্যাই আধ্যাত্মিক সোমরস, স্থূল সোমলতার রস তাহার বাহ্যিক চিহ্নস্বরূপ। আধ্যাত্মিক সোমরস বা মধুবিদ্যা পানের সামগ্রী নহে। ইহা হৃদয়ে অনুভবের বস্তু। যেমন বাহ্য সোমলতার রসে মত্ততা জন্মে, তেমনি আধ্যাত্মিক সোমরস বা ব্রহ্মবিদ্যা হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে মানুষ পাগল হইয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞান—ঈশ্বরপ্রেম—ভগবদ্ভক্তি প্রায় এক পর্যায়ভুক্ত। এই স্বর্গীয় সোমরস-পানে কত মহাপুরুষ উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বঙ্গদেশে একালে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রসঙ্গতঃ, একটি কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। হিন্দুধর্ম-দ্বেষিগণ বেদে সোমরসপানের নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, মত্ততা উৎপাদনের জন্যই সেকালে সোমরস পীত হইত এবং ঐ সোমরস অসভ্য যুগের এক রকম সুরা মাত্র। সোমরসের আধ্যাত্মিক অর্থ ছাড়িয়া দিলেও তাঁহাদের এই অপবাদ ভিত্তিহীন। যজ্ঞে ভিন্ন অন্য সময় সোমরসপানের উল্লেখ বেদে নাই। যজ্ঞের সময় সোমরসের মাদকতা-শক্তির প্রতিকারকল্পে ঋত্বিকগণ ইহা দধিমিশ্রিত করিয়া পান করিতেন। দধি-মিশ্রণে মত্ততা জন্মিত না। তাই, আজকালের সুরাপায়ীদিগের মত সেকালে

ব্রাহ্মণগণ যে মত্ততা-কামনায় সোমরস পান করিতেন, তাহা নহে। (১) বেদে সোমদেবতার অপর নাম—ইন্দু। চন্দ্রের নামও ইন্দু। চন্দ্রের শীতল জ্যোতিঃই সোমশক্তি। এই চন্দ্র-জ্যোতিঃ ধান্য-যবাদি ওষধি-সমূহের পুষ্টিদাতা এবং জীবসমূহের রক্ষক। সেই হেতু ইহা শক্তিবিশিষ্ট।

ঋগ্বেদে শচী অর্থাৎ ইন্দ্র-পত্নী, পৃশ্নি অর্থাৎ রুদ্র-পত্নী, ইলা, ভারতী, রাত্রি, সরস্বতী, অদিতি প্রভৃতি বহু দেবীর উল্লেখ আছে ; কিন্তু ইন্দ্রাদি দেবগণের সদৃশ এই দেবীগণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। এই দেবীগণের মধ্যে রাত্রিদেবী এবং সরস্বতী এখানে উল্লেখযোগ্য।

রাত্রিদেবী—ব্রহ্মশক্তি বা মহামায়া। দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ-র্নিগূঢ়াম্—এই মায়াশক্তি বা ব্রহ্মশক্তি প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মার বা ব্রহ্মের আত্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।(২) বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম হইলেও ব্রহ্মশক্তিকে বেদ উপেক্ষা করেন নাই। বৈদিক যুগেও শক্তিবাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত এবং রাত্রিসূক্ত তাহার প্রমাণ। দেবীসূক্তের (৩) ঋষিকা, মহর্ষি অম্ভৃণের কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক্। তিনি ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মারূপে উপলব্ধি করিয়া ঘোষণা করেন—আমিই ব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তি ও বিশ্বেশ্বরী। রাত্রিসূক্তের (৪) মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি কুশিক এই বিশ্বব্যাপিনী ব্রহ্মশক্তিকে রাত্রিদেবী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রাতি অভীষ্টম্ ইতি রাত্রিঃ, যিনি অভীষ্ট দান করেন তিনিই রাত্রি। (৫) রাত্রিদেবীই ভুবনেশ্বরী

(১) বেদ-প্রবেশিকা।

(২) শ্বেঃ উঃ, ১।৩

(৩) ঋক্, ১০।১২৫

(৪) ঋক্, ১০।১২৭.

(৫) রাতি—দদাতি, দান করেন।

ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—সেই চিন্ময়ী রাত্রিদেবী আমাদের প্রতি এখন প্রসন্না হউন; যেরূপ পক্ষিগণ বৃক্ষনীড়ে সুখে রাত্রিবাস করে, সেইরূপ আমরাও যেন তাঁহার প্রসাদে আমাদের স্বস্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় অবস্থান করিতে পারি। (১) তাৎপর্য—জীবের স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি; সেই মহামায়ার প্রসাদে আমরা যেন মায়ামুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারি। ঋষি শেষে বলিতেছেন—হে রাত্রিদেবী! দুগ্ধবতী ধেনুর মত আমি আপনাকে স্তুতিজপাদির দ্বারা প্রসন্না করিতেছি; আপনি পরমাত্মার দুহিতা; আপনার কৃপায় আমি কামাদি শত্রু জয় করিব; আপনি আমার এই স্তুতি ও হবিঃ গ্রহণ করুন। (২) ঋগ্বেদের এই রাত্রিদেবী পুরাণে ও তন্ত্রে স্বতন্ত্রভাবে মহামায়ারূপিণী মহাদেবীর স্থান অধিকার করিয়াছেন। ঋগ্বেদেও বিশ্বদুর্গা, সিন্ধুদুর্গা ও অগ্নিদুর্গার উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকা উপনিষদে এই দুর্গা-গায়ত্রীটি দেখা যায়—কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ। এখানে দুর্গি শব্দের অর্থ, দুর্গা।

সরস্বতী—বাক্-দেবী। 'সরস্' হইতে সরস্বতী শব্দ উৎপন্ন। সরস্ শব্দের আদিম অর্থ, জ্যোতিঃ। সরস্বতী, অর্থাৎ জ্যোতির্ময়ী দেবী। ইনিই বাক্-দেবী। এখানে বাক্ অর্থে সাধারণ বাক্য নহে—বেদাত্মিকা বাক্। অতএব, বেদবাণীই বাক্ বুঝিতে হইবে। বাক্-

---

(১) সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নিতে যামন্নাবিক্ষ্মহি।
বৃক্ষেণ বসতিং বয়ঃ॥
—ঋক্, ১০।১২৭।৪

(২) উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহির্দিবঃ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে॥
—ঋক্, ১০।১২৭।৮

দেবী, অর্থাৎ বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বেদ-বাক্য জ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতিঃস্বরূপ। সেই কারণ, বাক্-দেবীও জ্যোতির্ময়ী—সরস্বতী। সংস্কৃতে বাক্, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। কাজেই বেদ-বাক্যের যিনি অধিষ্ঠাত্রী, তিনি দেব না হইয়া দেবী হইয়াছেন। ঋগ্বেদে সরস্বতী শুধু বাক্-দেবী নহেন—তিনি সত্য ও প্রিয় বাণীর প্রেরণাদাত্রী এবং সৎবুদ্ধির চেতনাদাত্রী। (১) তিনি সৎবিদ্যা ও সৎবুদ্ধি দান করেন। ইহা হইতেই পরে সরস্বতীকে বিদ্যাদায়িনীরূপে পূজা করা হইতে থাকে। বৈদিক যুগে তিনি ছিলেন নিরাকার, তাঁহার আকার কল্পিত হয় পরবর্তী যুগে।

(খ) পৌরাণিক দেবতা।

পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দেবী এই চারি দেবতা সুপ্রসিদ্ধ। এই চারি জন যে পৌরাণিক যুগে প্রথম কল্পিত, তাহা নহে। বেদেও তাঁহাদের উল্লেখ আছে। পুরাণে তাঁহারা রূপান্তরিত হইয়াছেন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, দেবতাগণ অমূর্ত ও সূক্ষ্মশরীরী। তাঁহাদের স্থূলশরীর বা মূর্তি নাই। তাই, বৈদিক যুগে তাঁহারা ছিলেন নিরাকার। বৈদিকযুগে দেবতাগণের স্থূল মূর্তি যে আদৌ কল্পিত হয় নাই, তাহা নহে। ঋগ্বেদে দেখাযায় যে, দেবরাজ ইন্দ্রের দুই হস্তে বজ্র, দুই চক্ষু উজ্জ্বল, শ্মশ্রু-কেশ-বিশিষ্ট এবং মস্তকে

প্রসিদ্ধ পৌরাণিক দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও দেবী; এক পরমেশ্বরের বিভিন্ন বিভূতি

(১) চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী॥
—ঋক্, ১।৩।১১

শিরস্ত্রাণ (১) পৌরাণিক যুগে জনসাধারণের ধারণার সুবিধার্থে দেবতাদিগের সাকার মূর্তি পূর্ণভাবে কল্পিত হইয়াছিল। এই যুগে ঋষিগণ ধ্যানের সাহায্যে যে যে দেবতার যে যে সাকার মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা মুখে বর্ণনা করিয়াছিলেন। একই সগুণ ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের বিশ্বজগৎসম্পর্কে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাত্মক তিন ঐশ্বর্য বা বিভূতি পুরাণে যথাক্রমে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব নামে তিন পৃথক্ দেবতা বলিয়া কল্পিত। শ্রুতি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, এক সগুণ ব্রহ্মই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করেন। (২) যে মহাশক্তি-সাহায্যে তিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিতেছেন, সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি—দেবী। এই আদ্যাশক্তি ত্রিগুণাত্মিকা। সৃজন-পালন-সংহার এই ত্রিবিধ কার্যের মধ্যে তাঁহার এক এক গুণের প্রাবল্য প্রকাশ পায়। সৃজনে রজোগুণের, পালনে সত্ত্বগুণের এবং সংহারে তমোগুণের। সেই নিমিত্ত ব্রহ্মা রজোপ্রধান, বিষ্ণু সত্ত্বপ্রধান এবং শিব তমোপ্রধান। এই আদ্যাশক্তি বা ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। (৩)

ব্রহ্মা—পুরাণে সৃষ্টিকর্তা। বৈদিক দেবতা প্রজাপতিই পুরাণে ব্রহ্মানামে রূপান্তরিত। ঋগ্বেদে ঠিক সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার উল্লেখ নাই, ব্রহ্মাশব্দের উল্লেখ আছে, তবে ভিন্নার্থে। (৪) পুরাণে ব্রহ্মার সাকার রূপ—তিনি চতুর্মুখ, হস্তে জপমালা ও কমণ্ডলু। অধুনা একমাত্র পুষ্করতীর্থেই ব্রহ্মার পূজা প্রচলিত, অন্যত্র নহে।

(১) ঋক, ১০।১৬
(২) তৈঃ উঃ, ৩।১
(৩) ৮০, ৮২ ও ৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(৪) উপাসনা।

বিষ্ণু—পুরাণে পালনকর্তা। ঋগ্বেদেও বিষ্ণু বিশেষভাবে উল্লিখিত। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। (১) প্রভেদ—ঋগ্বেদে ইন্দ্র দেবরাজ এবং বিষ্ণু উপেন্দ্র বা ইন্দ্রের সহায়ক মাত্র; কিন্তু পুরাণে বিষ্ণু স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ দেবতা। পুরাণে এই উপেন্দ্রই ইন্দ্রের স্থান অধিকার করিয়াছেন। পুরাণে বিষ্ণুর মূর্তি-কল্পনা—তিনি চতুর্ভুজ এবং চারি হস্তে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, সূর্য-মণ্ডল-মধ্যবর্তী (২), পদ্মাসনে উপবিষ্ট, কেয়ূর-মকরকুণ্ডল-কিরীট-হারে ভূষিত (৩), এবং জ্যোতির্ময় দেহবান। বিষ্ণুর অপর নাম—নারায়ণ। বিষ্ণুর ধ্যানমন্ত্র—

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ মকরকুণ্ডলবান্ কিরীটি
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

শিব—পুরাণে সংহারকর্তা। ঋগ্বেদে রুদ্র শব্দের প্রতিশব্দ, শিব। পুরাণে শিবের মূর্তিকল্পনা—তিনি পঞ্চমুখ, ত্রিনেত্র, চারি হস্তে কুঠার-মৃগ-বর-অভয়-ধারণকারী, চন্দ্র-ভূষণ, রজতগিরিসদৃশ, রত্নালঙ্কারে উজ্জ্বল দেহবান্, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, সদা প্রসন্ন, ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিত, বিশ্বের আদি, বিশ্বের বীজ এবং নিখিল ভয়ের হরণকারী। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ঋগ্বেদে রুদ্রের দুই মূর্তি—প্রলয়ে সংহারমূর্তি এবং আধিব্যাধি ও ভবব্যাধিহররূপে মঙ্গলমূর্তি। পুরাণে বর্ণিত শিবেরও দুই মূর্তি—

১) ৩০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) সূর্যমণ্ডল বলিলে সূর্যের বর্ণমণ্ডল (Chromosphere) ও তেজোমণ্ডল (Photosphere) বুঝায়। প্রকৃত সূর্য এই মণ্ডলের দ্বারা আবৃত। এই সূর্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী দেবতাই পুরাণে নারায়ণ হইয়াছেন।

(৩) কেয়ূর—বাজু; মকরকুণ্ডল—মকরাকৃতি কর্ণভূষণ; কিরীট—শিরোভূষণ।

সংহারমূর্তি ও মঙ্গলমূর্তি। তিনি হস্তে কুঠার ধারণ করেন, আবার বর-অভয়ও ধারণ করেন; তিনি নাশ করেন, আবার নিখিল ভয় হরণ করেন। তাঁহার মাভৈঃ-বাণী মঙ্গলাত্মক। শিবের ধ্যানমন্ত্র—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

দেবী—বেদের রাত্রিদেবী পুরাণে দেবী, মহাদেবী এবং মহামায়া নামে অভিহিতা। পুরাণে দেবীর মূর্তিকল্পনা—তিনি সুধাসমুদ্রের মধ্যে মণিমণ্ডপে রত্নবেদীস্থিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা, উত্তপ্তপীতবর্ণা ও পীতবস্ত্র-পরিহিতা, স্বর্ণালঙ্কার-মাল্য-শোভিতা, হস্তে মুদ্গর ও শত্রুজিহ্বাধারিণী, চরণে রত্নখচিত-নূপুর-শোভিতা, ত্রিনয়নোজ্জ্বলা (১), সহস্রভুজে (২) শূলাদি অস্ত্রধারিণী, অমৃতরশ্মিরত্নখচিত মুকুটধারিণী, এবং নরমুণ্ডমাল্য-শোভিতা। দেবী ত্রিরূপা—রজোরূপা, তমোরূপা ও সত্ত্বরূপা। তাঁহার এই তিন রূপের তিন মূর্তি—রজোরূপে মহালক্ষ্মী, তমোরূপে মহাকালী এবং সত্ত্বরূপে মহাসরস্বতী। (৩) শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই চণ্ডিকা দেবীর তিন চরিত্র বর্ণিত। প্রথম চরিত্রে তিনি মহাকালীরূপে মধু-কৈটভ-ঘাতিনী; মধ্যম চরিত্রে তিনি মহালক্ষ্মীরূপে মহিষাসুরমর্দিনী; এবং উত্তর চরিত্রে তিনি মহাসরস্বতীরূপে শুম্ভ-নিশুম্ভ-বিনাশিনী। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে

(১) সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি এই তিন নয়ন।

(২) সহস্রভুজা শব্দের অর্থ, অনন্তভুজা। এখানে সহস্র শব্দ অনন্তবাচী। অনন্তভুজা—বিশ্বব্যাপিনী।

(৩) তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা।
মহালক্ষ্মী সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ॥

—দেবীভাগবত, ১।২।২০

চণ্ডিকা দেবীর ধ্যান দ্রষ্টব্য ; বাহুল্যভয়ে এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

বর্তমানকালে পঞ্চদেবতা

বর্তমানকালে পঞ্চদেবতার পূজা সুপ্রচলিত। পঞ্চদেবতা—গণপতি, সূর্য, বিষ্ণু, শিব এবং শিবা।

গণপতি—অপর নাম, গণেশ। ঋগ্বেদে গণপতির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা ভিন্নার্থে। (১) সেখানে দেবগণের পিতা, গণপতি বা ব্রহ্মণস্পতি। এখানে গণপতির অর্থ—গজমুণ্ডধারী লম্বোদর সিদ্ধিদাতা বিঘ্ননাশক গণেশ। গণেশের প্রণাম-মন্ত্র—

একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননং।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥

অর্থ—যিনি একদন্ত, মহাকায়, লম্বোদর, গজানন এবং বিঘ্ননাশকারী সেই হেরম্বদেবকে আমি প্রণাম করি।

সূর্য—ইনি বৈদিক দেবতা। বৈদিক যুগে সূর্যোপাসনা ছিল নিত্যসন্ধ্যা। সূর্যের প্রণাম-মন্ত্র—

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

অর্থ—জবাকুসুমের তুল্য রক্তবর্ণ, কশ্যপের পুত্র, অতি তেজস্বী, তমোনাশক, সর্বপাপহারী সূর্যদেবকে প্রণাম করি।

বিষ্ণু—বেদে এবং পুরাণে প্রসিদ্ধ। পুরাণে বর্ণিত বিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ইদানীং বিষ্ণুর স্থান অধিকার করিয়াছেন। আজকাল এই অবতারদ্বয়ের পূজাই বিষ্ণুর পূজা বলিয়া গণ্য। তাই, এখানে শ্রীরামচন্দ্রের ও শ্রীকৃষ্ণের প্রণামমন্ত্র দেওয়া গেল। শ্রীরামচন্দ্রের প্রণাম-মন্ত্র—

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়েঃ নমঃ॥

---

(১) উপাসনা।

অর্থ—শ্রীভগবান রাম রামচন্দ্র রামভদ্র রঘুনাথ জগতের পতি সীতাপতিকে নমস্কার। শ্রীকৃষ্ণেরপ্রণাম-মন্ত্র—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

অর্থ—ব্রহ্মণ্যদেবকে (১) নমস্কার; গো ও ব্রাহ্মণের (২) হিতকারী এবং জগতের হিতকারী গোবিন্দ কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

শিব—ইনিও বেদ-পুরাণে প্রসিদ্ধ। শিবের প্রণাম-মন্ত্র—

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিস্ত্বং পরমেশ্বর॥

অর্থ—শিব বা মঙ্গলময়, শান্ত এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপ কারণত্রয়ের হেতুস্বরূপকে (৩) নমস্কার; তাঁহার নিকট আমি আপনাকে নিবেদন করিতেছি। হে পরমেশ্বর, তুমিই আমার গতি।

শিবা—অপর নাম, গৌরী বা দুর্গা। পুরাণে এই দেবীর মহিমা সুকীর্তিত। গৌরীর প্রণাম-মন্ত্র—

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

অর্থ—আপনি সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপিণী, কল্যাণকারিণী, সর্বাভীষ্টসাধিকা, শরণযোগ্যা, ত্রিভুবনজননী ও গৌরবর্ণা। হে নারায়ণি, আপনাকে প্রণাম করি।

(১) স্বয়ং প্রকাশক বিষ্ণুকে।

(২) এখানে গোশব্দের অর্থ, পৃথিবী; ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ, ব্রহ্মার সৃষ্ট মনুষ্য।

(৩) শিব সংহার করেন সৃষ্টির জন্য। প্রলয় না হইলে পুনঃ সৃষ্টি হয় না, এবং সৃষ্টি না হইলে স্থিতির প্রশ্ন উঠে না। অতএব, শিব সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই তিনেরই হেতুস্বরূপ।

কি বেদে কি পুরাণে, দেব-দেবীগণের হস্তে বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র কল্পিত। যথা—ঋগ্বেদে বজ্রধারী ইন্দ্র, পিনাকপাণি রুদ্র ইত্যাদি। ইহার সূক্ষ্ম কারণ এই যে, দেব-দেবীগণ বিশ্বহিতার্থে জগতের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে রত, আর অসুরগণ বিশ্বের অহিতার্থে সেই শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত করিতে রত। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে দেব-প্রকৃতি এবং অসুর-প্রকৃতি বিদ্যমান। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। একটি থাকিলে, আর একটি থাকিবে। তাই, সৃষ্টিপ্রবাহের ভিতর সূক্ষ্মলোকে এই দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির দ্বন্দ্ব চিরদিন চলিতেছে। ইহাই দেবাসুর সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের জন্য দেব-দেবীগণ নানাবিধ সূক্ষ্ম অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত। স্থূল কারণের মধ্যে এক ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত। ভারত-প্রবেশের প্রাক্-কালে প্রাচীন দেবোপাসক আর্যগণের সঙ্গে অসুরোপাসক আর্যগণের সংঘর্ষ প্রায়ই ঘটিত। ভারত-প্রবেশের পর ভারতীয় আর্যগণের সহিত ভারতের আদিবাসী অনার্যগণের তুমুল যুদ্ধ বাধিয়াছিল। অনার্যদমনের পরও ভারতীয় আর্যগণকে আর্যরাজ্যের প্রতিষ্ঠা-বিস্তার-মানসে সর্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। সেই নিমিত্ত তাঁহারা কিছু যুদ্ধপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঋগ্বেদে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই কারণে তাঁহাদের দেব-দেবীগণও অস্ত্রশস্ত্রধারী বলিয়া কল্পিত।

দেব-দেবীগণ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত; ইহার সূক্ষ্ম ও স্থূল কারণ

[দুই]
অবতার।

'অব' পূর্বক 'তৃ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয় যোগে অবতার শব্দ নিষ্পন্ন। ইহার ধাতুগত অর্থ—নীচে নামা বা অবতরণ। শ্রীভগবান সৃষ্টিমণ্ডলের ঊর্ধ্ব স্থিত তাঁহার সেই অপ্রাকৃত নিত্য ধাম হইতে কখনো কখনো নীচে সৃষ্টিমণ্ডলে নামিয়া আসেন, জীবকে দিব্য প্রকৃতিতে

উঠাইবার অভিপ্রায়ে—ইহাই শ্রীভগবানের অবতরণ বা অবতারবাদ। এই অবতারবাদ প্রচারিত হয় পৌরাণিক যুগে।

অবতারবাদে প্রাথমিক শঙ্কা

প্রথমেই মনে এই শঙ্কা উপস্থিত হয় যে, সেই অসীম পরম পুরুষ শ্রীভগবান কখনো এই ক্ষুদ্র জীবের বা মানবের আধারে নামিয়া সসীম হইয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীভগবানের অসীমত্ব কি প্রকার, তাহা ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারার ফলে এই শঙ্কা দেখা দেয়। তাঁহার অসীমত্ব—জড়ত্বের অসীমত্ব নহে, চৈতন্যের অসীমত্ব। একটা খুব প্রকাণ্ড জড় পদার্থকে খুব ছোট জড় আধারের ভিতর রাখিতে পারা যায় না, ইহা সত্য। কিন্তু যিনি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপে অসীম, তিনি ক্ষুদ্র সসীম স্থূল আধারের ভিতর অনায়াসে থাকিতে পারেন। অসীম বৈদ্যুতিক শক্তি ছোট ছোট লোহার তারের ভিতর অবস্থান করে। ইহা সর্বদা আমরা দেখি। শ্রুতি তাই বলিয়াছেন—অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্, তিনি অণু হইতেও অণু এবং মহৎ হইতেও মহৎ।

এক চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম বিশ্বের কি চেতন, কি অচেতন, সকল পদার্থের মধ্যে অনুস্যূত—বেদান্তের বাণী। এই দৃষ্টিতে দেখিয়া বলিতে পারা যায় যে, শ্রীভগবান অন্তর্যামীরূপে সকল পদার্থেই যখন বিদ্যমান, তখন তিনি জীবের আধারে তো অবতীর্ণ হইয়াই আছেন, অতএব জীবমাত্রই তাঁহার অবতার। এই ধারণাও ঠিক নহে। জীবমাত্রই অবতার হইতে পারে না।

অবতারে ও জীবে প্রভেদ

সকল জীবের আধারে শ্রীভগবান অনুস্যূত হইলেও, তাঁহার চৈতন্যাংশের প্রকাশের তারতম্য আছে। তিনি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্য সর্বভূতে বর্তমান সত্য, কিন্তু ইহা সর্বভূতে সমভাবে প্রকাশমান নহে। একগাছা তৃণে যেটুকু চৈতন্যের প্রকাশ, একটি মানুষে তাহার প্রকাশ অনেক গুণ বেশী; আবার, একটি মানুষে যেটুকু চৈতন্যের

প্রকাশ, এক মানুষ-অবতারে বা নরদেহধারী অবতারে তাহার প্রকাশ অনেকগুণ বেশী। উদ্ভিজ্জ জীবে চৈতন্যের প্রকাশ এক কলা; স্বেদজ জীবে বা দংশ-মশকাদিতে দুই কলা; অণ্ডজ জীবে বা পক্ষী প্রভৃতিতে এবং চতুষ্পদ জরায়ুজ জীবে বা পশু প্রভৃতিতে তিন কলা। চারি প্রকার স্থূলদেহধারী জীবের ভিতর মনুষ্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই, মনুষ্যে চৈতন্যের প্রকাশ চারি কলা। নরদেহধারী অবতার যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ নয় হইতে ষোল কলা। অবতারগণের ভিতরও চৈতন্য-প্রকাশের তারতম্য আছে। (১)

অবতার নরদেহধারী হইলেও সাধারণ মনুষ্য নহেন—তিনি মায়া-মনুষ্য। প্রধানতঃ, অবতারে ও সাধারণ মনুষ্যে এই কয়টি বিষয়ে প্রভেদ—(ক) মানুষ প্রারব্ধ কর্মফলভোগের জন্য পিতামাতার রজোবীর্যজাত স্থূলদেহ ধারণ করে, কিন্তু অবতারের স্থূলদেহ কেবল রজোবীর্যজাত নহে—শুদ্ধ মায়ার দ্বারা রচিত। গীতায় শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন—প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া, নিজের শক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিজের মায়ার দ্বারা দেহধারণ করি। (২) জননীর গর্ভে বাস এবং জননীর গর্ভ-যন্ত্রনা ইত্যাদি মায়া-কল্পিত।

অবতারে ও সাধারণ মনুষ্যে প্রভেদ

(খ) মানুষের আত্মজ্ঞান অবিদ্যার বা মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত, কিন্তু অবতারে আত্মজ্ঞান অনাচ্ছাদিত ও অলুপ্ত। নরদেহধারণের পরও অবতারের ভিতর এই দিব্যজ্ঞান বর্তমান থাকে যে, তিনি এবং জগৎ-কারণ ব্রহ্ম এক এবং তাঁহার এই স্থূলদেহধারণ মায়িক মাত্র; তিনি স্বেচ্ছায় মায়া-রচিত দেহ ধারণ করিলেও, তাঁহার তৃতীয় চক্ষু বা

(১) প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মের কলা বা অংশ নাই। ভিন্ন ভিন্ন আধারে তাঁহার চৈতন্য-প্রকাশের তারতম্য বুঝাইতে কলা শব্দ ব্যবহৃত।

(২) গীঃ, ৪।৬

প্রজ্ঞানেত্র সর্বদা মায়াতীত বস্তু নিরীক্ষণ করে। অবতারগণের জীবনীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা প্রত্যেকেই পার্ষদগণের কাছে ইহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহারা শ্রীভগবানের মূর্ত রূপ। সচরাচর মানুষ আত্মজ্ঞান তো দূরের কথা, দেহাতীত আত্মার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করিতে চায় না; এতদূর অবিদ্যাচ্ছন্ন। এই অবিদ্যার প্রভাববশতঃ যখন মানবের জীবন-যাপন-প্রণালী নিম্নাভিমুখী হইয়া ক্রমশঃ পশুর স্তরে নামিয়া যায়, তখন তাহাকে পুনরায় তাহার দিব্য প্রকৃতিতে উঠাইতে অবতারের আবির্ভাব হয়। অবতার তাঁহার স্বীয় জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাধারণ মানুষের সম্মুখে উপস্থিত করেন, মানুষ তদ্ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং সাধনার দ্বারা দিব্য প্রকৃতি লাভ করে। তাই বলা হয় যে, শ্রীভগবান অবতাররূপে নীচে নামিয়া আসেন অধঃপতিত মানুষকে উপরের প্রকৃতিতে উঠাইবার অভিপ্রায়ে।

(গ) মানুষ ইহজন্মে সুখ-দুঃখ ভোগ করে পূর্বজন্মের কর্মফলে, অবতার তাহা করেন না। অবতারের কর্মফলভোগের প্রশ্ন নাই। তিনি বাহ্যতঃ সুখ-দুঃখ ভোগ করেন, ইহাও মায়িক মাত্র। আমরা দেখি, রাবণ কর্তৃক সীতা-হরণে শ্রীরামচন্দ্র দুঃখে বিলাপ করিয়াছিলেন, জরাসন্ধের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে উৎপীড়িত শ্রীকৃষ্ণ দুঃখে মথুরা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সব ঘটনা তাঁহাদের অভিনয় মাত্র মানবের সাজে। লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে নরলীলায় অবতীর্ণ হইয়া শ্রীভগবান অভিনয় করেন মাত্র। প্রকৃত সুখ-দুঃখের বোধ অবতারের নাই।

সগুণ ব্রহ্ম, মায়াধীশ (১)। তিনি মায়ার বা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির

---

(১) মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।—শ্বেঃ উঃ, ৪।১০

সহিত যুক্ত হইয়া যে সব অপ্রকট ও প্রকট কার্য করেন, তাহার নাম —লীলা। লীলার অর্থ, বিনা প্রয়োজনে ক্রীড়া। জীব যত কিছু কাজ করে প্রয়োজনবশতঃ, তাহার প্রয়োজন মিটাইতে। অভাব না থাকিলে প্রয়োজন হয় না। অসম্পূর্ণ জীবের অভাব আছে, তাই প্রয়োজনও আছে। পরমেশ্বরের অভাব নাই, তাই প্রয়োজনও নাই। তবুও তিনি যে কাজ করেন, তাহা তাঁহার ক্রীড়ামাত্র। ইহাই তাঁহার লীলা। লীলা দ্বিবিধ—প্রকট এবং অপ্রকট। যাহা মানুষের চক্ষুগোচর, তাহা প্রকট; এবং যাহা মানুষের চক্ষুগোচর নহে, তাহা অপ্রকট। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপ পরমেশ্বরের লীলা—অপ্রকট। স্থূললোকে অবতরণের পর স্থূলদেহধারী অবতাররূপে তাঁহার সব লীলা—প্রকট। লীলাবাদের সহিত অবতারবাদ জড়িত। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাত্মক অপ্রকট লীলা প্রবাহরূপে নিত্য, অর্থাৎ চিরস্থায়ী। স্থূলশরীরী অবতাররূপে প্রকট লীলা অনিত্য, অর্থাৎ অবতার-কাল পর্যন্ত স্থায়ী।

লীলা ও অবতারবাদ

পরমেশ্বরের অবতরণ বা শরীর-প্রবেশ মুখ্যতঃ তিন প্রকার—গুণাবতার, লীলাবতার ও আবেশাবতার। অপ্রকট লীলায় তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই তিন সূক্ষ্মশরীরী দেবতারূপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করেন; এই তিন দেবতায় সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিন গুণের এক একটির প্রাধান্য থাকায়, তাঁহারা পরমেশ্বরের গুণাবতার। পৃথিবীলোকে মৎস্য-কূর্মাদি স্থূলদেহধারী জীবের মূর্তিতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি প্রকট লীলা করেন বলিয়া মৎস্য-কূর্মাদি দশ অবতার, তাঁহার লীলাবতার। পরমেশ্বরের জ্ঞানাদি শক্তির দ্বারা আবিষ্ট মহাপুরুষ-গণ, তাঁহার আবেশাবতার; যথা—পুরাকালে সনকাদি এবং বর্তমান কালে শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ।

অবতারের প্রকার-ভেদ

সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপ অপ্রকট লীলাত্রয়ের মধ্যে স্থিতি-লীলার দেবতা, শ্রীবিষ্ণু। ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি বা রক্ষণ করিতে কখন কখন বিষ্ণুকে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া প্রকট লীলা করিতে হয়। মৎস্য-কূর্মাদি দশ অবতার, বিষ্ণুর ঐ প্রকট লীলার জন্য; অতএব, তাঁহারা বিষ্ণুর দশাবতার।

বিষ্ণুর দশাবতার

শ্রীভগবানের পৃথিবীতে অবতরণ আকস্মিক নহে। তিনি অসময়ে আসেন না, যথাকালে আসেন। গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—যখন পৃথিবীতে ধর্মের পতন ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি অবতীর্ণ হই সাধুদিগের রক্ষার জন্য, দুষ্টদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য। (১) শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও শ্রীভগবতী অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন। (২) বর্তমান শ্বেতবরাহ কল্পে, বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে, বর্তমান অষ্টাবিংশসংখ্যক মহাযুগে বিষ্ণুর দশাবতারের বিষয় শাস্ত্রে উল্লিখিত। বস্তুতঃ, স্থিতি-লীলার অনুরোধে শ্রীবিষ্ণুকে কতবার অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অতীতে পূর্ব পূর্ব কল্প-মন্বন্তর-মহাযুগে তিনি যে কতবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ভাবী কল্প-মন্বন্তর-মহাযুগে (৩) কতবার যে অবতীর্ণ হইবেন, তাহা গণনার বস্তু নহে। এই কারণ বিষ্ণুভাগবত বলেন—অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ। শাস্ত্রকথিত বিষ্ণুর দশাবতার—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ (৪),

---

(১) গীঃ, ৪।৭-৮

অবতারগণ ধর্ম-প্রবর্তক নহেন—ধর্মসংস্থাপক।

(২) চণ্ডী, ১১।৫৪-৫৫

(৩) কল্পাদির ব্যাখ্যা ২৮৫-২৮৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(৪) শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান জানিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে অবতারের শ্রেণীভুক্ত করেন না, তাঁহার স্থলে হলধারী বলরামকে এক অবতার বলেন।

শ্রীবুদ্ধ এবং কল্কি। শ্রীরামচন্দ্রে ও শ্রীকৃষ্ণে শ্রীভগবানের ষোল কলা চৈতন্যের প্রকাশ। দশাবতারসম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী এইরূপ। প্রলয়কালে (৫) বেদ প্রলয়-পয়োধি-জলে নিমগ্ন ছিল। (৬ শ্রীবিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বেদের উদ্ধার করেন—ইহা মৎস্যাবতার। তারপর, পৃথিবী পুনরায় জলপ্লাবিত হইলে তিনি কূর্মরূপে পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করেন—ইহা কূর্মাবতার। পৃথিবী আবার জলপ্লাবিত হইলে, তিনি বরাহরূপে পৃথিবীকে দন্তদ্বারা ধারণ করেন এবং মহাবল হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করেন—ইহা বরাহ-অবতার। তাহার পর, হিরণ্যাক্ষের ভ্রাতা এবং ভক্ত প্রহ্লাদের পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু যখন অত্যাচারী হইয়া উঠে এবং ভক্ত প্রহ্লাদের বিনাশের জন্য চেষ্টা করিতে থাকে, তখন শ্রীবিষ্ণু পৃথিবীকে এবং ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিতে নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন—ইহা নৃসিংহাবতার। তারপর, যখন দৈত্যরাজ বলির দর্পে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হয়, তখন বামনরূপে তিনি ছলনার দ্বারা অতিদর্পী বলির দর্প চূর্ণ করেন এবং পৃথিবীকে রক্ষা করেন—ইহা বামনাবতার। তারপর, যখন ক্ষত্রিয়-প্রতাপে পৃথিবী তাপিত হয়, তখন তিনি পরশুরামরূপে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন—ইহা পরশুরাম-অবতার। তারপর, যখন রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যাচারে পৃথিবী জর্জরিত হয়, তখন তিনি

(৫) এখানে এই প্রলয় শব্দে দৈনন্দিন বা নৈমিত্তিক প্রলয় বুঝায় না। প্রতি কল্পে চৌদ্দ মন্বন্তরের পর এক নৈমিত্তিক প্রলয় ঘটে। অতএব, এখানে বর্তমান মন্বন্তরে বর্তমান মহাযুগে পৃথিবীর জলমগ্ন হওয়ার অবস্থাকেই প্রলয় বলা হইয়াছে।

(৬) তখন মানব-সৃষ্টি হয় নাই। অধুনা ভূতত্ত্ববিদ্‌গণও বলেন যে, প্রাক্-মানবীয় যুগে তুষার-যুগ (Glacial Age) ছিল এবং সেই তুষার-যুগে পৃথিবী তুষারগলিত জলে কয়েকবার মগ্ন হইয়াছিল। ঋগ্বেদে, জেন্দাবেস্তায় এবং বাইবেলে ইহার উল্লেখ আছে। বাইবেল ইহাকে Deluge বলিয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্ররূপে রাবণকে বধ করেন—ইহা শ্রীরামচন্দ্র-অবতার। তারপর, কংসাদি অসুরগণের এবং দুর্যোধনাদি অধর্মপরায়ণ মিথ্যাচারীদিগের অধর্মের আগুণে পৃথিবী যখন দগ্ধপ্রায় হয়, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে তাহাদের সংহার করিয়া ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করেন—ইহা শ্রীকৃষ্ণ-অবতার। তারপর, যখন বৈদিক যজ্ঞকর্মের নামে অবাধ নৃশংস পশু-হত্যায় পৃথিবী নরক-ক্ষেত্রে পরিণত হয়, তখন তিনি জীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া শ্রীবুদ্ধরূপে সেই ব্যাপক পশুহত্যার নিবারণ করেন—ইহা শ্রীবুদ্ধ-অবতার। বর্ত্তমান কলিযুগের শেষভাগে যখন অধর্ম-অসত্যের পূর্ণ প্রভাবে পৃথিবী বাসের অযোগ্য হইবে, তখন শ্রীবিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া অধর্মাচারীদিগকে সংহার করতঃ ধর্ম ও সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন—ইহা কল্কি-অবতার। কল্কি ব্যতীত অপর নয় অবতার হইয়া গিয়াছে। বিগত নয় অবতারের ভিতর শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবুদ্ধ ঐতিহাসিক পুরুষ। শ্রীরামচন্দ্র শুধু অযোধ্যাপতি ছিলেন না; কেহ কেহ বলেন যে, তিনি অথর্ববেদের একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এবং বর্ণাশ্রমধর্মের ও সাকারোপাসনার প্রবর্ত্তক। রাময়ণ মহাকাব্য হইলেও, তাহার মূল কাহিনী ঐতিহাসিক। মহাভারতে এবং বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রভৃতিতে রামোপাখ্যান কথিত। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও রামাখ্যান নানাভাবে স্থান পাইয়াছে। ব্যাকরণকর্তা পাণিনিও রামাখ্যান উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব, শ্রীরামচন্দ্র যে ঐতিহাসিক পুরুষ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে সপ্তদশ খণ্ডে ষষ্ঠ মন্ত্রে স্পষ্ট পাওয়া যায়। উপনিষদের ঋষি সেখানে বলিয়াছেন যে, দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গিরার পুত্র ঘোর নামক একজন ঋষির নিকট শিষ্যরূপে পুরুষযজ্ঞদর্শন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন এবং অন্য উপাসনার প্রতি স্পৃহাহীন হন। শ্রীকৃষ্ণের

ঐ শিক্ষাগুরু ঘোর আঙ্গিরস, ঋগ্বেদে তৃতীয় মণ্ডলে ৩৬ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। বেদের এক আরণ্যকেও শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট নামোল্লেখ আছে। ঈশার (Jesus) জন্মের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে পাণিনি-ব্যাকরণ রচিত। পাণিনিতেও. শ্রীকৃষ্ণের জীবনী উল্লিখিত। মহাভারত ব্যাসদেবের রচিত। ব্যাসদেব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক। অতএব, মহাভারতে লিখিত শ্রীকৃষ্ণচরিত শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব সম্পর্কে প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীবুদ্ধের ঐতিহাসিকত্ব সর্ববাদিসম্মত, সে সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

দশাবতারের ভিতর ঐতিহাসিক নহে প্রথম ছয়টি—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন এবং পরশুরাম। বামনকে এবং পরশুরামকে মানব-সৃষ্টির প্রারম্ভে ধরিলেও, মৎস্য-কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহকে তাহার পূর্বে বলাই কর্তব্য। স্থূলশরীরী জীবের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ। মানবের আধারে শ্রীভগবানের আবির্ভাব দোষযুক্ত না হইলেও, মৎস্য-কূর্মাদি-রূপ মানবেতর নিকৃষ্ট জীবের আধারে তাঁহার আবির্ভাবের কথায় অনেকের মনে যেন একটা ধাক্কা লাগে। বুঝিয়া দেখিলে, আর সে ধাক্কার কারণ থাকে না। শ্রীভগবান সর্বভূতে অধিষ্ঠিত। নিকৃষ্ট জীবের মাঝেও যখন তিনি আছেন, তখন তিনি লীলাবশতঃ সেই সকল জীবেরও মায়িক দেহ ধারণ করিতে পারেন। যদি ধরা যায় যে, মৎস্য-কূর্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামন-পরশুরাম এই ছয় অনৈতিহাসিক অবতার সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী এক সুন্দর কাব্য মাত্র,তাহা হইলেও বলা যায় যে কাব্যেরও মূল্য আছে। পৌরাণিক কাহিনীতে উচ্চতম সত্যের উপদেশ আছে। পৃথিবী যখন জলমগ্ন (১), তখন শ্রীভগবান অবতীর্ণ

(১) এই পৌরাণিক কাহিনীর মতে, বর্তমান মহাযুগের আদিতে মৎস্য-কূর্ম-বরাহ এই প্রথম তিন অবতারের আবির্ভাবের প্রাক্-কালে পৃথিবীর উপর তিন বার মহা-

হইলেন মৎস্তরূপে। মৎস্ত জলচর। কাজেই, সেই মহাপ্লাবনে মৎস্ত-রূপ ধারণ ছাড়া আর অন্ত উপায় ছিল না। মৎস্তরূপে তিনি উদ্ধার করিলেন বেদ। বেদ, পৃথিবীর আদি ধর্মগ্রন্থ। পৃথিবীতে ধর্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে শ্রীভগবানের এই বেদোদ্ধার। জল হইতে স্থলের জন্ম। জল ও স্থলের মধ্যবর্তী সময়ে উভয়ের সমান অধিকার। তখন জন্মিল উভয়চর জীব—কূর্ম। তাই শ্রীভগবান সেই সময়ে কূর্মরূপে পৃথিবীকে উদ্ধার করিলেন। তাহার পরবর্তীকালে জলের অপেক্ষা স্থলের প্রাধান্ত। তখন জন্মিল স্থলচর জীব—বরাহ। তাই, সেইকালে তিনি বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে রক্ষা করিলেন। তাহার পরবর্তীকাল পশু ও মানুষের মাঝামাঝি। তখন মানুষের সৃষ্টি হয় নাই বটে, তবে পশুতে মানুষের সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। তাই, সেকালে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়াছিলেন নর-সিংহরূপে। তাহার পরবর্তীকাল, মানুষের। তবে তখনো মানুষ পূর্ণ মানুষ হইতে পারে নাই; সেইজন্ত—বামন। মতান্তরে, মানব-সৃষ্টির পূর্বে ধরাপৃষ্ঠে অতিকায় জীবজন্ত বাস করিত। তাহাদের সুবৃহৎ আকৃতির সহিত তুলনায় মানবের আকৃতি হইল খুব ছোট। সেই কারণও তখন মানবকে বামন অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকার দেখাইত। কাজেই, সেকালে তিনি অবতীর্ণ হইলেন বামনরূপে। তাহার পরবর্তীকালে মানুষ পূর্ণ মানুষ হইয়াছিল। (২) সেই নিমিত্ত তখন শ্রীভগবান অবতীর্ণ পূর্ণ মানব

প্লাবন ঘটে। অধুনা তুষার-প্লাবন সম্পর্কে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন তাহা ঘটে দুইবার; আর মার্কিন পণ্ডিতগণ (Americans) বলেন, চারবার। তাঁহাদের মতে, শেষ তুষার-প্লাবন ঘটিয়াছিল দশ হাজার বৎসর পূর্বে।

(২) নব্য ভূ-বিজ্ঞান বলেন—প্রথমে জলচর, পরে উভয়চর এবং তার পরে ভূচর প্রাণীর উৎপত্তি; ভূচর প্রাণীর ক্রমবিবর্তনধারায় প্রথমে বনমানুষ, গরিলা ইত্যাদি এবং সর্বশেষে মানুষ।

পরশুরামরূপে। মানব তখন ছিল অরণ্যবাসী, তাই পরশুরামের হাতে কুঠার। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বিষ্ণুর দশ অবতারগণের ভিতর শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুইজন আজকাল শ্রীবিষ্ণুর স্থান অধিকার করিয়াছেন। এখন তাঁহারাই শ্রীবিষ্ণু বলিয়া পূজিত। শ্রীরামচন্দ্র কেবলমাত্র ঐতিহাসিক দশরথ-পুত্র নহেন। রমন্তে যোগিনো যত্র ইতি রামঃ,—যোগিগণ যাঁহাকে ধ্যানের সাহায্যে লাভ করিয়া তৃপ্ত হন, তিনিই রাম। অর্থাৎ, তিনিই পরব্রহ্ম। (৩) শ্রীকৃষ্ণও কেবলমাত্র ঐতিহাসিক বসুদেব-পুত্র নহেন। বসতি ইতি বাসু,—যিনি সর্বভূতে বাস করেন, তিনি বাসুদেব; অর্থাৎ, পরব্রহ্ম। মহাভারতে এবং গোপালপূর্বতাপনীয় উপনিষদে কৃষ্ণ শব্দেরও ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ পরব্রহ্ম বলা হইয়াছে। (৪) অন্য পুরাণে কথিত হইয়াছে—ভক্তদুঃখকর্ষিত্বাৎ কৃষ্ণঃ, যিনি ভক্তের দুঃখ কর্ষণ বা নাশ করেন তিনি কৃষ্ণ। অর্থাৎ, কৃষ্ণই ভক্তের ভগবান। উপনিষদ্ বলেন—উপাসকগণের ধ্যানের জন্য নিত্যচৈতন্যস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অবিদ্যারহিত, অমূর্ত ব্রহ্ম অবতারের রূপ পরিগ্রহ করেন। (৫) তাৎপর্য—অমূর্ত ব্রহ্মের ধ্যান উপাসকগণের পক্ষে অতীব কঠিন, সেই নিমিত্ত ধ্যানের সুবিধার জন্য ব্রহ্ম স্বয়ং মূর্তিগ্রহণ করিয়া উপাসকগণের কাছে উপস্থিত হন। অনেক

---

(৩) রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥
—রাঃ পূঃ উঃ, ১।৬

(৪) ১৩৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় মূল শ্লোক দ্রষ্টব্য।

(৫) চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥
—রাঃ পূঃ উঃ, ১।৭

প্রসিদ্ধ ভক্ত শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া ভাগবত চৈতন্য লাভ করিয়াছিলেন, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। যেমন—তুকারাম, রামদাস, সুরদাস, মীরাবাই, তুলসীদাস প্রভৃতি।

হিন্দুধর্ম ব্যতীত অন্য ধর্মেও প্রকারান্তরে অবতারের পূজা হয়। খ্রীষ্টপন্থিগণ ঈশার (Jesus) পূজা করেন শ্রীভগবানের মধ্যস্থ (Mediator) (৬) বা পুত্র স্বরূপে। ইস্‌লামপন্থিগণ হজরত মহম্মদের পূজা করেন শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ বার্তাবহস্বরূপে। মার্কিন (America) প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে অবতারকে বলা হয় মধ্যস্থ (Mediator) বা পরিত্রাতা (Saviour); কেননা, তিনি শ্রীভগবানের সহিত তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তগণের মিলন-সাধন করেন। হিন্দুধর্মান্তর্গত ব্রাহ্মণ্যসমাজ পূর্ণভাবে অবতারবাদ গ্রহণ করিয়াছেন; আর্যসমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজ ইহা গ্রহণ করেন নাই।

বিষ্ণুর অবতার ব্যতীত শিবের এবং দেবীর অবতার-প্রসঙ্গও হিন্দুশাস্ত্রে আছে। শিব, সংহার-দেবতা। অতএব, ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি-

শিবের অবতার

রক্ষণের জন্য তাঁহার অবতার-গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। তবে, তাঁহার ভক্তগণের প্রতি কৃপাবশতঃ কখন কখন তিনি প্রকট মূর্তি ধারণ করেন, যেমন অর্জুনকে দর্শন দিয়াছিলেন কিরাতরূপে। শিব আবার জ্ঞানগুরু—জ্ঞানের দ্বারা তিনি ভব-ভয় হরণ করেন। জগতে অবিদ্যার প্রভাবে জ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা লুপ্ত হইবার উপক্রম হইলে, তিনি কখন কখন কোন মুক্ত পুরুষের অন্তরে আবিষ্ট হইয়া স্বীয় জ্ঞানশক্তি-সঞ্চারে জগতের অজ্ঞান-

---

(৬) For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;

—Bible, I Timothy II—5

কলুষ দূর করেন। সেই সকল মহাপুরুষ, শিবের আবেশাবতার। যেমন—যতিবর জগৎগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য।

ভিন্ন ভিন্ন কালে দেবী শ্রীভগবতীর আবির্ভাবের বা অবতরণের বিষয় শ্রীশ্রীচণ্ডী অপূর্ব কাব্যময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। জগতে দেবাসুর-সংগ্রাম অহরহঃ চলিতেছে অন্তরে-বাহিরে কি সূক্ষ্ম, কি স্থূল, স্তরে। জগতের অভ্যুদয়-পথে যাহারা মহাবাধা সৃষ্টি করে, তাহারা অসুর; আর, যাঁহারা সেই সকল মহাবাধা অতিক্রম করিয়া জগৎকে অভ্যুদয়-পথে পরিচালিত করেন, তাঁহারা দেবতা। অসুরগণ জগতের অমঙ্গলস্বরূপ এবং দেবতাগণ জগতের মঙ্গলস্বরূপ। বিধাতার এই বিপুল বিশ্বরাজ্যে দেব-শক্তি ও অসুর-শক্তি চিরকাল বিদ্যমান। মঙ্গল থাকিলেই অমঙ্গল থাকিবে, অমঙ্গল থাকিলেই মঙ্গল থাকিবে। কাজেই, বিশ্ব-সত্তায় এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব চিরদিন চলিতেছে। এই দেবাসুর সংগ্রামে মাঝে মাঝে আসুরিক শক্তি এত প্রবল হইয়া উঠে যে, দেব-শক্তি তাহার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারে না; তখন জগতে ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। সেইরূপ সন্ধিক্ষণে মহাশক্তিরূপা দেবী শ্রীভগবতী স্বয়ং অবতীর্ণা হইয়া আসুরিক শক্তিকে দমন করেন এবং জগতের অভ্যুদয়-পথ বাধামুক্ত করিয়া দেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই সার কথা। মানব-সৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টির সূক্ষ্ম স্তরে শ্রীভগবতী মহাকালী—মহালক্ষ্মী—মহাসরস্বতী-রূপে অবতীর্ণা হইয়া মধুকৈটভাদি অসুরগণের নিপাত করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম-মধ্যম-উত্তর চরিত্রে সবিস্তারে বর্ণিত। সর্বশেষে শ্রীভগবতী ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে তাঁহার ভাবী অবতারসম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়া যান। (১) তাঁহার সাতটি ভাবী অবতার তিনি

দেবীর অবতার

(১) চণ্ডী, ১১।৪১—৫৫

বিশেষভাবে ব্যক্ত করেন। সেই সাত অবতার—নন্দা, রক্তদন্তিকা, শতাক্ষী, শাকম্ভরী, দুর্গাদেবী, ভীমা এবং ভ্রামরী। এই সাত অবতারের ভিতর নন্দাবতার হইয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ছয় অবতার এখনো হয় নাই, পরে হইবে। সাত অবতারই বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে। দেবীর এই সকল অবতার সূক্ষ্মশরীরে ও সূক্ষ্মলোকে; অন্যপক্ষে, বিষ্ণুর দশাবতার স্থূল শরীরে ও স্থূল লোকে।

মনুষ্যলোকে শ্রীরামচন্দ্রাদি অবতারগণ ব্যতীত সময়ে সময়ে যুগাচার্যগণের আবির্ভাব হয়। তাঁহারা অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ।

যুগাচার্য ও সিদ্ধপুরুষ

তাঁহাদের মুখ্য কাজ, যুগে যুগে যুগোপযোগী শাস্ত্রার্থ-প্রকাশ। তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম-তেজ বিকীর্ণ হইয়া সাধারণ মানুষকে উদ্দীপ্ত করে। যেমন—শ্রীশঙ্করাচার্য, শ্রীরামানুজাচার্য, শ্রীনিম্বর্কাচার্য প্রভৃতি। তাঁহারা ঈশ্বরাবিষ্ট পুরুষ। সেই কারণ, তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানের আবেশাবতার বলা যাইতে পারে। কাহারো ভিতর বিষ্ণুর আবেশ, কাহারো ভিতর শিবের আবেশ। এই সকল যুগাচার্য ভিন্ন আরো এক শ্রেণীর মহাপুরুষ আছেন—সিদ্ধপুরুষ। যে সকল মহাপুরুষ অবতারগণের নিরূপিত সাধন-পথে অগ্রসর হইয়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহারাই সিদ্ধপুরুষ। তাঁহারা পূর্ণকাম ও জীবন্মুক্ত হইয়া লোক-কল্যাণে রত থাকেন। তাঁহাদের স্বার্থ-চেষ্টা থাকে না। অবতার ধর্ম-বিপ্লব-কালে ধর্ম-সংস্থাপন করেন; সিদ্ধপুরুষ অবতার-সংস্থাপিত ধর্মের আদর্শে নিজের জীবন গঠন করিয়া জন-সমাজে জলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ হন এবং তদ্দ্বারা সেই ধর্মকে পুষ্ট রাখেন। বিষ্ণু, শিব, শিবা ও তাঁহাদের অবতারগণকে উপাস্যরূপে উপাসনা-ভেদের ফলে সিদ্ধপুরুষ-গণের মধ্যে উপাসনা-বৈচিত্র্য থাকিলেও তাঁহারা সমশ্রেণীভুক্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

যোগ-সাধনা।

পূর্বে কথিত হইয়াছে, (১) ধর্মের দুই দিক—তত্ত্ব এবং সাধনা। হিন্দুধর্মে এই দুই দিকের নির্দেশ আছে। সাধনার নির্দেশ এত বেশী যে, হিন্দুধর্মকে সাধনমূলক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের যোগশাস্ত্রগুলি হিন্দুধর্মের বিজ্ঞানসম্মত সাধনার দিক বা ব্যবহারিক দিক। হিন্দুধর্মের চরম সাধ্য বস্তু, মুক্তি। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই মুক্তি (২)। ইহা সাধন-সাপেক্ষ। যোগশাস্ত্রসমূহে সেই সাধনার প্রণালী বিশ্লেষিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে যোগদর্শনের আলোচনার আরম্ভে (৩) বলা হইয়াছে, যোগ শব্দের দুই অর্থ। মুখ্যার্থ—পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ অর্থাৎ মিলন (৪)। গৌণার্থ—সেই মিলনসাধনার্থ চেষ্টা বা ক্রিয়া। যোগশাস্ত্রে ঐ মিলনসাধনার্থ ক্রিয়া বা প্রক্রিয়া বহু হইলেও বস্তুতঃ যোগ

---

(১) ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ১৮৯-১৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।

—যোগী যাজ্ঞবল্ক্যম্, ১।৪৩

ব্রহ্মই পরমাত্মা। জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

একই প্রকার—জীবাত্মা-পরমাত্মার সংযোগ। গৌণ অর্থে প্রক্রিয়া-ভেদে সাধারণতঃ যোগ-সাধনা সাত প্রকার—মন্ত্রযোগ, লয়যোগ, হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ। মন্ত্রজপ করিতে করিতে যে মনোলয় হয়, তাহার নাম—মন্ত্রযোগ। বাহ্য বা অভ্যন্তর কোন পদার্থের উপর চিত্তকে সন্নিবিষ্ট করিলে যে চিত্তলয় হয়, তাহার নাম—লয়-যোগ। মন্ত্রযোগ এবং লয়যোগ এই দুইটিকে ভক্তিযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি অন্য যোগের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। এখানে হঠযোগ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ এই পাঁচটি প্রধান যোগ সম্পর্কে কিছু আলোচনা আবশ্যক।

[এক]

হঠযোগ ঃ

শরীরং ব্রহ্ম-মন্দিরং, শরীর ব্রহ্মমন্দির। শরীরের ভিতর ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত; অতএব, শরীর ব্রহ্মের মন্দিরস্বরূপ। আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া মন্দিরকে যেমন পবিত্রভাবে রাখা কর্তব্য, তেমনি বাহ্য ও অভ্যন্তর মলরাশি পরিষ্কার করিয়া শরীরের পবিত্রতা-সাধন কর্তব্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, আত্মা বা পরমাত্মা বলহীনের দ্বারা লভ্য নহে। (৫) বল, অর্থাৎ দেহের বল এবং মনের বল। দেহ, মনের আধার। দেহ যদি অসুস্থ ও দুর্বল হয়, মনও হইয়া পড়ে অসুস্থ ও দুর্বল। সেই মন লইয়া আত্মানুসন্ধান সম্ভব নয়, পরমাত্মার সাক্ষাৎকার তো দূরের কথা। কাজেই, যোগ-সাধনার

(৫) মুঃ উঃ—৩।২।৪

প্রথম কথা—দেহকে সুস্থ, সবল ও পবিত্র রাখ। যে সকল প্রক্রিয়ার সাহায্যে দেহকে ঐরূপ রাখা যায়, তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন হঠযোগ। 'হ' শব্দে সূর্য এবং 'ঠ' শব্দে চন্দ্র বুঝায়; 'হঠ' শব্দে সূর্য-চন্দ্রের একত্র সংযোগ বুঝায়। এখানে ইঁড়াকে চন্দ্র এবং পিঙ্গলাকে সূর্য বলা হইয়াছে। মেরুদণ্ডের রন্ধ্রের ভিতর সুষুম্না নাড়ী। এই সুষুম্নার বহির্দেশে বাম পার্শ্বে ইড়া নাড়ী এবং দক্ষিণ পার্শ্বে পিঙ্গলা নাড়ী মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া নাসাপুট পর্যন্ত গিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্র বলেন, ভৌতিক স্থূল দেহে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ী আছে। তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান সুষুম্না—ইড়া—পিঙ্গলা এই তিনটি। হঠযোগের অর্থ, ইড়া ও পিঙ্গলার একত্র সংযোগ। ইড়া ও পিঙ্গলার ভিতর দিয়া অন্ত নাড়ীসমূহের সাহায্যেপ্রাণশক্তি সর্বদেহে সঞ্চারিত হয়। ইড়া ও পিঙ্গলার সামঞ্জস্যে প্রাণ-শক্তির সামঞ্জস্য ঘটে এবং তাহার ফলে মূলাধারে যে সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তি আছে, তাহা জাগরিত হয়। হঠযোগ চান—এই কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণে ও সঞ্চারে দেহের অস্থিপুঞ্জকে দধীচির অস্থির মত শক্ত করিয়া তুলিতে, যেন তাহারা অনায়াসে জরা-বার্ধক্য-মরণ জয় করিতে পারে।

হঠযোগের অর্থ ও উদ্দেশ্য

ঐ উদ্দেশ্যে হঠযোগ কতকগুলি শারীরিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেইগুলি তিন ভাগে বিভক্ত—অন্ত্রধৌতি, আসন ও মুদ্রা।

অন্ত্রধৌতি

দেহাভ্যন্তরে নাড়িভুঁড়ী পরিষ্কার-করণ—অন্ত্রধৌতি। আমরা যে সব খাদ্য গ্রহণ করি, তাহার মধ্যে অনেক বিষাক্ত পদার্থ থাকে। সেই বিষসমূহ উদরের ভিতর জমিতে থাকে। নিঃশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গেও অনেক বিষ বাহির হইতে দেহের

ভিতর প্রবেশ করে। উদরস্থ নাড়ীসকল মলাদিতে দূষিত থাকে। দেহাভ্যন্তরে এই সকল বিষ ও আবর্জনা হইতে যত রোগের উৎপত্তি। সেই কারণ, প্রয়োজন হয় নাড়ী-শোধনের। শরীরস্থ প্রধান ধাতু তিনটি—বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। ইহাদের মধ্যে একটি প্রবল হইলেই রোগের সৃষ্টি। অন্ত্রধৌতির দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ বিষাক্ত পদার্থগুলি বাহির হইয়া যায় এবং বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। বস্তি বা অন্ত্রনালী-ধাবন, ধৌতি বা উদর-ধাবন এবং নেতি বা নাসা-ধাবন প্রভৃতি অন্ত্রধৌতির বিবিধ প্রকরণ। আজকাল চিকিৎসকগণও সময়ে সময়ে রোগীর অন্ত্রধৌতির ব্যবস্থা করেন, কখন যন্ত্রসাহায্যে, কখন বা ঔষধ-সাহায্যে।

আসন

অঙ্গন্যাস বা হস্তপদাদির সংস্থান-বিশেষ—আসন। এক এক ভাবে অঙ্গন্যাসই এক একটি আসন। অঙ্গন্যাস করা যায় বিবিধ প্রকারে, তাই আসনও বিবিধ। হঠ-যোগে আসনের রকম অনেক—চুরাশী প্রকার। তন্মধ্যে পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, স্বস্তিকাসন, শীর্ষাসন, ময়ূরাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, সর্বাঙ্গাসন, এবং মৎস্যাসন উল্লেখযোগ্য। পদ্মাসন, সিদ্ধাসন ও স্বস্তিকাসন ধ্যান-ধারণা-জপের উপযোগী। পদ্মাসন ও সিদ্ধাসন, এই দুইটি আবার ধ্যানের পক্ষে খুব উপযোগী। অন্য আসনগুলি ব্রহ্মচর্য-সাধন, স্বাস্থ্য-পালন ও কুণ্ডলিনী-জাগরণের সহায়ক। শীর্ষাসন, ময়ূরাসন, পশ্চিমোত্তা-নাসন, সর্বাঙ্গাসন এবং মৎস্যাসন আজকালও অভ্যাস করিতে পারা যায়

এবং তাহাতে ফল পাওয়া যায়। (১) এই পাঁচটি আসন ছাত্র-যুবকগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

প্রাণায়াম ও ধ্যান-ধারণাদির উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ দেহ-ভঙ্গিমা—মুদ্রা। হঠযোগে মুদ্রা অনেক প্রকার। সুষুম্না নাড়ীর ভিতর দিয়া প্রাণশক্তি-পরিচালনের পক্ষে অতীব ফলজনক যে সকল মুদ্রা আছে, তন্মধ্যে মহামুদ্রা—কেশরীমুদ্রা—মহাবেদমুদ্রা এই তিনটি উল্লেখযোগ্য। হঠযোগের ত্রাটক মুদ্রা সুপ্রসিদ্ধ। ত্রাটককে স্বতন্ত্র ত্রাটকযোগও কহে। ইহা মনকে স্থির করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। সকল শ্রেণীর যোগীর কাছে এই ত্রাটক আদরণীয়। আন্তর বা বাহ্য কোন বস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার নাম, ত্রাটক। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থ বিন্দুকেন্দ্রে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ীর মিলন হইয়াছে বলিয়া এই বিন্দুকেন্দ্রকে ত্রিকূট বা ত্রিবেণী বলে। প্রধানতঃ এই ত্রিকূটে দৃষ্টি বদ্ধ রাখাই ত্রাটক নামে প্রসিদ্ধ। ত্রাটক-সিদ্ধ হইলে মন স্থির হয়। তাহা ব্যতীত চক্ষুর দোষ নষ্ট হয়, নিদ্রাতন্দ্রাদি আয়ত্তাধীন হয় এবং চক্ষুর রশ্মি-নির্গম-প্রণালী বিশুদ্ধ হয়। যোগশাস্ত্র এই ত্রাটকের প্রশংসায় মুখর।

মুদ্রা

হঠযোগে আসন-মুদ্রাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে। তাহার পক্ষে বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। দেহের প্রাণশক্তি সঞ্চিত হয় মেরুদণ্ডে ও মস্তিষ্কে এবং তথা হইতে স্নায়ুরজ্জুর (Spinal Cord) ও সূক্ষ্ম স্নায়ু-

(১) আসন সম্বন্ধে নানা সচিত্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কোন অভিজ্ঞ আসনসিদ্ধ লোকের নিকট সাক্ষাৎভাবে শিক্ষা লওয়াই যুক্তিযুক্ত; নচেৎ, অনেক সময় প্রমাদ ঘটে।

মণ্ডলীর ভিতর দিয়া বিতরিত হয় দেহ-যন্ত্রের সর্বত্র। এই প্রাণশক্তির উৎপত্তি-স্থান সাধারণতঃ রক্ত এবং বিশেষতঃ পুরুষের শুক্রগর্ভগ্রন্থিনিচয় (Seminal glands) এবং নারীর গর্ভাশয় (Ovary)। ইহা ছাড়া, ঘাড়ের নীচে কণ্ঠদেশের উপাস্থি (Thyroid Gland) শরীরের গঠন-বর্ধনের কাজ করে। হঠযোগের আসন-মুদ্রায় এই সকল গ্রন্থি-উপাস্থি প্রভৃতির কাজ ভালরূপে হয়; সেই নিমিত্ত ইহাতে প্রাণশক্তির সৃষ্টি-সঞ্চার-বিতরণ সুন্দর চলে। তাহার ফলে দেহ-যন্ত্র সচল ও শক্তিমান হইয়া উঠে এবং জরা-বার্ধক্য-মরণ তাহাকে শীঘ্র গ্রাস করিতে পারে না।

হঠযোগে আসন-মুদ্রার স্থান শ্রেষ্ঠ

ব্রহ্মচর্য-সংযম-সাধন হঠযোগের মূল কথা। ব্রহ্মচর্যের বিশেষ অর্থ—বীর্যধারণ। সংযমের অর্থ—ইন্দ্রিয় ও আহার সংযম। ব্রহ্মচর্য এবং সংযম সাধনের উপকারিতা বৈদিক যুগে বৈদিক ঋষি প্রচার করিয়াছিলেন—ব্রহ্মচর্যেন তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত, ব্রহ্মচর্যরূপ তপস্যার দ্বারা জ্ঞানিগণ মৃত্যুকে জয় করেন। (২) সেই অবধি আজ পর্যন্ত যুগে যুগে সকল ভারতীয় সাধনার মাঝে এই দুইটি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছে। (৩) ব্রহ্মচর্যের উপর এত জোর কেন, সে সম্পর্কে সামান্য কিছু বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। খাদ্য হইতে অন্নরস বা পাকস্থলীতে ভুক্তদ্রব্যনিঃসৃত শুক্লবর্ণ রসবিশেষ (Chyle), অন্নরস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে চর্বি, চর্বি হইতে হাড়, হাড় হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে বীর্য

ব্রহ্মচর্য ও সংযম

(২) অথর্ব, ১১।৫।১৯

(৩) খৃষ্টধর্মেও ব্রহ্মচর্যের স্থান উচ্চে। ২২১ পৃষ্ঠার পাদটীকা (১) দ্রষ্টব্য।

বা শুক্র পর পর উৎপন্ন হয়। দেহ-প্রাণের ধারক-পোষক এই সপ্ত ধাতু—অন্নরস, রক্ত, মাংস, চর্বি, হাড়, মজ্জা এবং বীর্য। সপ্তধাতুর আবার সারাংশ, বীর্য। কাজেই, বীর্যের মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশী। এই বীর্য সূক্ষ্ম জলীয় পদার্থরূপে জীবদেহের প্রতি অণুকোষে বিদ্যমান—প্রাণের প্রাণ। এই বীর্যের ক্ষয়-নিবারণই বীর্যধারণ—ব্রহ্মচর্য। হঠ-যোগের উদ্দেশ্য, দেহকে বজ্রের মত শক্ত করা। অযথা বীর্যক্ষয়ে তাহা কখনো সম্ভব হয় না। অতএব, হঠযোগীমাত্রের প্রথমে পালনীয় ব্রহ্মচর্য বা বীর্যধারণ। (৪) বীর্য সঞ্চিত হয় শুক্রগর্ভগ্রন্থিগুলিতে (Seminal Glands), নাভির ছয় ইঞ্চি নীচে; সেই স্থানকে যোগীর ষড়চক্রের ভাষায় বলা হয়, মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান। আসন-মুদ্রা-প্রাণায়াম-সাধনে এবং সংযমিত জীবন-যাপনে ঐ সঞ্চিত বীর্য ছড়াইয়া পড়ে দেহের সর্বত্র অণুকোষসমূহের ভিতর। শুধু তাহাই নহে। আসন-মুদ্রা-প্রাণায়ামে ঐ সঞ্চিত বীর্য ঊর্ধ্বগতি লাভ করে এবং মেরুপথে (Spinal column) উঠিয়া মস্তিষ্কের সম্মুখস্থ বৃহত্তর অংশে (Cerebrum) সংগৃহীত হইয়া ওজঃতে পরিণত হয়। মস্তিষ্কের এই অংশকে যোগীর ষড়চক্রের ভাষায় সহস্রার বা সহস্রদলপদ্ম বলা হয়। (৫) ওজঃ যাহার যত বেশী, ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তি তাহার তত বেশী।

---

(৪) তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন রক্ষ্যো বিন্দুর্হি যোগিনা।

—দত্তাত্রেয়-সংহিতা।

(৫) প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ্ Dr. Nicals ঠিক এই কথা অন্যভাবে তাঁহার ভাষায় বলিয়াছেন—

In a pure and orderly life this matter (অর্থাৎ বীর্য) is reabsorbed. It goes back into the circulation ready to form the finest brain-nerve and muscular tissues.

প্রতি মানুষের ভিতর আছে এক চৌম্বুক শক্তি (personal magnetism)। তাহার সাহায্যে এক মানুষ আকর্ষণ করে অপর মানুষকে নিজের দিকে। যাহার ওজঃ যত বেশী, তাহার এই আকর্ষণ-শক্তিও তত বেশী। সেই কারণ, সকল শক্তি-সাধনার মূলে ব্রহ্মচর্য-সাধন।

কালক্রমে হঠযোগের সাধন-প্রণালী বহুবিস্তৃত হইয়া জটিল হইয়া পড়ে। সমস্ত কাজ ছাড়িয়া নিজের ঘরে সারাদিন ইহা লইয়া থাকিলেও ফুরায় কিনা সন্দেহ। ইহা গৃহীর পক্ষে তো অসম্ভব বটেই, গৃহত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসীর পক্ষেও অসম্ভব। কেবলমাত্র দেহের শক্তিলাভের জন্য সারাজীবন এই ভাবে হঠযোগ-সাধনে কাটাইয়া দেওয়া কোনমতে সমীচীন হইতে পারে না। সেকালেও ঋষিগণ এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। হঠযোগের সাধনায় জীবাত্মা-পরমাত্মার সংযোগ হয় না। পরমাত্মা, অন্তরের অন্তরতম বস্তু। তাঁহাকে পাওয়ার পথে প্রধান বিঘ্ন, আমাদের উচ্ছৃঙ্খল মন ও চিত্তবৃত্তির উদ্দাম তরঙ্গ।

হঠযোগের শেষে রাজযোগের আরম্ভ

অতএব, পতঞ্জল-যাজ্ঞবল্ক্যাদি মহাযোগিগণ আবিষ্কার করেন এক নূতন সাধন-পথ, যাহাতে মন সংযমিত এবং চিত্ত-বৃত্তি নিরুদ্ধ হইতে পারে। তাঁহাদের এই নবাবিষ্কৃত সাধনপথের নাম, অষ্টাঙ্গযোগ বা রাজযোগ। হঠযোগের শেষ যেখানে, রাজযোগের আরম্ভ সেখানে। হঠযোগের আসন-মুদ্রাদি কয়েকটি প্রক্রিয়ার কিছু কিছু রাজযোগের প্রথম স্তরে গৃহীত হইয়াছে। সেই অর্থে হঠযোগকে রাজযোগের প্রাথমিক ধাপ বলা যাইতে পারে।

[দুই]

রাজযোগ

তৃতীয় অধ্যায়ে যোগদর্শনের আলোচনায় (১) রাজযোগসম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। এখানে বিশেষভাবে আরো কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—মনই মনুষ্যের বন্ধ-মোক্ষের কারণ; মন বিষয়াসক্ত হইলে মানুষ বদ্ধ হয়, আর নির্বিষয় হইলে মানুষ মুক্ত হয়। (২) এই নিমিত্ত রাজযোগ মনকে নির্বিষয় করিতে তৎপর। মন যেন অন্তর-রাজ্যের রাজা। সেই অন্তর-রাজ মনকে এই যোগ সুনিয়ন্ত্রিত করে বলিয়া ইহাকে রাজযোগ বলা হয়। শ্রুতি আরো বলিয়াছেন—স্বয়ম্ভু পরমেশ্বর ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্যদর্শীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তজ্জন্য জীব বাহ্য বস্তুই দেখিতে থাকে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। (৩) যতদিন মন বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বিষয়ভোগে রত, ততদিন আমরা বিশ্ব-ব্যাপী ও অন্তর্যামী পরমাত্মার প্রত্যক্ষানুভূতি তো দূরের কথা, তাঁহার অস্তিত্বসম্বন্ধেও সন্দেহ করি। অতএব, তাঁহার প্রত্যক্ষানুভূতির উদ্দেশ্যে প্রথমে প্রয়োজন, মনকে বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গণের

রাজযোগের অর্থ ও উদ্দেশ্য—ইহার অপর নাম, অষ্টাঙ্গযোগ

---

(১) ১০০—১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্॥—শাঃ উঃ, ১

(৩) পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ স্তস্মাৎ পরাঙ্‌ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
—কঃ উঃ, ২।১।১

প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া অন্তর্মুখী করা চিত্তবৃত্তি-নিরোধের দ্বারা। চিত্তের বিষয়াকার হওয়াকে চিত্তের বৃত্তি কহে। চিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রাজযোগের মতে, চিত্তবৃত্তিনিরোধই যোগ—যোগশ্চিত্ত-বৃত্তিনিরোধঃ। (৪) রাজযোগ এই চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায় সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন।

রাজযোগের আট অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি। এই কারণ, রাজযোগের অপর নাম—অষ্টাঙ্গযোগ। হঠযোগে আসন-মুদ্রাদি যেমন একরূপ শারীরিক ব্যায়াম, রাজযোগে তেমনি অষ্টাঙ্গ-সাধন একরূপ মানসিক ব্যায়াম। রাজযোগে অষ্টাঙ্গের মধ্যে যম-নিয়ম এই দুইটির স্থান সর্বপ্রথমে। যম-নিয়মের সাধনের দ্বারা নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়। নৈতিক চরিত্র গঠিত না হইলে, যোগী চিত্তবৃত্তিনিরোধের পথে অগ্রসর হইতে পারেন না। তাই, যম-নিয়ম-সাধন এই যোগ-সাধনার প্রথম কথা।

যম

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ—এইগুলি যম (৫) যম-সাধনের অর্থ, সংযম-পালন। পাঁচটি যম-সাধনের ভিতর পূর্বে পঞ্চম অধ্যায়ে অহিংসা এবং সত্য সম্পর্কে সদাচার প্রসঙ্গে (৬) কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে তাহাদের পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। পরদ্রব্য অপহরণ না করা—অস্তেয় বা অচৌর্য। যখন পরদ্রব্যগ্রহণের ইচ্ছাও মনে জাগে না, তখনি হয় অস্তেয়-সাধন। অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে, সমস্ত রত্ন

---

(৪) যোঃ সূঃ, ১।২

(৫) অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥—যোঃ সূঃ, ২।৩০

(৬) ২৪৩-২৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হয় ; (১) তাৎপর্য—এইরূপ ব্যক্তির কখনো ধনরত্নের অভাব হয় না। ব্রহ্মচর্যসম্বন্ধেও ইতিপূর্বে হঠযোগ-প্রসঙ্গে (২) কিছু বলা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, বীর্যলাভ হয়। (৩) মর্ম—ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির বিপুল শক্তিলাভ হয়। এই শক্তির মুখ্য অর্থ, ইচ্ছাশক্তি বা অধ্যাত্মশক্তি। দেহ-রক্ষার অতিরিক্ত ভোগসাধনের দ্রব্য কাহারো নিকট হইতে গ্রহণ না করা—অপরিগ্রহ। অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে, পূর্বজন্মের কথা স্মৃতিপথে উদিত হয়। (৪) পাতঞ্জল যোগসূত্রের মতে, এই পাঁচটি যম-সাধন স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকল কালে সকল দেশে সকল মানুষের আচরণীয়—এইগুলি সার্বভৌমিক মহাব্রত। (৫) ইহার তাৎপর্য—চিত্তবৃত্তি-নিরোধমূলক যৌগিক প্রক্রিয়া অধিকাংশের অসাধ্য, কিন্তু যম-নিয়মের সাধন মানুষমাত্রের কর্তব্য, নতুবা প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ হয় না।

নিয়ম

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান—এই পাঁচ ক্রিয়ার নাম, নিয়ম। (৬) নিয়মের অর্থ—বিধি-পালন। ইহাদের মধ্যে পূর্বে পঞ্চম অধ্যায়ে সদাচার-প্রসঙ্গে (৭) শৌচ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে,

(১) অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানং ॥ —যোঃ সূঃ, ২।৩৭

(২) ৩৩২-৩৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ ॥ —যোঃ সূঃ, ২।৩৮

(৪) অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ ॥ —যোঃ সূঃ, ২।৩৯

(৫) এতে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতং ॥ —যোঃ সূঃ, ২।৩১

(৬) শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ। —যোঃ সূঃ, ২।৩২

(৭) ২৪৮-২৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পুনরালোচনা অনাবশ্যক। প্রতিদিন যদৃচ্ছালাভে, অর্থাৎ যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাতে, মনে সন্তুষ্টিবোধ—সন্তোষ। মর্ম—তৃষ্ণা-কাঙ্খা-পরিত্যাগ। সন্তোষ সিদ্ধ হইলে অত্যুত্তম সুখ লাভ হয়। (১) বেদ-বিধান অনুসারে কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতোপবাসের দ্বারা শরীর শুদ্ধ করা—তপস্যা। তপস্যার ফলে শরীরের ও ইন্দ্রিয়বর্গের অশুদ্ধি ক্ষয় হয়; এই অশুদ্ধি ক্ষয় হইলে শরীরের ও ইন্দ্রিয়বর্গের কতকগুলি সিদ্ধি বা ক্ষমতা লাভ হয়। যেমন—সূক্ষ্মদর্শন, দূরশ্রবণ ইত্যাদি। প্রণব ও সূক্তমন্ত্রাদি অর্থচিন্তাপূর্বক জপ করা এবং বেদ-উপনিষদ্-গীতা প্রভৃতি মোক্ষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করা—স্বাধ্যায়। স্বাধ্যায়ের দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শনলাভ হয়। (২) শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত ঈশ্বরে চিত্ত-সমর্পণ করিয়া তাঁহার উপাসনা—ঈশ্বর-প্রণিধান। ঈশ্বর-প্রণিধানের দ্বারা লাভ হয় যোগ-সাধনার চরম ফল, সমাধি। (৩) এখানে প্রসঙ্গতঃ একটা কথা উল্লেখযোগ্য। কেহ কেহ মনে করেন যে, অষ্টাঙ্গযোগে ভক্তি-উপাসনাদির স্থান নাই। ইহা একটি ভ্রান্ত ধারণা। অষ্টাঙ্গযোগে স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান এই দুইটি নিয়ম-পালনের কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত। তাহার দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট যে, অষ্টাঙ্গযোগেও মন্ত্রজপাদির এবং ভগবদুপাসনার যথেষ্ট স্থান আছে। শুধু তাহাই নহে। পাতঞ্জল যোগসূত্র বলিতেছেন যে, যোগের শ্রেষ্ঠ

---

(১) সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ ॥—যোঃ সূঃ, ২।৪২

(২) স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ ॥—যোঃ সূঃ, ২।৪৪

(৩) সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ ॥—যোঃ সূঃ, ২।৪৫

সমাধি বিবিধ প্রকারের। ঈশ্বরের উপাসনায় ভক্তি-সাহায্যে সমাধি—ভাব-সমাধি। অষ্টাঙ্গযোগের ধারণা-ধ্যানাদির সাহায্যে সমাধি—ধ্যান-সমাধি। জ্ঞানযোগের শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির সাহায্যে সমাধি—জ্ঞান-সমাধি। এখানে ভাব-সমাধি বুঝিতে হইবে।

ফল যে সমাধি তাহাও ঈশ্বর-প্রণিধানের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে লাভ হয়। ইহা অল্প কথা নহে।

হঠযোগের আলোচনাকালে (৪) আসনসম্পর্কে কিছু কথিত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গযোগে স্থিরভাবে সুখে উপবেশনকে আসন কহে। (৫) এখানে আসনের অর্থ, উপবেশন; হঠযোগের বিবিধ প্রকার অঙ্গন্যাস নহে। স্থির-ভাবে মেরুদণ্ড সোজা এবং মস্তক-গ্রীবা-বক্ষস্থল ঋজুরেখায় রাখিয়া উপবেশন করিতে হইবে। এক আসনে দীর্ঘকাল, অর্থাৎ তিন চারি ঘণ্টা, বসার অভ্যাস চাই। এই কারণ, হঠযোগের কষ্টসাধ্য আসন-গুলি রাজযোগের উপযোগী নহে। হঠযোগের পদ্মাসন—সিদ্ধাসন—স্বস্তিকাসন এই তিনটি রাজযোগের পক্ষে প্রশস্ত। আসন-অভ্যাসে শীত-গ্রীষ্ম ক্ষুধা-তৃষ্ণা রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি কোন প্রকার দ্বন্দ্ব আর সাধকের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না—ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ। (৬)

আসন

শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি-নিয়ন্ত্রণ—প্রাণায়াম। (৭) সাধারণতঃ প্রাণায়াম ত্রিবিধ—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। বহিঃস্থ বায়ু আকর্ষণে দেহের ভিতর পূরণ করা—পূরক। জলপূর্ণ কুম্ভের মত দেহাভ্যন্তরে বায়ুকে ধারণ করা—কুম্ভক। ভিতরের এই ধৃত বায়ুকে বাহিরে নিঃসারণ করা—রেচক। প্রাণায়াম-সিদ্ধ হইলে, মোহাবরণের ক্ষয়ে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত

প্রাণায়াম

---

(৪) ৩৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫) স্থিরসুখমাসনম্ ॥—যোঃ সূঃ, ২।৪৬

(৬) যোঃ সূঃ, ২।৪৮

(৭) তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥

—যোঃ সূঃ, ২।

হয়। (১) মর্ম—স্বভাবতঃ চিত্ত সত্ত্বপ্রধান; কিন্তু ইহা রজঃ-তমঃ এই গুণদ্বয়ের দ্বারা আবৃত। প্রাণায়ামসাধনে রজঃ-তমঃ বিদূরিত হয় এবং জ্ঞান-স্বরূপ সত্ত্বগুণ প্রকাশিত হয়। আসন-প্রাণায়াম এই দুইটি অঙ্গ হঠযোগ হইতে রাজযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। এই দুইটির অভ্যাসে দেহস্থ স্নায়ুসমবায়ের ও জীবনীশক্তির ক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তাহার ফলে মনও হয় সুনিয়ন্ত্রিত।

ইন্দ্রিয়গণের আপন আপন গ্রহীতব্য বিষয় (২) পরিত্যাগে চিত্তের অনুগত হইয়া থাকা—প্রত্যাহার (৩)। ইন্দ্রিয়গণের সহিত মন সংযুক্ত হইলে তাহারা আপন আপন ভোগ্য বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, নচেৎ হয় না। প্রত্যাহারের তাৎপর্য, মনকে ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিযুক্ত করা। মন বিযুক্ত হইলে চক্ষু খোলা থাকিলেও বাহ্য বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না, কাণ খোলা থাকিলেও বাহ্য শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। মন যখন কোন চিন্তনীয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়, তখন সাধারণ জীবনেও অনেক সময় ঐরূপ অবস্থা ঘটে। প্রত্যাহার-সাধনার দ্বারা এই অবস্থা যোগীর ইচ্ছাধীন হয়। চিত্তবৃত্তিনিরোধের পক্ষে এই সাধনা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। প্রত্যাহার-সাধনায় ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয়।(৪) ইহাতে বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হয়। অষ্টাঙ্গযোগ-সাধনায় যম-

প্রত্যাহার

---

(১) ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্‌ ॥—যোঃ সূঃ, ২।৫২

(২) যথা—চক্ষুর বিষয়, রূপ : কর্ণের বিষয়, শব্দ ইত্যাদি। ৯৪ পৃষ্ঠায় পাদটীকা (১) দ্রষ্টব্য।

(৩) স্ববিষয়াসম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥
—যোঃ সূঃ, ২।৫৪

(৪) ততঃ পরমবশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্‌ ॥—যোঃ, সূঃ, ২।৫৫

নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম এই চারিটি হইল বাহ্য সাধনা। প্রত্যাহার, আন্তর সাধনার প্রবেশ-পথ ; তবে তাহাকে বাহ্য সাধনার পঞ্চম বা শেষ অঙ্গ বলা যাইতে পারে।

চিত্তকে দেশবিশেষে বন্ধন করিয়া রাখা—ধারণা। (৫) দেশ বিশেষে বন্ধনের অর্থ—নিজের দেহের ভিতর কোন কেন্দ্রে, অথবা দেহের বাহিরে কোন বস্তুতে, মনকে আবদ্ধ রাখা। দেহের প্রধান কেন্দ্র দুই—হৃদয় ও মস্তক। মস্তকের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র, ত্রিকূট বা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান। রাজযোগীর পক্ষে হৃদয় ও ত্রিকূট এই দুই কেন্দ্র প্রশস্ত। সাকার-উপাসকগণ বাহিরে কোন দেব-দেবীর চিত্রপটে এবং নিরাকার-উপাসকগণ ব্রহ্মপ্রতীক ওঁকারের চিত্রপটে মনকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন। ধারণার সাহায্যে মনকে দেহের ভিতর যে কেন্দ্রে কিছুক্ষণ আবদ্ধ রাখা যায়, সেখানে এক সক্রিয়শক্তি সংগৃহীত হয় এবং সেই শক্তি তদনুরূপ কাজ করে। হৃদয়ে ধারণায় সেই শক্তি দেয় শান্তি ও আনন্দ, আর মস্তকে ধারণায় জ্যোতিঃ ও জ্ঞান।

ধারণা

ধারণীয় পদার্থে ধারণার দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা—ধ্যান। (৬) সচরাচর ধারণীয় পদার্থে মন বেশীক্ষণ আবদ্ধ থাকে না, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। মনকে পুনঃ পুনঃ জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া সেই পদার্থে আবদ্ধ করিতে হয়। ইহা ধারণার অবস্থা। অভ্যাসের ফলে মন যখন সেই পদার্থে অপরিচ্ছিন্নভাবে কিছুক্ষণ আবদ্ধ হয়, তখন ধ্যানের অবস্থা। ধারণা যতই গাঢ় হয়, মন ততই অন্তরে প্রবেশ করে—তখনি হয় ধ্যানের আরম্ভ।

ধ্যান

(৫) দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥—যোঃ সূঃ, ৩।১

(৬) তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥—যোঃ সূঃ, ৩।২

ধ্যানের আরম্ভে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় এবং অন্তরে জাগে এক প্রশান্ত নিস্তব্ধতার ভাব। সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্ম ধ্যেয় বস্তু হইতে পারে। অতএব, সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ধ্যান দুই প্রকার। পরমাত্মার বা পরব্রহ্মের ধ্যান—নির্গুণ ধ্যান। সূর্য, গণপতি, বিষ্ণু, শিব এবং শিবা এই পঞ্চ দেবতার ধ্যান—সগুণ ধ্যান। ইহা ছাড়া, অনেকে ত্রিকূটে জ্যোতিঃ-ধ্যান করিয়া থাকেন। ত্রিকূটে জ্যোতিঃ-ধ্যানের কথা শ্রুতিও বলিয়াছেন। (১)

সমাধি—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত

ধ্যান গাঢ় হইলে সমাধি। সমাধির অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুর বাহ্য কোন রূপের বা গুণের অনুভূতি আর থাকে না, কেবলমাত্র থাকে সেই বস্তুর অর্থের আভাস, অর্থাৎ তাহার বিদ্যমানতার প্রকৃত অর্থ কি তাহাই যেন বিদ্যুতের মত ঝলসিয়া উঠে মনের মাঝে; (২) আর কোন বোধ থাকে না। ধারণা-ধ্যান-সমাধি এই তিনটিকে একত্র কহে সংযম। কেননা, অষ্ট অঙ্গের মধ্যে এই তিনটিই প্রকৃত পক্ষে মনকে সংযত করে; যম-নিয়মাদি পূর্ববর্তী অবশিষ্ট পাঁচ অঙ্গ এই সংযমের সোপানসদৃশ। বাহ্য ও আন্তর সকল পদার্থই ধ্যেয় বস্তু হইতে পারে। বাহ্য পদার্থ, স্থূল। আন্তর পদার্থ, সূক্ষ্ম। স্থূল পদার্থ হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম পদার্থের ধারণা-ধ্যান-সমাধি বা সংযম-সাধন করা যায়। সমাধির দুই স্তর—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। নিম্ন স্তরে সম্প্রজ্ঞাত এবং উচ্চ স্তরে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বস্তুর অর্থাভাস মাত্র হয়। রাজযোগের

---

(১) জাঃ উঃ, ২

(২) তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপ-শূন্যমিব সমাধিঃ ॥

—যোঃ সূঃ, ৩৷৩

মতে, সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা অবধি স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকার বস্তুই ধ্যেয় হইতে পারে এবং সেই অবস্থায় কতকগুলি সিদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে। স্থূল বস্তুর উপর সংযম-সাধনায়, ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের উপর আধিপত্যলাভ হয়। অন্তরে সূক্ষ্ম মনকে ধ্যেয় বস্তুরূপে সংযম-সাধন করিলে, যোগীর অন্তর্জগতের উপর আধিপত্যলাভ হয়—তখন নিজের মন এবং অপরের মন তাঁহার বশীভূত হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বাহ্য ও আন্তর জগতে এই সকল অলৌকিক ক্ষমতা লাভ হয় বটে, কিন্তু পরমাত্মার সাক্ষাৎকার অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মাঝে তখনো যেন এক অন্তরাল থাকিয়া যায়। তাহা সাধিত হয় সমাধির উচ্চ স্তরে—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে। অন্তর্দেশে একমাত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাত্মাকে ধ্যেয় বস্তু করিয়া, সেই বস্তুর উপর ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূপী সংযম-সাধনায় যে সমাধি হয়, তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া যান (৩)—ইহা নির্বাণমুক্তি। রাজযোগের মতে, সমাধির এই উচ্চ স্তর হইতেও চেতনা পুনরায় ধীরে ধীরে জীবনের সাধারণ স্তরে নামিয়া আসিতে পারে। চেতনার এইরূপ অবতরণের পর যোগী যেন এক নূতন মানুষ হইয়া যান। তখন তাঁহার না থাকে কামনা-বাসনা, না থাকে দুঃখ-ত্রাস; তখন তিনি জীবন্মুক্ত। তখন তিনি তাঁহার স্থূল দেহের অবসান না হওয়া পর্যন্ত, এই জগতে বিচরণ করেন লোক-কল্যাণের জন্য—মুমুক্ষুকে মুক্তিপথ দেখাইবার জন্য। এইরূপ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ জগতে দুর্লভ।

---

(৩) সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।

—যোঃ উঃ, ১০৭

[তিন]

জ্ঞানযোগ।

জ্ঞানের দ্বারা জীবাত্মা-পরমাত্মার সংযোগ—জ্ঞানযোগ। এখানে জ্ঞানের অর্থ, আত্মজ্ঞান। তাই, জ্ঞানযোগের অপর নাম—অধ্যাত্মযোগ। এই যোগের ভিত্তি বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ্। উপনিষদ্ বহু স্থলে বলিয়াছেন—আত্মানং বিদ্ধি, আত্মাকে উপলব্ধি কর। তাৎপর্য—তুমি যে বস্তুতঃ কে, তাহা প্রত্যক্ষভাবে জান। এই প্রত্যক্ষভাবে জানার নাম, আত্মজ্ঞান। এখানে আত্মা শব্দে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয় বুঝিতে হইবে। পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম উপাধি-পরিচ্ছিন্ন হইয়া প্রত্যেক জীবের আধারে জীবাত্মারূপে অধিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে, জীবাত্মা-পরমাত্মায় কোন ভেদ নাই, এই অদ্বৈতজ্ঞানই বেদান্তের সার। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞান বা পরাবিদ্যা। আত্মজ্ঞান বলিলে ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায়।

জ্ঞানযোগের অর্থ

আত্মজ্ঞানলাভ অতীব কঠিন। সাধকমাত্রেই এই জ্ঞানলাভের অধিকারী বা উপযুক্ত পাত্র হইতে পারে না। আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে হইলে, শাস্ত্রবিহিত ধর্মকর্ম ও উপাসনাদির সাহায্যে চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইতে হইবে। (৪)

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি, এবং মুমুক্ষুত্ব—এই চারিটি সাধন-চতুষ্টয়। (৫) একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য বা অবিনশ্বর এবং তদ্ব্যতীত সমস্ত পদার্থ অনিত্য বা বিনশ্বর—এই বিচারের নাম, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক। কর্মফলজনিত ঐহিক ও

আত্মজ্ঞানে অধিকার ও সাধনচতুষ্টয়

(৪) বেঃ সাঃ, ৬
(৫) বেঃ সাঃ, ১৫

পারলৌকিক সকল প্রকার সুখভোগে অনাসক্তি—ইহামুত্রফল-ভোগবিরাগ। শম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের বা মনের সংযম, দম অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণাদি বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের সংযম, উপরতি অর্থাৎ বিষয়ভোগ-বাসনার নিবৃত্তি, তিতিক্ষা অর্থাৎ শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, সমাধান অর্থাৎ শ্রবণ-মননাদিতে চিত্তের একাগ্রতা বা সমাহিতচিত্ততা এবং শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরুবাক্যে ও বেদান্তবাক্যে অবিচলিত আস্থা—এই ছয় গুণের নাম, ষট্‌সম্পত্তি। মুক্তিলাভের তীব্র ইচ্ছা—মুমুক্ষুত্ব। যে সাধক এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন, তিনিই যথার্থ আত্মজ্ঞানের বা ব্রহ্ম-জ্ঞানের অধিকারী। (১)

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হওয়ার পর আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়া, সাধককে আত্মজ্ঞানলাভার্থে যথাক্রমে তিনটি সাধনার সোপান অতিক্রমপূর্বক উপরে উঠিতে হইবে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—এই তিন সোপান। শ্রুতি বলেন—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যা-সিতব্যঃ। (২) অর্থ—আত্মার দর্শনার্থে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কর্তব্য। প্রথমে শ্রবণ, তারপর মনন, তারপর নিদিধ্যাসন। আচার্য শঙ্কর বলেন—শ্রবণ

জ্ঞানযোগের তিন সোপান—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন

(১) সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হওয়া গৃহস্থাশ্রমে অসম্ভব। তথাচ, যদি কোন গৃহী বেদান্ত-শাস্ত্রাদিপাঠে আত্ম-অনাত্ম-বিচার করেন, তাহাতে তাঁহার কোনরূপ প্রত্যবায় নাই, বরং তাহাতে তাঁহার অতীব মঙ্গল হয়। ভাষ্যকার ইহা বলিয়াছেন—সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্য-ভাবেঽপি গৃহস্থানামাত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মাণে সতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি, কিন্ত্বতীব শ্রেয়োভবতি।

(২) বৃঃ উঃ, ২।৪।৫

অপেক্ষা মনন শতগুণ এবং মনন অপেক্ষা নিদিধ্যাসন লক্ষগুণ উত্তম ; নিদিধ্যাসনের শেষ নির্বিকল্প সমাধির ফল অনন্ত। (৩)

শ্রবণ—গুরুর নিকট বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যাশ্রবণ। এই শ্রবণ অর্থে শুধু কাণে শোনা নয়। ইহার অর্থ—এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য, এই অবধারণ বা স্থিরীকরণ। (৪) এইরূপ অবধারণ না জন্মিলে শ্রবণ ব্যর্থ।

মনন—যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর কথা শ্রবণ করা হইয়াছে, বেদান্ত-সম্মত অনুকূল যুক্তিপ্রবাহের সাহায্যে অনবরত তাহার চিন্তা। (৫) পরব্রহ্মই পরমাত্মা। তিনি সর্বব্যাপক, সকল ভূতে অধিষ্ঠিত। তিনি আমাদের অন্তরে আছেন সত্য, কিন্তু আমাদের এই জড় দেহ-মন-বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র। যথার্থ আমি বলিতে সেই অন্তর্নিহিত পরমাত্মাকে বুঝায়। সাধারণতঃ, মানুষ দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ; জড় দেহটাকেই সে আমি জ্ঞান করে। এই জ্ঞান ভ্রান্ত—বেদান্তবিরুদ্ধ। এই দেহ আমার বটে, কিন্তু আমি এই দেহ নহি। এই বাড়ী আমার বটে অর্থাৎ আমার দখলে, কিন্তু আমি আর আমার এই বাড়ী এক পদার্থ নহে। আমা হইতে আমার এই বাড়ী পৃথক্। ঠিক সেইরকম, এই স্থূল দেহ

---

(৩) শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যান্মননং মননাদপি।
নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনন্তং নির্বিকল্পকম্ ॥

—বিঃ চূঃ, ৩৬৪

(৪) শ্রবণং নাম ষড়্‌বিধলিঙ্গৈরশেষবেদান্তানামদ্বিতীয়বস্তুনি তাৎপর্যাবধারণম্ ॥

—বেঃ সাঃ, ১৮২

গুরুর সাহায্য না পাইলে, স্বয়ং বেদান্তশাস্ত্রপাঠে যদি এই অবধারণ জন্মে, তাহাও শ্রবণ বলিয়া গণ্য।

(৫) মননং তু শ্রুতস্যাদ্বিতীয়বস্তুনো বেদান্তানুগুণযুক্তিভিরনবরতমনুচিন্তনম্ ॥

—বেঃ সাঃ, ১৯১

আমার বটে অর্থাৎ আমার দখলে, কিন্তু আমি আর আমার এই স্থূল দেহ এক পদার্থ নহে। এই দেহ আমা হইতে পৃথক্। যেমন বাড়ীর ভাঙ্গন-গঠনের সঙ্গে আমার ভাঙ্গন-গঠন হয় না, তেমনি এই স্থূল দেহের ক্ষয়-বৃদ্ধির সঙ্গে আমার ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় না। তারপর, আমি যে আমার মন, তাহাও নহে। সুষুপ্তিতে বা গাঢ় নিদ্রায় মনও থাকে না এবং মনের কোন বৃত্তিও থাকে না। যদি আমি ও আমার মন বস্তুতঃ এক পদার্থ হইত, তবে সুষুপ্তিকালে মনের লয়ের সঙ্গে আমিত্বেরও লয় হইত। কিন্তু তাহা হয় না। সুষুপ্তিতেও আমিত্ব থাকে। সুষুপ্তির পর পুনরায় জাগিয়া উঠিয়া আমি বলি যে, আমি সুষুপ্তিমগ্ন হইয়াছিলাম। সুষুপ্তিকালে আমিত্বের লয় ঘটিলে, পুনর্জাগরণে কখনো এই বোধ আমার আসিত না যে, আমি সুষুপ্তিমগ্ন ছিলাম। সুষুপ্তিতে যখন মনের লয় হয়, তখন জাগ্রত থাকে সাক্ষী-চৈতন্যস্বরূপ এক বস্তু—সেই বস্তুই আমি। অতএব, এই আমি মন হইতে স্বতন্ত্র। তারপর, আমি যে আমার বুদ্ধি, তাহাও নহে। বুদ্ধি মনকে পরিচালিত করে সত্য, কিন্তু আমি আর আমার বুদ্ধি এক পদার্থ নহে। এমন ব্যাধি আছে যাহার আক্রমণে দুই দশ বৎসরও মানুষের বুদ্ধি-চিহ্ন থাকে না। যদি আমি ও আমার বুদ্ধি এক পদার্থ হইত, তবে ঐ বুদ্ধিলোপকালে বুদ্ধির সঙ্গে আমিত্বেরও লোপ হইত। কিন্তু তাহা হয় না। ব্যাধির উপশমে আবার বুদ্ধি ফিরিয়া আসিলে আমি বলি যে, এতকাল আমি বুদ্ধিলুপ্ত হইয়াছিলাম—মূর্ছিত ব্যক্তি মূর্ছাভঙ্গের পর যেমন বলে, আমি এতক্ষণ মূর্ছিত হইয়াছিলাম। বুদ্ধিলোপকালে নিশ্চয়ই সাক্ষী-চৈতন্যস্বরূপ স্বতন্ত্র আমি জাগ্রত থাকে। অতএব, বুদ্ধি ও আমি এক পদার্থ নহে। যিনি দেহ-মন-বুদ্ধির পরিচালক, যিনি সুখ-দুঃখের

ভোক্তা ও সকল কর্মের কর্তা, তিনিই স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ এই তিন শরীরে জীবাত্মারূপী আমি। এই তিন শরীর জড় পদার্থ, আর তাহাদের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মারূপী আমি চেতন পদার্থ। জড় ও চেতন, এই দুই পদার্থ কখনো এক হইতে পারে না। জীবাত্মারও উপরে যিনি, তিনি কেবল সাক্ষী-চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিত এবং তিনি পরমাত্মা। এই পরমাত্মাই আসল আমি। এই পরমাত্মা বা আসল আমি সুখ-দুঃখ-ভোগ করেন না, কিংবা শুভাশুভ কোন কর্মও করেন না। প্রকৃতির সৃষ্ট এই বিশ্বরঙ্গমঞ্চে তিনি শুধু দ্রষ্টার ন্যায় অভিনয় দেখিয়া যাইতেছেন। এই পরমাত্মা এক ও অনন্ত, সকল জীবের হৃদয়-গুহায় অবস্থিত। তিনি পরব্রহ্ম। এইভাবে অনবরত বেদান্তসম্মত চিন্তা-প্রবাহকে মনন কহে। এখানে মননের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেখান হইল। অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর বিষয় কেবল শ্রবণ করিলেই চিত্তে তাহা গাঢ় হয় না, তাই চাই শ্রবণের পর মনন। শ্রবণ-মননের সাহায্যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহা পরোক্ষ জ্ঞান। পশ্চাৎ নিদিধ্যাসনের সাহায্যে এই পরোক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পর্যবসিত হয়।

নিদিধ্যাসন—বিরোধী দেহাদি জড়বস্তুবিষয়ক প্রত্যয় প্রত্যাখ্যান-পূর্বক যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু সম্বন্ধে শ্রবণ ও মনন করা হইয়াছে, তাহাতে অবিরোধী ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যয়ের প্রবাহীকরণ—নিদিধ্যাসন। (১) এই নিদিধ্যাসনের অর্থ, যোগ (২)। সেই নিমিত্ত

---

(১) বিজাতীয়দেহাদিপ্রত্যয়রহিতাদ্বিতীয়বস্তুসজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহো নিদিধ্যাসনম্ ॥
—বেঃ সাঃ, ১৯২

(২) কৃষ্ণযজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়স্বরূপ আসন-প্রাণায়াম-ধ্যানাদিমূলক যোগ-সাধনা উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব, যোগ-সাধনা বেদ-প্রতিপাদিত।

নিদিধ্যাসনের ভিতর অষ্টাঙ্গযোগ-সাধনার কথা। রাজযোগে যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার এই পাঁচ অঙ্গের যে ব্যাখ্যা, নিদিধ্যাসনেও তাহাদের সেই ব্যাখ্যা। রাজযোগে ধারণা-ধ্যান-সমাধি এই তিনটির যে ব্যাখ্যা, নিদিধ্যাসনে ঠিক তাহা নয়। রাজযোগে এই তিনটির ব্যাখ্যা কিছু ব্যাপক। নিদিধ্যাসনে এইগুলিকে কিছু সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে। রাজযোগে ধারণা-ধ্যান-সমাধির বস্তু, বাহ্য স্থূল পদার্থ এবং আন্তর সূক্ষ্ম পদার্থ উভয়বিধ। নিদিধ্যাসনে তাহা নয়। এখানে এক সূক্ষ্ম অদ্বিতীয় ব্রহ্মই শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের বিষয়। অতএব, ধারণা-ধ্যান-সমাধির বস্তু একমাত্র তিনিই—কোন বাহ্য স্থূল জড় পদার্থ হইতে পারে না। নিদিধ্যাসনে সমস্ত স্থূল জড় পদার্থের প্রত্যয়কে চিত্ত হইতে বিদূরিত করিয়া একমাত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্মের বিষয়ে প্রত্যয়-প্রবাহ চালাইতে হইবে। পাতঞ্জল যোগসূত্রে বিভূতিকামী যোগিগণের জন্য কতকগুলি বিভূতি বা সিদ্ধি-লাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে, নিদিধ্যাসনের যোগে সেই সকল সিদ্ধিলাভের কথা আদৌ নাই। নিদিধ্যাসনে এক কথা—প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভ। এ ক্ষেত্রেও রাজযোগের সহিত নিদিধ্যাসনের বিভিন্নতা। নিদিধ্যাসনে ধারণা ও ধ্যানের পর অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থে চিত্তের অবস্থান—সমাধি। অর্থ—পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ। সমাধি দ্বিবিধ—সবিকল্পক এবং নির্বিকল্পক। সবিকল্পক সমাধিতে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ হইলেও, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এই বিকল্পত্রয়ের নাশ হয় না। তখনো জীবাত্মা জ্ঞাতা, পরমাত্মা জ্ঞেয়, এবং পরমাত্মাসম্বন্ধে জীবাত্মার প্রত্যয় বা জ্ঞান এই তিনটির পার্থক্য-বোধ বর্তমান থাকে। নির্বিকল্পক সমাধিতে এই বিকল্পত্রয়ের নাশ হয়, অর্থাৎ এই তিনটির পার্থক্য-বোধ আর থাকে না। লবণ জলে

মিশ্রিত করিলে জলের সহিত একীভূত হইয়া যায়, তখন লবণত্বের পৃথক্ জ্ঞানের অভাবে জলমাত্রই জ্ঞান হয়। সেইরূপ নির্বিকল্পক সমাধিতে জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া যাওয়ায় জীবাত্মার পৃথক্ জ্ঞান আর থাকে না, থাকে একমাত্র পরমাত্মার বা ব্রহ্মের জ্ঞান। ইহাই ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। রাজযোগে সবিকল্পক সমাধিকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং নির্বিকল্পক সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হইয়াছে। নির্বিকল্পক সমাধি—নির্বাণমুক্তি। রাজ-যোগের ন্যায় জ্ঞানযোগও স্বীকার করেন যে, জীবাত্মা নির্বিকল্পক সমাধির পর নামিয়া আসিয়া জ্ঞানযোগীর স্থূলদেহের অবসান না হওয়া পর্যন্ত লোককল্যাণের জন্য সেই দেহে জীবন্মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করিতে পারেন।

জ্ঞানযোগে ভক্তি-উপাসনার স্থান আদৌ নাই—এই ধারণা ভুল। জ্ঞানযোগের অধিষ্ঠান, উপনিষদ্। সেই উপনিষদ্ স্বয়ং বলিতেছেন যে, তাঁহারই নিকট উপনিষদে উপদিষ্ট বিষয় অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশিত হয় যাঁহার পরমেশ্বরে পরাভক্তি আছে এবং সেই রকম ভক্তি আছে গুরুতে—যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। (১)

জ্ঞানযোগে ভক্তি ও উপাসনার স্থান

নিদিধ্যাসনে অষ্টাঙ্গ-সাধনার ভিতর নিয়মানুষ্ঠান বা বিধিপালন এক অঙ্গ। পঞ্চ নিয়মানুষ্ঠানের ভিতর স্বাধ্যায় বা মন্ত্রজপাদি এবং ঈশ্বর-প্রণিধান এই দুইটি নিয়ম পালনীয়। এই দুই নিয়ম-পালনের তাৎপর্য, ভক্তির আশ্রয়ে শ্রীভগবানের উপাসনা করা। সগুণ ব্রহ্মই শ্রীভগবান। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক ওঁকারের উপাসনা করেন। সগুণ ব্রহ্মের উপাসক স্রষ্টা-পাতা-সংহর্তা পরমেশ্বরের যে কোন প্রতীকের উপাসনা করেন।

(১) শ্বেঃ উঃ, ৬।২৩

শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগী ও কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীশঙ্করাচার্য স্বয়ং বলিয়াছেন—মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী, মোক্ষলাভের উপায়সমূহের মধ্যে ভক্তি সর্বাপেক্ষা বড়। (২) এই ভক্তি পরাভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি। তিনি এখানে বলিয়াছেন—স্বরূপানুসন্ধানং ভক্তি, স্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তি। ইহা জ্ঞানের অন্তর্গত। দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া কামনাহীন চিত্তে অন্তর্যামী পরমাত্মার বা স্বরূপের অর্থাৎ ভগবৎ-সত্তার অনুসন্ধান। ইহাই পরাভক্তির লক্ষণ।

[চার]

ভক্তিযোগ

ভক্তিযোগের অর্থ ও ভক্তির সংজ্ঞা

ভক্তির বা ভগবৎ-প্রেমের দ্বারা পরমাত্মার বা শ্রীভগবানের (৩) সহিত জীবাত্মার সংযোগ—ভক্তিযোগ। শ্রুতি বলিয়াছেন—শ্রীভগবান প্রেমস্বরূপ; সেই ভগবৎ-প্রেমের মাধুর্য যিনি আস্বাদন করেন, তিনিই জীবনে চিরস্থায়ী সুখ লাভ করেন। (৪) সেই ভগবৎ-প্রেমের বা ভক্তির সংজ্ঞা—সা পরানুরক্তিরীশ্বরে, ঈশ্বরে পরমা অনুরক্তি বা প্রীতি। (৫) সেই পরমা প্রীতি যে কি প্রকার, তাহা বিষ্ণুপুরাণে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের উক্তিতে সুপ্রকাশিত। প্রহ্লাদের উক্তি—অজ্ঞ ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় প্রীতি, সেইরূপ

(২) বিঃ চূঃ, ৩১

(৩) যোগীর যিনি পরমাত্মা, ভক্তের তিনি ভগবান।

(৪) রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।—তৈঃ উঃ, ২।৭

(৫) শাণ্ডিল্যসূত্র, ১।১।২

প্রীতি তোমার প্রতি তোমাকে স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে যেন কখনো দূর না হয়। (৬) প্রহ্লাদ শ্রীবিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহা হইতে এই বুঝা যায় যে, বিষয়ী লোকের স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-ধন-সম্পত্তির প্রতি যে প্রগাঢ় প্রীতি, সেই প্রীতি যখন সাধকের হৃদয়ে নিরন্তর জাগে শ্রীভগবানের প্রতি, তখনি তাহার লাভ হয় যথার্থ ভগবৎ-প্রেম বা ভক্তি।

শ্রীরামানুজাচার্যের মতে, উক্ত প্রকার ভক্তিলাভের জন্য সপ্তাঙ্গ-সাধন কর্তব্য। সপ্তাঙ্গ—বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ এবং অনুদ্ধর্ষ।

সপ্তাঙ্গ ভক্তি-সাধন

বিবেক—খাদ্যাখাদ্যের বিচার। সচরাচর, খাদ্যের দোষ ত্রিবিধ—জাতিদোষ, আশ্রয়দোষ ও নিমিত্তদোষ। জাতিদোষ, অর্থাৎ খাদ্য-বিশেষেরপ্রকৃতিগত দোষ; যেমন, মদ-মাংসাদি খাদ্যের প্রকৃতিগত দোষ হইল উন্মাদনা-উত্তেজনার সৃষ্টি, অতএব এই জাতীয় খাদ্য পরিত্যাজ্য। আশ্রয়দোষ, অর্থাৎ যে ব্যক্তির নিকট হইতে খাদ্য আসে তাহার দোষে খাদ্যে যে দোষ উপস্থিত হয়; তাৎপর্য—প্রত্যেক ব্যক্তির চতুর্দিকে সূক্ষ্ম পরমাণুমণ্ডলী সর্বদা ঘুরিতেছে, যে ব্যক্তি যে খাদ্য স্পর্শ করে সেই খাদ্যের ভিতর ঐ সূক্ষ্ম পরমাণুমণ্ডলীর মাধ্যমে তাহার সূক্ষ্ম শরীরের বা মনের প্রভাব প্রবেশ করে, কাজেই অসদ্ভাবাপন্ন ব্যক্তির স্পর্শে খাদ্যও তদ্ভাবদুষ্ট হয়। নিমিত্তদোষ, অর্থাৎ খাদ্যে ধূলি ইত্যাদি ময়লার সংস্পর্শ। খাদ্যের এই ত্রিবিধ দোষ বর্জনীয়। আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি, আহারশুদ্ধিতে মনের শুদ্ধি।

---

(৬) যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ১।২০।১৯

বিমোক—বাসনার দাসত্ব-মোচন। ভগবৎ-প্রেম লাভ করিতে হইলে, সকল প্রকার প্রবল বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। একমাত্র ঈশ্বরের কামনা ছাড়া আর কোন কামনা থাকিবে না।

অভ্যাস—তৈলধারার ন্যায় অবিশ্রান্ত ঈশ্বরচিন্তা। ইহা অতীব সুকঠিন। তবে অভ্যাসের দ্বারা ইহা সুসাধ্য হয়। কথায় বলে, অমৃতেও অরুচি আসে নিত্য সেবনে। একই ব্যঞ্জন যতই তৃপ্তিকর হোক না কেন, প্রত্যহ গ্রহণ করিলে অরুচি জন্মে। সেইরূপ একই প্রকারে ঈশ্বরচিন্তায় বিতৃষ্ণা আসে। তাহা নিবারণের অভিপ্রায়ে ভক্তি-সাধনায় ঈশ্বরচিন্তার বিবিধ প্রকার কথিত। যথা—মন্ত্রজপ, নাম-সংকীর্তন, ভজনসঙ্গীত, ভক্তিগ্রন্থপাঠ ইত্যাদি। এইরূপে নানাভাবে ঈশ্বরচিন্তায় মনের আগ্রহ জাগরূক থাকে।

ক্রিয়া—পঞ্চ মহাযজ্ঞ। ব্রহ্মযজ্ঞ, অর্থাৎ স্বাধ্যায়। দেবযজ্ঞ, অর্থাৎ ঈশ্বরের, কিংবা দেবতার, কিংবা অবতারের, কিংবা সাধুগণের পূজা। পিতৃযজ্ঞ, অর্থাৎ পূর্বপুরুষগণের প্রতি পিতৃতর্পণাদি কর্তব্যসাধন। নৃযজ্ঞ, অর্থাৎ মনুষ্যজাতির প্রতি কর্তব্যসাধন। ভূতযজ্ঞ, অর্থাৎ পশুপক্ষীর প্রতি কর্তব্যসাধন।

কল্যাণ—পবিত্রতা। সত্য, আর্জব বা অকপট ভাব, দয়া, অহিংসা, দান এবং অনভিধ্যা বা পরের দ্রব্যে লোভ-পরিত্যাগ—এই কয়টির আচরণই পবিত্রতা-সাধন।

অনবসাদ—সন্তোষ।

অনুদ্ধর্ষ—অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদের বর্জন। অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদকে উদ্ধর্ষ বলে। উদ্ধর্ষের ফলে মনের উপর অশুভ প্রতিক্রিয়া হয়। সেই কারণে ইহা বর্জনীয়।

ভক্তির দুই সোপান—তীব্র ব্যাকুলতা এবং শরণাগতি। প্রথমে

চাই শ্রীভগবানকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ তাঁহার প্রত্যক্ষানুভূতির উদ্দেশ্যে অন্তরে তীব্র ব্যাকুলতা। শ্রীভগবান আছেন, এই বিশ্বাস গাঢ়ভাবে অন্তরে না দেখা দিলে, তাঁহাকে পাইতে কিছুমাত্র ব্যাকুলতা আসে না—তীব্র ব্যাকুলতা তো দূরের কথা। তাই, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিচলিত বিশ্বাসই আদি কথা। মুখে বলি তিনি আছেন, কিন্তু অন্তরে যথার্থ বিশ্বাস নাই—এই অবস্থায় তাঁহাকে পাইতে প্রকৃত ব্যাকুলতা কখনো আসিতে পারে না। তারপর চাই, শরণাগতি—শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ। অর্থাৎ—তাঁহার চরণে দেহ-মন-প্রাণ-বুদ্ধি-অহঙ্কার সব নিবেদন। যেমন, ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ শ্রীবিষ্ণুর চরণে সম্পূর্ণ আত্মদান করিয়াছিলেন। এইরূপ শরণাগতিতে শ্রীভগবানের কৃপা-লাভ হয় এবং তখন তাঁহাকে জানা ও পাওয়া যায়।

ভক্তির সোপান

ভক্তি সাধনায় নিম্ন ও উচ্চ এই দুই স্তর। এই দুই স্তরকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় যে, ভক্তি দ্বিবিধ। নিম্ন স্তরে গৌণী বা বৈধী ভক্তি; উচ্চ স্তরে মুখ্যা বা পরাভক্তি। গৌণী ভক্তিতে দেহাত্মবুদ্ধি থাকিয়া যায়, তাই ইহা মলিনা ভক্তি; আর পরাভক্তিতে দেহাত্মবুদ্ধির নাশ হয়, তাই ইহা শুদ্ধা ভক্তি।

ভক্তি দ্বিবিধ—গৌণী ও পরাভক্তি

গৌণীভক্তি—প্রাথমিক ভক্তি-সাধনা। স্থূলসহায়ে সূক্ষ্ম ধারণার চেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে, সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর দেশ-কালের অতীত এবং নাম-রূপের অতীত। তিনি জড় নহেন—শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্যরূপে তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। সাধারণতঃ, মানুষের সেই শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুর ধারণা হয় না। অনেক সময় বালকদের স্থূল অবলম্বনে শিক্ষা দিতে হয়, পশ্চাৎ তাহাদের সূক্ষ্মের ধারণাশক্তি

জন্মে। সেইরূপ শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষানুভূতির পথে প্রথমে স্থূল অবলম্বনে আমাদের অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। তাঁহার প্রতীক-প্রতিমা-পট ইত্যাদি স্থূল অবলম্বন। মন্ত্র, স্তবস্তুতি, কাঁসর ঘণ্টা, বাহ্য পূজা প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ প্রথমে প্রয়োজন। এই সকল বাহ্য অনুষ্ঠান, গৌণীভক্তি বা বৈধীভক্তি। ইহার সাহায্যে সাধকের চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় এবং ক্রমশঃ তিনি সূক্ষ্ম-সাধনার পথে উপরে উঠিতে থাকেন। গৌণীভক্তির সাধনায় যখন চিত্ত একেবারে পরিশুদ্ধ হইয়া যায়, যখন চিত্তে রাগ-দ্বেষাদি মল আদৌ থাকে না এবং দেহাত্মবুদ্ধিও থাকে না তখন অন্তরে উদয় হয় পরাভক্তি বা ভগবৎ-প্রেম। এই হেতু কেহ কেহ বলেন, গৌণীভক্তি পরাভক্তির অঙ্গস্বরূপ। গৌণী-ভক্তি-সাধনার প্রধান কথা—ইষ্ট ও ইষ্ট-নিষ্ঠা। সাধকের রুচি-প্রকৃতি-সামর্থ্যের উপযোগী গুরু-নির্দিষ্ট শ্রীভগবানের কোন বিশিষ্ট স্থূল নাম-রূপ—ইষ্ট বা অভীষ্টদাতা। কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের সেই বিশিষ্ট নাম-রূপের ভজন-পূজন-উপাসনা—ইষ্ট-নিষ্ঠা। ইষ্ট-নিষ্ঠায় সাধকের ইষ্টদর্শন হয়। ইষ্টদর্শনই অভীষ্টসিদ্ধি; প্রত্যেক ইষ্ট-দেবতার এক এক শাস্ত্র-বিহীত মন্ত্র আছে—ইষ্টমন্ত্র। সেই মন্ত্রের সাহায্যে সেই দেবতার মনন করিতে হয়। বৈষ্ণবের ইষ্ট-দেবতা—শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্র অথবা শ্রীকৃষ্ণ। শাক্তের ইষ্ট-দেবতা—দেবী বা শ্রীভগবতী। শৈবের ইষ্ট-দেবতা—শিব। বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে, পঞ্চভাবের একটি ভাবে ইষ্ট-দেবতার সহিত প্রথমে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। এইরূপ সম্বন্ধস্থাপনে গৌণী-ভক্তির সাধনা সহজ হয়। (১) পঞ্চভাব—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য। স্থির চিত্তে বিষয়বিমুখ হইয়া ইষ্টের চরণে আত্মনিবেদন,

(১) এইরূপ সম্বন্ধস্থাপনকে বৈষ্ণবশাস্ত্রে রাগানুগাভক্তি কহে।

শান্তভাব; যেমন ধ্রুব ও প্রহ্লাদের। পিতামাতার প্রতি পুত্রকন্যার যে আত্মনিবেদনের ভাব, তাহা শান্ত। শান্তভাবে চিত্তের মাঝে কোন তরঙ্গ উত্থিত হয় না। ধ্রুব ও প্রহ্লাদ শ্রীভগবানকে পিতৃরূপে দেখিয়া শিশুর ন্যায় তাঁহার কোলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমি দাস এবং ইষ্টদেবতা আমার প্রভু, ইহা দাস্যভাব; যেমন মহাবীর হনুমানের। হনুমান শ্রীরামচন্দ্রকে প্রভু বলিয়া দেখিতেন। ইষ্ট-দেবতা আমার সখা, ইহা সখ্যভাব; যেমন অর্জুনের। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সখা বলিয়া দেখিতেন। ইষ্ট-দেবতা আমার পুত্র, ইহা বাৎসল্যভাব; যেমন কৌশল্যার ও যশোদার। কৌশল্যা শ্রীরামচন্দ্রকে এবং যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে পুত্র বলিয়া দেখিতেন। ইষ্ট-দেবতা আমার পতি, ইহা মাধুর্যভাব; যেমন বৃন্দাবনের গোপীগণের এবং পরবর্তীকালে মীরাবাঈয়ের। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পতি বলিয়া দেখিতেন। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সচরাচর কামকলুষিত দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট মানব মাধুর্যভাবকে স্ত্রীপুরুষের যৌন সম্বন্ধ মনে করে। ইহা তাহা নহে। ইহা আত্মার সহিত আত্মার মিলন। ইহাতে দেহ-বুদ্ধি বা দেহসম্বন্ধ আদৌ নাই। গোপীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার আত্মিক সম্বন্ধ ছিল। এই পঞ্চভাবের ভিতর ভক্তির গাঢ়তার ক্রমাধিক্য সুস্পষ্ট। শান্তভাব অপেক্ষা দাস্যভাব গাঢ়, দাস্য অপেক্ষা সখ্য আরো গাঢ়, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্য আরো গাঢ়, এবং বাৎসল্য অপেক্ষা মাধুর্য আরো গাঢ়। এই পঞ্চভাব বৈষ্ণবগণের সাধনীয়। শাক্তগণ শ্রীভগবতীকে মাতৃভাবে দর্শন করেন।

পরাভক্তি—ভগবৎ-প্রেম। বৈধীভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে সাধক সাধনার নিম্ন স্তর হইতে ক্রমশঃ উচ্চ স্তরে উঠিতে থাকেন, তাঁহার মন স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে ধাবিত হয়। দীর্ঘকাল অনুষ্ঠানের

শেষে শেষে তিনি যে ভূমিতে আরোহণ করেন, সেখানে ইষ্টের স্থূল নাম-রূপ প্রতীক-প্রতিমা-পট কাঁসর-ঘণ্টা-পূজা এ সব যেন অন্তর্হিত হইয়া যায়। এ-সবের আর কোন আবশ্যকতা তাঁহার নিকট থাকে না। সেই দেশকালাতীত, নামরূপাতীত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, শুদ্ধচৈতন্যময় পরমেশ্বরকে তিনি দিব্য-নয়নে দেখিতে পান তাঁহার অন্তরে-বাহিরে উপরে-নীচে সর্বত্র সর্বপদার্থে সর্বক্ষণ। তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি, তাঁহার দীপ্তিতে নিখিল জগৎ দীপ্তিমান (১)—এই মহান্ সত্যের যথার্থ উপলব্ধি তখন সাধকের হয়। সর্প-ব্যাঘ্রাদি হিংসাশীল জীবের মধ্যেও তিনি দেখেন শ্রীভগবানকে। ভক্তের পরাভক্তির উদয়ে শ্রীভগবান যেন আকর্ষিত হইয়া সেই ভক্তকে বিশ্বরূপে দেখা দেন। যে আকর্ষণী শক্তিতে ভক্ত-ভগবানের এই মিলন সংঘটিত হয়, তাহাই প্রেম—ভগবৎ-প্রেম। ইহা পরাভক্তির অপর নাম। কি জড়, কি চেতন, সর্বত্র এক আকর্ষণী শক্তি আছে—ইহা আধুনিক বিজ্ঞানের কথা। জড় জগতে সেই আকর্ষণী শক্তি মাধ্যাকর্ষণ, আণবিক আকর্ষণ (molecular attraction), রাসায়নিক সংশক্তি (chemical affinity) ইত্যাদি নামে খ্যাত। অন্তর্জগতে এই আকর্ষণী শক্তিই প্রেম নামে অভিহিত। ইহা জড় দেহের প্রতি জড় দেহের আকর্ষণ নহে—আত্মার প্রতি আত্মার আকর্ষণ। শ্রেষ্ঠ প্রেম—ভগবৎ-প্রেম। ভক্তি-সাধনার নিম্ন স্তরে বৈধীভক্তির অনুষ্ঠানকে ভগবৎ-প্রেম বলা যায় না। এই সাধনার উচ্চ স্তরে পরাভক্তিকেই ভগবৎ-প্রেম বলা যায়। এই প্রেমের দ্বারাই আকর্ষিত হইয়া পরম প্রেমাস্পদ শ্রীভগবান প্রেমিক ভক্তের কাছে উপস্থিত হন, ভক্তের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া দেন। ইহাই যোগীর ভাষায় জীবাত্মা ও

(১) কঃ উঃ, ২।২।১৫

পরমাত্মার সংযোগ বা মিলন। জীবাত্মা-পরমাত্মার এই মিলন, ঠিক নির্বাণমুক্তি নহে। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হন না। জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। ইহা সাযুজ্যমুক্তি। পরাভক্তিতে অন্তরে বাহিরে সর্বত্র সর্বপদার্থে সগুণ ব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের বিদ্যমানতার যে প্রত্যক্ষানুভূতি হয়, ইহাই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান। যতক্ষণ এইরূপ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হয়, ততক্ষণ এই সাযুজ্যমুক্তি ঘটে না। ভগবৎ-প্রেমের তিনটি লক্ষণ। প্রথমতঃ, ইহাতে কেনা-বেচার ভাব নাই। এই প্রেমে শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তির বিনিময়ে, তাঁহার কাছে কোন কিছু জিনিষ চাওয়া চলিবে না। আমি তোমাকে ভক্তি করি, অতএব তুমি আমার এই ঐহিক অভাবটি মিটাইয়া দাও—এইরূপ প্রার্থনা (১) চলিবে না। ইহাতে কেবল আছে আত্মদান—আপনাকে কেবল তাঁহার চরণে বিলাইয়া দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে ভয়ের লেশমাত্র নাই। প্রেমিকের কাছে প্রেমাস্পদ কখনো ভয়ের বস্তু হইতে পারেন না। ভয় থাকিলে প্রেম হয় না। (২) শ্রীভগবান, পরম প্রেমাস্পদ। তাই, তিনি কখনো ভগবৎ-প্রেমিকের কাছে ভয়ের বস্তু হইতে পারেন না—শাস্তা ও দণ্ডদাতা হইতে পারেন না। নরক-যন্ত্রণার ভয়ে ঈশ্বরোপাসনার মাঝে ভগবৎ-প্রেম নাই। তৃতীয়তঃ, ইহাতে এক শ্রীভগবান ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগের স্থান

---

(১) "আমাকে ভক্তি দাও, জ্ঞান দাও, নিষ্ঠা দাও, ধর্মে মতি দাও"—এইরূপ প্রার্থনা সত্ত্বগুণের বিকাশক, অতএব ঐহিক কামনাশূন্য এবং সেইজন্য দূষিত বা নিষিদ্ধ নহে।

(২) বাইবেলেও কিছুটা অনুরূপ উক্তি দেখা যায়। যথা—

"God is love" ; * * * "There is no fear in love ;" * * * "He that feareth is not made perfect in love,"—I. John iv, 16 and 18.

নাই। এই কারণ, ভগবৎ-প্রেমকে বা পরাভক্তিকে বলা হয়, অনন্যা-ভক্তি অথবা অব্যভিচারিণী ভক্তি। কিছুমাত্র পার্থিব ভোগবাসনা থাকিলে, ভগবৎ-প্রেম হয় না; কেননা, সে ক্ষেত্রে শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি ব্যভিচারিণী হইয়া পড়ে। যথার্থ ভগবৎ-প্রেম ভক্তের হৃদয় হইতে যাবতীয় ভোগবাসনা দূরীভূত করিয়া দেয়। এই প্রেমের উদয়ে আসে পূর্ণ বিষয়-বৈরাগ্য। ঐতিহাসিক যুগে ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, মীরাবাঈ, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি।

মানুষ স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ। ভক্তিযোগের সাধনা হয় ভাবের সাহায্যে। তাই, সকল প্রকার যোগ-সাধনার মধ্যে ভক্তিযোগ-সাধনাই সাধক-সমাজে বেশী প্রিয়। ভক্তিযোগের সাধক সংখ্যায় অনেক। ভক্তি-সাধনা ব্যাপক। কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি শাক্ত সকলেই ভক্তি-সাধক। কেবলমাত্র উপাস্যের প্রভেদ। বৈষ্ণব শ্রীবিষ্ণুর, শৈব শিবের এবং শাক্ত মহাদেবীর উপাসক। ভক্তিসাধনার প্রধান প্রচারক বৈষ্ণবাচার্যগণ হইলেও, ইহার আওতার ভিতর তান্ত্রিক উপাসনা ও এমন কি বৈদিক উপাসনাও আসিয়া পড়ে। বৈষ্ণব-তন্ত্রে ও শৈব-তন্ত্রে ভক্তি-সাধনার স্থান যথেষ্ট। শাক্ত-তন্ত্রে দিব্যভাবে শক্তি-সাধনাকে সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে। এই দিব্যভাবের সাধনা ভক্তিযোগের অন্তর্গত বলিলে ভুল হয় না। (১) ভক্তি-সাধনা কেবলমাত্র প্রতীক-প্রতিমা-পটাদি সাকার উপাসনার মধ্যেই

ভক্তি-সাধনার ব্যাপকতা

(১) শাক্ত-তন্ত্রে অধিকারীভেদে তিন ভাবের সাধনা বিহিত—পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব। যাহারা তামসিক তাহাদের জন্য পশুভাব, যাহারা রাজসিক তাহাদের জন্য বীরভাব, এবং যাহারা সাত্ত্বিক তাহাদের জন্য দিব্যভাব। দিব্যভাবের সাধনায় পঞ্চতত্ত্ব সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ও যৌগিক প্রক্রিয়া।

নিঃশেষিত নহে। সগুণ ব্রহ্মের নিরাকার উপাসনাও ভক্তি-সাধনা। নিরাকারবাদী ব্রাহ্মসমাজ ভক্তি-সাধক। নিরাকারবাদী বৈদিক ঋষিগণ যে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন, তাহাকেও ভক্তি-সাধনা বলা যাইতে পারে। শুধু হিন্দুধর্মেই ভক্তি-সাধনা, তাহা নহে। খ্রীষ্টধর্মে এবং ইস্‌লামে একমাত্র ভক্তি-সাধনাই নির্দিষ্ট, অন্য সাধনার স্থান নাই। বৈষ্ণব মতে যে পঞ্চভাবের কথা পূর্বে কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে খ্রীষ্টপন্থিগণের শান্তভাব এবং ইস্‌লামপন্থিগণের দাস্যভাব। খ্রীষ্টপন্থিগণ শ্রীভগবানকে পিতৃরূপে দেখেন—শান্তভাব। ইস্‌লামপন্থিগণ শ্রীভগবানকে প্রভুরূপে দেখেন—দাস্যভাব। ইস্‌লামের ভিতর স্থফী সম্প্রদায় শ্রীভগবানকে কান্তভাবে দেখেন—মাধুর্যভাব।

[পাঁচ]

কর্মযোগ

কর্মের দ্বারা বিশ্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ—কর্মযোগ। এই মর্ত্যলোকে অবিরাম কর্মস্রোত চলিতেছে—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। (১) যতদিন ইহজগতে আছি, ততদিন এই স্রোতে ভাসিয়া যাইতে হইবে—উপায় নাই। কর্মের ফল—সুখ ও দুঃখ। এই সুখ-দুঃখ-ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ দেহধারণ—মৃত্যুর পর জন্ম, জন্মের পর মৃত্যু, আবার মৃত্যুর পর জন্ম। এইভাবে সংসারচক্র

(১) এ জগৎ কর্মভূমি। ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ—কর্ম না করিয়া ইহজগতে কেহ ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না। —গীঃ, ৩।৫

অবিরত ঘূর্ণায়মান। কর্ম হইতে অব্যাহতি পাইলে কর্মফল-ভোগের প্রশ্ন উঠে না, এবং কর্মফলভোগের প্রশ্ন না থাকিলে সংসার-চক্রের আবর্তে নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না। কিন্তু ইহজগতে যখন জীবের কর্ম ছাড়া গতি নাই, তখন মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে এমন কৌশলে কর্ম করা উচিত, যাহাতে কর্মফলভোগের কারণ ঘটিতে না পারে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ইহা যেন একটা হেঁয়ালি। না—তাহা নয়। গীতার ভগবান স্পষ্টতঃ সেই কৌশল ব্যক্ত করিয়াছেন। কর্মের সেই কৌশলের নাম, কর্মযোগ—যোগঃ কর্মসু কৌশলং। (১) সেই কৌশল—নৈষ্কাম্যসিদ্ধি, অর্থাৎ নিরাসক্তচিত্তে কর্মসাধন। সাধারণতঃ, মানুষ কর্ম করে আসক্তি বা আত্মসুখভোগের অভিলাষ লইয়া। ইহা সকাম কর্ম। ইহাতে আসক্তির নিবৃত্তি তো কখনো হয় না, বরং তাহার মাত্রা আরো বাড়িয়া চলে। সেই নিমিত্ত কর্মযোগ বলেন—যে অবস্থায় যে কর্ম তোমার ন্যায়তঃ ধর্মতঃ শাস্ত্রতঃ কর্তব্য তাহা সম্পাদন কর, কিন্তু তাহা করিবে আসক্তি-শূন্যহৃদয়ে কেবলমাত্র কর্তব্যের অনুরোধে। ইহাই নিরাসক্তিবাদ বা নৈষ্কাম্যসিদ্ধি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই নৈষ্কাম্যসিদ্ধির উপায় কথিত হইয়াছে। নৈষ্কাম্যসিদ্ধির প্রধান উপায়—নির্মমত্ব, সংযম, সমতা, ঈশ্বরে কর্মসমর্পণ, এবং ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ।

কর্মযোগের অর্থ —নৈষ্কাম্যসিদ্ধি

নৈষ্কাম্যসিদ্ধির উপায়

নির্মমত্ব—সাধারণতঃ মানুষ আত্মকেন্দ্রিক। 'আমি ও আমার' বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া সে চলে। ইহার নাম, মমত্ব-বুদ্ধি। ইহা হইতে আসক্তির উদ্ভব হয়, কাজেই ইহা নৈষ্কাম্যসিদ্ধির অন্তরায়।

(১) গীঃ, ২।৫০

এই মমত্ব-বুদ্ধির বর্জন—নির্মমত্ব। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন —নিরাশীনির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ; নিষ্কাম, নির্মম ও বিগতশোক হইয়া যুদ্ধ কর অর্থাৎ কর্তব্য কর্ম কর। (১) এক সর্বব্যাপী পরমাত্মা মায়ার উপাধিতে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বহু হওয়ায় 'আমি—তুমি—সে' এই ভেদ কল্পিত হইয়াছে। অবিদ্যা দুর হইলে এই ভেদ আর থাকে না, কাজেই 'আমি ও আমার' বুদ্ধি মিথ্যা। যিনি অদ্বয়বাদী তিনি এইরূপ অনুচিন্তন করিতে পারেন। অবশ্য ইহা সকলের পক্ষে সহজ নহে। গৃহ-গোষ্ঠী-পরিজন-বিষয়াদি ইহজীবনে যাহা কিছু আমার বলিয়া মনে করি, এই জন্মের পূর্বে সে সব আমার ছিল না এবং মৃত্যুর পরও আমার থাকিবে না। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাহাদের প্রতি আমার দাবী। এই অস্থায়ী দাবীর কোন মূল্য নাই। অতীতে কত জন্ম চলিয়া গিয়াছে—কতবার কতরূপে এসব আমার সম্মুখে দেখা দিয়াছে—কিন্তু সে-সবের স্মৃতি পর্যন্ত আজ আমার নাই, মমত্ব তো দূরের কথা। তবে ইহজন্মের এই সবের প্রতিই এই মমত্ববোধ কেন? প্রকৃতপক্ষে, এই সব আমার বলিয়া যাহা কিছু আমার সম্মুখে দেখা দিয়াছে, সেই সব আমার নহে—শ্রীভগবানের। তিনিই এ-সকলের স্রষ্টা-কর্তা-বিধাতা। এমন কি আমি নিজেও আমার নহি—তাঁহার। অতএব, এই মমত্ব-বুদ্ধি নিরর্থক। যাঁহারা দ্বৈতবাদী তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ অনুচিন্তন সহজ। এই প্রকার কোন অনুচিন্তনের সাহায্যে ক্রমশঃ নির্মমত্ব-লাভ হয়।

সংযম—ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ, ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক মনকে হরণ করে। (২) তাৎপর্য—চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ

(১) গীঃ, ৩।৩০
(২) গীঃ, ২।৬০

যেন জোর করিয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে আমাদের মনকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের ফলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিপ্রায়ে মন যদি সর্বদা ভোগ্য বস্তুর আহরণে মত্ত হয়, তাহা হইলে সেই মন কখনো নিষ্কাম কর্মের দিকে যাইতে চাহে না। অতএব, নৈষ্কাম্যসিদ্ধির পক্ষে প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ের সংযম। কর্মযোগপ্রসঙ্গে গীতা এ কথা স্পষ্ট বলিয়াছেন—যিনি মন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া ফলাভিলাষশূন্য হইয়া কর্মেন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন তিনিই প্রশংসার্হ। (১) অষ্টাঙ্গযোগের যম নিয়মাদি-পালনের দ্বারা নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়। নৈতিক চরিত্রের গঠনে ইন্দ্রিয়গণ আপনা-আপনি সংযত হইয়া পড়ে। সেই কারণ, কর্মযোগীর পক্ষে যথাসম্ভব যম-নিয়মাদি-পালন প্রশস্ত।

সমতা—সুখ-দুঃখে, লাভালাভে, জয়-পরাজয়ে তুল্যজ্ঞান। (২) এই সমতার নাম, যোগ—সমত্বং যোগ উচ্যতে। (৩) মন চঞ্চল হইবে না কি সুখে কি দুঃখে, কি লাভে কি অলাভে, কি জয়ে কি পরাজয়ে। যদি চঞ্চল হয়, তাহা হইলে নিষ্কাম কর্ম সুসাধ্য হয় না; কেননা, চঞ্চল চিত্তে কামনার বা আসক্তির বাস। কামনা হইতেই মনের এই চঞ্চলতা। যাহার কর্মের মূলে কামনা নাই, তাহার কর্মশেষে কি সুখে-দুঃখে, কি লাভে-অলাভে, কি জয়ে-পরাজয়ে চিত্ত উদ্বেলিত হয় না। তাহার চিত্ত সর্বদা সর্বাবস্থায় শান্ত-স্থির-ধীর। সমতা-সাধন সুকঠিন, তবে একেবারে অসম্ভব নহে। চাই কামনার

---

(১) গীঃ, ৩।৭

(২) গীঃ, ২।৩৮

(৩) গীঃ, ২।৪৮

গীতায় যোগ শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

মূলোচ্ছেদ। কর্মফলের আকাঙ্ক্ষাই কামনার মূল। এই কর্মের অনুষ্ঠানে আমি সুখী হইব, লাভবান হইব, জয়ী হইব—এইভাবে কর্মফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে কর্ম করা যায়, তাহাই কামনামূলক কর্ম বা সকাম কর্ম। এইরূপ ফলাকাঙ্খী হইয়া কর্ম করিলে, কর্মান্তে ফলপ্রাপ্তিকালে অভীষ্ট সিদ্ধ হোক্ বা না হোক্ চিত্তের উদ্বেগ অনিবার্য। ইহা হইতে নিস্তার পাইতে হইলে কর্মের প্রারম্ভে ফলাকাঙ্খা ত্যাগ করিতে হইবে। তাই, গীতার অমোঘ বাণী—কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন; কেবলমাত্র কর্মে তোমার অধিকার, ফলে নহে। (৪) ফলাফল যাহাই হোক্ না কেন, ইহা আমার কর্তব্য তাই আমি করিব—এইরূপ জ্ঞানে সকল কর্তব্য সম্পাদন করিলে ফলাকাঙ্খা থাকে না। ফলাকাঙ্খা-ত্যাগের অর্থ, কামনার শিকড় কাটিয়া দেওয়া। এই বিশাল সৃষ্টি পরমেশ্বরের। এখানে শুভ অশুভ যতকিছু ঘটনা ঘটিতেছে, সে সব তাঁহার কার্য—তাঁহার লীলা। আমি ক্ষুদ্র জীব। পরমেশ্বরের ঐ লীলার গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিবার সামর্থ্য আমার নাই। আমিও তো তাঁহারই সৃষ্ট জীব। তাঁহার অপূর্ব লীলা-রহস্যের উদ্ঘাটন, কি সাধ্য আমার যে আমি করিতে পারি! আমি যে ঘটনাকে অশুভ মনে করিতেছি, হয়তো তাহার পিছনে তাঁহার এক শুভ কল্পনা আছে। আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি তাহা অবধারণ করিতে অক্ষম। অতএব, আমার কর্তব্য—শুভ অশুভ যে প্রকার ঘটনা আমার সম্মুখে উপস্থিত হোক্ না কেন, তাহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করা; দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণায় যতই পড়ি না কেন, ইহা পরমেশ্বরের দান এইরূপ জ্ঞানে তাহাতে ব্যথিত না

---

(৪) গীঃ, ২।৪৭

হইয়া স্থির ধীর থাকা। (১) এই প্রকার মননের অভ্যাসেও সমতালাভ হয়।

ঈশ্বরে কর্ম-সমর্পণ – যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ। (২) ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্ম করাই ঈশ্বরে কর্ম-সমর্পণ। আত্মসুখের অভিলাষে যে কর্ম করা যায়, তাহা সকাম হওয়ায় সংসারে বন্ধনের কারণ হয়। সেই নিমিত্ত নৈষ্কাম্য-সাধনায় সমস্ত কর্ম ঐভাবে ঈশ্বরে অর্পণ করিতে হইবে। গীতায় শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—যাহা কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, সেই সব আমাতে অর্পণ করিও। (৩) ঈশ্বরে কর্ম-সমর্পণের বুদ্ধিতে কর্ম করিলে, সেই কর্মের মাঝে জঘন্য কাম-কলুষ আসিতে পারে না। (৪) শ্রীভগবানে এই কর্ম অর্পণ করিতে হইবে, অর্থাৎ তাঁহার প্রীতির জন্য এই কর্ম করিতে হইবে, এই কথা মনে জাগিলে যাহাতে সেই

(১) সাধু মহাপুরুষদের জীবনীতে এই প্রকার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায় গাজীপুরের পওহারী বাবা ছিলেন বিখ্যাত সাধু। সর্বপ্রকার পীড়াকে তিনি প্রেমাস্পদ পরমেশ্বরের প্রেরিত দূতস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তিনি যখন রোগাক্রান্ত হইয়া রোগশয্যায় অসহ্য যন্ত্রণা পাইতেন, তখন কেহ তাঁহার পীড়াকে অন্য নামে অভিহিত করিলে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি অম্লানচিত্তে পীড়ার যাতনা সহ্য করিতেন।

(২) গীঃ, ৩।৯

(৩) গীঃ, ৯।২৭

(৪) ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে, জীব অকারণে চেষ্টা করিয়া দেহত্যাগ করে। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা পূরণের জন্যই সাধক কেবলমাত্র প্রাণরক্ষার্থে ভোজন করেন, আহারীয় দ্রব্যের আস্বাদ বিচার না করিয়া। গৃহী সাধক স্ত্রীসঙ্গ করেন ঈশ্বরের জীব-স্রোত রক্ষা করিতে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে নহে। এই ভাবে সাধক লৌকিক জগতে সমস্ত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশ্যে।

কর্মে পাপ-কালিমা না লাগে অন্তরে সেই প্রেরণা স্বতঃই আসে। কীট-দংশিত অপবিত্র পুষ্প শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ করা যায় না। তেমনি নীচভাবে দূষিত অপবিত্র কর্মও তাঁহাকে অর্পণ করা চলে না, যেহেতু তাহাতে শ্রীভগবান প্রীত হন না। অতএব, ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্মের মাঝে থাকে এক উচ্চ আদর্শ। আমার গৃহ-গোষ্ঠী-পরিজনাদি এই সব প্রকৃতপক্ষে আমার নহে—শ্রীভগবানের। তিনিই এই সব করিয়াছেন এবং তিনিই এই সকলের মালিক। আমি মাত্র তাঁহার নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক। যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন এই সকল দেখাশুনার ভার আমার উপর। তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট হন, সেইভাবে এই তত্ত্বাবধানের কাজ করা আমার উচিত। আমার জীবনাবসান ঘটিলে, তিনি আমার স্থলে আবার আর এক জনকে এই সকলের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবেন। অন্তরে এই প্রকার ভাব অনুক্ষণ জাগ্রত রাখিলে, ঈশ্বরে কর্ম-সমর্পণের বুদ্ধি দৃঢ় হয়।

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ—শরণাগতি। সাধারণতঃ মানুষ মনে করে—আমি নিজেই সব করিতেছি, আমার উপরে কেহই নাই। তাহার এই স্বতন্ত্র কর্তৃত্ববোধ, আত্মাভিমান। এই আত্মাভিমান হইতে কামনার উৎপত্তি। কাজেই, নৈষ্কাম্যসাধনায় এই আত্মাভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ কিছুই করে না। গীতার বাণী—সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর শরীররূপ যন্ত্রে আরূঢ় জীবসকলকে মায়ার বা প্রকৃতির সাহায্যে ঘুরাইতেছেন। (১)

(১) গীঃ, ১৮।৬১

অন্তর্যামী ঈশ্বর=জীবাত্মা। বস্তুতঃ আত্মা নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিই সব করে। তবে চৈতন্যময় আত্মার অধিষ্ঠান ব্যতীত জড়া প্রকৃতি কিছু করিতে পারে না। তাই, মুখ্য কর্তৃত্ব প্রকৃতির হইলেও গৌণ কর্তৃত্ব আত্মার।

তিনি যন্ত্রী, মানুষ যন্ত্র। অতএব, নৈষ্কাম্যসাধনায় নিজের স্বতন্ত্র কর্তৃত্বের স্থলে ঐ অন্তর্যামী ঈশ্বরের কর্তৃত্ব মানিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হইবে। ইহাই ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন—হে অর্জুন, সর্বতোভাবে সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরের শরণ লও। (২)

কর্মী ও কর্মযোগীর প্রভেদ

কর্মযোগীর ঈশ্বর-বিশ্বাসী হওয়া চাই। ঈশ্বর-নাস্তিক কর্মী হইতে পারে, কিন্তু কর্মযোগী হইতে পারে না। সেবা নিষ্কাম কর্মের অন্তর্ভুক্ত। সেবা অর্থে আর্ত-সেবা, সমাজ-সেবা, জাতি-সেবা, দেশ-সেবা ইত্যাদি বুঝায়। সেবকমাত্রেই কর্মী, কিন্তু কর্মযোগী নহেন। যে সেবক ত্যাগ-সংযমের সহিত ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণের ও কর্ম-সমর্পণের বুদ্ধিতে সেবার কাজ করেন, তিনি কর্মযোগী; আর যিনি তাহা করেন না, তিনি কর্মযোগী নহেন।

হঠযোগে প্রাণশক্তির সাধনা। ইহা অধ্যাত্ম-সাধনার সহায়ক নহে। অধ্যাত্ম-সাধনার সহায়ক—রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং কর্মযোগ। চতুর্বিধ যোগসাধনা বলিলে সচরাচর এই চারিটি বুঝায়।

চতুর্বিধ যোগসাধনার বৈশিষ্ট্য ও সমন্বয়

এই চতুর্বিধ যোগসাধনার লক্ষ্য এক—আত্মানুসন্ধান। সাধকগণের প্রকৃতিভেদে এই চারি বিভিন্ন যোগসাধনার ব্যবস্থা। যাঁহার প্রকৃতি ধ্যান-ধারণাশীল তাঁহার পক্ষে রাজযোগ, যাঁহার প্রকৃতি চিন্তাশীল তাঁহার পক্ষে জ্ঞানযোগ, যাঁহার প্রকৃতি ভক্তিশীল তাঁহার পক্ষে ভক্তিযোগ, আর যাঁহার প্রকৃতি কর্মশীল তাঁহার পক্ষে কর্মযোগ প্রশস্ত। অধিকাংশ সাধক ভক্তিপ্রবণ ও কর্মপ্রবণ, তাই ভক্তিযোগ ও

---

(২) গীঃ, ১৮।৬২

কর্মযোগ সাধক-সমাজে বেশী আদরণীয়। যে যোগের যে বিশিষ্ট প্রক্রিয়া বিহিত, তাহা তাহার বৈশিষ্ট্য। যে সাধক নিজের রুচি-প্রকৃতি-সামর্থ্য অনুযায়ী যে যোগসাধনার পথ বাছিয়া লয়েন, তাঁহার প্রথম কর্তব্য সেই যোগসাধনার বিশিষ্ট প্রক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান; নতুবা, ব্যর্থশ্রম হইবার সম্ভাবনা অধিক। কিন্তু সেই হেতু অন্য যোগসাধনার গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান যে নিষিদ্ধ, তাহা নহে। রাজযোগের অষ্টাঙ্গযোগ জ্ঞানযোগের নিদিধ্যাসনের অন্তর্গত, ইহা আমরা দেখিয়াছি। অষ্টাঙ্গযোগের যম-নিয়মাদি সকল দেশের সকল মানুষের পুরুষ-নারী-নির্বিশেষে পালনীয়, যেহেতু এইগুলি সার্বভৌমিক মহাব্রত। (১) জ্ঞান আর জ্ঞানযোগ, ভক্তি আর ভক্তিযোগ, কর্ম আর কর্মযোগ—একার্থবোধক নহে। জ্ঞানযোগী না হইয়াও জ্ঞানী হওয়া যায়, ভক্তিযোগী না হইয়াও ভক্ত হওয়া যায়, কর্মযোগী না হইয়াও কর্মী হওয়া যায়।

আমরা লৌকিক দৃষ্টিতে দেখি যে, কোন বস্তুসম্পর্কে অন্ততঃ একটা আপাতজ্ঞান না জন্মিলে, তাহার প্রতি প্রীতি আসে না এবং প্রীতির অভাবে তাহাকে লাভ করিবার প্রচেষ্টাও দেখা দেয় না। আবার, সেই বস্তুসম্পর্কে জ্ঞান ও প্রীতি থাকা সত্ত্বেও বিনা সক্রিয় প্রচেষ্টায় তাহাকে পাওয়া যায় না। কাজেই বস্তুলাভার্থে জ্ঞান, প্রীতি ও প্রচেষ্টা বা কর্ম এই তিনটির প্রয়োজন। পরমার্থবস্তুসম্পর্কেও ইহা কিয়দংশে সত্য। পরব্রহ্ম, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর সম্বন্ধে কিছু আপাত অর্থাৎ পরোক্ষ জ্ঞান না জন্মিলে তাঁহার প্রতি প্রীতির বা ভক্তির উদয় হয় না এবং ভক্তির অভাবে তাঁহাকে পাওয়ার জন্য কোনরূপ সাধনার প্রবৃত্তি অন্তরে জাগে না। সেই কারণ, চতুর্বিধ যোগসাধনার

(১) ৩৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

প্রত্যেকটিতে কিয়দংশে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম এই তিন তত্ত্বই বিদ্যমান। তবে কোনটিতে জ্ঞানের, কোনটিতে ভক্তির, কোনটিতে কর্মের প্রাধান্য। পূর্বকথিত যোগাঙ্গসমূহ স্থিরচিত্তে বিশ্লেষণ করিলে, এই সত্যে উপনীত হওয়া যায়।

চতুর্বিধ যোগসাধনার আশ্রমনির্ণয়

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, যোগ-সাধনা মুক্তির সাধনা। (১) মুক্তির সাধনা নিবৃত্তিমার্গে—প্রবৃত্তিমার্গে নহে। এই সাধনায় সর্বপ্রকার বিষয়-বাসনা পরিত্যাগের কথা। গৃহস্থাশ্রম প্রবৃত্তিমার্গে। গৃহস্থাশ্রমে সম্পূর্ণ বিষয়বৈরাগ্যের স্থান নাই। গৃহীর কর্তব্য—ধর্মাচরণ, ধর্মানুমোদিত অর্থোপার্জন এবং ধর্মানুমোদিত সকাম কর্মের অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্বর্গের প্রসঙ্গে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। (২) গৃহীর গোষ্ঠী-পরিজন-জাতি-সমাজ-দেশ এই সব আছে। তাহাদের প্রতি তাহার কর্তব্যও আছে। ইহা হইতে সহজে অনুমিত হয় যে, কোনও যোগ-সাধনা গৃহস্থাশ্রমের জন্য নির্দিষ্ট নহে। এখানে যোগ-সাধনা অর্থে চতুর্বিধ যোগসাধনার কোনটির পূর্ণাঙ্গসাধনা বুঝিতে হইবে। নিবৃত্তিমার্গে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমেই এই সকল পূর্ণাঙ্গ যোগসাধনা সম্ভব। পূর্ণাঙ্গ রাজ-যোগে প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির সাধনা গৃহীর পক্ষে অসম্ভব। জ্ঞানযোগের প্রারম্ভে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারী হওয়ার উদ্দেশ্যে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন (৩) হওয়াই গৃহীর সাধ্যাতীত। ভক্তি-যোগের উচ্চ স্তরে যে পরাভক্তি (৪) তাহা পূর্ণ বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত

(১) ৩২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(২) ৪৩—৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(৩) ৩৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(৪) ৩৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

না হইলে ঘটে না। তাই, ইহাও গৃহীর পক্ষে সম্ভব নহে। ভক্তপ্রবর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেও পরাভক্তির উদয়ে সন্নাসগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। নিষ্কাম কর্মযোগে সম্পূর্ণ নৈষ্কাম্যসিদ্ধি ও সমতা-সাধনকে বিষয়-বৈরাগ্য বলা যাইতে পারে। এই সিদ্ধিলাভও গৃহীর পক্ষে অতীব কঠিন। এই ভাবে বুঝিয়া দেখিলে বলা যায় যে, চতুর্বিধ পূর্ণাঙ্গ যোগ-সাধনার কোনটিও গৃহস্থাশ্রমের উপযোগী হইতে পারে না। কিন্তু একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। হিন্দুধর্মে চরম পুরুষার্থ—মুক্তি। ধর্ম-অর্থ-কাম এই ত্রিবর্গ কখনো মুক্তির বিরোধী হইতে পারে না। সেই কারণ, গৃহস্থাশ্রমে ত্রিবর্গের সাধনা করিলেও যদি কোন গৃহী সাধক মুক্তি-সাধনার অভিমুখী হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে নিরস্ত করিবার কিছুই নাই। এইরূপ সাধকের চিত্তে ক্রমশঃ বিষয়বৈরাগ্যের ভাব গাঢ় হইলে, যথাকালে তিনি গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশপূর্বক মুক্তি-সাধনায় ব্রতী হইতে পারিবেন। গৃহস্থাশ্রমে এইরূপ সাধকের পক্ষে কোন পূর্ণাঙ্গ যোগসাধনা সম্ভবপর না হইলেও, যোগসাধনার যে সকল সঙ্কেত তিনি গ্রহণ করিতে সমর্থ তাহা গ্রহণ করিতে পারেন; তিনি যম-নিয়মাদি-পালন এবং ধারণা-ধ্যান যতটুকু তাঁহার পক্ষে সম্ভব তাহা করিতে পারেন; বেদান্তাদিশাস্ত্রপাঠে ও শ্রবণ-মননে ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞান অর্জন করিতে পারেন; পূজা-জপ-স্তবস্তুতি ইত্যাদি গৌণী বা বৈধীভক্তির সাধনা করিতে পারেন; আত্ম-সুখের কামনা ত্যাগ করিয়া গোষ্ঠী-পরিজন-জাতি-সমাজ-দেশের কল্যাণার্থে নিষ্কাম কর্মে ব্রতী হইতে পারেন। এক কথায়, তিনি প্রবৃত্তিমার্গে থাকিয়াও নিবৃত্তিমার্গের জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন। (১)

(১) গৃহস্থাশ্রমে এমন ভক্ত-সাধক দেখা যায়, যিনি গৃহী হইয়াও অর্ধ-সন্ন্যাসী। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত সাধু নাগ মহাশয় যেমন ছিলেন।

কর্মযোগ প্রবৃত্তিমার্গে কি নিবৃত্তিমার্গে, ইহা এক জটিল প্রশ্ন। কর্ম-যোগের পূর্ণ নৈষ্কাম্যসিদ্ধি প্রবৃত্তিমার্গে লাভ করা দুঃসাধ্য। যখন মনে করি সমস্ত আত্মসুখ-ভোগেচ্ছার বিসর্জন হইয়াছে, তখনো অন্তরে লুকাইয়া থাকে সমাজে ও দেশে আত্মসম্মান-প্রতিষ্ঠার অভিলাষ। ইহাও সকাম —নিষ্কাম নহে। অতএব কর্মযোগ প্রবৃত্তিমার্গে অসম্ভব বলিলে ভুল হয় না। তবে ইহার আর একটা দিকও আছে। কি সকাম, কি নিষ্কাম, সকল কর্মই রজোগুণসম্ভূত। রজোগুণের কার্যক্ষেত্র প্রবৃত্তি-মার্গে। তাই, কর্মযোগ প্রবৃত্তিমার্গে, এই কথাও বলা চলে। যথার্থতঃ ইহা প্রবৃত্তিমার্গের শেষে এবং নিবৃত্তিমার্গের আরম্ভে—দুই মার্গের সন্ধিস্থলে। প্রবৃত্তিমার্গে কর্মযোগ-সাধনায় সকাম কর্ম পরিত্যাগের পর, নিবৃত্তিমার্গে কি সকাম—কি নিষ্কাম—সব কর্ম পরিত্যাগ। ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ সর্বত্র ব্রহ্মের প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত মুক্তি হয় না। নিষ্কামকর্মের ফলে সরাসরি এইরূপ প্রত্যক্ষানুভূতি হয় না, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি (১) হয় এবং সেই কারণ অন্তরে ব্রহ্মের ঐরূপ প্রত্যক্ষানু-ভূতির পথ পরিষ্কৃত হয়।

কর্মযোগ—প্রবৃত্তিমার্গে কি নিবৃত্তিমার্গে

কর্মযোগসাধনা সন্ন্যাসীর বিহিত কি-না, ইহা আর এক প্রশ্ন। সন্ন্যাসীর প্রয়োজন সত্ত্বগুণের আধিক্যে রজোগুণের হ্রাস। নিষ্কাম কর্মের জনক যখন রজোগুণ, তখন নিষ্কাম কর্মও সন্ন্যাসীর বর্জনীয়। ইহা ঠিক। তবে আরো কিছু ভাবিবার আছে। সন্ন্যাসী মুক্তিসাধক। মুক্তির সাধনায় চিত্তশুদ্ধি আদি কথা। শ্রুতি বলিয়াছেন—সাধারণতঃ মানুষের অশুদ্ধ চিত্তই সংসার-বন্ধনের

কর্মযোগসাধনা সন্ন্যাসীর বিহিত, অথবা নয়

(১) ৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কারণ; অতএব যত্নসহকারে চিত্তের শুদ্ধিসম্পাদন করিবে। (১) সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের পূর্বে যাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, এবং রজোগুণের হ্রাসে কর্মশীলতাও দূর হইয়াছে, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। সকলের তো তাহা হয় না, বিশেষতঃ বালসন্ন্যাসীদিগের। যাঁহাদের তাহা হয় না, তাঁহাদের পক্ষে প্রথমে কিছুদিন নিষ্কাম কর্ম যুক্তি-সম্মত। নতুবা তাঁহাদের সন্ন্যাস কষ্টকর হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ, নিষ্কাম কর্মযোগ ব্যতিরেকে জ্ঞাননিষ্ঠাযুক্ত সন্ন্যাস প্রাপ্ত হওয়া কষ্টকর। (২) তবে গৃহীর এবং সন্ন্যাসীর নিষ্কাম কর্মে দৃষ্টিকোণের প্রভেদ আছে। গৃহীর গৃহ-গোষ্ঠী-স্বজন-স্বজাতি-সমাজ এই সব আছে। সন্ন্যাসীর এই সব কিছু নাই। গৃহী নিষ্কাম কর্ম করিবেন গৃহ-গোষ্ঠী-স্বজন-স্বজাতি-সমাজ এই সবের হিতার্থে। সন্ন্যাসী নিষ্কাম কর্ম করিবেন জাতি-সমাজ-নির্বিশেষে সকল মানবের সকল জীবের বা জগতের হিতার্থে এবং নিজের মোক্ষার্থে—আত্মনঃ মোক্ষায় জগদ্ধিতায় চ। (৩) কেহ কেহ বলেন যে, সন্ন্যাস দ্বিবিধ—গৌণ ও মুখ্য। ফলত্যাগরূপ নিষ্কাম কর্ম —গৌণ সন্ন্যাস। সকাম ও নিষ্কাম উভয় কর্ম পরিত্যাগ—মুখ্য সন্ন্যাস। মুখ্য সন্ন্যাসই সন্ন্যাস নামে সচরাচর প্রসিদ্ধ। মুখ্য সন্ন্যাস সম্পর্কে গীতা বলিয়াছেন যে, যাঁহার পরমাত্মাতেই প্রীতি-তৃপ্তি-সন্তোষ প্রতিষ্ঠিত তাঁহার আর সকাম বা নিষ্কাম কোন কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না (৪)। এক কথায়, যিনি ব্রহ্মবিদ্ হইতে পারিয়াছেন তিনিই মুখ্য

---

(১) চিত্তমেব হি সংসারস্তৎ প্রযত্নেন শোধয়েৎ।—শাঃ উঃ, ৩

(২) গীঃ, ৫।৬

(৩) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী।

(৪) গীঃ, ৩।১৭

সন্ন্যাসের অধিকারী। কিন্তু সন্ন্যাসীমাত্রেই তো আর প্রকৃত ব্রহ্মবিদ নহেন। কাজেই, যাঁহারা সেই উচ্চস্তরে উঠিতে পারেন নাই তাঁহাদের পক্ষে গৌণ সন্ন্যাস পালনীয় চিত্তশুদ্ধির জন্য। তাই গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে গৌণ সন্ন্যাস (১) এবং মুখ্য সন্ন্যাস (২) এই উভয়বিধ সন্ন্যাসই কথিত হইয়াছে।

(১) গী:, ৫।৭-১২

(২) গী:, ৫।১৩

নবম অধ্যায়।

আনুষ্ঠানিক ধর্ম।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, গৃহীর ত্রিবর্গ সাধনার প্রথমেই ধর্ম অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ধর্ম। (১) সকল ধর্মেই কতকগুলি বাহ্য কৃত্রিম অনুষ্ঠান-পালনের নির্দেশ আছে। সেই অনুষ্ঠানসমূহের দ্বারা প্রত্যেক ধর্মের মতাবলম্বীকে সেই ধর্মের সীমারেখার ভিতর বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানসমূহকে ধর্মকর্ম বা আনুষ্ঠানিক ধর্ম কহে। মুখে আমি খ্রীষ্টিয়ান, কিংবা মুসলমান, কিংবা বৌদ্ধ, কিংবা হিন্দু বলিলেই যথার্থতঃ খ্রীষ্টিয়ান, বা মুসলমান, বা বৌদ্ধ, বা হিন্দু হওয়া যায় না। সেই সেই ধর্মের আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালন করা চাই, তবেই সেই সেই ধর্মের অনুগামী বলিয়া পরিচয় দেওয়ার যোগ্যতা লাভ হয়। হিন্দুধর্ম বিচিত্র—বিপুল; কাজেই, এই ধর্মের ধর্মকর্মও বিচিত্র-বিপুল। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ যুগে যুগে যুগোপযোগী ধর্মকর্মের বিধান দিয়াছেন। যুগপরিবর্তনের হেতু ধর্মকর্মেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সেই নিমিত্ত হিন্দুর ধর্মকর্মের বহু রূপ। এমন অনেক সুপ্রাচীন হিন্দুধর্মানুষ্ঠান আছে, যাহার মর্ম একালে বুঝা যায় না। কিন্তু যেকালে সেগুলির প্রবর্তন হইয়াছিল, সেকালে তাহাদের অর্থ ছিল। (২)

ধর্মকর্মের তাৎপর্য

---

(১) ৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) বর্তমানে যে অনুষ্ঠানের কোনও মানে বুঝা যায় না, এককালে তাহার একটা মানে ছিল।

—আচার্য শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যজ্ঞকথা।

ধর্মকর্ম—কায়িক, বাচিক এবং মানসিক। দেবতাগণের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যদানাদি, কায়িক কর্ম। তাঁহাদের স্তোত্রপাঠ ও নামজপাদি, বাচিক কর্ম। তাঁহাদের অনুচিন্তন বা উপাসনা, মানসিক কর্ম। বেদে কায়িক ধর্মানুষ্ঠানকে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ এবং মানসিক ধর্মানুষ্ঠানকে ভাবনাত্মক যজ্ঞ বলা হইয়াছে। উপাসনা—ভাবনাত্মক যজ্ঞ। এই দৃষ্টিতে উপাসনা কর্মের অন্তর্গত। তবে কায়িক বা বাচিক নহে বলিয়া, উপাসনাকে সচরাচর কর্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে গণ্য করা হয়। বুঝিবার সুবিধার জন্য এখানে কর্ম এবং উপাসনা পৃথক্‌ভাবে আলোচিত হইতেছে।

ধর্মকর্ম ত্রিবিধ—কায়িক, বাচিক ও মানসিক

[এক]

কর্ম।

যাবতীয় ধর্মকর্মের চরম লক্ষ্য—চিত্তশুদ্ধি। কেননা, চিত্তশুদ্ধিই ধর্মের মূল কথা। ভিন্ন ভিন্ন যুগে বাহ্যাবরণের পরিবর্তন ঘটিলেও, আসলে সকল ধর্মকর্মই এক, যেহেতু তাহাদের উদ্দেশ্য এক—চিত্তশুদ্ধি। শাস্ত্রকারগণ ধর্মকর্মকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রধানতঃ, কর্ম দুইভাগে বিভক্ত—বিহিত ও নিষিদ্ধ। যে সকল কর্ম চিত্তশুদ্ধির সহায়ক, সেই সকল কর্মে শাস্ত্রবিধি আমাদিগকে প্রবৃত্ত করায়, এইগুলি—বিহিত কর্ম। যে সকল কর্ম চিত্তশুদ্ধির বিঘ্নস্বরূপ, সেই সকল কর্ম হইতে শাস্ত্রবিধি আমাদিগকে নিবৃত্ত করায়, এইগুলি—নিষিদ্ধ কর্ম। যাবতীয় নিষিদ্ধ কর্ম শাস্ত্রে নরকভোগের সহায়ক বলিয়া কথিত ; যেমন,—ব্রহ্মহত্যা,

ধর্মকর্মের শ্রেণী-বিভাগ

মদ্যপান, চৌর্য ইত্যাদি। (১) বিহিত কর্ম পুনরায় চারি শ্রেণীর—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এবং প্রায়শ্চিত্ত। সন্ধ্যাবন্দনাদি যে সকল কর্ম প্রতিদিন অনুষ্ঠান না করিলে পাপভাগী হইতে হয়, তাহা নিত্যকর্ম। (২) উপাসনাকে স্বতন্ত্রভাবে না ধরিলে, ইহা নিত্যকর্মের মধ্যগত। যাহা কোন নিমিত্তকে উপলক্ষ্য করিয়া করা হয়, তাহা নৈমিত্তিক কর্ম; যেমন, গ্রহণ উপলক্ষে শ্রাদ্ধ-স্নান-দান ইত্যাদি। ষোড়শবিধ বা দশবিধ সংস্কারও নৈমিত্তিক কর্ম। (৩) যাহা কোন কামনা-সিদ্ধির জন্য কৃত হয়, তাহা কাম্য কর্ম; যেমন, স্বর্গকামনায় সোমযাগাদি। (৪) ইহজন্মের বা পূর্বজন্মের পাপনাশার্থ যে ক্রিয়া, তাহা প্রায়শ্চিত্ত; যেমন, উপবাস ও চান্দ্রায়ণব্রতাদি। (৫) বেদ, স্মৃতি, পুরাণ এবং তন্ত্র বিভিন্ন ভাবে আপন আপন যুগোপযোগী বিহিত কর্মের নির্দেশ দিয়াছেন। বেদবিহিত কর্মকে বৈদিক কর্ম বা শ্রৌত কর্ম, স্মৃতিবিহিত কর্মকে স্মার্ত কর্ম, পুরাণবিহিত কর্মকে পৌরাণিক কর্ম এবং তন্ত্রবিহিত কর্মকে তান্ত্রিক কর্ম বলা হয়। এখানে এইগুলি খুব সংক্ষেপে আলোচনার যোগ্য।

(ক) বৈদিক কর্ম।

যজ্ঞই বেদবিহিত কর্ম। যজ্ঞ—বৈদিক কর্মের নামান্তর। 'যজ্' ধাতু হইতে 'যজ্ঞ' শব্দ নিষ্পন্ন। যজ্ ধাতুর অর্থ পূজা করা

(১) নিষিদ্ধানি—নরকাদ্যনিষ্টসাধনানি ব্রাহ্মণহননাদীনি ॥ —বেঃ সাঃ, ৮

(২) নিত্যানি—অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি ॥ —বেঃ সাঃ, ৯

(৩) নৈমিত্তিকানি—পুত্রজন্মাদ্যনুবন্ধীনি জাতেষ্ট্যাদীনি ॥ —বেঃ সাঃ, ১০

(৪) কাম্যানি—স্বর্গাদীষ্টসাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি ॥ —বেঃ সাঃ, ৭

(৫) প্রায়শ্চিত্তানি—পাপক্ষয়সাধনানি চান্দ্রায়ণাদীনি ॥ —বেঃ সাঃ, ১১

যজ্ঞ শব্দের ধাতুগত অর্থ, পূজন। যাঁহারা পূজার পাত্র, তাঁহারা বেদবিজ্ঞানে যজত নামে অভিহিত—যজত, অর্থাৎ দেবতা। যজতগণ নিরাকার, চৈতন্যময়। তাঁহাদের পূজার জন্য সেকালে কোন মন্দির বা দেবালয় ছিল না। পূজকগণের নাম ছিল, যজমান। যজতগণকে চর্মচক্ষুতে দেখা যাইত না। যজমানেরা কতকগুলি পবিত্র বাক্যের সাহায্যে তাঁহাদিগকে মনন করিতেন। সেই সব বাক্যরাশির নাম, মন্ত্র। যজতগণ এই মন্ত্রেই প্রকাশিত হইতেন। তাই, মন্ত্রোচ্চারণ ব্যতিরেকে যজ্ঞ হইত না। সমাবর্তন সংস্কারের পর উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী গুরুকুল হইতে স্বগৃহে ফিরিয়া, একটি অগ্নিশালাতে অগ্নিস্থাপন পূর্বক সাগ্নিক হইতেন। অগ্নিস্থাপনের নাম, অগ্ন্যাধান। এই স্থাপিত অগ্নির নাম, গার্হপত্য অর্থাৎ গৃহপতির অগ্নি। অগ্নিশালায় এই অগ্নিকে দিবারাত্র প্রজ্বলিত রাখিতে হইত। এই অগ্ন্যাধানের মুখ্য কাল, বিবাহের সময়। একালের কুলদেবতার মন্দিরের পরিবর্তে, সেকালে প্রতি দ্বিজ গৃহস্থের বাড়ীতে এইরূপ এক একটি অগ্নিশালা থাকিত। যজ্ঞ শব্দের ব্যাপক অর্থ—পূজন। ইহার সঙ্কীর্ণ অর্থ—আহবনীয় অগ্নিতে যজতের বা দেবতার উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য-ত্যাগ। আহবনীয় অগ্নিতে যজতের উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণের সহিত দ্রব্যত্যাগ বা দ্রব্যাহুতিই ছিল সেকালে দেবতার পূজা। ইহাই দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ। হোমাগ্নিতে যজ্ঞ-দ্রব্যের আহুতির সময় বলা হইত—ইদং অমুক দেবতায়ৈঃ ন মম, এই দ্রব্য অমুক দেবতার আমার নয়। ইহাতে আছে—মমত্ব-বিসর্জন বা স্বার্থবলি। এই স্বার্থবলিই যজ্ঞের সার তত্ত্ব। সেকালে যজতগণের উদ্দেশ্যে দ্রব্যাহুতি এবং ঋত্বিকগণকে দান যে একমাত্র করণীয় ছিল, তাহা নহে। সাধ্যমত অতিথি-

বৈদিক কর্ম, অর্থাৎ বৈদিক যজ্ঞ

অভ্যাগতের এবং দরিদ্র নরনারায়ণের সেবার ব্যবস্থাও যজমানের কর্তব্যের মধ্যে ছিল। সকলে বিশ্বাস করিত যে, যিনি যজ্ঞকালে, দেব-সেবায় ও জন-সেবায় অকাতরে নিজের বহুমূল্য সম্পত্তি উৎসর্গ করেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গপথের পথিক। সেই কারণ, স্বর্গকামী রাজা যজ্ঞকালে সর্বস্বদানেও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। ত্যাগই ছিল যজ্ঞকর্মের মর্মকথা। যে দেবতারই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হোক্ না কেন, যজ্ঞীয় দ্রব্য অগ্নিতে আহুতি দিতে হইবে—ইহা বেদ-বিধি। অগ্নি স্বয়ং এক দেবতা, তদ্ভিন্ন তিনি অন্য দেবতাগণের প্রতিনিধি। (১) অগ্নিহোত্র যাগ গৃহস্থের অগ্নিশালায় হইত। কিন্তু ইষ্টিযাগ, পশুযাগ এবং সোমযাগের পূর্বে যজ্ঞায়তন-নির্মাণ ও বেদী-নির্মাণ করিতে হইত। তথায় অরণি-কাষ্ঠের দ্বারা যজ্ঞীয় অগ্নি মন্ত্রোচ্চারণের সহিত প্রণীত হইয়া, কাষ্ঠচূর্ণ ও ঘৃতধারার সহিত প্রজ্বলিত হইত। ইহাই যজ্ঞীয় অগ্নি। এই যজ্ঞীয় অগ্নিতে যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইত—অন্য অগ্নিতে নহে। মোটামুটি, বৈদিক যজ্ঞ চারি শ্রেণীর—অগ্নিহোত্রযাগ, ইষ্টিযাগ, পশুযাগ এবং সোমযাগ। অগ্নিহোত্রযাগ নিত্যকর্মের, ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ নৈমিত্তিক কর্মের, এবং সোমযাগ কাম্যকর্মের অন্তর্গত।

বৈদিক নিত্যকর্ম প্রধানতঃ তিনটি—অগ্নিহোত্রযাগ, সন্ধ্যাবন্দনা এবং স্বাধ্যায়।

বৈদিক নিত্যকর্ম

অগ্নিহোত্রযাগ—ইহা প্রতিদিন প্রত্যেক দ্বিজ সাগ্নিক গৃহীর যাবজ্জীবন অবশ্য করণীয় ছিল। অগ্নিহোত্র যজ্ঞে প্রয়োজন তিনটি অগ্নির—যজ্ঞবেদির পশ্চিমে গার্হপত্য বা গৃহপতির অগ্নি, পূর্বে আহবনীয় বা দেবগণের অগ্নি এবং দক্ষিণে দক্ষিণাগ্নি বা পিতৃগণের প্রতিনিধি অগ্নি।

(১) ২০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, গার্হপত্য দিবারাত্র প্রজ্বলিত থাকিত। যজ্ঞের সময় ঐ অগ্নি হইতে আহবণীয় ও দক্ষিণাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইত। প্রাতে ও সন্ধ্যায় এই তিনটি অগ্নিতেই আহুতি দেওয়ার বিধি। তন্মধ্যে আহবণীয় অগ্নিতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক একটি আহুতি দেওয়াই প্রসিদ্ধ। আহবণীয় অগ্নিতে, প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের পর সূর্যদেবতার এবং সন্ধ্যাকালে সূর্যাস্তের পূর্বে অগ্নি-দেবতার উদ্দেশ্যে, যথাক্রমে "সূর্যায় স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা" এবং "অগ্নয়ে স্বাহা, প্রজাপতয়ে স্বাহা" মন্ত্রোচ্চারণের সহিত কিছু তাজা দুগ্ধ আহুতি দিতে হইত। ইহাই অগ্নিহোত্রযাগ। অগ্নিহোত্রের মন্ত্র অতি সরল। বিনা ঋত্বিকের সাহায্যে গৃহস্থগণ সেই সরল মন্ত্র পাঠ করিয়া এই যাগ করিতে পারিতেন, ইহা সম্পূর্ণ আড়ম্বরশূন্য। সাগ্নিক দ্বিজস্ত্রীদেরও অগ্নিহোত্রযাগে হোম করিবার অধিকার ছিল। স্বামী যখন প্রবাসে থাকিতেন, তখন তাঁহার পত্নী এই যাগে প্রতিনিধিত্ব করিতেন। এমন কি, অনূঢ়া দ্বিজ-কন্যারও পিতার প্রতিনিধিরূপে হোমকর্তৃত্ব ছিল। এই যাগ কোন দিন বন্ধ থাকিত না। অগ্নিহোত্রযাগে প্রতিদিন সূর্য ও অগ্নি এই দেবতাদ্বয়ের পূজার তাৎপর্য আছে। দ্যুলোকে সূর্য এবং ভূলোকে অগ্নি, এই দুই দেবতার শক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক। দ্যুলোকে সূর্য স্বশক্তিতে গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি অন্য নভশ্চরগণকে আপনার চারিধারে নিয়ত ঘোরাইতেছেন। পৃথিবীতে তাপ-গতির উৎপত্তি তাঁহারই রশ্মিধারা হইতে। তাঁহার শক্তিতেই শীত-গ্রীষ্মাদি ষড় ঋতুর আবির্ভাব, বসুন্ধরা শস্যশ্যামলা, এবং পৃথিবী জীবের বাস-যোগ্য। তাঁহার শক্তি ব্যাধি-নাশক—পরমায়ু-বর্ধক। এক কথায়, তিনি বিশ্বের প্রসবিতা—ধারয়িতা—পালয়িতা। ভূলোকে অগ্নির সদৃশ শক্তিশালী আর কিছু নাই

অন্তরে বাহিরে সর্বত্র অগ্নির কাজ। আমাদের আহার্য প্রস্তুতের জন্য অগ্নির প্রয়োজন। দেহ-যন্ত্র চলিতেছে অগ্নির তাপে। ভুক্তান্নের পরিপাক হয় জঠরাগ্নিতে এবং তাহা হইতে উদ্ভূত হয় প্রাণ-শক্তি। দেহাভ্যন্তরস্থ অগ্নি নির্বাপিত হইলে রোগী হিমাঙ্গ হইয়া যায় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মনের মধ্যে যে অগ্নি, তাহাই মনের তেজ। ভূগর্ভে যদি অগ্নি না থাকিত তবে পৃথিবী বরফ হইয়া যাইত, জীববাসের অযোগ্য হইত। সূর্য ও অগ্নি যে কেবল শক্তিশালী, তাহা নহে। তাঁহারা জ্যোতিঃস্বরূপ। তাঁহাদের যজন বা পূজনের দ্বারা যজমানের অন্তরে অধ্যাত্মজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হয় এবং তাহার আলোকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হইয়া যায়। সেই নিমিত্ত এই দুই দেবতার নিত্য পূজার বিধি অগ্নিহোত্রযাগে।

সন্ধ্যা-বন্দনা—শুধু সন্ধ্যা নামেও অভিহিত। দিবা ও রাত্রির সন্ধিকালকে সন্ধ্যা বলে। সেই সময়ে সগুণব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের বন্দনা—সন্ধ্যা-বন্দনা বা সন্ধ্যা। বৈদিক যুগে দ্বৈকালিক সন্ধ্যার ব্যবস্থা ছিল। প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে। শ্রুতি বলিয়াছেন—সন্ধ্যা সকুশোঽহরহরুপাসীত, দিবারাত্রির সন্ধিক্ষণে আসনস্থ হইয়া সর্বদা পরমেশ্বরের উপাসনা বা চিন্তা করিবে। (১) সূর্যের উদয় ও অস্ত হইবার সময় যে বুদ্ধিমান মনুষ্য ব্রহ্মচিন্তন করেন, তিনি সকল প্রকার কল্যাণ প্রাপ্ত হন। (২) অতএব, দিবারাত্রির সংযোগ-কালে, অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে মনুষ্যগণের সন্ধ্যা-বন্দনা কর্তব্য। (৩)

(১) বৃঃ জাঃ উঃ, ৩।৮

(২) উদ্যন্তমস্তং যন্তমাদিত্যমভিধ্যায়ন্ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ সকলং ভদ্রমশ্নুতে ॥

—তৈঃ ব্রাঃ, ২।২।২

ব্রাহ্মণ=মনুষ্য।

(৩) তস্মাদহোরাত্রস্য সংযোগে ব্রাহ্মণঃ সন্ধ্যামুপাসীত ॥ —ষঃ ব্রাঃ, ৪।৫

বৈদিক সন্ধ্যার প্রক্রিয়া খুব সংক্ষেপে এইরূপ (১)—প্রথমে মন্ত্রসহ আচমন, অর্থাৎ জলদ্বারা বিধিপূর্বক দেহশোধন; তারপর, যথাক্রমে ইন্দ্রিয়স্পর্শ, মার্জন বা শুদ্ধিকরণ, প্রাণায়াম, অঘমর্ষণ বা ঈশ্বর-রচনা-চিন্তন, মনসাপরিক্রমা, উপস্থান, গায়ত্রী বা সাবিত্রী, সমর্পণ, নমস্কার এবং শান্তিপাঠ। এই সকল প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটির জন্য এক এক বৈদিক মন্ত্র আছে। সেই সেই মন্ত্রোচ্চারণে সেই সেই প্রক্রিয়ার সাধন করিতে হয়। এই মন্ত্রগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঋগ্বেদে দশম মণ্ডলে ১৯০ সূক্তে সৃষ্টি-রচনা-সম্বন্ধীয় তিনটি মন্ত্র। (২) এই তিনটি মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি, অঘমর্ষণ। সেই কারণ, ইহা অঘমর্ষণ মন্ত্র বলিয়া খ্যাত। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ গায়ত্রী বা সাবিত্রীমন্ত্র সর্বজনবিদিত; এই মন্ত্রের (৩) দ্রষ্টা ঋষি, বিশ্বামিত্র। ইহা ব্যতীত যজুর্বেদ হইতে আচমন মন্ত্র ও উপস্থান মন্ত্র এবং অথর্ববেদ হইতে মনসাপরিক্রমা মন্ত্র গৃহীত।

স্বাধ্যায়—সিদ্ধশাস্ত্রের নিত্যপাঠ। স্বাধ্যায়ের রীতি সকল ধর্মেই আছে। যেমন—খ্রীষ্টপন্থীর নিত্য বাইবেল-পাঠ, ইস্‌লামপন্থীর নিত্য কোরাণ-পাঠ, পারসিকের নিত্য গাথা-পাঠ ইত্যাদি। হিন্দুর সিদ্ধশাস্ত্র—বেদ। উপনিষদ্ বেদের অন্তঃপাতী। ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর এই চারিখানা উপনিষদ্ পদ্যে রচিত। এই চারিখানাই ছিল সেকালে পারমার্থিক তত্ত্বকথার স্মারকরূপে নিত্য-পাঠ্য স্বাধ্যায়। (৪)

বেদ-বিহিত নৈমিত্তিক কর্মে ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ, এই দুই যাগ এবং ষোড়শ সংস্কার বুঝায়।

---

(১) স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকৃত "বৈদিক সন্ধ্যা"।
(২) ২৯৫ পৃষ্ঠায় পাদটীকা (২) দ্রষ্টব্য
(৩) ঋক্‌, ৩।৬২।১০
(৪) ৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইষ্টিযাগ—আহিতাগ্নি গৃহস্থের করণীয়। ইহা দুই প্রকার—দর্শ ও পৌর্ণমাস। যজ্ঞীয় অগ্নিতে প্রতি অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় যজমানকে ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশ্যে "অগ্নয়ে স্বাহা, সোমায় স্বাহা" এই দুই মন্ত্রোচ্চারণের সহিত দধি আহুতি দেওয়াই ইষ্টিযাগ। অমাবস্যার ইষ্টিযাগ—দর্শযাগ। পূর্ণিমার ইষ্টিযাগ—পৌর্ণমাসযাগ। এই দুইটিতে ঋত্বিকের প্রয়োজন ছিল। এই দুই যাগ যাবজ্জীবন করার বিধি, ন্যূনপক্ষে ত্রিশ বৎসর। উভয় যজ্ঞের বিধি-বিধান প্রায় একরূপ। দর্শ-পৌর্ণমাস যাগদ্বয় অপেক্ষাকৃত সরল ছিল। ইহাতে বেশী দ্রব্যের আয়োজন করিতে হইত না এবং ব্যয়-বাহুল্য ছিল না। ইহাতে পশুবলির বা সোমাহুতির প্রয়োজন ছিল না।

বৈদিক নৈমিত্তিক কর্ম

পশুযাগ—ইহাতে পশুবলি দিতে হইত। ইহা নানাবিধ। তাহার মধ্যে একটি ছিল অবশ্য-কর্তব্য—নিরূঢ় পশুবন্ধযাগ। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে পূর্ণিমায়, অথবা অমাবস্যায়, এই যাগ করিতে হইত।

ষোড়শ সংস্কার—সংস্কারের অর্থ, মন্ত্রাদির দ্বারা শোধন। নিজ নিজ ধর্মানুযায়ী কতকগুলি নির্দিষ্ট বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা মানব-জীবনের শোধন বা সংস্কার অল্প-বিস্তর সকল ধর্মেই স্থান পাইয়াছে। কোন ধর্মের নির্দিষ্ট সংস্কার অনুষ্ঠিত না হইলে, কোন ব্যক্তি সেই ধর্মের আওতায় আসে না। হিন্দুধর্মে ইহা কিছু বেশী। মাতৃগর্ভে গর্ভ-সঞ্চারের প্রাক্কাল হইতে জন্ম হওয়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত, সমগ্র মানব-জীবনের প্রতি অবস্থা-পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে, এক এক সংস্কারের ব্যবস্থা হিন্দুধর্ম করিয়াছেন। মর্ম—জীবনের অঙ্কুরাবস্থা হইতে শেষ অবধি, প্রত্যেক নূতন অবস্থার প্রারম্ভে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই

অবস্থার উপযোগী পবিত্র মন্ত্রাদিসহ বাহ্যানুষ্ঠানের সাহায্যে আধ্যাত্মিক সত্তার সংস্পর্শে শোধন করিয়া লওয়া। সমগ্র মানব-জীবনে এইরূপ ছোট বড় নূতন নূতন অবস্থার পরিবর্তন যাহা ঘটে, তাহার সংখ্যা প্রায় বায়াম। তাহাদের ভিতর হইতে বেদ ষোলটি বাছিয়া লইয়া, তদনুরূপ ষোলটি সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, মুণ্ডন, কর্ণবেধ, উপনয়ন, বেদারম্ভ, সমাবর্তন, বিবাহ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস এবং অন্ত্যেষ্টি —এই ষোড়শ সংস্কার। বিবাহিতা পত্নীর ঋতুকালে চতুর্থ দিবসে ঋতুস্নানের পর, তাহার গর্ভে শুক্র-শোণিতের সমবায়—গর্ভাধান। ইহাকে স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বিবাহও বলা হয়। পুরুষের স্ত্রী-সংসর্গ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার জন্য নহে—সন্তান-লাভের জন্য, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। আর বলিষ্ঠ ও উত্তম পুত্রের প্রয়োজন সমাজ-রক্ষার জন্য। তাই স্ত্রীগর্ভে শুক্র-শোণিতের সমবায়ে যাহাতে বলিষ্ঠ ও উত্তম সন্তান লাভ হয়, সেই অভিপ্রায়ে গর্ভাধান-সংস্কারে পবিত্র বৈদিক মন্ত্রের (১) উচ্চারণে স্ত্রীগর্ভকে শোধিত করিয়া লইতে হয়। গর্ভ-সঞ্চারের তৃতীয় মাসে গর্ভস্থ শিশুর অন্নময় কোষ ও প্রাণময় কোষ গঠিত হয়। সেই কালে মন্ত্রদ্বারা সেই কোষদ্বয়ের শোধন—পুংসবন। এই সংস্কারে দিব্যগুণযুক্ত কতকগুলি ওষধি গর্ভিণী মাতাকে দেওয়ার কথা। (২) গর্ভ-সঞ্চারের সপ্তম মাসে গর্ভস্থ শিশুর

(১) পরিহস্ত বি ধারয় যোনিং গর্ভায় ধাতবে।—অথর্ব, ৬।৮১।২

অর্থ—হে শক্তিময় পুরুষ! গর্ভের পুষ্টির জন্য স্ত্রী-যোনিকে বিশেষরূপে রক্ষা কর।

(২) তাস্ত্বা পুত্রবিদ্যায় দেবীঃ প্রাবন্ত্বোষধয়ঃ॥—অথর্ব, ৩।২৩।৬

অর্থ—হে স্ত্রী! তোমাকে গর্ভস্থ শিশুর সুষ্ঠু কোষ-গঠনের জন্য এই ওষধিসমূহ দিতেছি, এই দিব্যগুণযুক্ত ওষধিসমূহ তোমাকে রক্ষা করুক।

অন্ন কোষগুলি (৩) গঠিত হইলে, তাহাকে স্বাস্থ্যবান করিয়া তুলিতে এবং গর্ভিণী মাতাকে সকল প্রকার গ্রহপীড়া হইতে মুক্ত করিতে মন্ত্রসহযোগে শোধন-ক্রিয়া—সীমন্তোন্নয়ন। এই সংস্কার-কালে পতি বেদ-মন্ত্রে প্রার্থনা করেন—আমার সৌভাগ্যবতী স্ত্রী যেন সূক্ষ্ম সূচিদ্বারা সীবন করিবার মত অতি সাবধানে প্রজনন-কর্ম সম্পন্ন করে এবং আমাকে দানবীর, বলবান, ও যশস্বী পুত্র দান করে। (৪) গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন এই তিনটি একাধারে গর্ভিণী মাতার এবং গর্ভস্থ শিশুর সংস্কার। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মন্ত্রদ্বারা তাহার শোধন—জাতকর্ম। এই সময় পিতা ভূমিষ্ঠ সন্তানকে সম্বর্ধনা করেন এবং তাহার দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনা করেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দশম, একাদশ বা দ্বাদশ দিনে নবজাত শিশুর প্রথম একটি শুভ নাম রাখার উদ্দেশ্যে মন্ত্রসহ শোধন-ক্রিয়া—নামকরণ। শিশুকে ঘর হইতে প্রথম বাহিরে লইয়া যাওয়ার সময় মন্ত্রদ্বারা তাহার কল্যাণাত্মক শোধন-ক্রিয়া—নিষ্ক্রমণ। এই সময় বেদ-মন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়—হে শিশু! তোমার নিষ্ক্রমণ-কালে দ্যুলোক ও ভূলোক কল্যাণকারী, সন্তাপ-নাশক ও ঐশ্বর্যদাতা হোক্; সূর্য তোমার কল্যাণপ্রদ এবং বায়ু তোমার হৃদয়ের অনুকূল মঙ্গলদায়ক হোক্; দিব্যগুণযুক্ত স্বাদু জল তোমার কল্যাণকারী হইয়া প্রবাহিত হোক্।(৫) জন্মের পর ষষ্ঠ মাসে শিশুকে প্রথম অন্নাহার দেওয়ার কালে

(৩) ১২০-১২১ ও ১৫৭-১৫৮ পৃষ্ঠায় পঞ্চকোষের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৪) সীব্যত্বপঃ সূচ্যাহচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায় মুক্থ্যম্ ॥—ঋক, ২।৩২।৪

(৫) শিবে তে স্তাং দ্যাবা পৃথিবী অসন্তাপে অভিশ্রিয়ৌ।
শং তে সূর্য আ তপতু শং বাতো বাতু তে হৃদে।
শিবা অভি ক্ষরন্তু ত্বাপো দিব্যাঃ পয়স্বতীঃ ॥—অথর্ব, ৮।২।১৪

মন্ত্রসংযোগে শোধন-ক্রিয়া—অন্নপ্রাশন। সেই সময় বেদমন্ত্রে প্রার্থনা করা হয়—হে শিশু! কৃষির দ্বারা উৎপন্ন যে অন্ন তুমি ভক্ষণ করিতেছ, যে পেয় তুমি পান করিতেছ, যাহা ভক্ষ্য এবং যাহা পুরাতন হওয়ায় অভক্ষ্য, সেই সব তোমার জন্য রোগনাশক অমৃত হোক্। (১) বালকের এক বৎসর, অথবা তিন বৎসর, বয়সে কেশ-কর্তনের সময় শোধন-ক্রিয়া—মুণ্ডন। মুণ্ডনের অপর নাম, চূড়াকরণ। এই সংস্কারকালে পিতা বেদ-মন্ত্রে প্রার্থনা করেন—গোমানশ্ববানয়মস্তু প্রজাবান্: এই বালক গো, অশ্ব ও সন্তান লাভ করুক, অর্থাৎ পুত্রবিত্তশালী হোক্। (২) মুণ্ডন-কালে, অথবা বালকের পাঁচ বা সাত বৎসর বয়সে, ধাতুনির্মিত অস্ত্রদ্বারা মন্ত্রসহ কর্ণছেদরূপ শোধন-ক্রিয়া—কর্ণবেধ। এই সময় পিতা বেদ-মন্ত্রে প্রার্থনা করেন—ভদস্তু প্রজয়া বহু, এই বালক প্রজার কল্যাণকারী হোক। (৩) সেকালে আট বৎসর বয়সে প্রত্যেক দ্বিজ বালককে বেদাধ্যয়নের অভিপ্রায়ে গুরুগৃহে যাইতে হইত। গুরুগৃহে গমন-কালে মন্ত্রাদিসহযোগে শোধন-ক্রিয়া—উপনয়ন। উপনয়ন-সংস্কার সম্বন্ধে পূর্বে পঞ্চম অধ্যায়ে ব্রহ্ম-চর্যাশ্রম-প্রসঙ্গে কিছু বলা হইয়াছে (৪), এখানে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। উপবীত-ধারণ না হইলে বৈদিক যজ্ঞের অধিকার লাভ হয় না—উপবীতী হইয়া তবে বৈদিক যজ্ঞ করিতে হয়। এই কারণ,

(১) যদশ্নাসি যৎপিবসি ধান্যং কৃষ্যাঃ পয়ঃ।
যদাদ্যং যদনাদ্যং সর্বং অন্নমবিষং কৃণোমি।।
—অথর্ব, ৮।২।১৯

(২) অথর্ব, ৬।৬৮।৩

(৩) অথর্ব, ৬।১৪১।২

(৪) ২২১-২২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উপবীতকে যজ্ঞোপবীত কহে। সেই নিমিত্ত বিবাহের পর দ্বিজ-পত্নীকে যখন স্বামীর প্রবাস-কালে অগ্নিহোত্রযাগে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতে হইত, তখন দ্বিজ-পত্নীদেরও উপবীত-ধারণে অধিকার ছিল। গুরুগৃহে গমনের পর ব্রহ্মচারী দ্বিজ-বালককে বেদাধ্যয়ন করিতে হইত। সেখানে বেদাধ্যয়নের প্রাকালে মন্ত্রদ্বারা শোধন-ক্রিয়া—বেদারম্ভ। (১) পঁচিশ বৎসর বয়স অবধি গুরুগৃহে বেদাধ্যয়নাদির পর, যৌবনের আরম্ভে, উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী যখন স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিত, তখন তাহার একটি শোধন-ক্রিয়া হইত—সমাবর্তন। সমাবর্তন-সম্পর্কেও পূর্বে পঞ্চম অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম-প্রসঙ্গে কিছু কথিত হইয়াছে, (২) আর এখানে কিছু বলা অনাবশ্যক। সমাবর্তনের পর স্বগৃহে ফিরিয়া দ্বিজ-বালককে দারপরিগ্রহ করতঃ গৃহী হইতে হইত। দার-পরিগ্রহের সময় মন্ত্রাদিদ্বারা বাহ্যানুষ্ঠানসহযোগে স্ত্রী-পুরুষের শোধন-ক্রিয়া—বিবাহ। ইহাই সুবৃহৎ সংস্কার। এই সংস্কারের দ্বারা স্ত্রী-পুরুষের মিলন সংঘটিত হয়। এই মিলন, দৈহিক মিলন বা যৌন সম্বন্ধ নহে। ইহা স্ত্রীর জীবাত্মার সহিত পুরুষের জীবাত্মার মিলন—আত্মিক মিলন। বিবাহ-মন্ত্রে বলিতে হয়—যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব, আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হৌক। এই মন্ত্রে স্ত্রী-পুরুষের মনোপ্রাণ এক হওয়ার কথা। ইহাই আত্মিক মিলন। এই মিলন-মন্ত্রকে যথার্থ কার্যকরী করিতে পারিলে, বিচ্ছেদের অবকাশ থাকে না। আত্মিক মিলনে বিচ্ছেদ নাই। এই নিমিত্ত বলা

(১) বর্তমানকালে গুরুকুল নাই, বেদাধ্যয়নও নাই, বেদারম্ভও নাই। এখন বালকের পাঁচ বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভ বা অক্ষরাভ্যাস সংস্কার হয়, চলিত কথায় যজ্ঞে হাতে-খড়ি।

(২) ২২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হয় যে, হিন্দুধর্মে বিবাহ-বিচ্ছেদের স্থান নাই। বিবাহিতা পত্নী— ধর্মপত্নী। বৈদিক বিবাহ-সংস্কারে পতিকে এই বেদ-মন্ত্র পাঠ করিতে হয়—হে বরাননে! ঐশ্বর্যযুক্ত আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি, ধর্ম সাক্ষ্য করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি; ধর্মতঃ তুমি আমার পত্নী এবং আমি তোমার স্বামী। (১) বিবাহিতা পত্নী শুধু ধর্মপত্নী নহেন—পতির অর্ধাঙ্গিনী। অতএব, আর্যহিন্দুর দৃষ্টিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ অঙ্গ-বিচ্ছেদের মত অস্বাভাবিক। (২) সকল ধর্মকর্মে পত্নীর আসন বাম দিকে। সেই হেতু দেখা যায় যে, সীতার অনুপস্থিতিতে শ্রীরামচন্দ্রকে সোনার সীতা বামে রাখিয়া যজ্ঞ করিতে হইয়াছিল। পতিব্রতা বিধবা নারী স্থূল দেহের অবসানে সূক্ষ্মশরীরে পরলোকে গমনান্তর মৃত স্বামীর সূক্ষ্মশরীরের সহিত মিলনের আশায় ইহলোকে বৈধব্য-যন্ত্রণা অম্লানবদনে সহ্য করেন। ইহাই হিন্দু-নারীর পাতিব্রত্যের মহান্ আদর্শ। বৈদিক যুগে বিধবা-বিবাহ হইত, ইহা সত্য; কিন্তু তাহা অসমর্থপক্ষে। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ-কালে শোধন-ক্রিয়া—বানপ্রস্থ। সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশকালে শোধনক্রিয়া—সন্ন্যাস। জীবনাবসানে জীবাত্মা যখন পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করেন, তখন মন্ত্রাদিসহকারে শ্মশান

(১) ভগস্তে হস্তমগ্রহীৎ সবিতা হস্তমগ্রহীৎ।
পত্নী ত্বমসি ধর্মণাহং গৃহপতিস্তব ॥

—অথর্ব, ১৪।১।৫১

(২) ঈশাও (Jesus) অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন—

Have ye not read, that he which made them (স্ত্রী-পুরুষ) at the beginning made them male and female+++and they twain shall be one flesh? Wherefore they are no more twain, but one flesh, what therefore God hath joined together, let not man put asunder.—Bible, St. Matthew, XIX, 4-6

ভূমিতে জলন্ত চিতায় এই জড় পাঞ্চভৌতিক দেহের ভস্মীকরণরূপ, শোধন-ক্রিয়া—অন্ত্যেষ্টি। অন্ত্যেষ্টি-সংস্কারই শেষ সংস্কার—স্থূলশরীর সম্বন্ধে শেষ কৃত্য।

পুত্র-বিত্ত-স্বর্গ ইত্যাদি কামনায় যে শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান, তাহাই কাম্যকর্ম। এইরূপ বেদ-বিহিত কাম্যকর্ম—সোমযাগ।

বৈদিক কাম্যকর্ম

সোমযাগ ছিল সেকালের মহোৎসব। ইহা ছোট-বড় নানাবিধ। ছোটগুলি একদিনেই শেষ হইত। কিন্তু বড়গুলিতে আয়োজনপর্বেই সারা বৎসর কাটিয়া যাইত। যেমন—জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয় ইত্যাদি। এই সকল বড় সোমযাগে বহু দ্রব্যের প্রয়োজন হইত, বহু ঋত্বিককে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া দান-দক্ষিণা দিতে হইত এবং সকল অতিথি-অভ্যাগতকে ও দরিদ্র নারায়ণকে অকাতরে ভক্ষ্য-ভোজ্য দান করিতে হইত। এই আড়ম্বরপূর্ণ সোমযাগ ধনী ব্যতীত অন্ত লোকের সাধ্যাতীত ছিল। এই সকল বড় বড় সোমযাগে চারি শ্রেণীর ঋত্বিকের আবশ্যক—হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু ও ব্রহ্মা। হোতা ঋগ্বেদের মন্ত্রপাঠ করিতেন; উদ্গাতা সামবেদের মন্ত্র স্বর-লয়-যোগে গান করিতেন; অধ্বর্যু যজুর্বেদের বিধানানুযায়ী যাবতীয় কার্য নিজে করিতেন; এবং ব্রহ্মা প্রধান পুরোহিতরূপে সকল কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। সোমযাগের প্রারম্ভে অগ্নি-স্থাপন, মধ্যে পশুযাগ এবং সর্বশেষে সোমাভিষব ও সোমপান। সেকালে সকলের বিশ্বাস ছিল যে, সোমযাগের দ্বারা যজমানের কাম্যপ্রাপ্তি হয় এবং ব্রহ্মজন্ম লাভ হয়, অর্থাৎ যজমান স্বর্গধামে স্থান পাইবার অধিকারী হয়। আজকাল যেমন ধারণা যে, দীক্ষার বা গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণের পর দীক্ষিত শিষ্যের ব্রহ্মজন্ম লাভ হয়—অর্থাৎ, সে ব্রহ্মের বা শ্রীভগবানের সাধনায়

অধিকারী হয়। সোমযাগের প্রধান অঙ্গ ছিল পাঁচটি—দীক্ষণীয় ইষ্টি, প্রায়ণীয় ইষ্টি, প্রবর্গ্য ক্রিয়া, পশুযাগ এবং সোমযাগ। যাজ্ঞিকগণ মনে করিতেন—দীক্ষণীয় ইষ্টিতে যজমানের ব্রহ্মজন্মের বা নূতন জীবনের গর্ভাধান হয়; প্রায়ণীয় ইষ্টিতে গর্ভস্থ নবজীবনের অন্ন আহরণ করা হয়; প্রবর্গ্য ক্রিয়াতে গর্ভস্থ নবজীবনের পোষণের উপযুক্ত কার্য হয়; পশুযাগে যজমানের পশুজন্মের বিনাশ হয়; এবং অবশেষে সোমযাগে সোমপান করিয়া যজমান নূতন জীবনে সজীব হইয়া উঠে, সে জীবনের আর মৃত্যু নাই। হবিঃশেষ ভক্ষণ না করিলে, সকল যজ্ঞই অসম্পূর্ণ হয়। তাই, অগ্নিহোত্রযাগের পর আহুতি দেওয়া দুধের কিছুটা যজমানকে খাইতে হয়, দর্শ-পৌর্ণমাসযাগে পুরোডাশের কিছু অংশ যাগের পর খাইতে হয়, পশুযাগেও আহুতি দেওয়া পশুমাংসের খানিকটা খাইতে হয়, সোমযাগে আহুতি দেওয়া সোমরস পান করিতে হয়।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। যজ্ঞ শব্দের প্রতিশব্দ, অধ্বর। ধ্বর, অর্থাৎ হিংসা। অধ্বর, অর্থাৎ অহিংসা। অতএব, যজ্ঞ বলিলে যথার্থতঃ অহিংসাত্মক যজ্ঞ বুঝায়। ইহা হইতে স্পষ্টতঃ অনুমান হয় যে, বৈদিক যজ্ঞ আদিকালে অহিংসাত্মকই ছিল, ইহাতে পশুবলি হইত না। সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে পশুযাগে ও সোমযাগে পশুবলির প্রবর্তন হয়। (১) পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞের সার কথা—স্বার্থবলি। যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ—আহবনীয় অগ্নিতে দেবতার

বৈদিক যজ্ঞ মূলতঃ অহিংসক

(১) কি প্রকারে পশুবলির প্রবর্তন হয়, তাহার কিছু ইঙ্গিত স্বর্গীয় আচার্য শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের "যজ্ঞকথা"তে পাওয়া যায়।

উদ্দেশ্যে মমত্ববোধ-বিসর্জনে দ্রব্যের আহুতি। যে বস্তু প্রিয়তম, তাহার উপর মানুষের মমত্ববোধ সর্বাপেক্ষা বেশী। সেই বস্তু—নিজের প্রাণ। সেই হেতু আহবনীয় অগ্নিতে দেবোদ্দেশে মমত্ববোধ ত্যাগ করিয়া নিজের প্রাণকে আহুতি দিতে পারিলেই সর্বোৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। তাই, নিজের প্রতিনিধিস্বরূপে অন্য প্রাণীর প্রাণবলি প্রবর্তিত হইল, যজমানের প্রতিনিধিস্বরূপে পশুবলি দেখা দিল। এই একের প্রতিনিধিস্বরূপ অন্যকে সম্প্রদানের নাম, নিষ্ক্রয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই নিষ্ক্রয় শব্দের নাকি স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, যজ্ঞীয় পশু যজমানের প্রতিনিধি। (২) বৈদিক ঋষি পশ্চাৎ এই নিষ্ক্রয়বাদের আরো কিছু প্রসার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—মানুষের পরিবর্তে যেমন ঘোড়া-গরু-ছাগল-ভেড়া বলি দেওয়া যায়, তেমনি যে কোন পশুর পরিবর্তে ব্রীহিধান ও যব দেবতার চরণে উৎসর্গ করা যাইতে পারে। পুরোডাস—এই ব্রীহিধান ও যবের দ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার রুটি। ইহার পর হইতে পশুযাগে ও সোমযাগে পশুমাংসের বদলে পুরোডাসের আহুতি আংশিকভাবে প্রচলিত হয়। আজকাল বৈদিক যজ্ঞকর্ম অপ্রচলিত। তবে অহিংসাত্মক বৈদিক যাগের কিছু কিছু বর্তমানে আর্যসমাজ

(২) নিষ্ক্রয়কে ইংরাজীতে Vicarious offering কহে। যজ্ঞানুষ্ঠানে এই নিষ্ক্রয়-প্রথা বহু দেশে প্রচলিত। খ্রীষ্টীয় ধর্মের মূলে এই নিষ্ক্রয়বাদ। সেই ধর্ম বলেন যে, সমস্ত মানবজাতি পিতা আদমের (Adam) পাপে পাপী। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য Sacrifice দরকার। ঈশ্বর-পুত্র ঈশা (Jesus) মানব-দেহ-ধারণে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি শেষে নিষ্ক্রয়স্বরূপ সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধিরূপে ক্রুসে (Cross) চড়িয়া আপনার প্রাণবলি দিলেন। ইহাও Vicarious Sacrifice—এক মহাযজ্ঞ। ইহুদীদের মধ্যে নিষ্ক্রয়বাদ প্রচলিত ছিল; জেহোবার মন্দিরে পশুবলি হইত।

—যজ্ঞকথা

পুনঃপ্রচলন করিয়াছেন। যেমন—অগ্নিহোত্রযাগ, ইষ্টিযাগ ইত্যাদি। বাঙ্গলাদেশে ইদানীং অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণবংশ দুই একটি দেখা যায়। কোথাও কোথাও কদাচিৎ পুত্রেষ্টিযাগও হয়।

শাস্ত্রবিহিত বিধি-নিষেধের উল্লঙ্ঘনকে পাপ বলে। যে কর্মের দ্বারা সেই পাপের ক্ষয়-সাধন হয়, তাহাই প্রায়শ্চিত্ত। বৈদিক যুগে প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। তবে পরবর্তীকালে স্মৃতিকারগণ বিশেষভাবে এই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন এবং পাপের গুরুত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত-কর্মের ব্যবস্থা করেন। বৈদিক যুগে পাপ-ক্ষালন যে অভিপ্রেত ছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ বেদ-মন্ত্রে পাওয়া যায়। বৈদিক ঋষি বলিতেছেন—হে বিশ্বদেবগণ! আমরা যে সব জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পাপকর্ম করিয়াছি, সমপ্রীতিযুক্ত তোমরা সেই সব হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর; জাগ্রতাবস্থায় বা স্বপ্নাবস্থায় যে সব পাপ করিয়াছি, অতীতে যে পাপ করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে যাহা করিব, কাষ্ঠবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার ন্যায় সেই সব হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর। (৩)

বৈদিক প্রায়শ্চিত্ত

(খ) স্মার্ত কর্ম।

স্মৃতিশাস্ত্র-বিহিত কর্ম—স্মার্ত কর্ম। স্মৃতি বেদানুগামী। বৈদিক কর্মের সহিত স্মার্ত কর্মের ঠিক বিরোধ নাই। তবে বৈদিক কর্ম

(৩) যদ্বিদ্বাংসো যদবিদ্বাংস এনাংসি চকৃমা বয়ম্।
যূয়ং নস্তস্মান্মুংচত বিশ্বদেবাঃ সজোষসঃ ॥
যদি জাগ্রদ্যদি স্বপন্নেন এনস্যোঽকরম্।
ভূতং মা তস্মাদ্ভব্যং চ দ্রুপদাদিব মুংচতাম ॥

—অথর্ব, ৬।১১৫।১-২

ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া পড়িলে, স্মৃতিকার ঋষিগণ ব্যক্তি-সমাজ-জাতির কল্যাণার্থে সেই সকল কর্মকে যুগোপযোগী করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন।

স্মার্ত নিত্যকর্ম—পঞ্চ মহাযজ্ঞ

স্মৃতি-বিহিত নিত্যকর্ম—পঞ্চ মহাযজ্ঞ। মানুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে, সৃষ্টির এক অংশ মাত্র। যেমন অংশ অংশীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, তেমনি মানুষ সৃষ্টিকে ছাড়িয়া কেবল একক থাকিতে পারে না। তাহা পারে না বলিয়াই সে জন্মাবধি অপরের কাছে ঋণী। মানুষ ঋণী দেবতাদের কাছে; কেননা, দেবতাদের শক্তিপ্রয়োগে বায়ু-তাপ-আলো-বৃষ্টি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে মানুষ পায়, তাহা না পাইলে তাহার অস্তিত্ব থাকিত না। মানুষ ঋণী পিতৃগণের বা স্বর্গীয় পূর্বপুরুষগণের কাছে; কেননা, তাঁহাদের বংশে তাহার জন্ম এবং তাঁহাদের বংশ-গৌরবে সে গৌরবান্বিত। মানুষ ঋণী সত্যদ্রষ্টা শাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণের কাছে; কেননা, তাঁহাদের রচিত শাস্ত্রপাঠে মানুষ অতীন্দ্রিয় দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া দিব্যজীবনলাভের অভিলাষী হয় এবং সত্য পথ দেখিতে পায়। মানুষ ঋণী অপর মানুষের কাছে; কেননা, মানুষ অন্য মানুষের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবন-নির্বাহ করিতে পারে না। মানুষ ঋণী মানবেতর অপর প্রাণীর কাছে; কেননা, মানুষ গো-ছাগল-মহিষাদি অপর প্রাণীর সাহায্য ছাড়াও থাকিতে পারে না। মানুষের এই পঞ্চ প্রকার ঋণ—দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ, ঋষি-ঋণ, নৃ-ঋণ এবং ভূত-ঋণ। এই পঞ্চবিধ ঋণের পরিশোধ প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। আত্মত্যাগের দ্বারা এই সকল ঋণের পরিশোধ হয় বলিয়া, এক এক ঋণ-পরিশোধ এক এক যজ্ঞ নামে অভিহিত।

যথা—দেব-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, ঋষি-যজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ ও ভূত-যজ্ঞ। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ।

দেব-যজ্ঞ—আমরা স্থূলশরীরে এই স্থূললোকের বা পৃথিবীর অধিবাসী। দেবগণ সূক্ষ্মশরীরে সূক্ষ্মলোকের বা দেবলোকের অধিবাসী। সেই দেবলোক হইতে তাঁহারা আলো, তাপ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বায়ু, ইত্যাদি বিশ্বের মৌলিক বা ভৌতিক শক্তিনিচয়কে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁহারা প্রসন্ন হইলে ঐ সকল শক্তিকে আমাদের হিতার্থে পরিচালিত করেন। এই নিমিত্ত তাঁহাদের প্রীতির উদ্দেশ্যে এবং তাঁহাদের নিকট আমাদের ঋণ পরিশোধার্থে তাঁহাদের নিত্য পূজা করা আমাদের উচিত। দেব-পূজায় অর্ঘ্যাঞ্জলি এবং হোমে মমত্ববোধ-ত্যাগে যজ্ঞীয় দ্রব্যের আহুতি দিতে হয়। ইহা আত্মত্যাগের কথা, অতএব যজ্ঞ।

পিতৃ-যজ্ঞ—পিতৃ শব্দের দ্বারা দুই শ্রেণীর পিতৃপুরুষ লক্ষিত হয়। একটি অমানব, আর একটি মনুষ্যজাত। ব্রহ্মার মানসজাত মরীচি, অত্রি প্রভৃতি দশ প্রজাপতি (১) সকল প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা, সেই হেতু তাঁহারা আমাদের পিতৃস্থানীয়। তাঁহারা অমানব পুরুষ। তাঁহারা সৃষ্টির প্রথমাবধি পিতৃলোকের বা ভুবর্লোকের অধীশ্বররূপে বিরাজমান। তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর পিতৃপুরুষ। আর, আমাদের মৃত পূর্বপুরুষগণ মনুষ্যজাত, তাঁহারা স্থূলদেহের অবসানে সূক্ষ্মদেহে পিতৃলোকে গমন করেন এবং তথায় বাস করেন। ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর পিতৃপুরুষ। সচরাচর পিতৃপুরুষ বলিলে ঐ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মৃত পূর্বপুরুষগণকে বুঝায়। পিতৃপুরুষগণ সূক্ষ্মশরীরী এবং আমাদের অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী। তাঁহাদের স্নেহাশীর্বাদে

---

(১) ২৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আমাদের শুভ কামনা সুসিদ্ধ হয়। তাঁহাদের নিকট আমাদের জন্মগত ঋণের পরিশোধকল্পে এবং তাঁহাদের কৃপা-আশীর্বাদ লাভার্থে, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে হোমে দ্রব্যাহুতি ও অর্ঘ্যাঞ্জলি ইত্যাদি দেওয়ার নাম, পিতৃযজ্ঞ। পিতৃ-তর্পণ পিতৃযজ্ঞের অন্তর্গত। তর্পণের দ্বারা তাঁহারা তৃপ্ত হন। আত্মত্যাগের কথা থাকায়—পিতৃযজ্ঞ। পিতৃশ্রাদ্ধও এক প্রকার পিতৃ-তর্পণ; কারণ, ইহার দ্বারা পিতৃপুরুষগণ তৃপ্ত হন।

ঋষি-যজ্ঞ—ইহার অপর নাম, ব্রহ্মযজ্ঞ। ঋষিযজ্ঞে কোন হোম হয় না এবং কোন অর্ঘ্যাঞ্জলিও দিতে হয় না। স্বাধ্যায়, অর্থাৎ ঋষিদের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ, এবং সন্ধ্যাবন্দনা এই দুইটি ইহার প্রধান অঙ্গ। নিত্য এই দুইটি কর্ম করিলেই ঋষিগণ সন্তুষ্ট হন, তাঁহাদের নিকট আমাদের জন্মগত ঋণের পরিশোধ হয়। স্বাধ্যায়ের ও সন্ধ্যাবন্দনার জন্য নিত্য আমাদিগকে অন্য কার্য ত্যাগ করিয়া কিছু সময় অতিবাহিত করিতে হয়। এখানেও কিছুটা আত্মত্যাগের কথা থাকায়, ইহাকেও যজ্ঞ কহে। স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী সন্ধ্যাবন্দনা ত্রৈকালিক। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে এবং সায়ংকালে এই তিনবার প্রত্যহ ইহা কর্তব্য। বৈদিক সন্ধ্যা এবং স্মার্ত সন্ধ্যা এই দুইটির ভিতর সামান্য প্রক্রিয়াভেদ আছে। স্মার্তসন্ধ্যায় আচমন, সংকল্প, বিনিয়োগমন্ত্র, প্রাণায়াম, উপস্থান এবং গায়ত্রী করণীয়। ইহাদের প্রত্যেকটির মন্ত্র আছে, তাহা পাঠ করিতে হয়। ঋগ্বেদের সৃষ্টি রচনাবিষয়ক প্রসিদ্ধ তিনটি মন্ত্র (১) স্মার্ত সন্ধ্যার আচমন মন্ত্রে গৃহীত। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রটিও এখানে গায়ত্রী মন্ত্ররূপে গৃহীত। মনে হয়, স্মার্ত ত্রৈকালিক সন্ধ্যায় আর তেমন কোন মন্ত্র বেদ হইতে গৃহীত হয় নাই; সেগুলি পৃথক্‌ভাবে রচিত।

(১) ২৭৫ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

নৃ-যজ্ঞ—ইহাতে অতিথিসেবা এবং জনসেবা মুখ্য কর্ম। ইহার অপর নাম, অতিথিযজ্ঞ। প্রত্যহ গৃহে অতিথিভোজনই অতিথিসেবা। গৃহাগত অতিথিকে ভোজন করাইয়া গৃহস্বামী ভোজন করিবেন—এই বিধি। জনসেবার অর্থ, আর্ত-পীড়িতের সেবা। ইহার দ্বারা অপর মানুষের কাছে আপনার ঋণের পরিশোধ হয়। ইহাতেও আত্মত্যাগের প্রয়োজন। তাই, যজ্ঞ।

ভূত-যজ্ঞ—পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গাদি মানবেতর প্রাণিগণের সেবা, প্রত্যহ আমাদের খাদ্যের কিছু অংশ তাহাদিগকে দেওয়া। আত্মত্যাগের কথা, তাই যজ্ঞ। ইহার দ্বারা মানবেতর প্রাণীসমূহের কাছে আমাদের ঋণের পরিশোধ হয়।

দেবযজ্ঞে এবং পিতৃযজ্ঞে প্রজ্বলিত হোমে আহুতি দিতে হয়। সেই কারণ, এই দুই যজ্ঞকে বলা হয়—ইষ্ট। ইষ্টের মুখ্য অর্থ, হোমকর্ম। নৃযজ্ঞে ও ভূতযজ্ঞে পুষ্করিণী-খনন, কূপ-খনন ইত্যাদি পূর্তকর্মরূপ দানকর্মই প্রধান। সেই হেতু এই দুই যজ্ঞকে বলা হয়—পূর্ত। দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং ভূতযজ্ঞ এই চারিটিকে একত্রে বলা হয়—ইষ্টাপূর্ত। স্মৃতির পরবর্তীকালে প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান ক্রমশঃ উঠিয়া যায়। একমাত্র ঋষিযজ্ঞের অন্তঃপাতী সন্ধ্যাবন্দনা ও গায়ত্রীজপ আজ অবধি চলিয়া আসিতেছে। ইহা সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। পিতৃযজ্ঞের এবং অতিথিযজ্ঞের আভাসও বেদ-সংহিতায় পাওয়া যায়। (২) উপনিষদে (৩) গৃহীর পক্ষে পঞ্চযজ্ঞসাধনা স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত। অতএব পঞ্চযজ্ঞসাধনা বেদসম্মত। তবে স্মৃতির আমলে বিশিষ্ট স্থান পায়। সেকালের

---

(২) যজুঃ, ২।৩৪ ; অথর্ব, ৯।৬।৩।৮

(৩) বৃঃ উঃ, ১।৪।১৬

পঞ্চ মহাযজ্ঞের সাধনা একালের সর্বতোভাবে উপযোগী নহে, ইহা সত্য কথা। একালে গৃহী হিন্দু পঞ্চযজ্ঞকে বর্তমানের উপযোগী করিয়া লইতে পারেন না, এই কথা কিন্তু ঠিক নহে। সাকার উপাসক নিজের রুচিমত আপনার গৃহে যে কোন দেব-দেবীর বিগ্রহ স্থাপন করিতে পারেন। অসমর্থপক্ষে দেব-দেবীর পট-চিত্রাদিও রাখা চলিতে পারে। নিত্য সেই বিগ্রহের, অথবা পট-চিত্রের, পূজার্চনাদি করা যাইতে পারে। ইহাও দেব-যজ্ঞ। নিরাকার উপাসক ওঁকার-মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, অথবা পট-চিত্র রাখিতে পারেন। তাহার উপাসনাও নিত্য করা চলে। ইহাও দেব-যজ্ঞ। পিতৃ-যজ্ঞের পিতৃ-তর্পণ নিত্য করা যায়—ইহা সহজ ও সরল। ঋষি-যজ্ঞের সন্ধ্যাবন্দনা প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে অনায়াসে করা চলে, বেশী সময় লাগে না। নৃ-যজ্ঞের অবসর আজকাল যথেষ্ট। নরনারায়ণের সেবার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন দুই এক পয়সাও দানের জন্য পৃথক্‌ভাবে সঞ্চিত রাখা চলে এবং মাসের শেষে সেই সঞ্চিত অর্থ ঐরূপ কোন সদনুষ্ঠানের অর্থ-ভাণ্ডারে দান করা যায়। যাঁহারা একান্ত অর্থহীন, তাঁহারা স্বেচ্ছাসেবকরূপে কোন জন-সেবার প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন অল্প সময় তাঁহাদের কায়িকশ্রম দান করিতে পারেন। ইহাও নৃ-যজ্ঞ। আজকাল ভূত-যজ্ঞের মধ্যে গৃহী হিন্দুর পক্ষে গো-সেবা প্রশস্ত। হিন্দুর গৃহে গো-সেবা বৈদিক যুগ হইতে প্রচলিত। এক সময় পল্লীবাসী হিন্দুর ঘরে ঘরে গো-সেবার ব্যবস্থা ছিল। যাঁহাদের সেই সুযোগ নাই, তাঁহারা গো-সেবার প্রতিষ্ঠানে সাহায্য করিতে পারেন। ইহাও ভূত-যজ্ঞ।

স্মৃতি-বিহিত নৈমিত্তিক কর্মের ভিতর দশবিধ সংস্কার ও বর্ণবৃত্তি উল্লেখযোগ্য।

দশবিধ সংস্কার—বেদে গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত ষোড়শ সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা আমরা দেখিয়াছি (১)। স্মৃতিকার ঋষিগণ এই ষোড়শ সংস্কার হইতে দশটি বাছিয়া লইয়াছেন, তাহাই দশবিধ সংস্কার বলিয়া খ্যাত। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহ—দশ সংস্কার। প্রত্যেক সংস্কার মন্ত্রসহ কর্তব্য। কোন সংস্কারে কোন মন্ত্র প্রযোজ্য, তাহার বিধান ঋষিগণ দিয়াছেন। ইহার ভিতর বেদ-মন্ত্র কিছু কিছু আছে। বৈদিক ষোড়শ সংস্কারের আলোচনাকালে এই দশটি সংস্কার সম্পর্কে কথিত হইয়াছে। এই স্থলে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। উপনয়ন সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতে পারে। দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যবর্ণের বালকের উপনয়ন বিহিত। গুরুগৃহে গমনের রীতি লুপ্ত হওয়ায়, আজকাল উপনয়নের সঙ্গেই উপবীত-গ্রহণ হইয়া থাকে। উপনয়ন ও উপবীত-গ্রহণ যেন একার্থবোধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বিজ-বালকের কত বয়স হইতে কত বয়স অবধি উপনয়ন-সংস্কার হইতে পারে, সে সম্বন্ধে স্মৃতি নির্দেশ দিয়াছেন। যথা—ব্রাহ্মণের অষ্টম বর্ষ হইতে ষোড়শ বর্ষ অবধি, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ বর্ষ হইতে বিংশ বর্ষ অবধি, এবং বৈশ্যের ষোড়শ বর্ষ হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষ অবধি। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপনয়ন না হইলে দ্বিজ বালক পতিত হয়। তাহার বেদপাঠে ও বৈদিক কর্মে অধিকার থাকে না। এইরূপ পতিত দ্বিজ দ্বিজবন্ধু বা ব্রাত্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ব্রতং বেদবিহিত অনুষ্ঠানং অতীত্য তিষ্ঠতীতি ব্রাত্যং, যিনি বেদবিহিত অনুষ্ঠান অতিক্রম করেন, অর্থাৎ অসংস্কৃত হন, তিনি ব্রাত্য। বিবাহ-সংস্কার সম্বন্ধেও

স্মার্ত নৈমিত্তিক কর্ম

(১) ৩৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এখানে দুই এক কথা বলা কর্তব্য। স্মৃতির অনুশাসনে সগোত্র-বিবাহ নিষিদ্ধ। এখন গোত্র কি তাহা কিছু জানা দরকার। গোত্রের অর্থ, কুল বা বংশ। আর্যহিন্দুসমাজের আদিতে বংশপ্রথা ছিল না এবং গোত্র-নিয়মও ছিল না। পশ্চাৎ এই সমাজে আর্যহিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, বংশপ্রথা স্বভাবতঃ দেখা দেয়; সেই সঙ্গে গোত্র-নিয়মও প্রচলিত হয়। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই গোত্র-নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুগণের জাতকর্ম হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত প্রত্যেক সংস্কারে আত্ম-পরিচয় দেওয়ার সময় গোত্রের উল্লেখ করিতে হয়, অর্থাৎ বংশ-পরিচয় দিতে হয়। গোত্রের উল্লেখে ভুল ঘটিলে, কোন শাস্ত্রীয় কার্য সিদ্ধ হয় না। এক এক ব্রাহ্মণ ঋষি ছিলেন এক এক গোত্র-প্রবর্তক বা বংশ-প্রবর্তক। তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি বংশধরগণ তাঁহার নামানুসারেই কুলনাম গ্রহণ করিতেন। যেমন—বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ ঋষিগণই গোত্র-প্রবর্তক। তাঁহাদের বংশীয় সকলে তাঁহাদের গোত্র-নামে পরিচিত। কিন্তু ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র তো সেই সব ব্রাহ্মণ গোত্র-প্রবর্তক ঋষিগণের সাক্ষাৎ বংশধর নহেন, তাই এই তিন বর্ণের পক্ষে তাঁহাদিগের ব্রাহ্মণ কুলপুরোহিতের গোত্রের নামে আত্মপরিচয় দিতে হয়। এখনকার ব্রাহ্মণ কুলপুরোহিতের গোত্র-নামে নহে; অতি প্রাচীনকালে গোত্র-নিয়ম-প্রবর্তনের অব্যবহিত পরে, যে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের গোত্র-নামে যিনি পরিচয় দিয়াছিলেন, বর্তমান কালে তাঁহার বংশধরেরা সেই নামেই পরিচয় দিয়া থাকেন। প্রাচীন কালের সেই ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছিলেন গুরু বা আধ্যাত্মিক জন্মদাতা। অতএব, গুরুর গোত্রে শিষ্যের পরিচয়-দানে কোন বাধা ছিল না। গোত্রকর্তা ঋষিগণের বংশধরদের ভিতর যাঁহারা

খ্যাতনামা, তাঁহাদের দ্বারা আবার প্রবরের সৃষ্টি। এক এক গোত্রে কয়েকটি প্রবর আছে। যেমন—জমদগ্নিগোত্রে জমদগ্নি, ঔর্ব ও বশিষ্ঠ এই তিন প্রবর। অদ্যাপি শাস্ত্রীয় কর্মে পরিচয়দানের সময় গোত্র এবং প্রবর এই দুই উল্লেখ করিতে হয়। বৌধায়ন সূত্রকারের মতে, গোত্রকর্তা ঋষি আটজন মাত্র। ধনঞ্জয়কৃত ধর্মপ্রদীপগ্রন্থে মোট আটত্রিশটি গোত্র এবং প্রত্যেক গোত্রের অন্তর্গত কতকগুলি প্রবর উল্লিখিত। অধুনা ধর্মপ্রদীপগ্রন্থে উল্লিখিত গোত্র-প্রবর প্রচলিত, বৌধায়নীয় গোত্র-প্রবর প্রচলিত নহে। স্মৃতিকারগণ সগোত্রে বিবাহ নিষেধ করিয়াছিলেন, ইহার তাৎপর্য আছে। সগোত্রে বিবাহের অর্থ, এক বংশে বিবাহ। এক বংশে বিবাহ জাতির অনিষ্টকর, এই সিদ্ধান্ত সম্প্রতি সুপ্রজনন-বিদ্যায় (Eugenics) লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতগণও করিয়াছেন। সগোত্র-বিবাহ নিষেধের মূলে যে সেই তত্ত্ব ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ। যদিচ বর্তমানকালে ইহার প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে মতানৈক্য দেখা যায়। এই গোত্র-প্রথা বা ঋষিগণের পরিচয়ে বংশ-পরিচয় দেওয়া হিন্দুর বিশিষ্টতা। ঋষিগণ ছিলেন পবিত্রতার আধার। পবিত্র বংশধারার উৎস যেন তাঁহারা। হিন্দু শুচিতানুরাগী। সেই কারণ, হিন্দু ঋষির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করে। (১)

---

(১) যেমন পাশ্চাত্য দেশে একটা মুটে-মজুর পর্যন্ত মধ্যযুগের কোন দস্যু ব্যারণের (Baron) বংশধররূপে আপনাকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে, ভারতে তেমনি সিংহাসনারূঢ় সম্রাট পর্যন্ত অরণ্যবাসী অকিঞ্চন ঋষিগণের বংশধররূপে আপনাকে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন। আমরা এইরূপ ব্যক্তির বংশধর বলিয়া পরিচিত হইতে চাই, আর যতদিন পবিত্রতার উপর এইরূপ গভীর শ্রদ্ধা থাকিবে, ততদিন ভারতের বিনাশ নাই।

—স্বামী বিবেকানন্দ, মদীয় আচার্যদেব।

বর্ণ-বৃত্তি—পঠন-পাঠন, যজ্ঞ করা ও করান, দান এবং পরিগ্রহ, এই কয়টি ব্রাহ্মণের বৃত্তি। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি। বৈশ্যের বৃত্তি—পশুপালন, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, সর্বপ্রকার ব্যবসা, কুসীদ ও কৃষিকাজ। শূদ্রের বৃত্তি—পরিচর্যা। পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণধর্মপ্রসঙ্গে বর্ণবৃত্তিগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।(১) বর্তমান কালে বর্ণবৃত্তি এক রকম নাই বলিলেই চলে।

স্মৃতিশাস্ত্রে পাপ-ক্ষালনার্থে প্রায়শ্চিত্ত কর্মের ব্যবস্থা অনেক প্রকার। পাপের গুরুত্বভেদে পাপকারীর প্রায়শ্চিত্তের বিধান।

স্মার্ত প্রায়শ্চিত্ত

প্রায়শ্চিত্ত—শরীরের ক্লেশদায়ক কষ্টসাধ্য ব্রতাচরণ। শারীরিক ক্লেশের দ্বারা পাপনাশ হয়। এই প্রায়শ্চিত্ত নানাবিধ—কৃচ্ছ্র (২), অতিকৃচ্ছ্র, কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, সান্তপন, চান্দ্রায়ণ(৩), পঞ্চতপা (৪) ইত্যাদি। এমন কি, তুষানলে দেহ দগ্ধ করিয়া

(১) ২০৪—২০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) দ্বাদশ দিন ব্যাপী। প্রথম তিন দিন তিন পল বা ২৪ তোলা কেবলমাত্র দধি-ভোজন, তৎপর তিন দিন উক্ত পরিমাণ ক্ষীরমাত্র ভোজন, তৎপর তিন দিন এক পল বা আট তোলা ঘৃতমাত্র ভোজন; তৎপর তিন দিন বায়ুমাত্র ভোজন অর্থাৎ উপবাস। এই ভাবে বার দিন দান-ধ্যান-অর্চনাদিতে রত থাকা।

(৩) মাস-ব্যাপী ব্রত। অমাবস্যায় উপবাস করিয়া তৎপরদিন প্রতিপদে একগ্রাস-মাত্র অন্নভোজন; দ্বিতীয়ায় দুই গ্রাস; তৃতীয়ায় তিন গ্রাস; এইরূপে শুক্লপক্ষে তিথি-বৃদ্ধির সঙ্গে এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতে ১৫ গ্রাস ভোজন। আবার, তৎপরদিন প্রতিপদে এক গ্রাস কমাইয়া ১৪ গ্রাস ভোজন; এইরূপে কৃষ্ণপক্ষে তিথিবৃদ্ধির সঙ্গে এক এক গ্রাস কমাইয়া অমাবস্যায় পুনরায় উপবাস। এইভাবে এক মাস দান-ধ্যান-অর্চনাদিতে রত থাকা।

(৪) গ্রীষ্মকালে চারিদিকে চারি অগ্নি স্থাপন করিয়া, পঞ্চম-অগ্নি-স্বরূপ সূর্যের তাপে তাপিত হইয়া জপ-ধ্যানাদির অনুষ্ঠান।

মৃত্যু-বরণের বিধানও আছে। যে পাপকর্ম খুব লঘু, তাহার নাশ হয় কেবলমাত্র বৈধ গঙ্গাস্নানে। অনুতাপসহকারে সকল প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য। যে সকল দ্বিজ যথাসময়ে উপবীত না হওয়ায় ব্রাত্য হয়, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ব্রাত্য-দোষ কাটাইয়া উপবীত গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন যে, নিত্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানও পাপ-ক্ষালনার্থে। উদূখল অর্থাৎ ঢেঁকি, যাঁতা, চুল্লী, কলসী ও ঝাঁটা এই পঞ্চ হিংসাস্থান-জনিত পঞ্চবিধ পাপের বা পঞ্চসূনার দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিত্য করণীয়। সেই অর্থে পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রায়শ্চিত্তস্বরূপও হয়। কাম্যকর্মসম্পর্কে স্মৃতি মুখ্যতঃ কতকগুলি হোমের ব্যবস্থা করিয়াছেন—সেগুলি বৈদিক যাগের পরিবর্তিত আকার।

(গ) পৌরাণিক কর্ম।

পুরাণ বেদ-স্মৃতির অনুগামী। স্মৃতিবিহিত নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এবং প্রায়শ্চিত্ত কর্ম পুরাণ গ্রহণ করিয়াছেন। পুরাণে বার-ব্রত-উপবাস, উৎসব-পার্বন, তীর্থপর্যটন, ইত্যাদি কর্ম বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পৌরাণিক কর্ম বলিলে সাধারণতঃ এই সকল কর্ম বুঝায়; কারণ, এইগুলিই পুরাণগ্রন্থের বিশিষ্টতা। বার-ব্রত-উপবাসকে কাম্য কর্মের, উৎসব-পার্বনকে নৈমিত্তিক কর্মের এবং তীর্থপর্যটন বা তীর্থ-সেবাকে প্রায়শ্চিত্ত কর্মের শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। এই স্থলে উৎসব-পার্বন এবং তীর্থ-সেবা এই দুইটি বিষয়ে কিছু আলোচনা সঙ্গত।

উৎসবের অর্থ, আনন্দ। উৎসবের অপর নাম, পর্ব। একত্রে বলা হয় উৎসব-পার্বন। যে অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজে আনন্দ পাওয়া যায় এবং অপরকে আনন্দ দেওয়া যায়, তাহাই উৎসব-পার্বন। সকল আনন্দের উপরে ধর্মানন্দ। অতএব ধর্মবিষয়ক উৎসব-পার্বন শ্রেষ্ঠ। সমস্ত ধর্মেই উৎসব-পার্বন অনুষ্ঠিত হয়। তবে হিন্দুধর্মে ইহার সংখ্যা বেশী। কথায় বলে—হিন্দুর বার মাসে তের পার্বন। ইহাদের প্রচলন পৌরাণিক যুগে। এক এক উৎসব-পার্বনের মূলে, এক এক পৌরাণিক কাহিনী। উদ্দেশ্য—কাহিনীর ভিতর দিয়া এইগুলিকে হিন্দু জনসাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল করা, তাহাদের চিত্তে ধর্মভাব জাগাইয়া রাখা এবং ধর্মের নামে সকল হিন্দুকে শ্রেণী-বর্ণ-নির্বিশেষে সম্মিলিত করিয়া হিন্দুর জাতীয় জীবনে সংহতি-শক্তি বাড়াইয়া তোলা। এই সব উৎসব-পার্বনের মধ্যে বিশটি উল্লেখযোগ্য—মকরসংক্রান্তি, গণেশচতুর্থী, বসন্তপঞ্চমী, শিবরাত্রি, হোলি, শীতলাসপ্তমী, রামনবমী, দশহরা, নাগপঞ্চমী, রক্ষাবন্ধন, কৃষ্ণাষ্টমী, অনন্তচতুর্দশী, মহালয়া-অমাবস্যা, দুর্গাপূজা, কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা, দেওয়ালী, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, অক্ষয়-নবমী, দেবোত্থান একাদশী, এবং কার্তিকী-পূর্ণিমা। এখানে এই-গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

উৎসব-পার্বন

মকরসংক্রান্তি—পৌষ মাসের শেষে সংক্রান্তিদিবসে, প্রধানতঃ সূর্যদেবের উত্তরায়ণ-উপলক্ষে। তাঁহার মকররাশিতে প্রবেশমাত্র উত্তরায়ণের আরম্ভ এবং ঠিক সেই সময় এই উৎসব। তাই নাম, মকরসংক্রান্তি অর্থাৎ সূর্যদেবের মকররাশিতে গমন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবসানে পিতামহ ভীষ্মদেব শরশয্যায় মানব-ধর্ম ও জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে কয়েকদিন ধারাবাহিক উপদেশ দেওয়ার পর, এই মকর-

সংক্রান্তির দিনে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। ইহা মহাভারতের কথা। সেই নিমিত্ত হিন্দুর ইহা এক স্মরণীয় দিন।

গণেশচতুর্থী—অন্য নাম, সঙ্কটচতুর্থী। গণেশ সিদ্ধিদাতা, বিঘ্ননাশক, এবং জগন্মাতার আদর্শ পুত্র। সেই গণেশ-দেবের প্রতি ভক্তি-নিবেদনের উদ্দেশ্যে মাঘ মাসের কৃষ্ণচতুর্থী তিথিতে এই উৎসব। প্রত্যেক দেবতার এক বাহন কল্পিত। গণেশের বাহন, মূষিক।

বসন্তপঞ্চমী—অন্য নাম, শ্রীপঞ্চমী। মাঘ মাসের শুক্লপঞ্চমী তিথিতে, অর্থাৎ বসন্ত ঋতুর প্রথম দিনে, এই উৎসব। তাই নাম, বসন্তপঞ্চমী। এই দিন বাগ্দেবী সরস্বতীর পূজা হয় এবং পঞ্চমবর্ষীয় হিন্দুশিশুর বিদ্যারম্ভ সংস্কার হয়। সরস্বতীর বাহন, রাজহংস।

শিবরাত্রি—ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণচতুর্দশী তিথির রাত্রিতে দেবাদিদেব শিবের পূজা। উপবাসই ইহার প্রধান অঙ্গ। বিচিত্রতায় শিব-চরিত্র অন্য দেব-চরিত্রকে হার মানাইয়া দেয়; সেই কারণ, তিনি দেবাদিদেব মহাদেব। শিব তাঁহার রুদ্র শক্তিতে ত্রিশূলধারীর বেশে সব লয় করিতেছেন; আবার, তাঁহার সৃজনীশক্তিতে শম্ভুমূর্তিতে সব সৃজন করিতেছেন; (১) আবার, তপঃশক্তিতে জটাজুটমণ্ডিত বল্কল-চর্ম-ধারী ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গে মহাতপস্বীরূপে মদন ভস্ম করিতেছেন; আবার, দিব্যশক্তিতে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান এই ত্রিনয়ন-যুক্ত হইয়া পঞ্চানন-মূর্তিতে জীবের ত্রিকালের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছেন; আবার, আরাম-দায়িনী শক্তিতে বৈদ্যনাথের বেশে জীবকে রোগমুক্ত করিতেছেন। এই রকম বিচিত্র-শক্তি-সম্পন্ন

(১) শিবের এই সৃজনী মূর্তির কল্পনা হইতে লিঙ্গ-পূজার উৎপত্তি। এই অধ্যায়ে পৌরাণিক উপাসনার আলোচনাকালে লিঙ্গ-পূজা সম্বন্ধে বিশেষভাবে কথিত হইবে।

দেবতা আর দ্বিতীয় নাই। শ্রাবণ মাসে ত্রয়োদশী তিথি ও সোমবার, শিবপূজার প্রশস্ত কাল। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মদেব বলিয়াছেন যে, পুরাকালে ইক্ষাকুবংশীয় রাজা চিত্রভানু সর্বপ্রথমে ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রির উৎসব করেন। তদবধি সেই প্রকারে এই উৎসব হিন্দু-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। শিবের বাহন, বৃষ।

হোলি—বা আবির-খেলা, ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে। বালক শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপবালকদিগের সহিত আবির খেলিয়াছিলেন। ইহা পৌরাণিক কাহিনী। তাহার স্মরণার্থে এই উৎসব। দুঃখের বিষয়, ইহা বর্তমান কালে কোথাও কোথাও এক জঘন্য আমোদপ্রমোদে দাঁড়াইয়াছে। পূর্ণ বসন্ত ঋতুতে, ফসল কাটার পর, এই উৎসব হয়। পল্লীবাসী জনসাধারণ তখন স্বভাবতঃ আনন্দে মাতোয়ারা। তাহাদের সেই আনন্দের বিকাশ হয় এই হোলি উৎসবে। সম্ভবতঃ, এই একটি মাত্র উৎসব, যাহাতে ধর্ম-সম্বন্ধ খুব কম। ইহাতে মাত্র দোলযাত্রার অনুষ্ঠান যাহা হয়, তাহাতেই কিছু ধর্ম-সম্বন্ধ আছে। একখানা দোলার উপর শিশু শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি সুসজ্জিত করিয়া দোলান হয়। ইহার নাম, দোলযাত্রা।

শীতলাসপ্তমী—প্রধানতঃ, ইহা হিন্দুনারীদের উৎসব। শীতলা দেবী—বসন্ত-বিস্ফোটকাদি রোগের দেবতা। সচরাচর গ্রামের বাহিরে, নিম গাছের তলায়, শীতলাদেবীর আসন। চৈত্র মাসে কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে, হিন্দুনারী সন্তানের মঙ্গল-কামনায় শীতলা মাতার পূজা করেন। এই দেবীর পূজায় বসন্তরোগের নিবারণ হয়। ঠিক এই সময়ে বসন্তরোগের আবির্ভাব ঘটে বলিয়া, শীতলা মাতার পূজা প্রচলিত। শীতলার বাহন, গর্দভ।

রামনবমী—চৈত্র মাসের শুক্লনবমী তিথিতে শ্রীরামচন্দ্রের শুভ জন্ম। ইহা তাঁহার জন্মোৎসব।

দশহরা—অপর নাম, গঙ্গাপূজা। সংস্কৃত দশবিধপাপহরা শব্দের অপভ্রংশ, দশহরা। গঙ্গামাতা দশবিধ পাপের হরণ করেন; তাই, গঙ্গাস্নানের দ্বারা পাপ-ক্ষালন হয়। এই কারণ, গঙ্গামাতা—দশহরা। পৌরাণিক কাহিনী এই যে, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লদশমী তিথিতে ভগীরথ গঙ্গামাতাকে স্বর্গ হইতে মর্তে নামাইয়া আনিয়াছিলেন পাপী-তাপীর উদ্ধারের জন্য। ইহাই গঙ্গামাতার মর্তলোকে জন্ম। প্রতি বৎসর এই মাসে, এই দিনে, এই তিথিতে দশহরা উৎসব হয়—গঙ্গামাতার জন্মোৎসব।

নাগপঞ্চমী—শ্রাবণ মাসের শুক্লপঞ্চমী তিথিতে নাগদেবতার পূজা। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে নাগরাজ বাসুকির জন্ম। মনসা দেবী, বাসুকির সহোদরা। নাগ-পূজা প্রত্যেক দেশের আদিম অধিবাসীদের ভিতর এককালে প্রচলিত ছিল। ভারতের আদিবাসী অনার্যগণের ভিতরও এই প্রথা ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, অনার্যগণের এই নাগ-পূজা কালক্রমে হিন্দুধর্মে স্থান পায় হিন্দুধর্মের পরধর্ম-সহিষ্ণুতার ফলে। তখন দেবাদিদেব শিবের কণ্ঠে নাগ দেখা দিলেন, ভয়ের পরিবর্তে পূজার বস্তুতে। নাগপঞ্চমীতে নাগ-দেবতা বাসুকির পূজা হয়। কেবলমাত্র বাঙ্গলা দেশে বাসুকির পূজা হয় না। এই দেশে পূজা হয় বাসুকির সহোদরা মনসাদেবীর এবং সেই পূজা নাগপঞ্চমীতে না হইয়া অন্য দিনে হয়।

রক্ষাবন্ধন—রেশমের রাখি একগাছা হস্তে বন্ধন। রাখিকে বলা হয়, রক্ষা। কারণ, এই রাখি রক্ষা-কবচের ন্যায় মানুষকে যাবতীয় বিপদ হইতে রক্ষা করে। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে সাধারণতঃ

ব্রাহ্মণগণ রাখিগুলিকে দেব-মন্দিরে মন্ত্র-পূত করিয়া লোকের হাতে বাঁধিয়া দেন।

কৃষ্ণাষ্টমী—অন্য নাম, জন্মাষ্টমী। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহার স্মরণার্থে, ইহা তাঁহার জন্মোৎসব। এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ—উপবাস।

অনন্তচতুর্দশী—ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে চতুর্দশী তিথিতে অনন্তের বা শ্রীবিষ্ণুর পূজা। শিবচতুর্দশীতে যেমন শিবের পূজা, অনন্তচতুর্দশীতে তেমনি বিষ্ণুর পূজা। মহাভারতে শান্তিপর্বে ভীষ্মদেব বলিয়াছেন যে, পুরাকালে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা চিত্রাঙ্গদ প্রথমে এই পূজার প্রবর্তন করেন। তদবধি এই পূজা এই দিনে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

মহালয়া-অমাবস্যা—আশ্বিন মাসের অমাবস্যা তিথি। নিষ্ঠাবান হিন্দু প্রতি অমাবস্যা তিথিতে মৃত পিতৃপুরুষদের তর্পণাদি করিতে পারেন। তবে বিশেষভাবে মহালয়া-অমাবস্যা তিথিতে এই তর্পণাদি করিলে, বিশেষ ফললাভ হয়। প্রতিপদ হইতে মহালয়া-অমাবস্যা এই কৃষ্ণপক্ষকে পিতৃপক্ষ বলা হয়। যে তারিখেই কোন পিতৃপুরুষের মৃত্যু ঘটুক না কেন, এই পিতৃপক্ষে তাঁহার সেই মৃত্যু-তিথিতে তাঁহার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করণীয়। পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ এই দুইটি প্রধান অনুষ্ঠান। তর্পণের অর্থ, জলের অঞ্জলিদান। তর্পণ তিন প্রকার—দেব-তর্পণ, ঋষি-তর্পণ ও পিতৃ-তর্পণ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও প্রজাপতি এই চারি দেবতার উদ্দেশ্যে অঞ্জলিদান—দেব-তর্পণ। ভৃগু, নারদ, অত্রি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের উদ্দেশ্যে অঞ্জলিদান—ঋষি-তর্পণ। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা,

মাতামহী, প্রমাতামহী প্রভৃতি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অঞ্জলিদান—পিতৃ-তর্পণ। পিতৃপক্ষের প্রতি তিথিতে নিষ্ঠাবান হিন্দুর তর্পণ কর্তব্য। বিশ্বাস—পিতৃপক্ষে সূর্যদেবের কন্যারাশিতে প্রবেশমাত্র মৃত পিতৃপুরুষদের সূক্ষ্মশরীরধারী জীবাত্মা পিতৃলোক হইতে ভূলোকে অবতরণ করিয়া জীবিত বংশধরগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করেন।

দুর্গাপূজা—ইহাকে দুর্গোৎসব বলে। বঙ্গের বাহিরে ইহা দশহরা নামে খ্যাত। গঙ্গামাতার মত দুর্গামাতাও দশবিধ পাপের হরণ করেন, তাই তাঁহারও নাম দশহরা। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে প্রতিপদ হইতে নবমী তিথি পর্যন্ত দুর্গাদেবীর পূজা হয়। দুর্গার বাহন, সিংহ। নয় দিনের মধ্যে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা প্রধান; আবার, এই তিন দিনের মধ্যে অষ্টমী পূজা সর্বপ্রধান। সন্ধিপূজা এই অষ্টমী তিথিতে। অষ্টমীতে বীরাষ্টমী মহাব্রত। দুর্গোৎসব, বাঙ্গালীর নিজস্ব। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে, বঙ্গদেশে প্রতিমায় দুর্গাপূজা খ্রীষ্টীয় দশম কিংবা একাদশ শতাব্দী হইতে প্রচলিত হইয়াছে। এইরূপ মহাড়ম্বরে জগন্মাতার সিংহবাহিনী দশভুজা মূর্তির পূজা, বাঙ্গলার বাহিরে আর কোথাও নাই। বাঙ্গলার বাহিরে প্রবাসী বাঙ্গালীরা স্থানে স্থানে দশভুজা-মূর্তির পূজা করেন। বিহারেও অনেক সহরে বিহারীগণ আজকাল দশভুজার পূজা আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গদেশে বাঙ্গালী যে আকারে পূজা করেন সে আকারে নয়। সামাজিক দৃষ্টিতে এই দুর্গাপূজা হিন্দুর জাতীয় পূজা—সর্ববর্ণের, সর্বজাতির, সর্বস্তরের লোকের ইহা একটি মহামিলন-ক্ষেত্র। ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া কুম্ভকার, কর্মকার, স্বর্ণকার, মালাকার, তন্তুবায়, গোপ, মোদক, শিল্পকার, সূত্রধর, চিত্রকর, বাদ্যকর প্রভৃতি সকলেই এই মহাপূজার অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎ অংশ-গ্রহণ

করিয়া কৃতার্থ বোধ করে। তথাকথিত অস্পৃশ্যজাতীয় নরনারীরাও মহাপ্রসাদে তৃপ্তিলাভ করে। বিজয়া দশমীর দিন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পরস্পর মিলন ও প্রীতি-সম্ভাষণ অতীব সুন্দর পদ্ধতি। বর্তমান কালে হিন্দুর এত বড় মহোৎসব আর নাই। বাঙ্গলার বাহিরে দশহরায় সাধারণতঃ কোন দেবী-মূর্তির পূজা হয় না। প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত প্রত্যহ যবাদি শস্যের উপর কলস-স্থাপনে এবং তাহাতে দেবীর আবাহনে পূজা হইয়া থাকে। নয়রাত্রি পূজা হয় বলিয়া, ইহার নাম—নবরাত্রি। প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ ও হোম, নবরাত্রির প্রধান অঙ্গ। প্রত্যহ কুমারী-পূজা এবং কুমারী-ভোজনও হয়। বঙ্গের বাহিরে দশহরা-উৎসব—রামলীলা। শরৎকালে শ্রীভগবতীর এই পূজার প্রবর্তন করেন শ্রীরামচন্দ্র। তৎপূর্বে দেবীর পূজা হইত বসন্তকালে। শরৎকাল, হরি-শয়নের কাল। তখন দেব-দেবীগণ নিদ্রিত থাকেন। সেই নিমত্ত শারদীয় পূজায় বোধন অর্থাৎ সুপ্ত দেবী-শক্তিকে জাগ্রত করাইবার বিধি। রাবণ-বধের উদ্দেশ্যে শক্তিলাভার্থে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে দেবীর অকাল-বোধন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। সেই অবধি অকাল-বোধনের পর এই শারদীয় পূজা চলিয়া আসিতেছে। সেই হেতু এই শারদীয় পূজায় শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা-স্মরণ খুব যুক্তিযুক্ত। শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র-কীর্তন ও তাঁহার লীলা-প্রদর্শন, রামলীলা। গীত, বাদ্য, নাটকাভিনয়ের সাহায্যে রামচরিত্র প্রদর্শিত হয়। বিজয়া দশমীতে রাবণ-বধের সঙ্গে সঙ্গে রামলীলার পরিসমাপ্তি। বারাণসী ও প্রয়াগ এই দুইটি রামলীলার প্রধান কেন্দ্র।

কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা—আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজার পর শুক্লা পূর্ণিমা তিথিতে। যে পক্ষ-কালে দেবীপূজা হয়, তাহাই দেবীপক্ষ। ইহা আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষ। দেবীপক্ষের অব্যবহিত পূর্বে যে কৃষ্ণপক্ষ,

তাহা পিতৃপক্ষ। কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা সম্বন্ধে প্রবাদ—লক্ষ্মীদেবী এই পূর্ণিমার রাত্রিতে বৎসরান্তে একবার ভূ-প্রদক্ষিণ করেন। সেই সময় তিনি ভূ-বাসীদের জিজ্ঞাসা করেন—নারিকেলজলং পিত্বা কো জাগর ভূমিতলে? এই ভূমিতলে এই পুণ্য রজনীতে নারিকেলের জল পান করিয়া কে জাগিয়া আছ? তাৎপর্য—যে এই রাত্রিতে নারিকেলের জল পান করিয়া জাগিয়া থাকে, সেই লক্ষ্মীদেবীর কৃপার অধিকারী হয়। এই প্রশ্নে সংস্কৃত 'কো জাগর' বাক্য হইতে এই পূর্ণিমা তিথির নাম—কোজাগর-পূর্ণিমা। লক্ষ্মীর বাহন, পেচক।

দেওয়ালি—দীপাবলি শব্দের অপভ্রংশ। ইহার অপর নাম, দীপ-মালিকা। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। এই রাত্রিতে প্রতি হিন্দুর গৃহ আলোকমালায় শোভিত হয়। তাহাই দীপাবলি। পূর্বে এই রাত্রিতে লক্ষ্মীদেবীর পূজা হইত—দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজা। পশ্চাৎ বঙ্গদেশে এই রাত্রিতে লক্ষ্মীদেবীর পরিবর্তে মহাকালীর পূজা প্রচলিত হয়। কালীপূজার বিশেষ আদর বাঙ্গলায়। বাঙ্গলার বাহিরে দেওয়ালির রাত্রিতে এখনো দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজা হয়।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া—দেওয়ালির ঠিক পরে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে। ইহার অপভ্রংশ—ভাইদ্বিতীয়া। হিন্দুগৃহে এই উৎসবে ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রীতি-মিলন এবং প্রীতি-ভোজন হয়। ইহাকে ভাইফোঁটাও কহে।

অক্ষয়নবমী—কার্তিক মাসের শুক্লনবমী তিথি। এই রাত্রিতে জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। দুর্গা—কালী—জগদ্ধাত্রী এই সব এক শক্তিময়ী মহাদেবীর নামান্তর মাত্র। বাঙ্গলার বাহিরে জগদ্ধাত্রী পূজার বিশেষ প্রচলন নাই। এই অক্ষয়নবমী তিথিতে ত্রেতাযুগের আরম্ভ। পিতার আদেশে পিতৃভক্ত শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দশ বৎসর বনবাসের পর, অযোধ্যা

প্রত্যাবর্তনের পথে প্রয়াগে এই অক্ষয়নবমী তিথিতে ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমে, তাঁহার ভ্রাতা ভরতের সহিত মিলিত হন। এই ঘটনা ভরত-মিলাপ বা ভরত-মিলন নামে প্রসিদ্ধ। এই ঘটনার স্মরণার্থে আজো প্রয়াগে এই তিথিতে ভরত-মিলাপ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই পুণ্য তিথিতে যাহা দান করা যায় তাহার ফল অক্ষয়, সেই নিমিত্ত ইহাকে অক্ষয়নবমী বলা হয়।

দেবোত্থান-একাদশী—কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে একাদশী তিথি। পৌরাণিক কাহিনী মতে, শ্রীবিষ্ণু আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন; তাই, তাহা—শয়ন-একাদশী। তারপর, তিনি কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে উত্থান করেন; তাই সেই একাদশী—দেবোত্থান একাদশী। শ্রীবিষ্ণুর শয়নকালের এই চারি মাসকে বলা হয় চতুর্মাস। হিন্দুর কাছে এই চতুর্মাস কু-কাল, এই সময় সকল প্রকার শুভ কাজ নিষিদ্ধ। এই সময় চাতুর্মাস্য-ব্রত-পালনের নিয়ম। এই ব্রত আরম্ভ হয় আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে অথবা পূর্ণিমাতে, এবং শেষ হয় কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে। বলা বাহুল্য এই চারি মাসে বৃষ্টিবর্ষণ হয়, তাহার ফলে এই দেশ কিছু অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। স্থূল দৃষ্টিতে চাতুর্মাস্যের সহিত ইহার যেন কিছু সঙ্গতি দেখা যায়। মহাভারতে ভদ্রশীলা, দেবমালি, যজ্ঞমালি ও সুমালি প্রভৃতির উপাখ্যানে দেবোত্থান-একাদশীর মহিমা কীর্তিত। এই একাদশীতে উপবাস অতি পুণ্যজনক।

কার্তিকী-পূর্ণিমা—কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথি। সর্বপ্রথমে এই শুভ দিনে শিবের ত্রিপুরাসুরজয়ের স্মরণার্থে শৈবগণ উৎসব করিতেন। পশ্চাৎ এই দিনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের রাসলীলার স্মরণার্থে বৈষ্ণবগণ রাসোৎসব করিতে থাকেন। আবার, শাক্তগণ

এই শুভ দিনে গঙ্গাদেবীর পূজার ও গঙ্গাস্নানের বিশেষ ব্যবস্থা দিয়াছেন।

সকল ধর্মেই কতকগুলি তীর্থ বা পুণ্যস্থান আছে। যেমন—ইস্‌লামপন্থীর মক্কা, খ্রীষ্টপন্থীর জেরুজালেম ইত্যাদি। সকল ধর্মই বলেন যে, এই সকল তীর্থস্থান দর্শন করিলে পুণ্য-সঞ্চয় হয়। হিন্দুধর্মের মতে, শ্রীভগবান জগতের সর্বত্র অনুস্যূত; কিন্তু তীর্থক্ষেত্রে তাঁহার দিব্যভাবের প্রকাশ সর্বাধিক, যেমন সূর্যের আলোক সর্বত্র পতিত হইলেও কাচখণ্ডের উপর তাহার প্রকাশ বেশী। তীর্থ-পরিভ্রমণের অপর নাম, তীর্থ-সেবা। তীর্থ-সেবায় দৈহিক ক্লেশ অল্প-বিস্তর ভোগ করিতে হয়। এই কারণ, হিন্দুধর্ম বলেন—তীর্থ-সেবায় পাপ-ক্ষালন হয়, ইহা প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। প্রবাদ—কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে জ্ঞাতিবধজনিত পাপে পাণ্ডবগণ লিপ্ত হন, শেষ জীবনে সেই পাপক্ষালনের অভিপ্রায়ে মহর্ষি বাদরায়ণ ব্যাসের পরামর্শে তাঁহারা রাজ্যত্যাগ করিয়া দ্রৌপদী সহ কেদার-বদরি-পরিভ্রমণের পর মহাপ্রস্থান করেন। তীর্থ-সেবার আর এক ফল—চিত্তশুদ্ধি। শৈবদের শৈবতীর্থ, বৈষ্ণবদের বৈষ্ণবতীর্থ, শাক্তদের শাক্ততীর্থ। অন্য সম্প্রদায়েরও অন্য তীর্থ। এইভাবে হিন্দুর তীর্থস্থান সংখ্যায় অনেক দাঁড়াইয়াছে। শৈব সম্প্রদায়ের কাশী, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, কেদারনাথ, রামেশ্বর ইত্যাদি প্রখ্যাত তীর্থ। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, পুরী, নৈমিষারণ্য, দ্বারকা, বদরিনারায়ণ, নাথদ্বার, শ্রীরঙ্গম ইত্যাদি প্রসিদ্ধ তীর্থ। শাক্তসম্প্রদায়ের কালীঘাট, বিন্ধ্যাচল, জ্বালামুখী, মাদুরা, কন্যাকুমারী ইত্যাদি বিখ্যাত তীর্থ। এই সব তীর্থের পরিচয় পুরাণে আছে। স্কন্দপুরাণ, ভারতবর্ষের তৈর্থিক ভূগোল ও ইতিহাস। এই পুরাণে তীর্থস্থানসম্পর্কে যাবতীয়

তীর্থ-সেবা

তথ্য পাওয়া যায়। পুরাণ বলেন যে, মোক্ষদায়িনী পুরী বা নগরী সাতটি—অযোধ্যা, মথুরা বা সমস্ত ব্রজমণ্ডল, হরিদ্বার, কাশী, কাঞ্চীপুরম্, অবন্তী বা উজ্জয়িনী এবং দ্বারকা। এখানে চতুর্ধাম এবং একান্ন মহাপীঠস্থান সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক কথা বলা যাইতেছে।

চতুর্ধাম—তীর্থসেবীদের ভিতর চারি ধাম পরিভ্রমণ সুবিদিত। সেই চারি ধাম—দ্বারকা, রামেশ্বর, পুরুষোত্তম এবং বদরিকাশ্রম। হৃষীকেশের উত্তরে উত্তরাখণ্ড এবং দক্ষিণে ভারতখণ্ড। চারি ধামের মধ্যে কেবলমাত্র বদরিকাশ্রম উত্তরাখণ্ডে, আর অপর তিনটি ভারতখণ্ডে। যখন বিশেষভাবে উত্তরাখণ্ডের চারি ধাম বলা হয়, তখন বুঝায়—যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী, কেদারনাথ ও বদরিনারায়ণ। এই চারিটি গিরিরাজ হিমালয়ের অভ্যন্তরে। পথ দুর্গম। বদরিকাশ্রম বলিতে শুধু বদরিনারায়ণই বুঝায় না। হৃষীকেশ হইতে বদরিনারায়ণের ঊর্ধ্বে ব্যাসগুহা ও শতপথ পর্যন্ত, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ বদরিকাশ্রমক্ষেত্র নামে খ্যাত।

মহাপীঠস্থান—পৌরাণিক কাহিনী এই যে, দক্ষরাজের কন্যা সতী ছিলেন শিবের মহিষী। দক্ষরাজের এক যজ্ঞে শিব আমন্ত্রিত হয়েন নাই। এই শিবহীন যজ্ঞের অর্থ, শিবকে অবমাননা। স্বামীর এই অবমাননা সতীর অসহ্য, তাই সতী দেহত্যাগ করেন। বিষ্ণুচক্রে সেই সতীদেহ একান্ন অংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া একান্ন স্থানে পতিত হয়। যে যে স্থানে সতীর ঐ বিচ্ছিন্ন দেহাংশ পতিত হয়, সেই সেই স্থান এক একটি মহাপীঠস্থানরূপে গণ্য। বিশেষতঃ শাক্তদের নিকট এই একান্ন মহাপীঠস্থান মহাতীর্থস্বরূপ। প্রত্যেক পীঠস্থানে প্রত্যহ চণ্ডীপাঠের বিধি। একান্ন মহাপীঠস্থানের তালিকায় দেখা যায় যে, সতীদেহের বিভিন্ন অংশ পতিত হইয়াছিল উত্তরে নেপাল হইতে

দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ হইতে পূর্বে আসাম প্রদেশ পর্যন্ত। পৌরাণিক কাহিনীর ভিতর যাহাই থাকুক না কেন, স্থুলদৃষ্টিতে ইহা সুস্পষ্ট যে, সতীদেহের বিচ্ছিন্ন অংশসমূহ যেন আচ্ছাদিত করিয়াছিল এই বিরাট উপমহাদেশকে। সেকালে সিংহল দ্বীপও ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন অখণ্ডিত আর্যহিন্দু ভারতের যেন এক জীবন্ত মূর্তি চক্ষুর সন্মুখে ভাসিয়া উঠে। সতীদেহ যেন ভারতমাতারই দেহ, শক্তিময়ী সতীদেবী যেন ভারতমাতা, হিন্দুধর্ম যেন সেই ভারতমাতার ধর্ম—সতীর ধর্ম—শক্তির ধর্ম।

(ঘ) তান্ত্রিক কর্ম।

তন্ত্র স্বতন্ত্র হইলেও বেদ-বিরোধী নহেন। বেদজ্ঞ তান্ত্রিক পণ্ডিতমণ্ডলী বলেন যে, তন্ত্রের মূল বেদ এবং তান্ত্রিক আচার বৈদিক আচারের প্রতিধ্বনি। বৈদিক যাগযজ্ঞাদি রূপান্তরিত হইয়া তান্ত্রিক হোমে পরিণত হইয়াছে। তান্ত্রিক কর্মে সর্বত্র যন্ত্র-মন্ত্রের প্রয়োগ। ইহাই তাহার বিশেষত্ব। তন্ত্রের মতে, কোন প্রকার বীজমন্ত্র প্রথমে সংযুক্ত না করিলে মন্ত্র বীর্যহীন হয়। তন্ত্রে ক্লীং, হ্রীং, শ্রীং প্রভৃতি বহুপ্রকার বীজমন্ত্র আছে। দুর্গাযন্ত্র, শ্যামাযন্ত্র, মাতৃকাযন্ত্র প্রভৃতি কয়েক প্রকার যন্ত্রও আছে। বেদ-স্মৃতি-পুরাণের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য এবং প্রায়শ্চিত্ত কর্ম বিভিন্নরূপে তন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তন্ত্রে মারণ-উচ্চাটন-বশীকরণ ইত্যাদি কতকগুলি নিকৃষ্ট কাম্যকর্মের বিধান আছে সত্য, (১) কিন্তু তাহাই তন্ত্রের সব কথা নহে। পুত্র-বিত্ত-স্বর্গাদি কামনায় কাম্য কর্মের নির্দেশ তন্ত্রেও আছে।

(১) অথর্ববেদেও এইরূপ নিকৃষ্ট কাম্য কর্মের বিধান আছে।

প্রায়শ্চিত্তের কথাও আছে। তন্ত্রে নিত্যকর্মের ভিতর ষট্‌কর্মের বিধান—স্নান, জপ, হোম, শাস্ত্রাধ্যয়ন, দেব-পূজা এবং অতিথি-সেবা। কিয়দংশে ইহা স্মার্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুরূপ। তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনাও নিত্যকর্মের অন্তঃপাতী। এখানে তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনা সম্পর্কে কিছু বলা যাইতে পারে।

তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনা

তান্ত্রিক সন্ধ্যা ত্রৈকালিক। ইহা প্রত্যহ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে করণীয়। বৈদিক সন্ধ্যায় শূদ্রের অধিকার নাই, তান্ত্রিক সন্ধ্যায় শূদ্রেরও অধিকার আছে। তান্ত্রিক পণ্ডিতদের মতে, দীক্ষিত দ্বিজ অগ্রে বৈদিক সন্ধ্যা শেষ করিয়া পরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবেন। তান্ত্রিক সন্ধ্যার প্রক্রিয়া—আচমন, জলশুদ্ধি, অঘমর্ষণ, সূর্যার্ঘ্য, তর্পণ, গায়ত্রী, ধ্যান, প্রাণায়াম, ন্যাস এবং গুরু-প্রণাম। প্রত্যেক প্রক্রিয়ার তান্ত্রিক মন্ত্র আছে। শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈব সকল সম্প্রদায়ের জন্য তন্ত্রশাস্ত্র। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র-মন্ত্র-দেবতা তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত। শাক্তের শাক্তাগম, বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাগম এবং শৈবের শৈবাগম (২)। তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দনায় এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মন্ত্র। ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ মন্ত্র—

> তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
> দিবীব চক্ষুরাততম্॥ (৩)

ইহা তান্ত্রিক আচমন-মন্ত্রের অন্তর্গত। বৈদিক গায়ত্রীমন্ত্রের নাম, সাবিত্রী। এই মন্ত্রে কেবলমাত্র দ্বিজগণের অধিকার, শূদ্রের

(২) ৮৪-৮৫ এবং ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) ঋক, ১।২২।২০

নহে। তাই, তন্ত্রে ঐ বৈদিক গায়ত্রীর পরিবর্তে অন্য গায়ত্রী কথিত। প্রত্যেক দেবতার যেমন ধ্যান-মন্ত্র পৃথক্‌, তেমনি গায়ত্রী-মন্ত্রও পৃথক্‌। নারায়ণের গায়ত্রীমন্ত্র—নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ ; সূর্যের গায়ত্রী-মন্ত্র—আদিত্যায় বিদ্মহে মার্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য প্রচোদয়াৎ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল তান্ত্রিক গায়ত্রীমন্ত্রে দ্বিজ-শূদ্রের সমান অধিকার। তন্ত্র বলেন যে, সন্ধ্যা-বন্দনায় ফললাভার্থে মন্ত্রাদি-পাঠ অবশ্য কর্তব্য। যদি কেহ সন্ধ্যার সমস্ত প্রক্রিয়া-সাধনে অশক্ত হন, তবে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে আপনার ইষ্টদেবতার ধ্যান করিয়া সেই দেবতার মূল মন্ত্র জপ করিতে পারেন। ইহা সন্ধ্যার সংক্ষিপ্ত প্রকরণ। নিয়মিত সময়ে সন্ধ্যা না করিলে, সন্ধ্যা পতিত হয়। তখন আপনার ইষ্টদেবতার গায়ত্রীমন্ত্র দশবার জপের পর পুনরায় সন্ধ্যা কর্তব্য।

[দুই]

উপাসনা।

'উপ' অর্থাৎ ব্রহ্মের কিংবা ব্রহ্মের কোন প্রতীকের সমীপে, 'আসনা' বা আসন-গ্রহণ—উপাসনা। দেবতাগণ ব্রহ্মের প্রতীক। (৪) উপাসনা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। আসন-গ্রহণের অর্থ, ব্রহ্মের সঙ্গলাভার্থে স্থিতিশীল হইয়া তাঁহার বা তাঁহার কোন প্রতীকের চিন্তন। তাৎপর্য—উপাস্যের চিন্তারূপ মানসিক ব্যাপারের দ্বারা তাঁহার সঙ্গলাভ হয়। ব্রহ্মাই

উপাসনার অর্থ

(৪) ২৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

একমাত্র উপাস্য। ব্রহ্মের দুই ভাব—নির্গুণ ও সগুণ। এই দুই ভাবেই তিনি উপাস্য হইতে পারেন। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা অতীব কঠিন। (৫) নাম-রূপ-গুণ-ঐশ্বর্যাদির অতীত নির্গুণ ব্রহ্ম সহজে আমাদের ধারণার মধ্যে আসেন না। এই নিমিত্ত আমরা প্রায় সকলেই সগুণ ব্রহ্মের উপাসক। নিরাকারবাদীও সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন। সগুণ ব্রহ্মের নিরাকার এবং সাকার এই দুই প্রকার উপাসনা হইতে পারে। বস্তুতঃ, উপাসনা এক; তবে উপাসকের বোধশক্তির তারতম্যবশতঃ উপাসনার প্রণালীভেদ মাত্র। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবে উপাসকগণের বোধশক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন উপাসনা-প্রণালী উদ্ভূত হইয়াছে। তিনটি প্রধান যুগ—বৈদিক, পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক। এই তিন যুগের উপাসনাসম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

(ক) বৈদিক উপাসনা।

বৈদিক উপাসনা দ্বিবিধ—অহংগ্রহ ও প্রতীক। উপাস্যের সহিত উপাসকের অভেদ বুদ্ধিতে যে উপাসনা, তাহাই অহংগ্রহ-উপাসনা।

অহংগ্রহ-উপাসনা

অহং অর্থাৎ আমি, এবং গ্রহ অর্থাৎ আধার। অহংগ্রহের অর্থ, ব্রহ্মই আমার আধার। আমি এবং আমার আধারস্বরূপ ব্রহ্ম অভিন্ন, আমিই ব্রহ্ম—এই বুদ্ধিতে উপাসনা, অহংগ্রহ-উপাসনা। ইহার প্রক্রিয়া—সগুণ ব্রহ্মকে পরমাত্মারূপে নিজের হৃদয়ে নিজের প্রত্যগাত্মার সহিত অভিন্ন বোধে উপাসনা। বেদান্তের "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি", এই মহাবাক্য-

(৫) অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥—গীঃ, ১২।৫

গুলি(১) এই অভেদ প্রতিপন্ন করে। অহংগ্রহ-উপাসনা কেবলাদ্বৈতবাদী বেদান্তীদের উপযোগী। শ্রীশঙ্করাচার্য এই অহংগ্রহ-উপাসনার ফল কি, তাহা বলিয়াছেন—নিরন্তর আমিই ব্রহ্ম এইরূপ বাসনায় অবিদ্যাজনিত ভয় দূর হয়, যেমন রসায়ন-সেবনে রোগ বিদূরিত হয়। (২) আচার্যদেবের এই উক্তিতে যথার্থই এক বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আমিই ব্রহ্ম, এই ধারণা অন্তরে বদ্ধমূল হইলে কোন প্রকার দীনতা, ক্লীবতা, তামসিকতা ও মলিনতা মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে না—তাহার ভিতর দিব্যভাব স্বভাবতঃ উদ্দীপ্ত হয়। আজকাল মনোবিজ্ঞান স্বীকার করেন যে, মনোমধ্যে পরোক্ষ স্বতঃসঞ্জাত সঙ্কেতের (Auto-suggestion) দ্বারা রোগীকে নীরোগ করিতে পারা যায়। তাই, চিকিৎসকগণ রোগীর মনে প্রথমে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিবার চেষ্টা করেন যে, তাহার সেরূপ কোন কঠিন রোগ নাই। নীরোগ লোক নিয়ত রোগচিন্তায় রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে; আবার, রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে এই দৃঢ় ধারণায় সত্যসত্যই সত্বর রোগমুক্ত হয়। ইহা এক পরীক্ষিত সত্য। অহংগ্রহ-উপাসনার মূলে ঐরূপ এক বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ওঁকার—ব্রহ্মোপাসনায় ওঁকারের সর্বোচ্চ স্থান। অহংগ্রহ-উপাসনায় যিনি উত্তম অধিকারী তিনি ব্রহ্মের কোন আলম্বন ব্যতিরেকে ব্রহ্মের সহিত স্বীয় জীবাত্মার অভেদবুদ্ধি উৎপাদন করিতে

(১) ১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যাবিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নম্॥
—আত্মবোধ, ৩৬

পারেন। কিন্তু সকলের পক্ষে তাহা সহজ নহে। যিনি মধ্যম অধিকারী তিনি, ওঁকারকে ব্রহ্মের আলম্বন স্বীকারে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, তাহার সহিত স্বীয় জীবাত্মার অভেদ-বোধ করিতে পারেন। শ্রুতি অনেকবার বলিয়াছেন যে, ওঁকারই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মস্বরূপ—ওমিতি ব্রহ্ম। (৩) এখানে ওঁ শব্দ নির্গুণব্রহ্ম এবং সগুণব্রহ্ম উভয়েরই বাচক। ওঁ-উচ্চারণের দ্বারা নির্গুণব্রহ্ম ও সগুণব্রহ্ম উভয়কেই বুঝায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—পরং চাপরং ব্রহ্ম যদোঙ্কারঃ। (৪) ইহা ব্রহ্মের সর্বশ্রেষ্ঠ নাম। এই কারণ, ওঁ শব্দ অতীব পবিত্র। ওঁকারকে প্রণব কহে। প্র+নু—অল্=প্রণব। প্রণূয়তে প্রকর্ষেণ স্তূয়তে পরব্রহ্ম অনেন ইতি প্রণবঃ, প্রকৃষ্টভাবে পরব্রহ্মের স্তুতি হয় যাহার দ্বারা তাহাই প্রণব। ইহা প্রণব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।

প্রতীকোপাসনা

প্রতীক শব্দের অর্থ, অঙ্গ বা অবয়ব। সৃষ্টিমণ্ডলে স্থূল ও সূক্ষ্ম লৌকিক পদার্থসমূহ সগুণব্রহ্মের অঙ্গস্বরূপ। এই সকল পদার্থ মায়াশক্তির সাহায্যে কারণ-ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। শ্রুতি স্পষ্ট বলিয়াছেন—তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ, সেই পরমেশ্বরের অবয়বরূপে কল্পিত বস্তুসমূহের দ্বারা এই অখিল জগৎ পরিপূর্ণ। (৫) তাহা হইলে মায়িক ও লৌকিক পদার্থমাত্রই সগুণব্রহ্মের অবয়ব অর্থাৎ প্রতীক হয়। এইভাবে তাঁহার কোনও প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধির আরোপ করিয়া উপাসনা—প্রতীকোপাসনা। এই প্রতীকগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ব্রহ্ম শুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ, কিন্তু প্রতীকগুলি জড় পদার্থ। অতএব, উভয়ে কখনো

(৩) তৈঃ উঃ, ১।৮
(৪) প্রঃ উঃ, ৫।২
(৫) শ্বেঃ উঃ, ৪।১০

এক হইতে পারে না। ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট, প্রতীক নিকৃষ্ট। তবে, চৈতন্যের অবয়ব জড় পদার্থ হইতে পারে; যেমন চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মার অবয়ব জড় জীব-দেহ। তাই, প্রতীক ব্রহ্মের অবয়ব। প্রতীক ব্রহ্ম না হইলেও, তাহাতে ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাসনা করা যাইতে পারে। এইভাবে উপাসনাই প্রতীকোপাসনা। অব্রহ্মণি ব্রহ্মানুসন্ধানং, ব্রহ্মাতিরিক্ত নিকৃষ্ট বস্তুতে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মের ধ্যান। এই স্থলে নিকৃষ্ট বস্তুতে উৎকৃষ্ট বস্তুর আরোপ বুঝিতে হইবে, উৎকৃষ্ট বস্তুতে নিকৃষ্ট বস্তুর আরোপ নহে। এই বিচারে অন্তর্জগতে মন-বুদ্ধি ইত্যাদি এবং বহির্জগতে সাগর, পর্বত, অরণ্য ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুই ব্রহ্মের প্রতীক হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সকল বস্তুর যে কোনটির উপর ইচ্ছামত ব্রহ্ম-বুদ্ধির আরোপ করিয়া উপাসনা করিলেই যথার্থ প্রতীকোপাসনা হয় না। ইহাদের ভিতর যে বস্তুটি শাস্ত্রবিহিত তাহাকে অবলম্বন করিয়া, অর্থাৎ তাহার উপর ব্রহ্মবুদ্ধির আরোপ করিয়া, যে উপাসনা—তাহাই যথার্থ প্রতীকোপাসনা। আচার্য শঙ্করের স্পষ্ট উক্তি—যথাশাস্ত্রসমর্পিতং কিঞ্চিদালম্বনমুপাদায়। কোন কোন বস্তু প্রতীকোপাসনার যোগ্য, তাহা উপনিষদ্-ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থে কথিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—অগ্নি, সূর্য, বায়ু আকাশ, দ্যুলোক, পৃথিবী, সমুদ্র প্রভৃতি (১) প্রতীকোপাসনার যোগ্য। এই সব পদার্থ ব্যতীত ওঁকারও ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক বা শব্দ-প্রতীক বলিয়া কথিত—এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরং। (২) ওঁকার ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মবাচক, এই কথা পূর্বে অহংগ্রহ-উপাসনার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। সেখানে ওঁকারের উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা—ব্রহ্মের প্রতীকোপাসনা নহে।

(১) ছাঃ উঃ, ৪।১২-১৮

(২) কঃ উঃ, ১।২।১৭

আবার, এখানে এই ওঁকারকে ব্রহ্মের প্রতীকরূপেও উপাসনার নির্দেশ। অর্থাৎ, প্রতিমাদির ন্যায় ওঁকার এখানে ব্রহ্মের যেন ধ্যেয় মূর্তি। অ, উ ও ম এই অক্ষরত্রয়ের সংযোগে ওঁ শব্দের উৎপত্তি। তিন বেদ হইতে এই তিন অক্ষর সংগৃহীত হইয়াছে—ঋক হইতে 'অ', যজুঃ হইতে 'উ', এবং সাম হইতে 'ম'। সৃষ্টিকালে মায়াশক্তির দ্বারা আবৃত সগুণব্রহ্ম হইতে পঞ্চমহাভূতের সর্বপ্রথমে উৎপন্ন হয়—আকাশ। (৩) আকাশের সূক্ষ্মাংশ বা তন্মাত্র—শব্দ। প্রথমে শব্দতন্মাত্র, তারপর স্থূল আকাশ। (৪) অতএব দেখা যায় যে, পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টিমণ্ডলে শব্দতন্মাত্রই সগুণব্রহ্মের প্রথম সৃষ্টি। ওঁকার শব্দাত্মক। পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টির আদিতে এই শব্দাত্মক ওঁকার-ধ্বনির ভিতর দিয়া পরমেশ্বর আত্মপ্রকাশ করেন। এই শব্দ অনাহত, অর্থাৎ আঘাতজনিত নহে। স্থূলজগতে যে সব শব্দ আমরা সচরাচর শুনিয়া থাকি, সে সব বস্তুর আঘাত-জনিত বা আহত। সূক্ষ্মজগতে যে ওঁকার-ধ্বনি উঠিতেছে, তাহা এইরূপ বস্তুর আঘাত-জনিত নহে। এই অনাহত ধ্বনি অন্তর্জগতেও নিত্য উত্থিত হইতেছে। চিত্ত সমাহিত হইলে এই ধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। এই ওঁ-ধ্বনি বাহিরে (৫) ও অন্তরে অনবরত উঠিতেছে। এই নিমিত্ত ইহা ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। এখানে ওঁকার ব্রহ্মস্বরূপ না হইলেও, তাহার উপর ব্রহ্মবুদ্ধি আরোপ করিয়া উপাসনা করা

---

(৩) তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। —তৈঃ উঃ, ২।১।৩

(৪) ২৫৭ পৃষ্ঠায় ইহার ব্যাখ্যান দ্রষ্টব্য।

(৫) গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরস (Pythagoras) একস্থানে বলিয়াছেন—যেমন একটি লাটিমকে সুতা বাঁধিয়া জোরে ঘুরাইলে তাহা হইতে এক বোঁ বোঁ শব্দ উঠে, তেমনি অতিবেগে সর্বদা ঘূর্ণায়মান পৃথিবী-চন্দ্রাদি গ্রহ-উপগ্রহ হইতে এই বিরাট সৌরজগতে এক বিপুল ধ্বনি নিরত উঠিতেছে ; সেই ধ্বনিকে হিন্দুশাস্ত্রের ওঁধ্বনি বলা যাইতে পারে।

যায়। যিনি মন্দ অধিকারী তাঁহার পক্ষে অহংগ্রহ-উপাসনার অভেদত্ব-বোধ সুকঠিন, তিনি প্রতীকোপাসনা করিতে পারেন। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা যাইতে পারে। হিন্দুবিদ্বেষী ধর্ম-প্রচারকগণ অগ্নি-সূর্য-বায়ু প্রভৃতি প্রতীকসমূহের উপাসনাকে জড় প্রকৃতির উপাসনা এই আখ্যা দিয়া, তথাকথিত সভ্যসমাজে বৈদিক উপাসনাকে হেয় করিতে তৎপর। প্রতীকোপাসনার যথার্থ মর্ম অবগত না হওয়ার ফলেই তাঁহাদের এই অপচেষ্টা। সৃষ্টিমণ্ডলে নিছক জড় পদার্থ কিছু নাই, জড়ের মধ্যেও চৈতন্য অনুস্যূত—ইহাই বেদবাণী। অতএব, বৈদিক হিন্দু অগ্নি-সূর্যাদিকে জড় পদার্থ জ্ঞানে উপাসনা করে না; তাহাদের উপর চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের আরোপ করিয়া ব্রহ্মপ্রতীক বা চিন্ময় দেবতাবোধে উপাসনা করে। কাজেই ইহা ঠিক জড়-উপাসনা নহে। স্থূল বস্তুর সাহায্যে সূক্ষ্ম বস্তুর অবধারণা। পাঠশালার ছাত্রদিগকে স্থূল বস্তুর সাহায্যে সূক্ষ্ম বস্তুর শিক্ষা দিতে হয়, নচেৎ তাহারা বুঝিতে পারে না। উপাসনাক্ষেত্রেও সেই নিয়ম। বয়সে বৃদ্ধ হইলেও অধ্যাত্মসাধনায় অনেকে শিশু। তাই, স্থূলের অবলম্বন ভিন্ন সূক্ষ্মের অবধারণা তাহাদের হয় না। এইরূপ মন্দাধিকারীদের পক্ষে প্রতীকোপাসনা প্রশস্ত।

(খ) পৌরাণিক উপাসনা।

পৌরাণিক যুগে যে সব উপাসনা প্রবর্তিত হয়, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—প্রতিমা-পূজা, লিঙ্গ-পূজা, শালগ্রাম-পূজা, এবং নাম-জপ ও নাম-কীর্তন। প্রতীকোপাসনা দুই প্রকার—সাকার এবং নিরাকার। এখানে আকার বলিতে মানুষের মত হস্ত-পদ-মুখ-বিশিষ্ট আকার বুঝিতে হইবে।

প্রতিমা-পূজা

বৈদিকযুগের প্রতীকোপাসনা ছিল নিরাকার। অগ্নি, সূর্য, বায়ু প্রভৃতি প্রতীকগণের হস্ত-পদ-মুখ-বিশিষ্ট আকার কল্পিত হয় নাই। সাকার প্রতীকোপাসনা প্রচলিত হয় পৌরাণিক যুগে। ইহাই প্রতিমা-পূজা বা মূর্তি-পূজা। ঠিক কোন সময় হইতে আর্যহিন্দুসমাজে প্রতিমা-পূজার প্রচলন হয়, তাহা বলা কঠিন। কেহ কেহ বলেন যে, জৈনধর্ম-প্রবর্তকগণ প্রথমে মূর্তিপূজা আরম্ভ করেন। (১) ঋষভদেব হইতে মহাবীর পর্যন্ত তীর্থঙ্করদের বড় বড় মূর্তি নির্মাণ করিয়া জৈনগণ পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের অনুসরণে আর্যহিন্দু-সমাজেও এই মূর্তি-পূজা দেখা দিল। মতান্তরে, প্রদ্যুম্নের পুত্র অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপিত করিয়া পূজা আরম্ভ করেন এবং তদবধি মূর্তি-পূজা চলিয়া আসিতেছে। সে যাহাই হোক, প্রতিমাপূজাও প্রতীকোপাসনা। সূক্ষ্মশরীরী দেবতার কল্পিত স্থূল আকারের পূজা—প্রতিমা-পূজা। প্রত্যেক দেবতার প্রতিমাতে সেই সূক্ষ্মশরীরী চিন্ময় দেবতার আরোপ করিয়া পূজা করা হয় বলিয়া, প্রতিমা-পূজাকে সাকার প্রতীকোপাসনা বলা হয়। দেবতাদের মূর্তি-কল্পনা একেবারে বেদমূলক নহে, একথা বলা যায় না। ঋগ্বেদেও মূর্তির কল্পনা আছে, ইহা আমরা সপ্তম অধ্যায়ে দেখিয়াছি। (২) মূর্তি-পূজা-প্রচলনের মূলে কয়েকটি সারগর্ভ যুক্তি বিদ্যমান। প্রথমতঃ, দেশ-কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এমন কোন বস্তুর চিন্তা সাধারণ মানুষের কষ্টসাধ্য—উপাসনা তো দূরের কথা। সাধারণ মানুষ অতি-মানবের চিত্রন-সৃজন-চিন্তনে অক্ষম (৩)।

(১) স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কৃত, সত্যার্থ-প্রকাশ, ১১শ সমুল্লাস।

(২) ৩০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) Man can paint or make or think nothing but man. —Emerson.

অতএব, মানুষ পরমেশ্বরের, অথবা সূক্ষ্মশরীরী দেবতাদের, ধারণা করিতে চায় মানুষেরই আকার দিয়া। সে মনে করে, তাহার দেবতা তাহারই সদৃশ—তবে তাহার সঙ্গে তাহার দেবতার প্রভেদ এই যে, তাহার ভিতর যে সব দিব্যগুণ অতিসামান্য মাত্রায় আছে, সে সব গুণ তাহার দেবতার ভিতর আছে খুব বেশী মাত্রায়। নিরাকার প্রতীকোপাসনায় বৈদিক প্রতীকগণের বা যজতগণের আকার মানুষের মত ছিল না, তাই তাহাতে সাধারণ উপাসকের অন্তরের পিপাসা মিটে নাই। প্রয়োজন হইয়াছিল সাকার মূর্তির। দ্বিতীয়তঃ, পরমেশ্বরের ঐশ্বরিক ভাব অনন্ত। মানবের কি সাধ্য যে সে তাঁহার সেই অনন্ত ঐশ্বর্যের ধারণা করিতে পারে। তিনি শক্তিময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময় এবং পবিত্রতাময়—এই পাঁচটি ভাবেরই একত্র ধারণা মানুষ করিতে পারে না। যদি শিল্পকৌশলে একাধারে ঐ সমস্ত ভাবের সমাবেশে একখানা চিত্রপট আঁকিয়া তাহার সম্মুখে ধরা যায়, তাহা হইলে সে চিত্তের মাঝে ঐ ভাবপঞ্চ যুগপৎ গ্রহণে সমর্থ হয়, ঠিক যেরূপ বালকগণ মানচিত্র দেখিয়া বিচিত্র নদী-পর্বত-বিশিষ্ট দেশ-বিদেশের ধারণা করিতে পারে। ঋষিগণ ধ্যানলব্ধ দৃষ্টিতে পরমেশ্বরের যে সকল ঐশ্বরিক ভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন, শিল্প-কৌশলে সেই সকলের সমাবেশে এক এক দেব-মূর্তির রচনা করিয়াছিলেন। এক এক দেব-প্রতিমাতে একাধিক ঐশ্বরিক ভাবের সংস্থিতি। যেমন, পরমেশ্বরের আদ্যাশক্তিরূপিনী মহাশক্তির যে সব ঐশ্বরিক ভাব ঋষি ধ্যানদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, সেই সবের একত্র সংস্থিতি দুর্গা-প্রতিমাতে। (৪) প্রতিমা-দর্শনে শুধু যে উপাসকের

---

(৪) অধুনা দেব-দেবীর প্রতিমা-নির্মাণে দেব-দেবীর ধ্যান-মূর্তির সহিত কোথাও কোথাও বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। প্রতিমা শব্দের অর্থ, প্রতিবিম্ব। ঋষিগণের

চিত্তে যুগপৎ ঐ সব ঐশ্বরিক ভাবের দ্যোতনা হয়, তাহা নহে। নিমিষের জন্যও তাহার চিত্তকে লইয়া যায় সান্ত হইতে অনন্তে; উপাসক তন্ময় হইয়া যায় অনন্তের ভাবে। সকল প্রকার যথার্থ শিল্প-কৌশলের সাধারণ ধর্ম এই যে, তাহা অতি সামান্য ঘটনার কিংবা বিষয়ের উপর এক বিশ্বব্যাপী সনাতন অনন্ত ভাবের আরোপ করে। দেবদেবীর প্রতিমাচিত্রনে সেই ধর্ম সুপ্রকাশিত। মূর্তিপূজা-বিরোধী এই বলিয়া সচরাচর দোষারোপ করেন যে, ইহা কেবল পুতুলপূজা—কাঠ-পাথর-মাটির মূর্তির পূজা। এই দোষারোপ ভিত্তিহীন; কেননা, প্রতিমাতে দেবতার আরোপ করিয়া তবে পূজা করা হয়। যে পরমাত্মা সর্বভূতে সর্বত্র অনুস্যূত, তাঁহার সংযোগে প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হয় সর্বপ্রথমে। তখন তিনি হয়েন চিন্ময় দেবতা। তখন সেই প্রতিমাকে পূজা করা হয় দেবতা-জ্ঞানে। পণ্ডিতের দৃষ্টিতে হয়তো এই ধাতুময়, প্রস্তরময়, বা দারুময় জড় মূর্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা নিতান্ত বালসুলভ মনোবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানটিকে পণ্ডিতের দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না—দেখিতে হইবে ভক্ত-সাধক-উপাসকের দৃষ্টিতে। এইরূপ ব্যক্তির নিকট প্রতিমা পুতুল নয়। যখন আত্মহারা ভক্ত-সাধক-উপাসক সাশ্রুনয়নে প্রতিমায় তদ্গতপ্রাণ ও তন্ময়চিত্ত হইয়া সব দুঃখ-দৈন্য-জ্বালা চাতুরী-ছলনা-প্রবঞ্চনা হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণা ক্ষণেকের তরেও ভুলিয়া যায়, তখন এই যে তাহার চিত্তপরিবর্তন, ইহা কখনো প্রাণহীন পুতুলের দ্বারা

· ধ্যানদৃষ্টিতে যে দেবতার যে মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাই ধ্যান-মূর্তি। যে বাহ্য মূর্তিতে ঋষিদৃষ্ট অন্তরের এই ধ্যান-মূর্তি প্রতিবিম্বিত হয় না, সেই বাহ্য মূর্তি ঠিক প্রতিমাবাচ্য নহে। এরূপ কোন বাহ্য মূর্তিতে রচনার শিল্পচাতুর্য যথেষ্ট থাকিলেও, তাহা শাস্ত্রতঃ প্রতিমাবাচ্য নহে।

সাধিত হইতে পারে না। ইহা চিন্ময় দেবতার কাজ। (১) ধর্মের আদিকথা—চিত্তশুদ্ধি। যদি প্রতিমা-পূজার সাহায্যে উপাসকের চিত্তশুদ্ধি ঘটে, তবে তাহা নিশ্চয়ই ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গবিশেষ।

যে সকল ধর্মে প্রতীকের উপাসনা নিন্দিত, সেই সকল ধর্মপন্থীও উপাসনার অভিপ্রায়ে কোন-না-কোন বাহ্য প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টপন্থী ক্যাথলিক (Catholic) সেই সম্প্রদায়-ভুক্ত সাধুদের মূর্তি পূজা করেন। খ্রীষ্টপন্থী প্রোটেষ্ট্যাণ্ট (Protestant) এইরূপ মূর্তিপূজার বিরোধী হইলেও, ক্রুসকে (cross) ঈশার (Jesus) প্রতীকরূপে পূজা করেন। ইস্‌লামপন্থীর কাছে মক্কার প্রধান মসজিদ, হজরত মহম্মদের প্রতীকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মুসলমানকে নমাজের সময় ভাবিতে হয় যে, তিনি যেন কাবার মসজিদে রহিয়াছেন। তীর্থদর্শনে যাইলে তাঁহারা ঐ কাবার মসজিদের ভিতর এক কৃষ্ণ প্রস্তরবিশেষকে চুম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, ঐ চুম্বন-চিহ্ন তাঁহাদের কল্যাণার্থে শেষ বিচারের দিনে সাক্ষীস্বরূপ হাজির হইবে। মুসলমানগণ আরো বিশ্বাস করেন যে, জিম্‌জিম্‌ নামক কূপ হইতে যে কেহ কিছুমাত্র জল গ্রহণ করিবে তাহার পাপরাশি বিধৌত হইবে এবং গোর হইতে পুনরুত্থানের পর সে নবদেহে চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে। তারপর আর এক কথা। আজকাল সমস্ত দেশেই সমস্ত ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে দেখা যায় যে, কোন স্বনামধন্য পুরুষের জন্মতিথিতে বা মৃত্যুতিথিতে তাঁহার প্রস্তরমূর্তি, ছায়াচিত্র, বা তৈলচিত্রকে পুষ্পমাল্যে

(১) একনিষ্ঠ সাধকের সম্মুখে তাঁহার ইষ্টদেবতার প্রতিমা ভাবঘন মূর্তিতে জীবন্তরূপে দেখা দেন, ইহার প্রমাণ বিরল নহে। বাঙ্গলা দেশে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাধকপ্রবর শ্রীরামপ্রসাদ তাহার দৃষ্টান্ত।

ভূষিত করিয়া পূজা-সম্মান করা হয়, যদিও তিনি ঐ প্রতিমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত থাকেন না। ইহা করা হয় এই হেতু যে, ঐ প্রতিমূর্তি তাঁহার ভাব-শক্তি-গুণের কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহা যদি দোষের না হয়, তবে দেব-প্রতিমাতে দেবতার অধিষ্ঠান জানিয়া সেই প্রতিমার পূজার্চনায় কোন দোষ থাকিতে পারে না; কেননা, তাহাও সেই দেবতার ভাব-শক্তি-গুণের কথা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়।

লিঙ্গপূজা

লিঙ্গ-পূজা বলিতে সাধারণতঃ আমরা শিব-লিঙ্গের পূজা বুঝি। লিঙ্গ শব্দের অর্থ একাধিক; কেবলমাত্র পুরুষাঙ্গই ইহার অর্থ নহে। কোন-কিছুর চিহ্ন, তাহার লিঙ্গ। শিব-লিঙ্গ বলিলে গৌরীপট্ট বা যোনিপীঠ সমন্বিত শিব-লিঙ্গ বুঝিতে হইবে, এমন কোন মানে নাই। যাহা শিবের চিহ্ন বা সূচক, তাহাই শিব-লিঙ্গ। এমন অনেক তীর্থস্থান আছে, যেখানে গৌরীপট্টযুক্ত শিব-লিঙ্গের পরিবর্তে কেবলমাত্র এক শিলাখণ্ডকেই শিব-লিঙ্গ বলিয়া পূজা করা হয়। যেমন—হিমালয়ে প্রসিদ্ধ কেদারনাথতীর্থে, কাশীতে কেদারেশ্বরে, কন্খলে দক্ষেশ্বর-শিবমন্দিরে, গোদাবরীতীরে ত্র্যম্বকেশ্বর-শিবমন্দিরে, পুরীতে জম্বুকেশ্বর-শিব-মন্দিরে, দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ গোরক্ষনাথ-শিবমন্দিরে। কাশ্মীরে প্রখ্যাত অমরনাথ তীর্থে এক খণ্ড বরফ, অমরনাথ শিবের প্রতীক। পুরাণে শিবলিঙ্গের ব্যাখ্যা এইরূপ—উপরে অনন্ত আকাশ শিবের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন বা প্রতীক এবং নীচে পৃথিবী তাহার পীঠিকা; তিনি সর্বদেবতার আলয়, এবং প্রলয়ে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ তাঁহাতে লয় পায়, সেই হেতু লিঙ্গ কথিত। (১) অধিকাংশ-

(১) আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥

ক্ষেত্রে গৌরীপট্ট বা যোনিপীঠ সমন্বিত শিবলিঙ্গের পূজা হয়, এই কথা অবশ্য স্বীকার্য। তবে কিভাবে এই প্রথা প্রচলিত হয়, তাহার একটি সুন্দর যুক্তি আছে। বেদে শিবের নাম, রুদ্র। রোদয়তি ইতি রুদ্রঃ—তিনি সংহারমূর্তিতে সমস্ত সৃষ্টির সংহার বা লয় করিয়া যেন জীবগণকে রোদন করাইয়া থাকেন। তাঁহার এই রুদ্রমূর্তিকে জনসাধারণ ভয়ের চক্ষেই দেখিয়া থাকে—প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে না। এই অবস্থায় তাঁহার প্রতি ভক্ত-সাধকের যথার্থ অনুরতি কখনো জন্মাইতে পারে না। যিনি সৃজন করেন, তিনিই লোকের প্রিয়; যিনি ধ্বংস করেন, তিনি নহেন। সেই নিমিত্ত শিবকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে, তাঁহাকে সংহারকর্তার পরিবর্তে সৃজনকর্তারূপে পৌরাণিক যুগে কল্পনা করা হয়। শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, প্রলয়কালে সব ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু এক অদ্বিতীয় রুদ্র থাকেন। (২) তিনি তাঁহার নিজাংশভূতা প্রকৃতি হইতে আবার নূতন জগৎ সৃষ্টি করেন। তাই, পুরাণে শিব জগতের পিতা এবং তাঁহার অংশভূতা প্রকৃতি জগতের মাতা বলিয়া কল্পিত। জগন্মাতাই পার্বতী। শিব-পার্বতী হইলেন জগতের পিতামাতা। সাধারণতঃ আমরা দেখি যে, স্ত্রী-পুং-সংযোগে জীবের উৎপত্তি হয়। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। শিব-পার্বতীর সংযোগে যখন জগতের উৎপত্তি, তখন পুরাণকার ইহাকে স্থূলরূপে দেখাইবার উদ্দেশ্যে ঐ স্বাভাবিক নিয়মানুসারে যোনি-বেষ্টিত লিঙ্গের কল্পনা করিয়াছেন। গীতাতেও (৩) শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই আমার যোনি; ইহাতে আমি গর্ভের আধান করি, অর্থাৎ সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ

(২) শ্বেঃ উঃ, ৩।২
(৩) গীঃ, ১৪।৩

করি; (৪) সেই গর্ভাধান হইতে হিরণ্যগর্ভাদি সর্বভূতের সৃষ্টি হয়। এখানেও গর্ভাধানের কথা। তাই, পুরাণে যোনি-বেষ্টিত লিঙ্গ কল্পিত। লিঙ্গ-পূজাকে নিরাকার প্রতীকোপাসনা বলা যাইতে পারে।

ভিন্নধর্মাবলম্বিগণ এই লিঙ্গ-পূজার অপব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে নিন্দিত করেন। তাঁহাদের মতে, অসভ্য অনার্যদের ভিতর শিশ্ন-পূজা বা পুরুষাঙ্গ-পূজা প্রচলিত ছিল। তাহাদিগের সেই জঘন্য পূজা-পদ্ধতি আর্যগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। অনার্যদের মধ্যে শিশ্ন-পূজা প্রচলিত ছিল, ইহা সত্য। শুধু ভারতে অনার্যদের মধ্যে নহে। এককালে বেবিলোনীয়, মিশরীয়, গ্রীক এবং রোমক জাতির মধ্যেও এই শিশ্ন-পূজা প্রচলিত ছিল। (৫) কিন্তু এই কথা সত্য নয় যে, আর্যগণ তাহাদের সেই শিশ্ন-পূজাকে সাদরে আর্যধর্মে স্থান দিয়াছিলেন। বেদে ইহার ঠিক বিপরীত কথা দেখা যায়। ঋগ্বেদে বহুস্থলে অনার্যদের ঐ শিশ্ন-পূজাকে লক্ষ্য করিয়া ঘৃণার সহিত অনার্যদিগকে কথিত হইয়াছে—শিশ্নদেবাঃ, শিশ্ন বা পুরুষাঙ্গই তাহাদের দেবতা। যাহারা অতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহারাই শিশ্নদেবাঃ। ইহা প্রশংসার বাক্য নহে, নিন্দার বাক্য। (৬) শিশ্ন-পূজার ভিতর বিশ্বসৃষ্টির ভাব কিছুমাত্র নাই।

শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুবুদ্ধির আরোপে পূজা—শালগ্রাম-পূজা। ইহাও নিরাকার প্রতীকোপাসনা। যে মন্ত্রে শালগ্রাম শিলাকে স্নান

(৪) জড়া প্রকৃতির উপর চিন্ময় ব্রহ্মের চিদাভাস পাতনকে লৌকিক ভাষায় এখানে বীর্যপাতন বলা হইয়াছে।

(৫) ইংরাজিতে বলে Phallus worship।

(৬) Vedic Culture, X (Siva-Cult)।

করাইতে হয়, তাহা প্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র—যে পুরুষ সহস্রশীর্ষ অর্থাৎ অসংখ্য মস্তকযুক্ত, সহস্রাক্ষ অর্থাৎ অসংখ্য নেত্রযুক্ত, সহস্রপদ অর্থাৎ অসংখ্য পদযুক্ত, তিনি জগৎকে সর্বদিকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন এবং পঞ্চ স্থূলভূতে ও পঞ্চ সূক্ষ্মভূতে গঠিত এই জগৎকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন। (১) এই মন্ত্রে একাধারে সবিশেষ এবং নির্বিশেষ ব্রহ্ম সূচিত হইয়াছে। শালগ্রাম শিলা, সেই বিশ্বব্যাপক ব্রহ্ম বা বিষ্ণুর প্রতীক। স্নান করাইবার এই মন্ত্রে ইহা অবধারণ করিতে হয়। ইহাকেই কহে শালগ্রাম শিলায় বিষ্ণুবুদ্ধির আরোপ।

শালগ্রাম-পূজা

মূর্তি-পূজা দুইভাবে হইতে পারে—অন্তরে ও বাহিরে। নিজের অভ্যন্তর প্রদেশে হৃদয়ে, ত্রিকূটে বা অন্য কোন কেন্দ্রে ইষ্টদেবতার মূর্তি কল্পনা করিয়া, সেই মূর্তির ধ্যান ও মানসপূজা বা উপাসনা করা চলে। ইহা সাধকের নিত্যকর্ম। বাহিরে দেব-দেবীর প্রস্তরময়, দারুময়, অথবা ধাতুময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া যে পূজা করা হয়, তাহা নৈমিত্তিক কর্ম। ঐরূপ বাহ্য মূর্তিকে প্রতিমা বলে। নৈমিত্তিক পূজায় একত্র অনেক লোকের উপাসনার উদ্দেশ্যে প্রতিমার আবশ্যক। ইহাতে সমবেত উপাসনার সাহায্যে জাতির সংহতি-শক্তি জাগ্রত হয়। নিত্য ব্যক্তিগত উপাসনায় প্রতিমার একান্ত প্রয়োজন হয় না। ব্যক্তিগত উপাসনায় দেব-দেবীর মূর্তি-ধ্যানও যে অপরিহার্য, তাহা নহে। অন্তরে ঐরূপ কোন মূর্তির কল্পনা না করিয়াও, কেবলমাত্র ইষ্টদেবতার নাম-জপের ও নাম-কীর্তনের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। শাস্ত্র

নাম-জপ ও নাম-কীর্তন

---

(১) সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিম্ সর্বতঃ স্পৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ —ঋক, ১০।৯০।১

বলেন—জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎ সিদ্ধিঃ ন সংশয়ঃ। ইহা দৃঢ় বাণী। জপের অর্থ, মনে মনে পুনঃ পুনঃ শ্রীভগবানের কোন নাম বা মন্ত্র উচ্চারণ। নামই নামী—নাম ধরিয়া ডাকিলে, নামী সাড়া দেন। নাম-কীর্তনের অর্থ, শ্রীভগবানের নামের গুণকীর্তন। যাঁহারা নিরাকারবাদী, তাঁহারাও নাম-জপ ও নাম-কীর্তনকে উপাসনার অঙ্গস্বরূপ গ্রহণ করেন। আসল কথা—উপাসকের অধিকারভেদে উপাসনাভেদ। শাস্ত্র বলিয়াছেন—সমাধির অবস্থায় ব্রহ্মের সহিত অভেদ-ভাব, সর্বোত্তম; অন্তরে সগুণব্রহ্মের কোন গুণ অবলম্বনে ধ্যান, মধ্যম; তাঁহার স্তুতি-জপ, অধম; তাঁহার বাহ্য মূর্তির পূজা, অধমাধম। (২) এইভাবে শাস্ত্রে চারি প্রকার অধিকার-ভেদ উল্লিখিত—উত্তম, মধ্যম, অধম এবং অধমাধম। উত্তমাধিকারীর সংখ্যা খুব কম। মধ্যমাধিকারীও বিরল। সাধকদের মধ্যে অধিকাংশ অধম ও অধমাধম অধিকারী। বাহ্যমূর্তির পূজা অধমাধম হইলেও, জনসাধারণের পক্ষে ইহা সুগম। নাম-জপ এবং নাম-কীর্তন বা স্তুতি-জপ অধম, কিন্তু ইহাও অধিকাংশের উপযোগী।

(গ) তান্ত্রিক উপাসনা।

কি নির্গুণ, কি সগুণ, কি নিরাকার, কি সাকার, কি বৈদিক, কি পৌরাণিক, কি সাত্বিকী, কি রাজসী, কি তামসী, সকল প্রকার উপাসনা স্থান পাইয়াছে তন্ত্রে। এই শাস্ত্রে উপাসকের রুচি-প্রকৃতি-সামর্থ্য অনুসারে উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী কথিত; অতি উচ্চস্তর

---

(২) উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমঃ॥

—শিবসংহিতা।

হইতে অতি নিম্ন স্তরের উপাসনা—সব আছে। তাই, বলা যাইতে পারে যে, তন্ত্রে অধিকারবাদ পূর্ণমাত্রায় গৃহীত। বর্তমানকালে দেব-দেবীর পূজার্চনায় তন্ত্রের প্রাধান্য আসমুদ্র হিমাচল, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে। কি শৈব, কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, প্রায় সকলেই তন্ত্রানুসারে দীক্ষা-ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তন্ত্রে দ্বিজ এবং স্ত্রী-শূদ্র সকলের অধিকার। তন্ত্র পূজার্চনার স্থানে স্থানে বৈদিক মন্ত্রও গ্রহণ করিয়াছেন। তান্ত্রিক উপাসনা সম্বন্ধে এখানে আর বেশী কিছু বলা হইল না।

দশম অধ্যায়।

হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য।

প্রত্যেক ব্যক্তির ও প্রত্যেক জাতির মত প্রত্যেক ধর্মেরও বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য সেই ধর্মকে অন্য ধর্ম হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে। হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রধানতঃ সাতটি—(১) পরমেশ্বরের বিশ্বানুগতা ও অন্তর্যামিত্ব, (২) পরধর্মসহিষ্ণুতা, (৩) বিশ্বভ্রাতৃত্ব, (৪) অধিকারবাদ, (৫) সার্বভৌমিকতা, (৬) পরিবর্তনশীলতা এবং (৭) আত্মনির্ভরতা।

[এক]

পরমেশ্বরের বিশ্বানুগতা ও অন্তর্যামিত্ব।

পারসিক ধর্মে অহুর-মজ্‌দার অর্থাৎ পরমেশ্বরের বিশ্বব্যাপকতা স্বীকৃত; কিন্তু তিনি বিচারপতিরূপে মর্ত্যের বা পৃথিবীলোকের বাহিরে অবস্থান করেন। ইহুদী ধর্মে পরমেশ্বর সম্পূর্ণ মর্ত্যাতীত। তিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আছেন পৃথিবীর বাহিরে। খ্রীষ্টধর্মের বাইবেলে আমাদের মধ্যে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান বহুবার কথিত হইয়াছে; কিন্তু সৃষ্টিমণ্ডলের সর্বত্র তিনি অনুস্যূত, এই স্পষ্ট উক্তি বাইবেলে নাই। খ্রীষ্টধর্মের মতেও বিচারপতিরূপে পরমেশ্বর মর্ত্যের বাহিরে অবস্থান করেন। ইস্‌লামের অন্তর্গত সুফীসম্প্রদায় বেদান্ত-মতবাদের দ্বারা কিছু প্রভাবান্বিত, তাই তাঁহারা পরমেশ্বরের বিশ্বানুগতা বা বিশ্বব্যাপকতা

অন্য ধর্মে বিচারপতি পরমেশ্বর মর্ত্যের বাহিরে

স্বীকার করেন। কিন্তু মূল ইস্‌লাম ধর্ম তাহা স্বীকার করেন না। ইস্‌লাম বলেন—আল্লা অর্থাৎ পরমেশ্বর পৃথিবীর বাহিরে অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন; 'রোজ কেয়ামৎ' অর্থাৎ বিচার-দিবস আগত হইলে মৃতদিগের সমাধি বা গোর হইতে পুনরুত্থান ঘটে এবং তাহারা আল্লার সম্মুখে উপস্থিত হয়। তখন আল্লা তাহাদের প্রত্যেকের এই পৃথিবীলোকে কৃতকর্মের বিচার করিয়া পুণ্য ও পাপ অনুযায়ী স্বর্গভোগের ও নরকভোগের নির্দেশ দেন। তিনি স্বয়ং মর্ত্যে নামেন না, তবে অন্তরীক্ষ হইতে মর্ত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং মাঝে মাঝে স্বর্গীয় দূত এখানে পাঠান। ইস্‌লামের এই মতবাদ খ্রীষ্টধর্ম ও ইহুদীধর্ম হইতে গৃহীত। আবার, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইহুদী ধর্ম ইহা কতকাংশে লইয়াছেন পারসিক ধর্ম হইতে। ঐ সকল ধর্মে বিচার-দিবস (Day of Judgment) এক মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। যতকাল সেই দিন না আসে, ততকাল মৃত ব্যক্তিকে গোরের মধ্যেই থাকিতে হইবে।

একমাত্র হিন্দুধর্মই পুনঃ পুনঃ উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছেন—সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর বিশ্বানুগ, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র সর্বলোকে অনুস্যূত। চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্ম-ব্রহ্মাণ্ডবাদের আলোচনায় (১) ইহা কথিত হইয়াছে। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। হিন্দুধর্ম আরো বলেন যে, সেই বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বর সর্ব ভূতের অন্তরে অধিষ্ঠিত। ইহার নাম—সর্বভূতাত্মবাদ।

হিন্দুধর্মে তিনি মর্ত্যে সর্বভূতের অন্তরে

ইহাই তাঁহার অন্তর্যামিত্ব। হিন্দুধর্মের মতেও পরমেশ্বর বিচারকর্তা। কিন্তু তিনি এই পৃথিবীর বাহিরে অন্য লোকে কোথাও আসন পাতিয়া বসিয়া নাই। তিনি এই পৃথিবীতে সকল জীবের অন্তরে অধিষ্ঠিত

(১) ১৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইয়া তাহাদিগকে নিয়ত পরিচালিত করিতেছেন (২) এবং পাপ-পুণ্যের বিচারে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করাইতেছেন। তাঁহারই বিচারে আমরা শুভাশুভ কর্মের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ সর্বদা ভোগ করি(৩)। তিনি মানবের অন্তরে প্রজ্ঞারূপে নিত্য বিরাজমান এবং প্রজ্ঞার বাণীই তাঁহার বাণী। সেই বাণী ধ্বনিত হয় বিবেক-বাণীরূপে আমাদের সকলের হৃদয়ে। ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। (৪) খ্রীষ্টধর্ম, ইস্‌লাম প্রভৃতি অপর ধর্মে পরমেশ্বরের যে বিচারকের ভাব চিত্রিত, তাহাতে বিচার-দিবসে সেই মহান্ বিচারকের সম্মুখে অপরাধীর ন্যায় আমাদিগকে হাজির হইতে যেন ভয় লাগে। অন্যপক্ষে, হিন্দু-ধর্মে জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামী সারথিরূপে তাঁহার অধিষ্ঠানের ভাবে, সত্যসত্যই আমাদের প্রাণে ভয়ের পরিবর্তে ভরসার সঞ্চার হয়। সেই সারথিরূপী অন্তরের দেবতা—চিরকল্যাণময় দেবতা—কখনো আমাদিগকে অমঙ্গলের পথে লইয়া যাইবেন না, যদি আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া অন্তরে তাঁহার বাণী শুনিবার শক্তিলাভ করি এবং সেই বাণীর অনুসরণ করি।

[দুই]

পরধর্মসহিষ্ণুতা।

হিন্দুধর্ম কখনো আগুয়ান হইয়া অপর ধর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নাই, বরং অপর ধর্মের মতবাদকে যতদূর সম্ভব ঐক্যের দৃষ্টিতে আপনার করিয়া লইতে প্রযত্ন করিয়াছেন। ইহাই হিন্দুধর্মের

(২) যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ॥—বৃঃ উঃ, ৩।৭।১৫

(৩) ১২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পরধর্মসহিষ্ণুতা। নিরপেক্ষ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী এই সত্য একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন আর্যহিন্দু অনার্যগণের ধর্ম-কৃষ্টি-সাধনাকে আর্য-ভাবের দ্বারা পরিশোধনান্তর নিজের ধর্মে স্থান দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন—কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্, বিশ্বের সকলকে শুদ্ধির দ্বারা আর্য করিয়া লও। (৫)

হিন্দুধর্মে সামঞ্জস্য-শক্তি—অপর ধর্মে তাহার অভাব

উত্তরকালে বিদেশী ব্যাকট্রীয়ান গ্রীক, হুন ও শক প্রভৃতি জাতি ভারত অধিকার করিলে, তাহারা শত্রু হইলেও তাহাদের ধর্মমতের বিরুদ্ধে আর্যহিন্দু কখনো যুদ্ধ-ঘোষণা করেন নাই; বরং যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। শুধু ভারতে নহে—সমগ্র এসিয়া মহাদেশে—হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তার করে, অন্য ধর্মকে ধ্বংস না করিয়া, তাহার ধর্মমতকে সাধ্যমত হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া। মুসলমান কর্তৃক এই দেশ অধিকারের পর, ইস্‌লামকেও হিন্দুধর্ম অঙ্গীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন স্ফীবাদ-প্রচারে। ইংরাজ কর্তৃক এই দেশ অধিকারের পর, খ্রীষ্টধর্মকেও হিন্দুধর্ম নিজের কোলে আশ্রয় দিয়াছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের নববিধানের ভিতর দিয়া। এই ভাবে পরধর্মকে আপন করিয়া লওয়ার ফলে, হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে আজ এত বিচিত্রতা—এত নানাবর্ণের সাধন-পদ্ধতি। গাছপালা, ইটপাথর, পশুপক্ষী হইতে নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনা পর্যন্ত। প্রকৃতপক্ষে, কালপ্রবাহে হিন্দুধর্ম আজ প্রায় সর্বধর্মের সংক্ষিপ্তসার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভিন্নধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে হিন্দুধর্মের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কখনো কখনো উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন—তোমরা হিন্দুধর্ম বল কোনটাকে?

(৫) ঋক, ৯।৬৩।৫

তাঁহারা বুঝিতে অসমর্থ যে, হিন্দুধর্মের উদ্দেশ্য বহুর মাঝে একের সন্ধান—ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতের সবিশেষ সামঞ্জস্য। ইস্‌লাম এবং খ্রীষ্টধর্ম সারূপ্য স্থাপন করিতে পারেন অন্য ধর্মের নাশে। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া সবিশেষ সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে অক্ষম। কিন্তু হিন্দুধর্ম তাহা করিতে সক্ষম। আর্যভারতে বহির্ভারতের আক্রমণ পুনঃ পুনঃ হইয়াছে, কত রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে, তত্রাচ হিন্দুধর্ম আজো দৃঢ়মূল; তাহার কারণ, হিন্দুধর্মের ঐ সামঞ্জস্য-শক্তি। তাই, হিন্দুধর্ম কালজয়ী।

কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দুধর্মের আক্রমণ-নীতির ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে বহিষ্কৃত হয়। এই ধারণা ভুল। প্রকৃত কথা এই। শ্রীবুদ্ধের প্রবর্তিত আসল বৌদ্ধধর্ম এক হাজার বৎসর পরে ভারতে বিকৃত হইয়া জঘন্য কাপালিক তন্ত্রাদিতে পরিণত হয়। তখন শ্রীশঙ্করাচার্য প্রভৃতি আচার্যগণ সেই বিকৃত বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেন। তাহার ফলে ভারতে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের আত্মবিলুপ্তি ঘটিতে থাকে হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সেই আত্মবিলুপ্তি সম্পূর্ণ হয় তন্ত্রের মাধ্যমে। (১) এই আত্মবিলুপ্তির শেষ পর্যায়ে কতক হিন্দু দেব-দেবী রূপান্তরিত হইয়াছিলেন বৌদ্ধধর্মের ভিতর। যেমন—হিন্দুর শ্রীবিষ্ণু হইয়াছিলেন বৌদ্ধের পদ্মপানি, হিন্দুর শক্র বা ইন্দ্র হইয়াছিলেন

(১) প্রখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ Sir Monier-Williams বলিয়াছেন—"Budhism was not forcibly expelled from India by the Brahmins. It simply in the end—possibly as late as the thirteenth century of our era—became blended with systems which surrounded it (i e Vaishnavism, Saivism and Saktism), though the process of blending was gradual,"—
Budhism.

বৌদ্ধের সঙ্ক, হিন্দুর দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয়া তারাদেবী হইয়াছিলেন বৌদ্ধের শক্তিদেবী। শ্রীভগবান শ্রীবুদ্ধ অদ্যাবধি হিন্দুর পূজ্য ও দশাবতারের অন্যতম (২)

[তিন]

বিশ্বভ্রাতৃত্ব।

অন্য ধর্মে ঠিক বিশ্বভ্রাতৃত্ব যে আছে, তাহা নহে—আছে স্বধর্ম-ভ্রাতৃত্ব। ইস্‌লামে ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা যথেষ্ট আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ইস্‌লাম বলেন—মনুষ্যবিশেষের যাহা সাধনার ধন, তাহার ফলভোগী জাতি-দেশ-বর্ণ-নির্বিশেষে মনুষ্যমাত্রই, কেহ কোন কিছু নিজে সমস্ত ভোগ করিবার অধিকারী হইতে পারে না। এই প্রেরণা ইস্‌লামে আছে, তাই ইস্‌লাম অল্প সময়ের মধ্যে দেশে দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায় যে, বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান্ ও উদার আদর্শকে ইস্‌লাম পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ইস্‌লামের ভ্রাতৃত্ব কেবলমাত্র ইস্‌লামপন্থীদের ভিতর সীমাবদ্ধ—তাহা মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব মাত্র। সেই ভ্রাতৃত্বে অ-মুসলমানদের স্থান নাই। এক ব্যক্তি যে দেশের অধিবাসীই হোক্, যে জাতিই তাহার হোক্, যে বর্ণই তাহার হোক্, সে যদি একবার ইস্‌লামমন্ত্র গ্রহণ করে, তৎক্ষণাৎ সে মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের অধিকারী হইবে—আর যদি সে তাহা না করে, তবে সে সেই ভ্রাতৃত্বের অধিকারী হইবে না। একই পূর্বপুরুষের রক্ত যাঁহাদের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহমান, তাহাদের যদি কেহ

অন্য ধর্মে স্বধর্মভ্রাতৃত্ব

(২) ৩২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইস্‌লামকে গ্রহণ করে, তখন সেই নবদীক্ষিত মুসলমান আর তাহার রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের জন্য বেদনা অনুভব করে না, বেদনা অনুভব করে তাহাদের জন্য যাহারা ইস্‌লামপন্থী, যদিচ তাহাদের ভাষাটিও তাহার দুর্বোধ্য। এক কথায়, রক্তের টান তখন আর তাহার থাকে না। খ্রীষ্টধর্মেও বিশ্বভ্রাতৃত্ব পূর্ণ নহে। সেই ধর্ম বলেন যে, আমরা সকলেই এক পিতার সন্তান এবং পরস্পর ভ্রাতা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেই ভ্রাতৃত্বও সীমাবদ্ধ খ্রীষ্টধর্মানুরাগীদের এবং খ্রীষ্টপন্থীদের মধ্যে। খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকগণ যে ধর্মপ্রচারের সঙ্গে জনসেবার কার্য করেন তাহা নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ; তবে তাহার মূলে ঠিক বিশ্বভ্রাতৃত্ব নাই। সময়ে সময়ে তাঁহাদের ধর্মান্তরিতকরণের উদ্দেশ্য প্রকট হওয়ায় কিছু তিক্ততার সৃষ্টি করে।

বিশ্বভ্রাতৃত্বের পূর্ণ আদর্শ হিন্দুধর্মে, এই কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই ধর্মে এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভিত্তি পরমেশ্বরের সর্বব্যাপকত্বের উপর—বুনিয়াদ পাকা। কেবলমাত্র জাতি-দেশ-বর্ণ-নির্বিশেষে নহে, ধর্ম-নির্বিশেষেও আমরা পরস্পর ভ্রাতা। কেন? শুধু এক পরমেশ্বরের সন্তান-বোধে নহে, এই বোধে যে একই পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং আমাদের সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। আমরা এক অক্ষর আত্মার উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেহধারী জীব। এখানে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টিয়ান, রাজা-প্রজা, সধন-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল এই সবের ভেদ নাই। আমরা বস্তুতঃ সকলেই এক। এমন কি, তৃণ-গুল্ম পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গাদির সঙ্গেও আমরা বস্তুতঃ এক; কেননা, তাহাদের অন্তরেও তিনি বিদ্যমান। প্রভেদ মাত্র তাঁহার চৈতন্যাংশের বিকাশে। কোন জীবে তাঁহার

হিন্দুধর্মে পূর্ণ বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং পরমেশ্বরের সর্বব্যাপকত্বই তাহার ভিত্তি

চৈতন্যাংশের বিকাশ খুব কম, কোন জীবে খুব বেশী। মাত্রার তারতম্য। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গিমা—সমদর্শন। এই সমদর্শন যথার্থ লাভ হইলে, কাহারো প্রতি ঘৃণার ভাব আসিতে পারে না—হৃদয়ে জাগিয়া উঠে প্রকৃত বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব। শ্রুতি বলিয়াছেন—যিনি সকল বস্তুই আত্মাতে এবং সকল বস্তুতেই আত্মাকে অবস্থিত দেখেন, তিনি সেই সমদর্শনের ফলে, আর কোন বস্তুতে ঘৃণাবোধ করেন না। (১) ইহাই বেদমূলক সত্য সনাতন হিন্দুধর্মের মর্মবাণী। এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব-বোধেই হিন্দু অতীতকালে গ্রীক, হুন, শক, মুসলমান, ইংরাজ প্রভৃতি অ-হিন্দুকে হিন্দুস্থানে স্থান দিয়াছিল এবং আপনার করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল।

[চার]

অধিকারবাদ।

সকল ব্যক্তির অবস্থা, গুণ, রুচি, প্রকৃতি ও ধীশক্তি সমান নহে। অতএব, ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে এক পথ হইতে পারে না। তাই হিন্দুধর্মে ব্যক্তির অবস্থা, গুণ, রুচি, প্রকৃতি ও ধীশক্তি অনুযায়ী সাধনার ব্যবস্থা। ইহার নাম—অধিকারবাদ। অন্য ধর্মে ঠিক এই অধিকারবাদ নাই। হিন্দুধর্মে ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ সুনিপুণ। ব্যক্তির জীবনকে প্রথমতঃ বয়স ও অবস্থা অনুযায়ী ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমে ভাগ করা হইয়াছে। তারপর, ব্যক্তি-বিশেষে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণের তারতম্য ও প্রাধান্য অনুযায়ী

(১) যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥—ঈঃ উঃ, ৬

ব্যক্তিগণকে পৃথক্‌ভাবে ভাগ করা হইয়াছে। তারপর, জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম এই ত্রিবিধ চিত্ত-প্রবণতার তারতম্য অনুযায়ী ব্যক্তিগণকে পৃথক্‌ শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। এইরূপ বিভাগের পর, মানব-জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তির ধীশক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে সাধনার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। সেই নিমিত্ত ব্রহ্মচারীর সাধনা এক, গৃহীর আর এক, বানপ্রস্থের আর এক, সন্ন্যাসীর আর এক; সাত্ত্বিকের সাধনা এক, রাজসিকের আর এক, তামসিকের আর এক; জ্ঞানীর সাধনা এক, ভক্তের আর এক, কর্মীর আর এক। হিন্দুধর্মে এই ব্যক্তিত্ব-বিশ্লেষণ আছে বলিয়াই, অপর ধর্মের মত এক নিরাকার উপাসনা অথবা এক সাকার উপাসনা সর্বত্র সমানভাবে চালাইবার চেষ্টা করা হয় নাই। সেই হেতু অন্য ধর্মে যাহারা পাপী-তাপী-পতিত বলিয়া ঘৃণার ও বর্জনের পাত্র, তাহারাও আশ্রয় পাইয়াছে হিন্দুধর্মের কোলে। তাহাদেরও উপযোগী ধর্মসাধনার ব্যবস্থা হিন্দুধর্ম দিয়াছেন। সর্বাবস্থায় সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষনীয় বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা-বিধান যেমন এক হয় না, সর্বাবস্থায় সকল সাধকের পক্ষে সাধনীয় বস্তু সম্বন্ধে সাধনার বিধান তেমনি এক হইতে পারে না। অতএব, হিন্দুধর্মের এই অধিকারবাদ যুক্তিসম্মত।

[পাঁচ]

সার্বভৌমিকতা।

ধর্মোঽখিলং বেদমূলং—বেদ সকল ধর্মের মূল। জগতে এমন কোন ধর্ম নাই, যাহার মূল তত্ত্ব বেদে নাই। যে সকল ধর্ম একেশ্বরবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদের সেই একেশ্বরবাদ মূলতঃ বেদ হইতে লওয়া।

কি প্রাচ্য—কি পাশ্চাত্য—পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে স্বীকার করেন যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ হইল বেদ। হিন্দু বেদপন্থী—বৈদিক ধর্মই যথার্থ হিন্দুধর্ম। বৈদিক ধর্মের পশ্চাৎ উদ্ভূত হয় অন্য ধর্মসমূহ এবং বেদের পরে রচিত হয় অন্য ধর্মসমূহের ধর্মগ্রন্থগুলি—ইহা ধর্মেতিহাসের কথা।

বৈদিক ধর্মই সকল ধর্মের মূল

জগতে প্রধান ধর্ম ছয়টি—বৈদিক ধর্ম বা বেদপন্থী হিন্দুধর্ম, পারসিক ধর্ম, ইহুদী ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম এবং ইস্‌লাম। কালের পৌর্বাপর্য অনুসারে এইগুলি উল্লিখিত হইল। সকলের পরে ইস্‌লাম। ইহাদের মধ্যে ইহুদী ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও ইস্‌লাম সম্পূর্ণ বহির্ভারতের এবং সেমিটিক (Semetic) জাতীয়। তাহাদের জন্মস্থানগুলি পরস্পর নিকটবর্তী। তাহাদের জন্মস্থান যথাক্রমে—প্যালেষ্টাইন, জেরুজালেম এবং মক্কা-মদিনা। এই সব স্থান ভৌগলিক দৃষ্টিতে এক অঞ্চলের অন্তর্গত। ধর্মেতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই ত্রিবিধ সেমিটিক ধর্মের উৎপত্তি পারসিক ধর্ম হইতে। কিন্তু পারসিক ধর্ম মূলতঃ বহির্ভারতের হইলেও আর্যজাতীয় এবং বৈদিক ধর্মের যমজ ভ্রাতা। এই বিষয়ে প্রথম অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। (১) বৌদ্ধধর্ম, বৈদিক ধর্মের বিদ্রোহী সন্তান মাত্র; অতএব আর্যজাতীয়। কি প্রকারে বৈদিক ধর্ম হইতে অবশিষ্ট অপর ধর্মসমূহ উদ্ভূত হইয়াছিল, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

হিন্দুর মূল ধর্মগ্রন্থ—বেদ; পারসিকের—জেন্দ্‌-আবেস্তা; ইহুদীর—প্রাচীন বাইবেল (Old Testament); বৌদ্ধের—ত্রিপিটক; খ্রীষ্টপন্থীর—নব্য বাইবেল (New Testament); এবং মুসলমানের—কোরাণ। হিন্দুদের বিশ্বাস, বেদ কালাতীত। (২) বেদগ্রন্থ

(১) ২—৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (২) ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কাহারো রচিত না হইলেও সর্বপ্রথম সঙ্কলিত হয় আনুমানিক ৪০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং সেই সঙ্কলিত মন্ত্ররাশি ঋগাদি চারি ভাগে বিভক্ত হয় আনুমানিক ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। (৩) জেন্দ্-আবেস্তা জেন্দ্ ভাষায় প্রণীত হয় আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। প্রাচীন বাইবেল হয় হিব্রু ভাষায় আনুমানিক ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। (৪) ত্রিপিটক (৫) হয় পালি ভাষায় আনুমানিক ৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। নব্য বাইবেল হয় গ্রীক ভাষায় আনুমানিক ৩০ খ্রীষ্টাব্দে। কোরাণ হয় আরবি ভাষায় আনুমানিক ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে। জেন্দ্ ভাষা, বৈদিক ভাষার রূপান্তর মাত্র। পারসিকগণ অসুরোপাসক আর্য, আর বৈদিকগণ দেবোপাসক আর্য। পারসিকদের এবং বৈদিক আর্যদের ধর্মমতের ও ধর্মানুষ্ঠানের সারাংশ প্রায় একরূপ, ইহা আমরা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি। সেই কারণ, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে, পারসিক ধর্মের সার বেদ হইতে গৃহীত। কেহ কেহ বলেন যে, বেদব্যাসের সহিত জরথুস্ত্রের মিলন হইয়াছিল, এই কথাও নাকি জেন্দ্-আবেস্তায় আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে বৈদিক ধর্ম যে পারসিক ধর্মে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

পারসিক ধর্মের সার বেদ হইতে গৃহীত

পারসিকগণ পারস্যদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। পারস্যদেশ এবং ইহুদী ধর্মের জন্মস্থান প্যালেষ্টাইন প্রদেশ নিকটবর্তী। প্রাচীন

(৩) ৫৭—৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) ইহাতে মুশার (Moses) প্রবর্তিত [১৫৭১ খ্রীঃ পূঃ] বিধান লিপিবদ্ধ। এই বিধানই ইহুদী ধর্ম।

(৫) ইহাতে বিনয়-পিটক, সূত্র-পিটক ও অভিধর্ম এই তিন অংশ আছে। তাই, ইহার নাম ত্রিপিটক। প্রসিদ্ধ ধম্মপদ-নামক গ্রন্থ সূত্র-পিটকের অন্তর্ভুক্ত।

বাইবেলের মতে এব্রাহিম (Ibrahim) ইহুদী জাতির পিতামহস্থানীয়। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ (৬) বলেন যে, এই এব্রাহিম ও জরথুস্ত্র সমসাময়িক এবং তাঁহারা দুই জন নাকি অসুরোপাসক আর্যদিগের আর্যনোবীজো-নামক প্রাচীন উপনিবেশে কিছুকাল একত্র বাস করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় পারসিক ধর্মের মতবাদ ইহুদী ধর্মে অনুস্যূত হওয়া খুব স্বাভাবিক। তাই দেখা যায় যে, জেন্দ্-আবেস্তার ঈশ্বরতত্ত্ব, সয়তানবাদ, স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব, সমাধি হইতে পুনরুত্থান, বিচার-দিবস ইত্যাদি মতবাদ প্রাচীন বাইবেলে স্থান পাইয়াছে। যেহেতু পারসিক ধর্মের উৎপত্তি বৈদিক ধর্ম হইতে, সেই হেতু বলিতে পারা যায় যে, ইহুদী ধর্মও বৈদিক ধর্মের দ্বারা পারসিক ধর্মের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত। বৈদিক ধর্মের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে বিস্তার করে ইহুদী ধর্মে পশুবলিপ্রথায়। ইহুদী ধর্মের উপাসনায় বৈদিক পশুযজ্ঞ বিশেষভাবে স্থান পায়। ইহুদীগণ পাপ-ক্ষালনার্থে পশুবলি দিতেন। জেহোবার মন্দিরে হাজার হাজার পশুবলি হইত। হিন্দুধর্মের সাকার উপাসনাও প্রকারান্তরে ইহুদী ধর্মে প্রবেশ করে।

পারসিক ধর্ম হইতে ইহুদী ধর্মের উৎপত্তি

পরবর্তীকালে ঈশা (Jesus) প্যালেষ্টাইন প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে জুডিয়ার অন্তর্গত বেথলেহেমে (Bethlehem of Judea) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন নাজারেথ (Nazareth) গ্রামের সূত্রধর যোসেফ্ (Joseph) এবং মাতা ছিলেন মেরী (Mary)। ঈশা স্বয়ং ইহুদী। কিন্তু তিনি ইহুদী ধর্মের ব্যাপক পশুবলি ও সাকার উপাসনা ইত্যাদি সমর্থন না করিয়া, এই ধর্মের সংস্কার-সাধন করেন। তাঁহা

সুসংস্কৃত ইহুদী ধর্মই খ্রীষ্টধর্ম

(৬) Dr. Spiegel

কর্তৃক সুসংস্কৃত ইহুদী ধর্ম—খ্রীষ্টধর্ম। ঈশার উপদেশাবলী সব ছিল মৌখিক। তিনি স্বয়ং কোন ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, কিংবা তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা কোন ধর্মগ্রন্থ রচিত হয় নাই। তাঁহার তিরোভাবের ~~প্রায় ত্রিশ বৎসর~~ পরে, তাঁহার শিষ্যবর্গ নব্য বাইবেল রচনা করেন। খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্বাংশ সম্পূর্ণরূপে ইহুদী ধর্ম হইতে গৃহীত। যথা—ঈশ্বরতত্ত্ব, সয়তানবাদ, স্বর্গীয় দূত ইত্যাদি। খ্রীষ্টধর্মের নৈতিক অংশসমূহ বৌদ্ধধর্মের নীতিকথা অবলম্বনে রচিত। যথা—অহিংসাবাদ, দয়া-দাক্ষিণ্য, দীনতা, ক্ষমা ইত্যাদি। বৌদ্ধধর্মের ত্রিপিটকের অন্তর্গত জাতক। এমন কি, এই

বৌদ্ধধর্ম হইতে খ্রীষ্ট-ধর্মের নৈতিক অংশ গৃহীত

জাতকের নীতিগর্ভ গল্পমালার অনুকরণে নব্য বাইবেলে জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে কতকগুলি তদ্রূপ গল্পের (parables) অবতারণা করা হইয়াছে। বৌদ্ধমঠের আদর্শ অনুযায়ী ক্যাথলিক খ্রীষ্টিয়ানদল তাঁহাদের মঠ নির্মাণ করেন। ইহার কারণ, স্বয়ং ঈশা বৌদ্ধধর্মের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ঈশার জন্মের এক শত বৎসর পূর্বে প্যালেষ্টাইনে এসেনিস্ (Essenes) নামে এক ইহুদী সম্প্রদায় ছিল। (১) এই সম্প্রদায়টি বৌদ্ধ ভিক্ষুসম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিয়া একেবারে তদ্ভাবান্বিত হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের মত তাঁহারা সন্ন্যাসী ছিলেন। অতএব এই সম্প্রদায়টিকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়

(১) Pliny নামক একজন প্রখ্যাত রোমবাসী Naturalist ২৩ খৃঃ হইতে ৭৯ খৃঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি ঐ এসেনিস্ সম্প্রদায় সম্পর্কে চাক্ষুষ প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"On the western shore of the Dead Sea dwelt the Essenes. They are an Eremite clan, one marvellous beyond all others * * *, without any women, with sexual intercourse entirely given up, without money, and the associates of palm trees."—H. C. A. I.

বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকে বলেন যে, ঈশার অভিষেক গুরু জোহন (John the Baptist) একজন এসেনিস্ ছিলেন এবং তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুসম্প্রদায়ের ন্যায় কাষায়-বাস পরিধান করিতেন। নব্য বাইবেলের কথা—ঈশার জন্মের সময় তাঁহার জন্মস্থানে প্রাচ্য পণ্ডিতগণ আসিয়াছিলেন। (২) তখন প্রাচ্যে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান-কাল। এখানে প্রাচ্য পণ্ডিতগণ বলিতে বৌদ্ধ আচার্য ও প্রচারকদিগকে বুঝায়। ঈশার সুদীর্ঘ অজ্ঞাতবাস সম্বন্ধে নব্য বাইবেলে কিছু পাওয়া যায় না। তাহার প্রধান কারণ, ঈশার তিরোভাবের ~~প্রায় ত্রিশ বৎসর~~ পরে নব্য বাইবেল লিখিত হয় এবং এই গ্রন্থে তাঁহার শিষ্যবর্গ তাঁহার সিদ্ধিলাভের পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলীই বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করেন, পূর্বের সাধনজীবনের প্রসঙ্গ তেমন কিছু উল্লেখ করেন নাই। ঈশার অজ্ঞাতবাস হয় তাঁহার সাধনজীবনে। পণ্ডিতদের মতে, ঈশা অজ্ঞাতবাসের সর্বপ্রথমে মিশরে আসেন। তখন মিশরে থেরাপিউট্ (Therapeuts) নামে বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন এসেনিস্ সম্প্রদায়ের এক শাখা ছিল। তাহাদের সঙ্গলাভে তিনি অধিকতর বৌদ্ধনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। তারপর, মিশর হইতে তিনি আসেন কাশ্মীরে। আঠার হইতে বত্রিশ বৎসর বয়স অবধি তিনি ভারতে হিন্দু বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ন্যায় অতিবাহিত করেন এবং প্রাচীন আর্যাবর্তের শিক্ষা-সংস্কৃতির সহিত সুপরিচিত হন। অজ্ঞাতবাসের পর ভারত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঈশা তাঁহার নব মতবাদ প্রচার করেন। (৩) ঈশা ও তাঁহার

ঈশার বৌদ্ধসঙ্গলাভ ও অজ্ঞাতবাস মিশরে, কাশ্মীরে এবং ভারতে

(২) St. Matthew, II—1

(৩) নিকোলাস্ নটোভিস্ নামে এক রুশ ঐতিহাসিক নাকি তিব্বতের এক বৌদ্ধ মঠ হইতে ঈশার ভারতবাসসংক্রান্ত একখানা প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন।

শিষ্যবর্গ ছিলেন গৃহত্যাগী ও ব্রহ্মচারী। তিনি যে এই ত্যাগ-ব্রহ্মচর্য-ব্রত বৌদ্ধ ভিক্ষু অথবা হিন্দু সন্ন্যাসাশ্রম হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সুস্পষ্ট। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধধর্মের জননী বৈদিক ধর্ম। বৌদ্ধধর্মের অহিংসা, দয়া-দাক্ষিণ্য ও ক্ষমা প্রভৃতি উচ্চ স্তরের নীতিকথা নূতন নহে। এইগুলি বেদ হইতে গৃহীত। প্রাচীনতম ঋগ্বেদেও এই সকল নীতিমূলক মন্ত্র আছে। অতএব, খ্রীষ্টধর্মের ভিতর পরোক্ষভাবে বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে বৈদিক ধর্মের অনুপ্রবেশ স্পষ্টতঃ দেখা যায়। খ্রীষ্টধর্মের ভিতর বৈদিক ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় অধ্যাত্মবাদে। বৌদ্ধধর্ম আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই; কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বাইবেলে অধি-আত্মার অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত। (৪) খ্রীষ্টধর্মের এই অধ্যাত্মবাদ যে বৈদিক ধর্ম হইতে গৃহীত তাহা সহজে অনুমিত হয়। মনে হয়, যখন ঈশা (Jesus) ভারতে অজ্ঞাতবাস করেন তখন এই বেদ-মূলক অধ্যাত্মবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন।

ইস্‌লামের প্রবর্তক, হজরত মহম্মদ। তিনি আরব্যদেশে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় সেই দেশে সাকার দেব-দেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। হজরত মহম্মদ ছিলেন একেশ্বরবাদী এবং নিরাকার উপাসনার সমর্থক। তাই, তিনি তৎকালীন প্রচলিত ধর্মের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ইস্‌লাম প্রধানতঃ ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের উপর এবং গৌণতঃ পারসিক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাইবেল-কোরাণের সাদৃশ্য অতিমাত্রায়। জেন্দ্-আবেস্তার ঈশ্বরতত্ত্ব, সয়তানবাদ, স্বর্গীয় দূত, পুনরুত্থান, বিচারদিবস ইত্যাদি মতবাদ

পারসিক, ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের উপর ইস্‌লাম প্রতিষ্ঠিত

(৪) ১৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন ও নব্য বাইবেলের মাধ্যমে কোরাণেও স্থান পাইয়াছে। যেহেতু পারসিক, ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় ধর্মের উচ্চ তত্ত্বের সারাংশসমূহ আসলে বেদ হইতে গৃহীত এবং ইস্‌লাম যেহেতু ঋণী ঐ সকল ধর্মের কাছে, সেই হেতু ইস্‌লামের উচ্চ তত্ত্বগুলির মাঝে যে পরোক্ষভাবে বৈদিক ধর্মতত্ত্ব অনুপ্রবিষ্ট, ইহা বলিলে ভুল হয় না। ইস্‌লামের একেশ্বরবাদ এবং নিরাকার উপাসনার মূলে সেই প্রাচীনতম বেদের প্রভাব বিদ্যমান। সাকার-নিরাকার উপাসনার দ্বন্দ্ব হিন্দুধর্মেও আছে। (৫) কিন্তু হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব এই যে, এই দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও উভয়কে স্থান দিয়াছেন পাশাপাশি আপনার কোলে। এখন এই সকল আলোচনার সিদ্ধান্ত—জগতে ছয়টি প্রধান ধর্মের আদি ও মূল বৈদিক ধর্ম এবং সেই ধর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অপর ধর্মগুলির উচ্চ তত্ত্বরাশির অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট, সেই নিমিত্ত বৈদিক ধর্ম বা বেদপন্থী হিন্দুধর্ম সার্বভৌমিক। এই সিদ্ধান্তবশতঃ মনু মহারাজ তারস্বরে গর্বভরে ঘোষণা করিয়াছেন—পৃথিবীর সর্বদেশীয় মানব এই আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণদিগের অর্থাৎ বেদবিদ্ পণ্ডিতদিগের নিকট নিজ নিজ চরিত্র-নীতি শিক্ষা করিয়াছে। (৬) ইহা অত্যুক্তি নহে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এককালে বহির্ভারত হইতে বিদ্যার্থিগণ আর্যভারতে আসিয়া এখানকার পণ্ডিতদের নিকট শিক্ষালাভ করিত, এবং আর্যভারতও বাণিজ্যব্যপদেশে বহির্ভারতে যাইয়া ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রচার

তাই ইস্‌লামের উচ্চ তত্ত্বসমূহে বৈদিক ধর্ম-তত্ত্ব অনুপ্রবিষ্ট

(৫) ৪২১-৪২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৬) এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাৎ অগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ ॥
—মনু, ২।২০

করিতেন। জাভা, সুমাত্রা, মালয় উপদ্বীপ, বলী দ্বীপ, ইন্দোচীন এবং কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে তাঁহাদের সর্বদা যাতায়াত ছিল। ঐ সকল দেশে হিন্দুরাজ্যও স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীন পারস্যে, আরবে, সিরিয়াতে, মিশরে, জাপানে, দক্ষিণ আমেরিকায় এবং মেক্সিকোতে হিন্দুধর্ম বিস্তারলাভ করে। ঐ সকল দেশে হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। যে কারণেই হোক্ মধ্যযুগে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইলে, বহির্ভারতে ঐ প্রচারের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। তাই বলা যাইতে পারে যে, জগতে সুশিক্ষার ও সুসংস্কৃতির আদি ধারক, বাহক ও প্রচারক এই ভারত—আর্যভারত—আর্যহিন্দুভারত। (১)

[ছয়]

পরিবর্তনশীলতা।

অন্য ধর্মে শাশ্বত সনাতন সত্য অল্প, অধিকাংশ আচার-অনুষ্ঠানে ও চরিত্র-নীতিতে পূর্ণ এবং তাহাও বহু ক্ষেত্রে একদেশী। সেই নিমিত্ত যে যুগে যে ধর্মের উৎপত্তি সেই যুগে তাহা যেমন কার্যকরী হয়, পরবর্তী যুগে পরিবেশের ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে আর তাহা

---

(১) সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত ক্রুজার (Creuzer) এই কথাই বলিয়াছেন অন্য প্রকারে। তাঁহার উক্তি—

"If there is a country on earth which can justly claim the honour of having been the cradle of the human race, or at least the scene of a primitive civilization, the successive developments of which carried into all parts of the ancient world, and even beyond, the blessings of knowledge, which is the second life of man, that country is assuredly India."—H. C. A. I.

এখানে India শব্দে অবশ্য তিনি প্রাচীন আর্যহিন্দুভারতকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

তেমন কার্যকরী হয় না। যুগ-পরিবর্তনে যুগপ্রেরণা অনুসারে সেই ধর্ম তাহার আবরণ বদলাইতে জানে না, কাজেই বর্তমানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না। ঈশা-প্রচারিত ধর্ম এখনো প্রায় তাহাই আছে, হজরত মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম এখনো প্রায় তাহাই আছে। হিন্দুধর্মের প্রকৃতি ঠিক ঐ রকম নহে। হিন্দুধর্মে বেদ-বেদান্তের প্রচারিত শাশ্বত সনাতন সত্যগুলিকে যুগপ্রেরণা অনুসারে যুগে যুগে যুগধর্মের পরিচ্ছদ পরাইয়া দেওয়া হয়, যাহাতে প্রত্যেক যুগের লোক অনায়াসে ঐ সত্যগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া অনুধাবন করিতে সক্ষম হয়। এই কারণ, হিন্দুধর্মের সনাতন সিদ্ধশাস্ত্র বেদ হইলেও, স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, পঞ্চরাত্রসংহিতা, শৈব আগম প্রভৃতি নানা যুগধর্মশাস্ত্র (২) হইয়াছে। হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম, তথাপি ইহা এখনো জীবন্ত। তাহার অন্যতম কারণ, যুগে যুগে যুগ-প্রেরণা অনুসারে তাহার বাহ্যাবরণের পরিবর্তনশীলতা। এই বাহ্যাবরণের পরিবর্তনশীলতার অভাবে সুপ্রাচীন অন্য ধর্মসমূহের চিহ্ন পর্যন্ত এখন লুপ্ত। প্রাচীন এসিরিয়া, বেবিলোনিয়া, মিশর, গ্রীস এবং রোম তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম অনেক দিন হারাইয়াছে। এখন সেই সব দেশে সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম। পুণ্যভূমি ধর্মভূমি ভারতবর্ষ কেবলমাত্র দাবী করিতে পারে যে, তাহার সেই সনাতন ধর্ম এখনো সে হারায় নাই।

(২) ৫০ ও ৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

[সাত]

আত্মনির্ভরতা।

অন্য ধর্মে মানবের আত্মনির্ভরতার স্থান কম। খ্রীষ্টধর্ম, ইস্‌লাম প্রভৃতিতে বিচার-দিবসের কল্পনাটি মানুষকে যেন সর্বদা কিছু ভীত করিয়া রাখিয়াছে। জীবদ্দশায় যেটুকু সৎকাজ করা যায়, তাহা যেন নরকের ভয়ে; পাছে পরমেশ্বর বিচারদিবসে নরকভোগের নির্দেশ দেন। খ্রীষ্টধর্ম বলেন যে, আমরা জন্মপাপী! মানুষ যদি নিয়ত আপনাকে জন্মপাপী ভাবে, যদি সে সারাজীবন নরকের ভয়ে ভীত হয়, তবে তাহার যথার্থ আত্মবিশ্বাস—আত্মনির্ভরতা—আত্মশক্তি কথনো জন্মিতে পারে না। হিন্দুধর্মে মানুষকে ঐ রকম ঘৃণ্য ও পাপী বলিয়া কল্পনা করা হয় নাই, অথবা তাহাকে নরকের ভয়ে সর্বদা ভয়যুক্ত করিয়া রাখা হয় নাই। হিন্দুর উপনিষদ্ পাঞ্চজন্যশঙ্খনিনাদে ঘোষণা করিয়াছেন—অভীঃ, হে মানব! তুমি ভয়শূন্য হও। সকল জীবের সকল ত্রাসের সেরা—মরণত্রাস। মরণের ভয় পশু-পক্ষীর ও কীট-পতঙ্গের হইতে মানুষের পর্যন্ত। হিন্দুধর্ম এই মরণত্রাসকে অতিক্রম করিতে বার বার উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—হে মানব! তুমি মৃত্যুকে জয় কর, মৃত্যুঞ্জয় হও, স্থূলদেহের নাশে তোমার নাশ নাই, তুমি বস্তুতঃ অজর অমর, জরা-মরণ-ভীতি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তুমি অমৃতের সন্তান। হিন্দুধর্ম বলেন—হে মানব! তুমি নিজ কর্মফলের দ্বারা তোমার স্বর্গ-নরক তুমি সৃষ্টি করিতে পার, তুমি বিশ্বাস কর যে

অন্য ধর্মে মানুষ ঘৃণ্য, পাপী ও বিচারযোগ্য তাই আত্মনির্ভরতার স্থান কম

হিন্দুধর্মে মূল মন্ত্র—অভীঃ; তাই আত্ম-নির্ভরতার স্থান যথেষ্ট

তোমার মাঝে অনন্ত শক্তি নিহিত, তুমি স্বীয় সাধনার সাহায্যে দেবত্বলাভেও সক্ষম। হিন্দুধর্ম বলেন—হে মানব! তুমি জন্মপাপী নও, তুমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা, শুধু মায়ামোহে আপনাকে ক্ষুদ্র-বদ্ধ-নীচ মনে করিয়া বৃথা দুঃখ-কষ্ট পাইতেছ, সেই মোহ দূর কর। ইহা সত্যসত্যই খুব আশ্বাসের—আত্মবিশ্বাসের—আত্মনির্ভরতার বাণী।

হিন্দুধর্মসম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি। এইবার

শেষ কথা

কিছু বলিয়া উপসংহার করি। অধুনা হিন্দুধর্মের মাঝে কিঞ্চিৎ আবর্জনা জমিয়াছে, ইহা স্বীকার্য। তবে জগতে এমন কোন ধর্ম নাই—কি খ্রীষ্টধর্ম, কি ইস্‌লাম—যাহার ভিতর কোন আবর্জনা জমে নাই। হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম। কাজেই কালবশে এই ধর্মের অভ্যন্তরে যে কিছু আবর্জনা রাশিকৃত হইবে, ইহা খুব স্বাভাবিক। এই আবর্জনার পরিশুদ্ধিকল্পে প্রয়োজন—শাশ্বত সনাতন বৈদিক মূল তত্ত্বের ভিত্তিতে এবং ঋষি-মহাপুরুষদের প্রদর্শিত পথে বর্তমানের উপযোগী ধর্মসংস্কার। ইদানীং ভারতে হিন্দুধর্ম-সংস্কারের আন্দোলন ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। তবে কথা এই যে, হিন্দুধর্মের মাঝে কিছু আবর্জনা জমিয়াছে বলিয়া হিন্দুনামে আত্ম-পরিচয় দিতে কোন হিন্দুরই লজ্জা-বোধ করা উচিত নহে; বরং সেই সুপ্রাচীন সুমহান আর্যঋষিগণের সন্তান মনে করিয়া প্রত্যেক হিন্দুরই আপনাকে হিন্দুনামে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করা উচিত। অলমতিবিস্তরেণ। নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ ॥

সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	পাদটীকা (২)	বেদ-বেশিকা	বেদ-প্রবেশিকা
৫	৭	আর্যনোবীজোর	আর্যনোবীজো
৫	৮	আর্যনোবীজো	আর্যনোবীজোর
৮	৯	তুশরও	তুশরত্ত
৯	৯	কো-লি-সি-সা-টাং-না	ফো-লি-সি-সা-টাং-না
৯	১৬	আয়ূকাল	আয়ুকাল
১২	১২	ভুমি	ভূমি
১২	১৬	উত্তরাংশ ও	উত্তরাংশও
১৪	পাদটীকা (১)	জয়পূর	জয়পুর
১৬	১৯	কোল	চোল
১৯	৩	জম্ম	জন্ম
১৯	১৩	বহ	বহু
২২	১	বীর্যতে	ধার্যতে
২৫	পার্শ্বটীকা	আর্ব	আর্য
২৮	৯ ও ১৪	উদ্ভুত	উদ্ভূত
২৮	১৭	সম্পুর্ণ	সম্পূর্ণ
২৮	১৮	সংকার	সংস্কার
২৯	১৬	সংকারের	সংস্কারের
৩০	৫	তাঁহাদেব	তাঁহাদের
৩০	৮	মাতৃতুল্য	মাতৃতুল্য
৩৬	৭	হিন্দুধর্মের	হিন্দুধর্মের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৯	১৩	ধর্ম্মুই	ধর্মই
৪০	১০	রাগ-দ্বেষ-ম্মক্ত	রাগ-দ্বেষ-মুক্ত
৪১	১১	হিন্দুধর্ম	হিন্দুধর্ম
৪৪	১	ধমাচরণের	ধর্মাচরণের
৪৮	১৫	ধর্মের ও	ধর্মেরও
৫৯	১৫	পারম্পর্য	পারম্পর্য
৬৩	৬	কৌযিতকী	কৌষিতকী
৬৮	৪	সত্য সমূহ	সত্যসমূহ
৭৪	৬	অন্য	বাইবেল ছাড়া অন্য
৭৪	৭	গীতার	বাইবেল বাদে গীতার
১০১	৭	আটটি	পাঁচটি
১০৪	৮	ন্যায়-দর্শন ও	ন্যায়-দর্শনও
১২১	১৭	উর্ধে	উর্ধ্বে
১২৩	৬	ভাস্য	ভাষ্য
১২৪	১২	নাপবঃ	নাপরঃ
১২৯	১১	১০৩৭ খ্রীঃ	১০১৭ খ্রীঃ
১৩৬	পাদটীকা (১)	নির্বিতি	নির্বৃতি
১৩৭	২	১৪০১ খ্রীঃ	১৪৭৯ খ্রীঃ
১৪২	২০	চার্বাক-দর্শন ও	চার্বাক-দর্শনও
১৫৩	১	মহাচিৎগগণে	মহাচিৎগগনে
১৫৪	৯	অনুস্যুত	অনুস্যূত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫৪	পাদটীকা (১)	সম্ভবতাহ	সম্ভবতীহ
১৬৪	৫	ঊর্দ্ধে	ঊর্দ্ধ্বে
১৬৮	পাদটীকা (২)	সুখ দুঃখো বিপর্যয়ে	সুখী দুঃখী বিপর্যয়ে
১৭০	১৮	বসিয়া বসিয়া	বলিয়া বসিয়া
১৭৩	১৮	মেযন	যেমন
১৭৫	১৭	জৈনধর্মের	জৈনধর্মে
১৮১	১	ঊর্দ্ধে	ঊর্দ্ধ্বে
২০৩	পাদটীকা	দ্রকে	শূদ্রকে
২২৪	পাদটীকা	(৬)	(৩)
২৩৫	পাদটীকা (৫)	ব্রজ্রত্যধঃ	ব্রজত্যধঃ
২৫৪	৭	ব্রহ্মশক্তির	ব্রহ্মশক্তি
২৬৩	পাদটীকা (৩)	বায়ুকে	বায়ুকে
২৬৭	১৩	ল স্থূজীবাদির	স্থূলজীবাদির
২৯৯	২০	রত্নবীতমম্	রত্নধাতমম্
৩১৪	১৬	অনুস্যূত	অনুস্যূত
৩২৯	৬	রন্ধের	রন্ধ্রের
৩৩৯	পাদটীকা (৭)	—যোঃ সূঃ, ২।	—যোঃ সূঃ, ২।৪৯
৩৭০	২	সন্নাসগ্রহণ	সন্ন্যাসগ্রহণ
৩৮১	পাদটীকা (২)	২৯৫	২৭৫
৪১৩	৬	সন্মুখে	সম্মুখে
৪৪৩	১	এব্রাহিম (Ibrahim)	এব্রাহাম (Abraham)
৪৪৩	২	এব্রাহিম	এব্রাহাম